# শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

## দ্বিতীয় খণ্ড

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Srimad Bhagavat Gita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

তৃতীয় অধ্যায়

## কর্মযোগ

গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের পণ্ডিতরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে, ন্যায় শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম ও ব্যাখ্যার সাহায্যে তাঁদের নিজস্ব দর্শনকে সামনে রেখে বোঝাতে চাইবেন গীতা তাঁর দর্শনের কথাই বলছে। একজন একটা যুক্তি নিয়ে আসবেন, আর-একজন আর-একটি যুক্তি এনে আগের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেবেন, তিনি আবার একটা পাল্টা যুক্তি আনবেন, এইভাবে বিতর্ক চলতেই থাকবে। এখানে আমরা ঐ ধরণের কোন আলোচনাতেই যাব না। আমরা শুধু দেখব গীতা কি বলতে চাইছে, শুধু গীতার মূল ভাবকে তুলে ধরার চেষ্টাই করা হবে। অবশ্য গীতার অনেক জায়গা বোঝা ও ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন, যেখানে সঠিক ভাবকে ধরে রাখা খুব মুশকিল।

টানা পনের-কুড়ি বছর ধরে কোন ভাষ্যাদিকে অবলম্বন করে নিয়মিত যদি গীতা একটু একটু করে প্রতিদিন অধ্যয়ন করা যায় তখন কোথাও কোথাও গিয়ে গীতার আসল ভাবটা স্পষ্ট হতে শুরু হয়। যে কোন আচার্যের পক্ষেই গীতার সারতত্ত্ব কারুর মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় অসম্ভব, যতক্ষণ না নিজে থেকে ধারণা না হবে ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাবে না। আচার্য শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যাবেন, কিন্তু গীতা বুঝতে হলে নিজেকেই বুঝতে হবে, তারজন্য আগে চাই অন্তর্মুখীনতা, নিয়মিত জপ-ধ্যান করে করে মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। শৈশবকাল থেকে আমরা এই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জগতকে গ্রহণ করার শিক্ষা পেয়ে এসেছি, কিন্তু ভিতর থেকেও আমাদের যে জ্ঞান হয় এই ব্যাপারটা আমাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই মানতে চায় না। এই কারণেই গীতা বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন বলা হয়।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান এক জায়গায় বলছেন *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। কর্মযোগ কি? কাজ কর কিন্তু ফলে আসক্তি রাখবে না। এতটুকু বুঝে নিলেই তো পুরো গীতা বুঝে গেলে। তা কি কখন হয়? আচার্য শঙ্কর গীতা ভাষ্যের প্রথমের দিকে এক জায়গায় বলছেন, গীতায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, সেইজন্য গীতাকে বুঝে নেওয়া এবং ধারণা করে ধরে রাখাটা খুব কঠিন। তার থেকেও বেশি, গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন তত্ত্বকে গীতায় একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, ফলে গীতা বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। পরম্পরা গত বিদ্যায় বলা হয়, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যদি ভাল থাকে, প্রকরণ গ্রন্থ, অর্থাৎ যে যে শাস্ত্রগুলি দিয়ে শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু হয়, যেমন বিবেকচূড়ামণি, দৃক্-দৃশ্য বিবেক এই ধরণের গ্রন্থগুলো একটু অধ্যয়ন করে নেওয়ার পর বেদের উপর কিছু ধারণা থাকা দরকার, উপনিষদের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার, তবে গিয়ে যদি গীতা বোঝা যায়। গীতা একদিকে উপনিষদের সার, অন্য দিকে সমন্বয় শাস্ত্র। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে* বলে ভগবান সূত্রাকারে ছেড়ে দিলেন। আমরা আগে বলেছি যে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যে দর্শন তার পুরো বীজাকারে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক-একটা বীজকে পরে পরে এক-একটা অধ্যায়ে বিস্তারে বলা হয়েছে। বিস্তারে বলা

হলেও কোথাও কোন পুনরাবৃত্তি নেই। পুনরাবৃত্তি থাকুক বা নাই থাকুক তত্ত্ব কিন্তু একই থাকবে, তত্ত্ব তো আর পাল্টে যেতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের কথা শুরু করছেন *প্রজহাতি যদা কামান্ দিয়ে*, তার একটু আগে ভগবান বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। আমরা সাধারণ ভাবে গীতাকে ভক্তি ভাবে নিয়ে থাকি, আমরা মনে করি গীতা ভগবানের কথা, ঠাকুর বলেছেন সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাক গীতা সঙ্গে থাকবে, ঠাকুর আবার বলছেন, গীতা তিনবার বললে যা হয়, গীতা মানেই তাই, গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়, গীতা বলছেন সব ত্যাগ কর। এটুকু শুনে নিয়ে আমরা মনে করি, গীতাতে কি আছে আমার জানা হয়ে গেল।

কারুর বুদ্ধি যদি একটু তীক্ষ্ণ হয়, সে তখন বলবে গীতার এই দুটো শ্লোকের মধ্যে তো বিরোধ দেখা যাচ্ছে। একদিকে ভগবান বলে দিলেন, কাজ কর, কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু ফলের প্রত্যাশা করবে না। আবার বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, কাজের যে কৌশল এটাই যোগ। আবার তার আগে বলছেন, *প্রজহাতি যদা কামান্*, যার কাম খসে পড়ে গেছে সে কেন কাজ করবে। সৃষ্টিকে নিয়ে অদ্বৈতবাদীরা খুব মজা করে বলেন, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি আপ্তকাম, যার কোন কামনা নেই, তিনি সৃষ্টি কেন করবেন! আপনারাই বলছেন, ঈশ্বর পূর্ণকাম, তবে তিনি কেন সৃষ্টি করতে গেলেন? কারণ যে কোন কাজ করার জন্য একটা ইচ্ছা লাগে। ইচ্ছা হওয়া মানেই সে অপূর্ণ, তাহলে ভগবান কি অপূর্ণ? তাহলে তিনি সৃষ্টি কেন করলেন? তখন বলবে, বাচ্চা যেমন করে। ও, তাহলে আপনার ভগবান কি বাচ্চা? বিনা কোন উদ্দেশ্য, বিনা কোন ইচ্ছা ছাড়া একমাত্র পাগল কাজ করে। আপনার ভগবান কি পাগল? প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন উত্তর নেই।

ধর্মীয় শাস্ত্রে এই ধরণের গভীর প্রশ্ন আসে, আর এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বড় বড় ঋষি মহাত্মাদেরও ঘাম ছুটে যায়। রামানুজাচার্য, মাধ্বাচার্য, খ্রীশ্চান ফিলজফি, ইসলামিক ফিলজফ, জুইস ফিলজফি, কেউই ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু উত্তর তো একটা দিতে হবে, তাই বলে দেন, ঠাকুরের ইচ্ছা, আল্লার মর্জি, প্রভুর ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা ইত্যাদি। তাঁর ইচ্ছা মানে, তুমি সোজাসুজি বল না ভাই, আমি জানি না, আমার জানা নেই। বেদান্ত এটাই বলে, দেখ ভাই, আমার জানা নেই সৃষ্টি কেন হল, কিভাবে হল, এরই নাম মায়া। কিন্তু যাঁরা ঘোর অদ্বৈতবাদী, তাঁরা বলবেন, সৃষ্টি আদপেই হয়নি, এ যা কিছু দেখছ সব নাম আর রূপের খেলা। স্বামীজীর দেববাণীতে খুব সুন্দর ভাবে বেদান্ত, ভক্তি, দ্বৈত সব কিছুকে একটা প্ল্যাটফরমে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য দেববাণী সবারই একবার পড়া দরকার। এই যে গীতায় দুটি বিপরীত কথা, একদিকে বলছেন তুমি কাজ কর, অন্য দিকে বলছেন, *বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ*, যার মন থেকে সব কামনা পড়ে গেছে, সে নিস্পৃহ হয়ে জগতে বিচরণ করে, আর আপনি বলছেন এটাই শ্রেষ্ঠ। তাহলে আমি কোনটা করব?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগ আর বুদ্ধিযোগের অথবা বলতে পারি সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধির কথা বলে দিলেন। একটা হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থা আরেকটি হচ্ছে কর্মের অবস্থা। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, আত্মাই কেবল আছেন তিনি সাংখ্য বুদ্ধি অবলম্বন করেন। আর যাদের এই সাংখ্য বুদ্ধি হয়নি তাদেরকে বললেন তোমরা কর্মযোগ কর। অর্জুনকে পরিষ্কার বলে দিলেন –*কর্মণ্যেবাধিকারস্তে*, কর্মেই তোমার অধিকার, সাংখ্য বুদ্ধির জন্য তুমি এখনও প্রস্তুত নও। মা সরষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল করেছেন, সেই একই মাছকে কাঁচা লঙ্কা, আদা আর জিরের ফোড়ন দিয়ে একটা পাতলা ঝোল করেছেন। এক ছেলেকে মা এই পাতলা ঝোল দিতেই ছেলে রেগেমেগে বলছে 'আমাকে মাছের ঝাল কেন দিলে না'? মা বলছে, 'ওরে তোর পেটে ঐ

ঝাল সইবে না'। ছেলের রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তুমি ভালো জিনিসটা অপরকে দেবে আর আমাকে শুধু এই পাতলা ট্যালট্যালে ঝোল কেন দেবে? অর্জুনও ঠিক এই প্রশ্নই করছেন।

ধর্ম জগতে এটা একটা খুব পুরনো বিবাদ, এটাকে বলে জ্ঞান-কর্ম বিরোধ। জ্ঞান হল আত্মজ্ঞান, বেদান্ত; আর কর্মযোগ মানে কাজ করা। মাঝে মাঝে সব প্রশ্ন করে, আমি গৃহবধূ, আমি কি করে জীবন চালাব? আপনি কোথা থেকে শুনে নিয়েছেন যে, গৃহবধূর জীবন চালানো যায় না? আগামীকাল একজন রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার বলবে, আমি ইঞ্জিন ড্রাইভার, আমি কি করে জীবন চালাব? পরশু একজন সন্ন্যাসী বলবে, আমি সন্ন্যাসী, আমি কিভাবে জীবন চালাব? আরে ভাই, যে যেভাবে চলেছে, তাকে সেভাবেই জীবনটা চালাতে হবে। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হল, গ্ল্যামারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

একজন একটা চাকরি পেয়েছে, নূতন চাকরি, কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। বিরাট বড় কোম্পানীতে প্রথম চাকরি করতে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করেছে, 'এখানে কি কি কাজ আছে'? সব শোনার পর বলল, 'আমাকে আপনি ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজটা দিন'। মালিক শুনে হেসে বলছেন, 'ইতিমধ্যে আমাদের বারোজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে'। ছেলেটি বলল, 'তের সংখ্যায় আমার কোন আপত্তি নেই'। ছেলেটি বুঝতেই পারছে না যে, এভাবে দুম্ করে কাউকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দেওয়া যায় না। জন্ম নিয়েই সবাই বলছে আমার আত্মজ্ঞান চাই। কিছু দিন আগে কমেন্টে একজন লিখলেন, অষ্টাবক্র গীতার যদি ব্যাখ্যা করেন। ভদ্রলোক আদৌ জানেন কিনা জানি না, অষ্টাবক্র গীতা কোথায় আছে। অষ্টাবক্র গীতা মহাভারতের একটা ছোট্ট অংশ, আর প্রামাণিক গ্রন্থও না, এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ। কোথাও অষ্টাবক্র গীতার নাম শুনে নিয়েছেন। আর-একজন লিখে পাঠালো বিবেকচূড়ামণী যদি পড়ান। এই গ্রন্থগুলির নাম কোথাও শুনে নিয়েছে, একটা গ্ল্যামার বোধ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এই গ্ল্যামার বোধকে কেন্দ্র করে অর্জুনেরও ঠিক এই একই সমস্যা হয়েছে। অর্জুন মনে করেছেন, জ্ঞানই যদি সব কিছু হয়, তাহলে আমি কেন কাজ করতে যাব! এই সমস্যা সব জায়গায় হয়। একটা সময় রামকৃষ্ণ মিশনেরও এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা ছিল। ঠাকুর কথামৃতের পাতায় পাতায় বলছেন, আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সংসার। মাস্টারমশাইও এই কথাগুলোর উপর অনেক জোর দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে স্বামীজী যখন কাজ করতে শুরু করলেন, তখন সেটাকে নিয়ে ঘোর আপত্তি উঠেছিল। সবাই মিলে শ্রীশ্রীমায়ের দরবারে গেছেন। মা একবার শুনেই বলে দিলেন, নরেন যা করছে সেটাই ঠিক।

হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেবা করতে গেছেন, ওখানে সবাই সাধুদের নাম দিলেন 'ভাঙ্গী সাধু'। অনেক বছর আগে একটা জায়গায় আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে এক ভদ্রলোক, তিনি একটা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, তিনিও একই কথা আমাকে বলতে শুরু করলেন, আমাদের যে গুরু মহারাজ, তিনি বলছেন 'কাজ কিছু না, আত্মজ্ঞানটাই সব'। আমি হেসে বললাম, 'এমন গাড্ডায় গিয়ে পড়বেন যে, চোখে, মুখে সরষে ফুল দেখতে শুরু করবেন'।

একবার আমাদের দিল্লীর আশ্রমে একজন পণ্ডিতকে আনা হয়েছিল, সন্ন্যাসীদের শাস্ত্র পড়াবেন। কিছু দিন পড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ আপনাদের শাস্ত্র পড়ানো যাবে না। আপনারা কথামৃত দিয়ে শুরু করেন, কথামৃত হল তত্ত্ববাক্য, শেষ কথা। শেষ কথা আপনারা আগেই জেনে গেছেন, তারপর শুরুর কথা আপনি কেন শিখতে যাবেন'। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা খুব কঠিন হবে, যদি তত্ত্ব জ্ঞান আগেই জেনে যায়। অর্জুন এখন তত্ত্ব জ্ঞান আগে জেনে গেলেন, এখন বলছেন, আমি কাজ কেন করব! আমরা এই উপমা আগেও নিয়েছিলাম, অঙ্ক পরীক্ষায় বন্ধুদের জিজ্ঞেস করবে,

‘অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কত রে’? পাশ থেকে সে হয় ফিস্ ফিস্ করে কোন রকমে উত্তরটা বলে দিল। আর সেও জোর করে মিলিয়ে ওই উত্তরটা লিখে দিল। হয়ত কোন রকমে লেগে গেল, নম্বরও পেয়ে গেল, পাশও হয়ত করে গেল, কিন্তু মাঝখান থেকে তার অঙ্ক শেখাটা আর হল না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, টিয়া পাখী এমনি সময় রাম রাম বলে, বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তত্ত্ব কথা শোনা হয়ে গেছে, কিন্তু সেটার উপর যে খাটনি হবে, সেটা ঠিক ভাবে হয়নি; আসল সমস্যা যখন আসবে তখন মুখ থেকে ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোবে। অর্জুন ঠিক এই সমস্যায় পড়েছেন।

ভগবান তখন বলছেন, না, এভাবে কখন হয় না; তোমাকে আগে কাজ করতে হবে। ভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সবাইকে এই কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন। কিছু দিন আগে একজন আমাকে লিখলেন, ‘গীতা বুঝতে কি কি দরকার’? আমিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠালাম, ‘কোয়ন্টাম ফিজিক্স বুঝতে যা যা লাগে, গীতা বুঝতেও একই জিনিস লাগে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বুঝতে যে খাটনি লাগে, গীতা বুঝতে ঠিক একই খাটনি লাগে। সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে, সেই জ্ঞানের বিস্তার লাগে, সেই আচার্য লাগে আর বছরের পর বছর খাটনি লাগে’। গীতা যাঁরা প্রথম শুনবেন তাঁদের কাছে এগুলো কঠিন লাগাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দুবার তিনবার শুনলে আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ব্যাকরণ পড়ার সময় আমাদের সবাইকে ‘কারকের বিভক্তি’ ভাল করে বুঝতে হয়। আমরা সব সময় যে কাজ করি, আমরা মনে করি কাজ মানে কাজ, আমি এই কাজ করলাম। কিন্তু কাজের যে বিস্তার, এটা বোঝা যায় কারকের বিভক্তি দিয়ে। যেমন, আমি খেলাম। খুব সহজে বুঝে গেলাম খাওয়াটা একটা কাজ। কিন্তু তার সাথে যোগ হয়, আমি ভাত খেলাম। ‘ভাত’ এখানে হয়ে গেল দ্বিতীয়া, ‘আমি’ হয়ে গেল প্রথমা, প্রথমা আর দ্বিতীয়া এসে গেল। এবার বলছি, আমি হাত দিয়ে ভাত খেলাম, তৃতীয়া এসে গেল; সংস্কৃতে বলে করণ। এইভাবে আসে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, আপাদান, এক এক করে শেষে আট খানা কারকের বিভক্তি হয়ে যায়। কাজের বেলায় সাত খানা থাকে। এই যে কারক, কারকের চিহ্ন যদি একটু কোথাও থাকে, তার মানেই বুঝতে হবে ওখানে ক্রিয়া হচ্ছে। ওখানে হয়ত কর্তা বলা হচ্ছে না, কর্তা হয়ত উহ্য থাকছে, কিন্তু কর্তা, কর্ম, করণ, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়, সম্প্রদান, আপাদান, এগুলোর একটা যদি কোন না কোন ভাবে থাকে, তাহলেই ওটা হয়ে যাবে কর্ম।

তার সঙ্গে, যে কোন কর্মই একটা ক্রিয়া, আর ক্রিয়া হলেই তার একটা ফল হবে। তার মানে কারকের আটটি, তার সঙ্গে ক্রিয়া নিজে, সব মিলিয়ে একটা ক্রিয়া চলছে, আর তার সাথে ক্রিয়ার ফল। কারক, ক্রিয়া ও ফল এই নটি কি দশটি, এটাই কর্মের বিস্তার। এর একটা যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সবটাই আছে। ধুয়ো যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আগুন আছে, আগুন যদি থাকে ইন্ধন থাকবে। এইভাবে পিছনের দিকে যাচ্ছি, একটি যদি থাকে, তাহলে দ্বিতীয় থাকবে, দ্বিতীয় থাকলে তৃতীয় থাকবে। হিন্দু শাস্ত্রে এই নটির মধ্যে কোন একটা যদি থাকে, ওটাকে তখন বলছেন কর্ম। তাহলে কর্ম কি? কারকের সাতটি এবং ক্রিয়া ও তার ফল, এই নটির মধ্যে যে কোন একটা যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে ওটা কর্ম। এটাই তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, কর্ম থেকে মানুষ কোন দিন বেরোতে পারে না।

আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করতে চান? আপনি কি ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে চান? আমি বললাম, অবশ্যই আমি ঈশ্বরদর্শন পেতে চাই, আমি ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে চাই। তার মানে, আপনার কোন দিন ঈশ্বরজ্ঞান হবে না। কেন হবে না? কারণ ‘আমি চাইছি’, এটা একটা কর্ম হয়ে গেল। কি ভাবে কর্ম? ‘আমি চাইছি’, আমি কর্তা, প্রথমা এসে গেল, প্রথমা যেমনি এসে গেল, তার মানে এটা কর্ম। আমার কি কোন দিন ঈশ্বরজ্ঞান হবে? কোন দিন হবে না। কারণ ঈশ্বরজ্ঞান মানেই, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও

জ্ঞান এক হয়ে যাওয়া। যেখানে কারকের বিস্তার, ক্রিয়ার বিস্তার, ক্রিয়ার যে ফল, তার যে বিস্তার, সেখানে আত্মজ্ঞান হবে না। সেইজন্য আত্মজ্ঞান কদাচিৎ কখন কারুর হয়। একজন কমেন্টে লিখলেন, 'আপনি গীতা পড়াচ্ছেন খুব ভাল, আপনি ভগবানের ভক্ত। গেরুয়া তো আপনার আছে, কিন্তু বাকি চিহ্ন কোথায়'? আমি জানালাম, 'আমি বেদান্তী সন্ন্যাসী, আমার কোন চিহ্ন লাগে না'। বেদান্তী সন্ন্যাসী জামা-কাপড়ও পরে না, সমাজে আছি বলে পরতে হয়। বেদান্তী সন্ন্যাসীরা যে কোন ধরণের লিঙ্গের বাইরে থাকেন। কারণ এনাদের চেষ্টাই হল, কারক, ক্রিয়া কর্মের বাইরে যাওয়া।

আমি ধ্যান করি, আমি ভক্তি করি, আমি ভক্ত। যেমনি বললাম আমি ধ্যান করি বা ভক্তি করি, আমি কর্মের এলাকার মধ্যে পড়ে গেলাম। ঠাকুরও বলছেন, জপ করাটাও কর্ম, ধ্যান করাটাও কর্ম। সেইজন্য কেউ যদি বলে, আমি কর্ম করব না, এটা কোন মতেই সম্ভব না। যখনই কেউ বলে, আমি গৃহবধূ আমি কি করব? আপনার উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক উত্থান হয়, সেখানে সামাজিক উত্থান, আর্থিক উত্থান আলাদা জিনিস। শ্রীশ্রীমা কি ছিলেন? সারাটা জীবন একজন গৃহবধূ হয়েই ছিলেন। ভক্তরা আসছেন, লোকজন আসছেন, খাওয়াচ্ছেন, দুটি কথা বলছেন, এছাড়া তো আর কিছুই ছিল না। তবুও শ্রীশ্রীমা আমাদের জীবনের আদর্শ। উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক উত্থান হয়, তাহলে one work is as good as another work। একটি কাজের সাথে আরেকটি কাজের কোন তফাৎ নেই। উদ্দেশ্য যদি থাকে সম্মান পাওয়া, নাম-যশ পাওয়া, তাহলে কাজে কাজে তফাৎ হবে। দাঁড়িপাল্লার কাছে সোনা আর লোহার কোন তফাৎ হয় না, মনের কাছেও কাজের কোন তফাৎ হয় না। আমরা যখন বলি, আমরা বেদান্ত জানতে চাই, অদ্বৈত বেদান্ত জানতে চাই, এগুলো হল গ্ল্যামারের জন্য। এদের আর যাই হোক কোন গভীরতা নেই, গভীরতা থাকলে কখনই এ-রকম কথা বলবে না। যার ভিতর গভীরতা আছে, তার কোন একটা শুনলেই হবে। অর্জুনের এই যে হাল্কা ভাব, একটা অগভীর মনোভাব, ভগবান এটাকে কাটাচ্ছেন। এখানে ভগবান অনেকগুলো কারণ দেখাবেন, কেন তোমার কর্ম করা দরকার।

প্রথমে বলছেন, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে, এটা চলছে কর্মের জন্য। সূর্যোদয় হচ্ছে, সূর্যাস্ত হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরছে, গ্রহ নক্ষত্র নিজের কক্ষ পথে নিয়ম মেনে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে, এখানে একটা কর্ম চলছে। বাব-মা সন্তানকে স্নেহ মমতা দিয়ে পরিপালন করছেন, স্বামী স্ত্রীকে দেখছে, স্ত্রী স্বামীকে দেখছে, গরু দুধ দিচ্ছে, ক্ষেতে ফসল ফলছে, এই সমস্ত কিছুকে কর্ম নিয়মন করে। কর্ম যদি না থাকত সব বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। দ্বিতীয় বলছেন, হিন্দুদের পবিত্রতম গ্রন্থ বেদ, সেই বেদে সর্বত্র কর্মের কথা বলা হয়েছে, বেদ মানেই তুমি কাজ কর, কাজ তোমাকে করতে হবে। বেদে শুধু বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে, কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। ঠাকুরের ভক্তরা যেমন কথায় কথায় বলেন, কথামৃতে ঠাকুর এই কথা বলেছেন। হিন্দুদের কাছে এটাই হয়ে যায়, বেদে কি বলা হয়েছে? বেদে কর্মের কথা বলছেন। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা জায়গায় বর্ণনা আছে, দুজন ঋষি খুব নিবিষ্ট ভাবে পরস্পর আলোচনা করছেন, সেখানে বলছেন, তাঁরা কর্মেরই প্রশংসা করলেন। তৃতীয় বলছেন, জনকাদি মহাপুরুষরাও কাজ করেছিলেন। মহাপুরুষ বলতে এখানে গান্ধীজী বা নেতাজীর কথা বলা হচ্ছে না, আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষদের কথা বলছেন। আমরাও অন্যদের বলি, দেখ, স্বামীজী কত কাজ করেছিলেন। স্বামীজী বলছেন, কাজ করে করে মুখ থেকে রক্ত উঠে এসেছে। এরপরে ভগবান বলবেন, অর্জুন আমি নিজেও কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত বসে থাকি না। আমি যদি এক ক্ষণের জন্য কাজ বন্ধ করে দিই, জগৎ উৎসন্নে চলে যাবে।

এখানে চারটে বলা হল, জগৎ কর্মের উপর চলছে, দ্বিতীয় বেদ কর্ম করতে বলছে, তৃতীয় মহাপুরুষরাও কাজ করেছেন এবং চতুর্থ ভগবান নিজেও কাজ করছেন। পাঁচ নম্বরে বলছেন, অর্জুন তুমি প্রারব্ধ কর্মের অধীন। শুধু অর্জুন না, আমরা সবাই প্রারব্ধ কর্মের অধীন। যারাই প্রারব্ধ কর্মের

অধীন, তাদের সবাইকে কাজ করতে হয়। যদি কাজ না করে, তাহলে ওই কর্মগুলো বোঝার মত তোমার উপর পড়ে থাকবে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ জগৎ আছে; আমি থাকা মানেই তুমি কর্মের অধীন। সেইজন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বললেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে*, কর্মেই তোমার অধিকার, জ্ঞানে তোমার অধিকার নেই। রামকৃষ্ণ মিশনে কাজের প্রাধান্য সব সময় আছে। যাঁরা নূতন জয়েন করতে আসেন, সিনিয়র মহারাজরা তাঁদের সব সময় বলেন, কাজ কর, কাজ কর, কাজ করে যাও। কাজ করলে যে মানুষের কামনা, বাসনাগুলি খসে পড়ে যেতে থাকে, এখানে সেই যুক্তি দিচ্ছেন না, এখানে যে যুক্তগুলি দেওয়া হচ্ছে, সবই আধ্যাত্মিক যুক্তি। গীতা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, আধ্যাত্মিক গ্রন্থে জাগতিক কোন যুক্তি দেওয়া হয় না। এই পাঁচটি কারণের উপর তৃতীয় অধ্যায় পর পর চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে *প্রজহাতি যদা কামান্* বলে দিলেন, যেটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এটাকে এখানে কিভাবে মেলানো যাবে? এই কথা বলা হচ্ছে তাঁদেরই জন্য, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, একমাত্র তাঁরাই কাজ করেন না। তুমিও যদি চাও কর্মের এই যে বিস্তার, এর বাইরে যাব, কাজের সীমানার বাইরে যাব, তাহলে প্রথমে তুমি কাজ করতে থাক। কাজ করতে করতে নিষ্কাম কর্ম করতে শেখ। নিষ্কাম কর্ম মানে, যে কাজটাই করছে, সেই কাজটাই ফল। যেমন যে রান্না করছে, তার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতম সুস্বাদু রান্না করা। ভাগবতে রাসলীলার শেষে ভগবান গোপীদের বলছেন, হে গোপীরা, তোমাদের যে আমার প্রতি এই ভালবাসা, এর প্রতিদান আমি কোন দিন তোমাদের দিতে পারব না, সেইজন্য তোমাদের এই ভালবাসাটাই তোমাদের হৃদয়ে থাকুক, এটাই ভালবাসার ফল হোক। যেটাই কর্ম সেটাই ফল, এটাই নিষ্কাম কর্ম, এটাই ভক্তি, এটাই জ্ঞান।

পড়াশোনা করা মানেই জ্ঞান অর্জন করা, লোকে বলবে উনি কত জ্ঞানী, সেটা উদ্দেশ্য না। পড়াশোনা করে ভাল নম্বর পাওয়া, চাকরি পাওয়াটা উদ্দেশ্য না, এগুলো বাইপ্রোডাক্ট। পড়াশোনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা। নিষ্কাম কর্ম মানে, কাজটাই একমাত্র গুরুত্ব, আমাকে এই কাজ করতে হবে, ওটাই কাজের ফল। কিন্তু আমরা কাজ করার আগে দেখে নেব, এই কাজ করলে আমার কি কি লাভ হবে, অর্থাৎ ফলটা আগে জেনে নিয়ে তারপর কাজে নামি। এরা যদি বলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে হবে বুঝিয়ে দিন, সেটা কি কোন দিন সম্ভব?

এখানে পরিষ্কার বলছেন, যদি তুমি তোমার আধ্যাত্মিক উত্থান চাও, তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কাজগুলিকে নিষ্কাম কর্মের দিকে নিয়ে যেতে হবে। নিষ্কাম কর্ম করলে মনের সব আবর্জনাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। মনের আবর্জন পরিষ্কার হয়ে গেলে মন শুদ্ধ, নির্মল হবে। মন শুদ্ধ হলে তখনই মনের শক্তির বিকাশ হয়। আমাদের মনে কেন শক্তি নেই? আমরা নিজেদের কেন দুর্বল মনে করছি? কারণ আমাদের মন পরিষ্কার নয়। মন যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা যত পাপকর্ম করে এসেছি, সব পাপকর্মের আবর্জনাকে পোড়াতে হবে। এই আবর্জনা পোড়ান যাবে শুধু নিষ্কাম কর্ম করে। Work as duty, এটা আমার দায়ীত্ব তাই করলাম। নিষ্কাম কর্ম করার জন্য আগে করতে হবে কাজ। প্রথমে কাজ সকাম, বাসনাযুক্ত হয়েই সবাই কাজ করে, তা নাহলে মানুষ কাজ করতে পারবে না। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্ম করা শুরু হয়, সেখান থেকে মনের পাপ নাশ হয়, সেখান থেকে মন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনই শক্তিশালী মন।

দিনে অন্তত একটি ভাল কথা বলতেও আমাদের মনে ইচ্ছে হয় না, কারণ সব সময় আমরা হতাশার মধ্যে পড়ে আছি। সকাল হলেই আমরা শুধু এই অভিযোগ সেই অভিযোগ করে দিন শুরু করি। বৃষ্টি হলে কমপ্লেন, বৃষ্টি না হলে কমপ্লেন, রোদ হলে কমপ্লেন, সারাদিন ফোন আসছে কমপ্লেন, ফোনের টাওয়ার না থাকলে কমপ্লেন, কারণ ফোন আসছে না, জীবনে আমাদের

কমপ্লেনের শেষ নেই। এত হতাশা, এত অভিযোগ, সব কিছুর কারণ একটাই, মন স্থির নেই, মন শক্তিহীন হয়ে আছে। কেন মনে শক্তি নেই? কারণ মন শুদ্ধ পবিত্র নয়। মন পবিত্র নয় কেন? মনের ভিতর জন্মজন্মান্তরের পাপকর্মের বোঝা পুটলি হয়ে জমে আছে। এই পাপের পুটলি যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। বাচ্চার খিদে পেলে মা শত শরীর খারাপ থাক, কোন রকমে উঠে এসে বাচ্চাকে খাওয়াবেই। মা জানে যত শরীর খারাপ থাকুক, এটা আমার দায়ীত্ব, এই কাজ আমাকেই করতে হবে। যত যা কিছু হয়ে থাকুক, মা সন্তানকে দেখবেই। ঠিক তেমনি আমাদের যখন কোন কাজ এসে যায়, তখন এভাবেই সব কাজ করতে হবে, এতে জন্মজন্মান্তর ধরে মনের মধ্যে সঞ্চিত পাপের বোঝা হাল্কা হতে শুরু করে। এই হল কর্মযোগের উপর একটা ভূমিকা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে বলছেন –

অর্জুন উবাচ
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্।।২।।

(*অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে(যুদ্ধে) কেন নিযুক্ত করছেন? আপনি সন্দেহজনক রূপে প্রতীয়মান বাক্য দ্বারা আমর মনকে যেন ভ্রান্ত করছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি।*১-২)

এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এটা ঘোর কর্ম, এই কর্ম থেকে কত অশান্তি, আরও কত কি হয়; আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে প্রবচন দিচ্ছিলেন, *প্রজহাতি যদা কামান্* থেকে শুরু করে *আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং*, তারপরেও তৎ *কিং কর্মণি ঘোরে মাং*, আমাকে কেন আপনি এই ঘোর কর্মে নিয়োজিত করছেন। আপনি এই বলছেন, কাজ কর; আবার একটু পরেই কর্মত্যাগের কথাও বলছেন, অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলছেন। কথাগুলি পরস্পর বিরোধী, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আপনি ঠিক করে বলুন তো আমাকে কি করতে হবে? অর্জুনের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক।

আমরা জানি ধ্যানযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধ্যান হচ্ছে dignified laziness, যদি কেউ খুব করে জপধ্যান করে তাতে তার শুধু লাভই লাভ। প্রথম লাভ হচ্ছে কোন কাজ করতে হবে না, কারণ যখনই তাকে জপধ্যান করতে দেখবে তখন তাকে কেউ বিরক্ত করে কোন কাজ করতে বলবে না। দ্বিতীয় যে ধ্যান করছে তার মুখ বন্ধ, সেইজন্য কারুর সাথে বেশি বাক্যালাপ করতে হবে না। লোকের সাথে যত ঝামেলা এই বাক্যালাপ থেকেই সূত্রপাত হয়। তৃতীয়, ধ্যান করতে গিয়ে ঘুমে ঢুলতে থাকে, এতে ভালো বিশ্রামও হয়ে যাবে, বিছানায় শুয়ে যদি ঘুমোয় তাহলে লোকে বলবে ব্যাটা কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এসে পড়ে পড়ে খালি ঘুমোচ্ছে। আর ধ্যান করতে করতে ঝিমোতে থাকলে লোকে বলবে, আহা রে ধ্যান করতে করতে ভাবের ঘোরে চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। ধ্যান করাতে শুধু লাভই লাভ। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আপনি কেন আমাকে dignified laziness হতে দেবেন না?

কাজ করা মানে খালি খেটে মরা ছাড়া আর কিছুই না। মেরি আর মার্থা দুই বোন ছিল। ওদের বাড়িতে একবার যীশু গেছেন। মার্থা বেচারী একাই ছুটোছুটি করে এঘর সেঘর করে রান্নাবান্না থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করে যাচ্ছে যাতে যীশু আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোদের সেবার কোন ত্রুটি না হয়। অন্য দিকে মেরী যীশুর কাছে চুপচাপ বসে যীশুর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনে যাচ্ছে। মার্থা এসে যীশুকে বলছেন – আপনি একটু মেরীকে বলুন না আমাকে সাহায্য করতে। যীশু আবার মেরীকে খুব

স্নেহ করতেন। যীশু তখন মার্থাকে বলছেন –মেরী যা করছে ঠিকই করছে। এই ব্যাপারটাই পরে আলস্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভক্তি আর আলস্য ভাব এই দুটোকে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। পার্থক্য শুধু একটা জায়গায়, বাইরে থেকে সেই পার্থক্য বোঝা যায় না। তৃতীয় অধ্যায়েই ভগবান বলবেন –*কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্* - তুমি কাজ না করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কিন্তু তোমার মনের মধ্যে বিষয় বাসনা ঘুরঘুর করছে। এই জিনিস কখনই করতে নেই। আধ্যাত্মিক জীবনে সেইজন্য বেশির ভাগ মানুষই প্রবঞ্চক হয়ে ওঠে। পঞ্চম অধ্যায়েই আবার বলবেন –সন্ন্যাস জিনিসটা ভালো নয়, কারণ যারা প্রথমে কাজ কর্ম করে প্রস্তুতির পর্ব পার না করেই সন্ন্যাস নিয়ে নেয় তাহলে তার সর্বনাশ হতে বেশি দিন লাগবে না, সত্ত্বগুণী হওয়ার বদলে সে তমোগুণী হয়ে যাবে। যারাই কোন কাজ কর্ম না করে শুধুই জপধ্যান করে যায়, তাদেরকে বাইরে থেকে যে রকমই লাগুক না কেন, ভিতর থেকে বিশ্বাস করা খুব সমস্যা হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ যারা কাজ আসছে কাজ করে দিচ্ছেন আবার কাজ নেই ঠাকুরের নাম করছেন তাঁদের কথা আলাদা; তাঁরাই মহৎ। কিন্তু যারা নিজেদের কর্তব্য কাজকর্ম ছেড়ে খালি জপ আর ধ্যান নিয়েই পড়ে থাকে, একটা সময়ের পর এদের ব্যক্তিত্বে অনেক রকম গোলমাল ধরা পড়ে।

আমরা আচার্য শঙ্করের গীতা ভাষ্যকে অনুসরণ করে চলেছি। আচার্য মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা করেন, যেটা আমাদের সরাসরি দরকার নেই। কিন্তু এগুলো আমাদের জেনে রাখা খুব ভাল। এগুলোই ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরা। ভারতে আগে অনেকগুলো দর্শন ছিল। বিদ্যারণ্য সর্বদর্শন সংগ্রহ লিখলেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ষড়দর্শন হয়ে গেল, ছয়টি দর্শনের নামই হয়ে গেল ষড়দর্শন। কিন্তু ছটির থেকে আরও বেশি দর্শন ছিল। বেদান্তেরই অনেকগুলো দর্শন ছিল, তার মধ্যে একটি খুব নামকরার দর্শন হল *জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়*, এই দর্শনের বক্তব্য হল, আত্মজ্ঞানের দিকেও যাবে, তার সাথে কাজও করবে। আচার্য শঙ্কর এই দর্শনকে আক্রমণ করে বিভিন্ন জায়গায় দেখাচ্ছেন, জ্ঞান জ্ঞানই, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয়, কোন গাঁট বন্ধন হয় না, আত্মজ্ঞান কারুর সাথে লেজ জুড়ে নেই। তিনি খুব পরিষ্কার করে বলছেন, যদি জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় ঠিক হত, তাহলে অর্জুনের এই প্রশ্ন উত্থাপিত হত না, আর ভগবানও এটাকে নিয়ে উত্তর দিতে যেতেন না। আমরা এখানে এটা একটা তথ্য হিসাবে উল্লেখ করলাম।

পরের শ্লোকে যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা আমাদের বোঝার দরকার আছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ, এর মূল বক্তব্য ঈশোপনিষদেও বলা হয়েছে। সেখানেও প্রথমে বলছেন, তুমি যদি উপলব্ধি চাও তাহলে তুমি সব কিছুতেই ঈশ্বরকে দর্শন কর –*ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, এই জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এটাকে যদি না বোধ করতে পার তাহলে –*কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ*, তুমি কাজ করে যাও। কিভাবে কাজ করবে? *ন কর্ম লিপ্যতে নরে* – কর্ম করবে কিন্তু কোন কিছুতে লিপ্ত হবে না। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই উচ্চ আদর্শকেই ভগবান অর্জুনের সামনে রাখছেন। কাজ করা মানেই একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া থাকবে। আমার খিদে পেয়েছে, খিদে পাওয়া মানেই একটা বাহ্যিক উদ্দীপনা, তবে পেটের ভেতর থেকে আসে বলে বাহ্যিক ব্যাপার অতটা বোঝা যায় না। খিদে পেতেই আমার মস্তিষ্কে সঙ্কেত গেল, আমাকে কিছু খেতে হবে। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদেরও খিদে পায়, আর খিদে পেলে তাঁরা কি না খেয়ে থাকবেন? তাঁরাও খাওয়া-দাওয়া করেন। অবশ্যই খাবেন।

ঠাকুরের জীবনে এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে –দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন কামারপুকুরে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আর লক্ষ্মীদিদিও কামারপুকুরে তখন আছেন। রোজ সকালে উঠেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করতেন –হ্যাঁগা, আজ তোমাদের কি ব্যান্নুন হচ্ছে? কয়েক দিন পরেই ঠাকুর নিজে থেকেই বলছেন –ছিঃ একি! রোজ সকাল হলেই খাবার কথা মাথায় আসছে, রোজ রোজ একি জিজ্ঞেস করছি কি ব্যান্নুন হবে জিজ্ঞেস করছি; বলেই ধিক্! যেমনি এই ভাবনা এলো তখনই

বলছেন, তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাবো। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন পরমহংস, আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রকমের চরম উপলব্ধি তাঁর হয়ে গেছে। এখন তিনি যে খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবছেন, তিনি কি ভুল করছেন? না, এটাই হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের বেদান্ত। আমরা প্রশ্ন করতে পারি বেদান্ত কি দুই রকমের? ব্যবহারিক বেদান্ত আর অব্যবহারিক বেদান্ত? হ্যাঁ, দুই রকমেরই বেদান্ত হয়। যে বেদান্ত ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ হয় না, সেই বেদান্তের কোন দাম নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রোজ সকালে উঠে জিজ্ঞেস করছেন – ওগো আজ তোমাদের কি রান্না হবে। তখন ওটা impractical ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মাথায় এসেছে এটা impractical তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দিয়ে বলছেন – তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাব। যে অবেদান্তী, যে এখনও সিদ্ধ হয়নি, এমনকি যে সাধকও নয়, সে বলবে আজ থেকে আমি মাছ খাবো না, বলেই পরের দিন থেকেই মাছ খাওয়া শুরু করবে। এদের কোন আঁট নেই। যিনি বেদান্তী, সিদ্ধ পুরুষ, সাধক, তিনি একবার যখন যা বলে দিলেন সেখান থেকে তাঁর মন আর নড়বে না।

কর্মে লিপ্ত না হওয়া মানে, কর্মের সরাসরি ও আনুষাঙ্গিক কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকা। আমি একজন শিক্ষক, আমাকে ছাত্রদের পড়াতে হবে, পড়াতে গিয়ে আমাকে কত মাইনে দিচ্ছে, ছাত্ররা আমাকে কতটা সম্মান করছে, ছেলেরা পাশ করে চলে যাওয়ার পর আমাকে মনে রাখবে কিনা, আমাকে বিভিন্ন দিনে উপহার দেবে কিনা, এই সব নিয়ে আমি কখনই ভাবব না, যদি আমি আমার কর্মে লিপ্ত হতে না চাই। শিক্ষকের ছাত্রদের পড়ানটাই তার স্বধর্ম, ভালো ভাবে নিজকে প্রস্তুতি করে যত্ন নিয়ে পড়ানোটাই তার স্বধর্ম, এর বাইরে তার আর কিছু নিয়ে না ভাবাটাই কর্মে লিপ্ত না হওয়া। আমি কি কাজ করছি সেটা বড় কথা নয়, আমি চাপরাশির কাজ করতে পারি, রেললাইনের পাথর ভাঙতে পারি, মুটেগিরি করতে পারি, কিন্তু যেটাই করছি সবটাই ভগবানের পূজো, এটাই তার কাছে স্বধর্ম। উচ্চতম স্বধর্ম হল যখন ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হন, এই ভাবটাও তার থাকবে না। সুফি সম্প্রদায়ে রাবাইয়া একজন খুব নামকরা সাধিকা ছিলেন। রাবাইয়া খুব সুন্দর প্রার্থনা করতেন – "হে আল্লা, আমি যদি নরকের ভয়েও তোমার প্রার্থনা করি, তুমি চিরকালের জন্য আমাকে নরকে রেখে দিও। আর স্বর্গ কামনা করে যদি তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি আমাকে স্বর্গে ঢুকতে দিও না। আর তোমাকে যেন ভালোবাসতে পারি, এই ভাবনা নিয়ে তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে কৃপা কর"।

কর্মযোগের এই অধ্যায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আমরা কাজ কেন করব, কয়েকটা শ্লোকে বলেছেন। তারপর কয়েকটি শ্লোকে বলবেন কিভাবে কাজ করব, এরপর বেদের সময়ে যজ্ঞাদি কর্মের সাথে ইদানিং কালে যেভাবে কর্ম করা হয়ে থাকে, কয়েকটি শ্লোকে তার সমন্বয় করা হবে। আর যারা পরমহংস পরিব্রাজক যাদের কোন কাজ করতে হয় না, তারা যখন কাজ করবেন তখন কি কাজ করবেন। এই অধ্যায়েই ভগবান বলছেন সবাইকেই কাজ করতে হবে, শুধু পরমহংস পরিব্রাজক তিনিই কাজ করবেন না। এমনকি যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য কাজ করেন।

যাঁরা কাজ করছেন এদের মধ্যে দুই ধরণের লোক হয়, একজন জ্ঞানী আরেকজন অজ্ঞানী। আমরা যে কাজটা করব সেটা জ্ঞানীর মত করব, অজ্ঞানীর মত কাজ করব না, কারণ আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি। তারপর কর্মই ঈশ্বরের পূজা এই মনোভাবে কর্ম করা, মানে কর্মকে কিভাবে পূজা ও উপাসনাতে রূপান্তরিত করা যাবে। সব শেষে বলবেন কর্মযোগে কি ধরণের বিঘ্ন আসে। ভালো কাজ করতে গেলে ঠিক ঠিক কি ধরণের সমস্যা আসে। মানুষ নিজেকে ধন্য করার জন্য, কৃতার্থ করার জন্যই কাজ করছে, কৃতার্থ করার জন্যই যদি কাজ করে থাকে তাহলে কিভাবে কৃতার্থ হবে সেটাই অধ্যায়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করবেন। তিন নম্বর শ্লোক খুব সুন্দর শ্লোক, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে –

শ্রীভগবানুবাচ
লোকেহস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

*(শ্রীভগবান বললেন –হে অনঘ অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারিদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মিদের জন্য কর্মযোগ –এই দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলেছি।)*

এই শ্লোকের বৈশিষ্ট্য হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রথম গীতাতে বলছেন, আমি ভগবান। *লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা*, সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদমুখে আমি এই কথা বলেছি। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে এই কথাই একটু অন্য ভাবে বলবেন, তখন অর্জুন বলবেন, আরে আপনি এটা কি বলছেন। কিন্তু এখানে অর্জুন ধরতেও পারেননি যে ভগবান বলছেন, আমি ভগবান। কেন বলেছেন? যখন সৃষ্টি হয় তখন আমিই দুই প্রকার পথের বিধান দিয়েছিলাম –একটা জ্ঞানীদের পথ, আর-একটা যোগীদের পথ। গীতার প্রথম দিকে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছিল, সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে সনক, সনন্দন আদি চারজন ঋষিদের আমি সৃষ্টি করলাম, তাঁরা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অবলম্বন করে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি সপ্তর্ষ মণ্ডলের ঋষি ও প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলাম, যাঁদের প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হল, কিভাবে সংসার ধর্ম পালন করতে হয়। এখান থেকেই সৃষ্টি হল যোগের পথ।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সেই দিন থেকে এই দুটি ধর্ম – নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম রূপে চলে আসছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে মানুষ যেখানে কাজ করে আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হল, মানুষ যখন সব কিছু ত্যাগ করে দেয়। সমস্ত কিছুর ত্যাগে একমাত্র সন্ন্যাসীদের অধিকার। আর কাদের দরকার? যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেছে, মন যাঁর শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তিনিই সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন, অন্য কেউ পারে না। ঠাকুর যখন বলছেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, তার উদ্দেশ্য আলাদা; এই ব্যাপারে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

ভগবান বলছেন, তুমি শাস্ত্রকে মেনে চল; শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জ্ঞান ও কর্মে দুই ধরণের অধিকারী হয়, অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম মানুষের দুটি পথ। কিছু মানুষ জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত, আবার কিছু মানুষ কর্মের জন্য উপযুক্ত। আজ থেকে প্রায় দশ-বার বছর আগে, একজন নূতন ব্রহ্মচারীর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পোস্টিং হয়েছে। ব্রহ্মচারী তার আগে কোন কাজ করেননি। তাঁকে একজন মহারাজ বললেন, 'যাক ভাল হল, এবার তোমার কাজের অনুভব হবে'। ব্রহ্মচারী সেই মহারাজকে একটু যেন গর্বের ভাব নিয়ে বলছেন, 'সবাইকে কাজ করতে হয় না মহারাজ, অনেকে আছেন যাঁদের আগের আগের জন্মে কাজ করা হয়ে গেছে'। মহারাজ আর কি বলবেন, মনে মনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন। ভারতবর্ষে আমরা দুই ধরণের লোক পাই, এক ধরণের মানুষের অজ্ঞানের একটা মনুমেন্ট, তার সাথে বিশাল অহঙ্কার। অনেক সময় অজ্ঞানীদের অহঙ্কার হয়, আর কখন অল্প একটু জ্ঞান আছে বলে অহঙ্কার হয়। বেশির ভাগেরই অল্প একটু জ্ঞান আছে বলে অহঙ্কার থাকে। ভারতের উপর ভগবানের এমনই কৃপা যে, অজ্ঞানী আর অহঙ্কারীর বৃষ্টি ভারতবর্ষে তিনি দিতেই থাকেন। ভারতের মানুষ যেন বিশাল বিশাল বটবৃক্ষ, হয় অহঙ্কারের, নয়তো অজ্ঞানের। সেই ব্রহ্মচারীর মত মানুষই বলতে পারে, আগের আগের জন্ম অনেক কাজ করা আছে। তার কিছু দিন পরেই দেখা গেল, সেই ব্রহ্মচারীকে কর্মের মধ্যে এমন জুতে দিয়েছে যে, দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না, কাজ করেই যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, কি ভাই, তোমার না আগের আগের জন্মে অনেক কাজ করা আছে! মুখে শুধু ফটর ফটর, কিছু একটা শুনে নিয়েছে, সবাইকে এই জন্মে কাজ করতে হয় না, আগের জন্মে অনেক কাজ করা হয়ে গেছে।

ভগবান স্পষ্ট করে বলছেন, সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ; *জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং*, যাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদের জন্য জ্ঞানপথ। *কর্মযোগেন যোগীনাম্*, আর বাকীদের জন্য কর্মযোগ। এটাকে পরে আরও বিস্তারে বলবেন। অর্জুনকে সম্বোধন করে বলছেন *ময়ানঘ*, অনঘ মানে, যাঁর মধ্য কোন পাপ নেই; হে নিষ্পাপ অর্জুন, আমি সর্বজ্ঞ, আমি ঈশ্বর, পূর্বে আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির এই দুই প্রকার উপায় বলেছি। এই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানমার্গের যিনি, তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে পুরোপুরি নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিয়েছেন। এখানেই পরিষ্কার যে, এই পথ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য। সন্ন্যাসী এখানে কেবল গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বোঝাচ্ছেন না, সন্ন্যাসী মানে মন থেকে যাঁর সব কিছু ত্যাগ হয়ে গেছে, যাঁর মনে জগতের কোন কিছুর প্রতি কোন প্রকার কামনা-বাসনা নেই, চিত্ত যাঁর পুরো শুদ্ধ।

বলছেন, এই যে কর্ম, এই কর্ম সরাসরি মুক্তি দেয় না, দেওয়া সম্ভবই না। স্বামীজী যে জ্ঞান ও কর্মের কথা বলছেন, সেখানে প্রস্তুতির কথা বলছেন। স্বামীজী যে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, সেটা হল নিত্য অনিত্যের বিচার। আর আচার্য যে জ্ঞান বলছেন, এটা হল knowledge, জিনিসটাকে জানা।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

*(কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মা-রূপে অবস্থিতি, মোক্ষ লাভ করতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না।। কেবলমাত্র জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ দ্বারা উক্ত অবস্থালাভ অসম্ভব।)*

এই শ্লোকে কর্মের মহিমা, কর্মযোগ কেন করতে হয় বলা হচ্ছে। স্বামীজী এসে এত যে কর্মের উপর জোর দিলেন, যার জন্য লোকের বুঝতে পারছিল না, সন্ন্যাসী হয়ে কেন তিনি এত কাজের কথা বলছেন। কারণ ভারত তখন পুরোপুরি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তমোগুণ আত্মজ্ঞানের জন্মগত দুষমন। কর্ম না করলে মানুষ তমোগুণ থেকে রজোগুণে যেতে পারবে না। স্বামীজী তাই এত কর্মের কথা বললেন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, *ন কর্মণাম্ অনারম্ভাদ্ অপ্রারম্ভাৎ কর্মাণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনাম্ ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা*। কর্ম মানে যে কোন কাজ না, আচার্য এখানে যজ্ঞাদি কর্মের কথা বলছেন। কর্ম কিভাবে যজ্ঞ হয়ে যায়? এটাকে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আরও বিস্তারে বলবেন। বেদে যখনই যজ্ঞের কথা বলা হয়, তখন সেখানে সাধারণ ভাবে অর্থ করা হয়, পবিত্র অগ্নি স্থাপন করে মন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন দেবতা ও দেবীর যজ্ঞ করতে থাকা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাচ্ছেন, কিভাবে সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞে রূপান্তরিত করা যায়।

আচার্য বলছেন, যতক্ষণ এই জন্মে বা অন্তত আগের আগের জন্মে যজ্ঞাদি কর্ম না করে বা যজ্ঞ-রূপে কর্ম যদি না করে থাকে, তাহলে এই জন্মে তোমার ক্রিয়াকর্মাদি দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, তোমার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞ রূপে হচ্ছে কি হচ্ছে না। মানুষ যখন যজ্ঞ রূপে কর্ম করে, কর্মকে যখন পবিত্র ভাবে করে, স্বার্থশূন্য হয়ে যখন কাজ করে, তখন তার হৃদয় মন পরিষ্কার হয়। হৃদয় পরিষ্কার হলে তখন তার পাপের নাশ হয়। পাপের নাশ হওয়ার পরেই মানুষ জ্ঞানমার্গের জন্য প্রস্তুত হয়। আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করছেন, এই জন্মে, না হলে আগের জন্মে, আগের জন্মে করা থাকলে এই জন্মেও করার প্রবৃত্তি থাকবে, এটা যে কাউকে দেখলেই বোঝা যায়। কাজ করার সময় দেখতে হয়, সে এই কাজ লোভে পড়ে করছে, নাকি কোন কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাজ করছে,

নাকি দায়ীত্ব বোধে কাজ করছে, না ভক্তি ভাবে, ভালবেসে কাজ করছে, তার চেয়ে বড় যজ্ঞ রূপে কাজ করছে কিনা।

আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজ, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য; খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী ছিলেন, গোপেশ মহারাজ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। প্রচুর জপধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে উনি আশ্রমের অধ্যক্ষকে বলতেন, 'দেখ আমার মধ্যে একটু রজোগুণ জাগছে, আমাকে কিছু কাজ করতে হবে'। উনি যখন যে সেন্টারে থাকতেন, তখন সেই সেন্টারের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সেন্টারের এক ফালি জমিতে কখন ভুট্টা চাষ, কখন ছোলা চাষ, কখন ফুলের গাছ লাগাতেন। গাছ লাগানোর পর উনি বলে দিতেন, 'আমার ভিতরে রজোগুণ এসেছে, তাই আমি এই কাজটা করছি। আগামীকাল যদি তোমাদের মনে হয় আশ্রমের কাজের জন্য এই জমিটা পরিষ্কার করা দরকার, তোমরা গাছ কেটে দিও। রজোগুণ থেকে আমার মনে যে চাঞ্চল্য এসেছে, সেটাকে নাশ করার জন্য আমি এই কাজ করছি'।

কাজ সব সময় করা হয় মনের চাঞ্চল্যকে নাশ করার জন্য, আর সেইজন্য ওই কাজ যজ্ঞ রূপেই করতে হয়। আমি কেন কাজ করি, কারণ আমার মনের মধ্যে চাঞ্চল্য আছে। অথবা কোন একটা সময় আমার চাঞ্চল্য হয়েছিল, যার খেসারত আমাকে সারা জীবন দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই বলছেন, যদি যজ্ঞাদি কর্ম না করে থাক, তাহলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে না। আর যতক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্ম না করছ, ততক্ষণ কর্মত্যাগ হবে না। অর্জুন, তুমি যে মনে করছ, আমি যুদ্ধ করব না, আমি বৈরাগী হব; বৈরাগী হওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার দ্বারা হবে না। কারণ ওই ভাবে কখনও তুমি কর্ম করোনি; যার জন্য তোমার চিত্ত, তোমার মন এখনও পরিশুদ্ধ হয়নি। যেহেতু তোমার চিত্ত ও মন শুদ্ধ হয়নি, সেইহেতু *প্রজহাতি যদা কামান্* যতই তোমার ইচ্ছা থাকুক, যতই তোমার আকর্ষণ থাকুক, যুদ্ধ না করে তুমি থাকতে পারবে না, নৈষ্কর্ম্য তুমি হতে পারবে না। উত্তরাখণ্ডের সাধুরা সারাদিন শুধু নৈষ্কর্ম্য, জ্ঞান আর অদ্বৈতের বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। তার সাথে ইদানিং ইউটিউব হয়ে সবাই অষ্টাবক্র, অহং ব্রহ্মাস্মির বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে, দেখে হাসি পায়। স্বামীজী ইয়ং ছেলেদের বলছেন, গীতা পড়ার থেকে তোমার ফুটবল খেলা বেশি ভাল, কারণ ফুটবল খেললে তোমার ভিতর একটু শক্তি জাগবে, ভিতরে শক্তি এলে তবেই তুমি গীতা বুঝতে পারবে।

আমাদের সবারই উদ্দেশ্য নিবৃত্তিমার্গ, কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের জন্য তুমি এখন প্রস্তুত নও। কারণ তুমি কর্মই করোনি, শুধু তাই নয়, তোমার স্বধর্ম যুদ্ধ করা, সেই যুদ্ধই তুমি করতে চাইছ না, এতেই পরিষ্কার যে তুমি নিবৃত্তিমার্গে অনুপযুক্ত। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরাও যখন দেখেন যে লোকশিক্ষার জন্য কাজ করা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কাজে নেমে পড়েন, যদিও সন্ন্যাস আর কর্ম এক সঙ্গে চলে না। যার জন্য আমরা দেখি, স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে শিক্ষা দিতে নেমে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র এত বড় লঙ্কাকাণ্ড করলেন, মহম্মদ তরোয়াল নিয়ে নেমে গেলেন। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরাও দরকার হলে কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু অজ্ঞানী যদি প্রথমেই উচ্চতম আদর্শের দোহাই দিয়ে বলে আমি কাজ করব না, কারণ উচ্চতম অবস্থা হল কাজ না করা, আর এই ভেবে শুধু সন্ন্যাস নিয়ে কর্মত্যাগ করে চুপচাপ বসে যদি মনে করে এতেই আমার সিদ্ধি হয়ে যাবে, এতে ভাল তো কিছুই হবে না, উল্টে অনেক বিপত্তি হবে। কাজ সবাইকে করতেই হবে। জগৎ নশ্বর আর ঈশ্বরই সত্য এই জ্ঞান উপলব্ধি হওয়ার আগেই যদি তুমি কর্মসন্ন্যাস নিয়ে নাও তাহলে তোমার কোন কিছুই হবে না।

জাতিটা আজ নির্জীব হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছেড়ে দিন, আমাদের কুড়ি পঁচিশটা ভাষা, ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া সাহিত্যে আমাদের একটি নোবেল প্রাইজ নেই। বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের জাতির একটা কোন অবদান নেই। আমাদের শত

শত ইউনিভার্সিটি, অথচ বিশ্বের ইঞ্জিনিয়ারিংএ আমাদের একটি অবদান নেই। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি নিয়ে আমাদের দেশে কত কি হচ্ছে, কিন্তু কোন নোবেল প্রাইজ নেই। এমন কোন একটা প্রোডাক্ট নেই, যেটা বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। কেন এই অবস্থা? শক্তিবিহীন জাত। এই শক্তিবিহীন জাতি গীতা বুঝবে, না ধর্ম বুঝবে?

এই কারণে স্বামীজী বারবার বলছেন, কাজ কর, কাজ কর, দেশকে ভালবাস, তোমরা তমোগুণে ডুবে আছ, ভিতরে রজোগুণকে জাগাও। শক্তির বিকাশ হলে মানুষ ধারণা করতে পারবে, আমাদের শাস্ত্র কি বলছে, গীতা কি বলছে। গীতা উপনিষদ বোঝার জন্য শক্তি দরকার। কাজ না করে, নিষ্কাম কর্ম না করে গীতা উপনিষদ কোন দিন কেউ ধারণা করা দূরে থাক, একটু যে বুঝবে সেটাও হবে না। কারণ ভগবান নিজে এই কথা এখানে বলছেন, *ন কর্ম্যণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে*। প্রচুর কর্ম না করে কেউ কর্মবন্ধন থেকে, দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় না, আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। *ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি*, শুধুমাত্র সন্ন্যাস নিয়ে নিলে, শুধুমাত্র কর্মত্যাগ করলে সিদ্ধি লাভ হয় না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

*(কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারবে না। অ-স্বতন্ত্র হয়ে সকলেই মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।)*

এই সংসারে কোন মানুষ কর্ম ছাড়া এক ক্ষণও থাকতে পারে না। এরপরেই বলবেন, তুমি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, এটাও কর্ম। আমরা আগে কারকের বিস্তার দেখিয়েছিলাম, সাতটি কারক আর ক্রিয়া ও ফল, এর একটি থাকা মানেই সেটা কর্ম। আমরা যে বেঁচে আছি, এই বেঁচে থাকার মধ্যেই একটা ক্রিয়া জড়িয়ে আছে। ক্রিয়া থাকা মানে, একটা ফলও জড়িয়ে আছে, তার মানে আমরা সবাই কর্মে বাঁধা হয়ে আছি। আমরা এক অপরকে বলি, আপনার মধ্যে এই এই দোষ আছে। আমি মানছি আমার মধ্যে এই এই দোষ, একটু রেগে যাওয়া, অধৈর্য হওয়া, এগুলো আছে। কিন্তু এবার ভেবে দেখুন তো, এই সব দোষ যদি আমার না থাকত তাহলে আমি কেন জন্ম নিতাম? আমার ব্যক্তিত্বে অনেক দোষ আছে, অনেক দুর্বলতা আছে বলেই তো আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে। এত কিছুর পরেও আমি যদি পুরো সত্ত্বগুণী হতাম, তাহলে জন্মাবার পর হিমালয়ের কোন গুহায় চলে গিয়ে ধ্যান করতাম, সেটাও তো পারলাম না।

আমরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজদের দেখেছি, এনারা হলেন আচার্য। অবতারের যাঁরা পার্ষদ, এনাদের পরেই হলেন আচার্যরা, আমরা সেই স্তরের লোকও না। কারণ আমাদের ভিতর অনেক দুর্বলতা আছে, তাই তো আমাদের এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে। এই যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, এখানে এসে আমরা আমাদের নিজেদের পরিষ্কার করছি। আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে, যে দোষ আছে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বামীজী সেইজন্য সঙ্ঘের নাম দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মুষা। সোনা-রূপার যারা কাজ করে, তাদের একটা পাত্র থাকে, যার মধ্যে এ্যসিড ও অন্যান্য কেমিক্যাল থাকে, যা দিয়ে সোনা রূপা পরিষ্কার করা হয়, তাকে মুষা বলা হয়। রামকৃষ্ণ মুষাতে আমাকে ফেলে রেখে আমাকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, আমার যে স্বাভাবিক স্বরূপ, আমি যে সেই প্রকৃত সোনা, সেই স্তরে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। জন্ম নিয়েছ মানেই তোমার মধ্যে দোষ আছে, দুর্বলতা আছে; তাই কাজ করতে হবে, কাজ করাটাই তোমার স্বাভাবিক ধর্ম। যদি তোমার কোন দুর্বলতা, কোন দোষ না থাকত তোমাকে জন্মই নিতে হত না, জন্ম নিয়েছ মানেই তোমাকে কাজ করতে হবে।

আর তুমি যদি গায়ের জোরে সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তুমি ঘোর তমোগুণী হয়ে যাবে। স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে, একবার তিনি হিমালয়ের দিকে যাচ্ছেন, দেখছেন রাস্থার পাশে একজন সাধু কম্বল চাপা দিয়ে গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে আর ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে নাক ডাকছে। স্বামীজী তখন ইয়ং, রেগে গিয়ে বলছেন, দে ব্যাটাকে লাঙলে জুতে। চাষের কাজে বলদ দিয়ে লাঙল টানা হয়, বলছেন বলদ সরিয়ে একে লাঙলের সাথে জুতে দিতে, লাঙল টানলে যদি তমোগুণটা কাটে। কাজ না করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে এই রকম তমোগুণী হয়ে যায়, তমোগুণীরা কি করে –

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

*(যে মূঢ় ব্যক্তি হাত, পা ও বাক্যাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করে মনে মনে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, তাকে মিথ্যাচারী বলে।)*

*কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য*, বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়গুলি, হাত-পা সব ভিতরে গুটিয়ে রেখেছে, *য আস্তে মনসা স্মরণ্*, কিন্তু মনে মনে অনেক কিছু ভাবছে, ভোগের চিন্তা করে যাচ্ছে। বয়স্করা শুধু বলবে, আজকালকার ছেলেরা বয়স্কদের সম্মান দিতে জানে না। আপনি যখন ইয়ং ছিলেন, আপনিও তখন কাউকে সম্মান দিতেন না। মনে মনে সম্মান পাওয়ার খুব ইচ্ছা, কিন্তু সারা জীবন একটি কাজ করলেন না, যেটার জন্য আপনাকে লোকে আজকে সম্মান দেবে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যিনি প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট হন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তরা লাইন দিয়ে তাঁদের প্রণাম করতে যান, প্রণিপাত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কারণ, তিনি তাঁর জীবনটা সেই ভাবে চালিয়ে আজ এখানে এসেছেন।

*ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে*, এই ধরণের মানুষ যারা হয়, তারা মিথ্যাচারী; কত কটূ ভাষায় ভগবান বলছেন। তুমি ত্যাগী, সন্ন্যাসীর ভাণ করছ, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগসাম্রাজ্য, সেখানে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলছেন মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর জন্য মনের পাপও পাপ। সন্ন্যাসী মনে মনেও যদি কামনা করে, সেটা পাপ। বলছেন, তুমি কাজ করছ না, কিন্তু মনে মনে ভোগের বস্তু কামনা করছ, সোজাসুজি ভগবান এদেরকে বলছেন, তুমি মিথ্যাচারী। এর বিপরীতটাও ভগবান এবার বলছেন –

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

*(কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।)*

কিন্তু যিনি কাজ করছেন, তখনও তিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমে রেখেছেন। ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখা মানে, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি দৌড়াতে দিচ্ছেন না, শুধু কাজ করে যাচ্ছেন, কাজ কাজের মত হয়ে যাচ্ছে। এনারা হলেন বিশিষ্ট পুরুষ। কাজের দুটো option বলছেন। একটা হল, কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে রেখেছে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে অনেক কিছুর চিন্তা করে যাচ্ছে। আর-একজন হলেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আটকে রেখেছেন, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ভগবান সাত নম্বর শ্লোকে বলছেন, এনারা শ্রেষ্ঠ। নিয়ন্ত্রণ যদি করতে হয়, মনকে নিয়ন্ত্রণ কর।

একজন মহারাজ মজা করে আমাদের বলতেন, 'বুঝলে ভাই ধ্যান কর, শুধু ধ্যান করতে শেখ। মন্দিরে গিয়ে বসবে, চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে শুধু ধ্যান করবে, তাহলে তুমি অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে'। কি কি সমস্যা হবে না? প্রথম হল, কারুর সাথে কথা বলতে হবে না,

ঝগড়া-ঝাটি হবে না। দ্বিতীয় ঘরে যদি ঘুমোও, বলবে, ব্যাটা সাধু হয়েছে শুধু ঘুমোবার জন্য, কিন্তু ওখানে যদি ঘুমিয়ে পড়ো, সবাই বলবে, আহা ধ্যান করতে করতে ঢুলে পড়ছে। তৃতীয়, সবাই বলবে কত ভক্তি। চতুর্থ তোমাকে কাজ করতে হবে না। এভাবে কি কিছু হয়, কিছুই হয় না। কাজ করা থেকে বেঁচে যাবে ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক উত্থান হবে না।

গীতা এই ধরণের বেনিয়ম আচরণ নিয়ে বেশি আলোচনা করছেন না, শুধু বলছেন অজ্ঞানী হাত পা গুটিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযম করছে কিন্তু মনকে ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; আর জ্ঞানী ঠিক উল্টোটা করেন, তাঁরা মনকে সংযত করে অনাসক্ত ভাবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা পুরোদমে কাজ করেন। এই কথা বলার পর অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি আমার প্রিয় বলে তোমাকে বলছি –

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যাকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।

*(তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না।)*

হে অর্জুন, নিয়ত তুমি কর্ম করে যাও; শাস্ত্রে যে কর্ম তোমাকে করতে বলা হয়েছে, সেই কর্ম অবশ্যই করবে। কর্ম ব্যতিরেকে তোমার এই শরীরও চলবে না। এখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে গীতার গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করি। যে জিনিসগুলিকে প্রথমের দিকে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, সেগুলোকে আরও বিস্তার করছেন, পুরো বিস্তার অবশ্য হয় না। কারণ প্রথমের দিকে আমরা বলেছিলাম, পুরো বেদ উপনিষদের সার হল গীতা, এমনকি আমরা যে এত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, তাতেও এর পুরো বিস্তার হয় না। নিজে থেকে যিনি যত পড়াশোনা করবেন, চিন্তন, মনন ও ধ্যান করবেন, তত তিনি ভাল বুঝবেন। এখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি নিত্য কাজ কর, নিত্য কাজ মানে নিত্যকর্ম করা।

নিত্যকর্ম হল, সমাজ আমাকে যে দায়ীত্ব দিয়েছে, পরিবারের প্রতি আমার যে দায়ীত্ব আছে এবং আমার নিজের উত্থানের জন্য যে কর্ম করতে হবে, সেই কর্মকে বলছেন নিত্যকর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম বললেই আমাদের মনে হয় বর্ণপ্রথাকে নিয়ে চলা। বর্ণ বলতে আমরা জানি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণ। এই চারটে বর্ণ হল, সমাজের প্রতি যার যার যে যে কর্তব্য, সেই কর্তব্যগুলি পালন করা। আশ্রমধর্ম হল, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটে আশ্রমধর্ম পালনের উদ্দেশ্য হল নিজের উত্থানের জন্য। বর্ণ এবং আশ্রম এই দুটো দায়ীত্বকে মিলিয়ে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে, অর্জুনকে ভগবান এই কথা খুব জোর দিয়ে বলছেন। কারণ *শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ*, এই যে শরীর দেখছ, এই শরীরটাও কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। তুমি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, এটাও কাজ। তুমি দেহাভিমানী, দেহের সাথে তুমি নিজেকে জুড়ে রেখেছ।

পরের শ্লোকটাও খুব সুন্দর শ্লোক। এই শ্লোকটাকে আমরা যদি মুখস্ত করে চিন্তন করতে থাকি, জীবনে তাহলে এটা আমাদের খুব কাজে দেবে। এটা ঠিকই যে, গীতা পুরোটাই মুখস্ত করা দরকার। যদি কেউ পুরোটা মুখস্ত না করতে পারেন, তাহলে অন্ততঃ দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় ও পঞ্চেদশ অধ্যায় অবশ্যই মুখস্ত করা উচিত। এটাও যদি কেউ না করতে পারেন, তাহলে বেছে বেছে কিছু শ্লোক মুখস্ত করতে হবে, মন্দের ভাল, যার মধ্যে এই শ্লোকটিকেও রাখতে হবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার।।৯।।

*(ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য সব কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, তুমি ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমোচিত সব কর্ম কর।)*

ভগবান বলছেন, তুমি যখন বুঝে গেলে যে, কাজ তোমাকে করতেই হবে, তাহলে এখন থেকে সমস্ত কাজ তুমি যজ্ঞ রূপেই কর; যে কাজই কর না কেন, সেই কাজকে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন কর। যজ্ঞ রূপে কাজ করলে, তুমি ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে এগোতে শুরু করবে। যদি তুমি যজ্ঞ রূপে কর্ম না কর, তাহলে ঐ কর্মটাই বন্ধন রূপে তোমাকে বেঁধে নেবে। এখানে ভগবান বলছেন, কাজ তুমি কেন করবে। কাজ থেকে কর্মযোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, মনে অনেক রকম সংশয় হয়, ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন, নাকি ঈশ্বর বলে কিছু নেই; এই ধরণের অনেক রকম প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলেন, তোমার কর্মই তোমার ভাগ্য তৈরী করে দেবে, বলতে চাইছেন, কাজ দ্বারাই ভাগ্য সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার বলেন, ঈশ্বর সব ঠিক করে রেখেছেন, সব পূর্ব নির্ধারিত; বিশেষ করে খ্রীশ্চানরা এই কথা বলেন। যদি সব কিছু কর্ম দিয়েই পাওয়া যায়, তাহলে তো সবাইকে কাজ করতেই হবে, এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। যদি আমরা কপালে বিশ্বাস করি, বেশির ভাগ হিন্দুরা তাই মনে করেন; কপাল মানে হল, আগে যেমনটি কর্ম আমি করেছি, আজ সেই কর্মের ফলই পাচ্ছি। ঠিক তেমনি, আজকে যে কর্ম করছি, আগামী দিনে সেই কর্ম অনুসারেই ফল পাবো। এই কার্য-কারণ সম্পর্কে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাদের কাজ করতেই হবে। আর যদি আমরা মনে করি ঈশ্বর আমার জন্য সব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, যদিও এটা হিন্দুদের মত নয়; বিশেষ করে প্রাচীনতম শাস্ত্রগুলিতে এই মত পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরে পরে কিভাবে কিভাবে এই মত হিন্দুদের মধ্যে ঢুকে গেছে, হিন্দুরাও এখন সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছে।

ইংরাজীতে একটা কথা প্রায়শই বলা হয়, I need to fulfill my destiny, ভগবান যদি আমার জন্য কিছু ঠিক করে রাখেন, আমাকে তাহলে চেষ্টা করে সেখানে পৌঁছাতে হবে। প্রথম যুক্তি হল কার্য-কারণ সম্পর্ক। দ্বিতীয় যুক্তি, ঈশ্বর যদি আমার জন্য সব ঠিক করে থাকেন, তাহলে আমাকে সেটাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। আমি তো বলতে পারি যে, সব কিছু যদি ঠিক করাই থাকে, তাহলে কাজ না করলেও সেটা আমি পেয়ে যাবো। এই জায়গাতে এসে সমস্যা হয়। আমি করি আর নাই করি, সব তো ঠিক করাই আছে, এমনিতেই এসে যাবে। কপালে যদি থাকে আমার আসবেই, সেইজন্য আমি কাজ কেন করতে যাব, কিছু দিন আগে পর্যন্ত এটাই ভারতবর্ষের ফাঁকিবাজদের ঠিক ঠিক দর্শন ছিল।

গীতা এখানে কয়েকটি শ্লোকে এই জিনিসটাকে পরিষ্কার করছেন। তোমার জন্য যদি এটা ঠিক করাও থাকে, তাও তোমার কাজ করা দরকার। কারণ তুমি কাজ তো করছই, তোমার শরীর তো কাজ করছেই। তুমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, খাওয়া-দাওয়া করছ, কথা বলছ, ঘুমোচ্ছ, সব কিছু করছ, কিন্তু কাজ করার সময় বলছ, আমি কাজ করব না। যদি তুমি বল, কাজ না করলেও আমার হবে, কিন্তু সেটা তোমার এই জন্য হবে না, কারণ তোমার যে স্বভাব, তোমার মনের যেমন প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক যে প্রস্তুতি, সেটাই তোমাকে দিয়ে কাজ করাবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান এটাই অর্জুনকে বলবেন, তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে।

কাজ ছাড়া কেউ বসে থাকতে পারবে না। যেমন একজন পিয়ানো বাজান, তিনি একজনের বাড়িতে গেছেন। বাড়িতে যার কাছে গেছেন, সে তখন বাড়িতে নেই। তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তিনি বসে বসে দেখছেন ঘরের কোণে একটা পিয়ানো রাখা আছে। তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে পিয়ানোতে টুং টাং করে বাজাতে শুরু করবেন। কারণ তার স্বভাবে আছে। আমাদের স্বভাবেই আছে কাজ করা, ঠেলে আমাদের দিয়ে কাজ করাবে। তার থেকে আরও সহজে

বোঝা যায়, আমাদের শরীরটাই চলবে না, যদি আমরা কাজ না করি। সব কিছুই করছি, কিন্তু ঐ জায়গাতে কেন বলব, পূর্ব নির্ধারিত ভাবে আমার সব ঠিক করা আছে, কাজ না করলেও আমি পেয়ে যাব? কিন্তু না, কাজ আমাদের করতে হবে, স্বভাবে কাজ করাবে।

আমি যদি ত্যাগ নাও করতে চাই, মৃত্যু যখন আসবে, তখন আমার পায়ে দড়ি বাঁধবে, তারপর টেনে আমাকে নিয়ে চলে যাবে, আমাকে সব কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য করাবে। কিন্তু আমরা ঠেকেও শিখতে চাই না, আমরা সব কিছুকে ধরে রাখতে চাই। ধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চাইছেন –একটা কয়েদীর মত তোমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে যাবে, এই জিনিস হতে দিও না। তোমার আত্মসম্মানকে ধুলায় লুটিয়ে দিও না, নিজে থেকেই তুমি ত্যাগ করে দাও। তুমি যদি ত্যাগ করতে শেখ, তাহলে ধীরে ধীরে তুমি একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবে, তখন এই মৃত্যুর ব্যাপারটা তোমার কিছুই মনে হবে না। মৃত্যু তোমাকে আর ভয় দেখাতে পারবে না, শুধু মৃত্যুই না, কোন কিছুই আর তোমাকে ভয় দেখাতে পারবে না, কারণ তুমি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। গীতা যে কর্মের কথা বলছেন, সেই কর্মকে এই অর্থেই নিতে হয়। তোমার প্রকৃতি, তোমার ভিতরের যে স্বভাব, সেটা তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেই। তাহলে আমরা নিজে থেকেই কাজ করি না কেন। কি দরকার অন্য কেউ আমাকে দিয়ে কাজ করাতে আসবে, আমি আমার সম্মান বজায় রেখে কাজ করব, তোমার কথা মত কিছু করব না।

দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে যুদ্ধে অনেক সৈন্য বন্দী হয়ে যায়, এরা সাধারণ বন্দী না, এরা হল যুদ্ধবন্দী। অনেক সময় যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে তারা কাজ করায়, যেহেতু কয়েদী। সেখানেও যারা বন্দী হয়েছে, তাদের অফিসাররা পরিষ্কার বলে দেয়, দুষমনের আদেশে তুমি কাজ করবে না, আমার আদেশে কাজ করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। আমেরিকা বা বৃটেনের অনেক সৈনিক দুষমন দেশে বন্দী হয়ে যেত। এখন শত্রু পক্ষের ইনচার্জ বন্দীদের আদেশ করছে, তুমি এখানে রাস্থা তৈরীর কাজে লেগে যাও। সৈন্যরা কাজ করবে না, ওকে শাস্তি দিয়ে দিক, যাই করে দিক, ও কাজ করবে না। কিন্তু যখন আমেরিকার কমাণ্ডারকে আদেশ করা হচ্ছে, তুমি তোমার সৈন্যদের দিয়ে এই কাজ করিয়ে দাও। ওই কমাণ্ড যখন আদেশ করে তখন ওরা কাজ করে দিচ্ছে। জাপানী সৈন্যরা দেখল, আমেরিকার সৈনিকরা যুদ্ধে বন্দী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানের সাথে কখন আপোষ করবে না। আমরাও কেন আমাদের আত্মসম্মানের সাথে আপোষ করতে চাইব? যদি আমরা আমাদের আত্মসম্মানের সাথে আপোষ না করতে চাই, তাহলে আমাদের স্বভাব ঠেলে কেন করাবে, আমি স্বেচ্ছায় করব, আমি আমার ইচ্ছায় করব।

এই জায়গাতে এসে একটা brandingএর ব্যাপার পাওয়া যায়। আগে আমরা জানতাম বাটা কোম্পানী বাজারে যে জুতা বিক্রী করে, সেটা তারা নিজেরা ফ্যাক্টরিতে বানায়। পরে আমরা জানলাম ব্যাপারটা তা না, কলকাতার আশেপাশে যারা ভাল জুতা বানায়, বাটা কোম্পানী তাদের দায়ীত্ব দিয়ে দেয়, তার সাথে কোম্পানী কোয়ালিটি কন্ট্রোল করে, তারপর সেই জুতাতে বাটা কোম্পানীর স্ট্যাম্প মেরে দেয়। অনেক আগে কোন ম্যাগাজিনে একটা ঘটনা বেরিয়েছিল।

ইতালি হল ফ্যাশান মার্কেট। সারা বিশ্বে পোশাকের যে ডিজাইনগুলো দেখা যায়, এগুলো ইতালির একটা বিশেষ অঞ্চল থেকে বের হয়। ঘটনার বিরাট বর্ণনা আছে, ব্যাপারটা হল, যারা কোন পোশাকের ডিজাইন চায়, তারা ওই অঞ্চলের পোশাক নির্মাতাদের ওই ডিজাইনটা দেয়, তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পোশাকের উপর নিজের কোম্পানীর ছাপ মেরে দেয়। বিশ্বে যত নামকরা পোশাক নির্মাতা, জুতা নির্মাতা আছে, কোম্পানীগুলো কোন জিনিসই তৈরী করে না। কোন বিশেষ অঞ্চলে ওদের পছন্দ মত ভাল কারিগররা আছে, তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করে; এরা শুধু ওদের তৈরী জিনিসগুলোর উপর branding করে দেয়।

জীবনে যদি কেউ ভাল হতে চায়, কাজ করে যদি মুক্তি পেতে চায়, কর্ম করে যদি কেউ মহাপুরুষ হতে চায়, তাহলে তাকে এই brandingটা করে দিতে হবে। এই brandingটা হল যজ্ঞ। সমস্ত কাজকে যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, সব কাজকে যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, কাজটা branding হয়ে গেল। এবার এই কাজ তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে চলে যাবে। তাকে আলাদা করে কিছু করতে হবে না, সবই তো সে করছে, শুধু ভাবটা পাল্টে দিতে হবে। নিজের ঘর ঝাড়পোছ করছে। আপনি কেন ঝাড়ু দিচ্ছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি? কেন থাকবে না, সবাই আছে, কিন্তু কাজ কেউ করতে চায় না, আমাকেই তাই বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিরক্তির ভাব। এই কাজটাই তখন একটা বন্ধন হয়ে তাকে বেঁধে ফেলছে। কিন্তু এতে যজ্ঞের brandingটা লাগিয়ে দিলে এই কাজটারই একটা বিরাট দাম হয়ে যাবে।

ভারত সরকার কিছু দিন আগে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প নিয়ে এলেন। আমরা প্রকল্প বলি না, আমরা বলি যজ্ঞ। মায়েদের বাড়িতে রোজই রান্না করতে হয়, ওই রান্নাটাই যজ্ঞে রূপে করে দিক। মা কি করছেন এখন? তিনি এখন রন্ধন যজ্ঞ করছেন। কার জন্য এই যজ্ঞ করছেন? ঈশ্বরের জন্য করছি। এই রান্না কারা খাবে? ঈশ্বরের সন্তানরা খাবেন। কারা ঈশ্বরের সন্তান? আমার স্বামী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আমার ভাসুর, দেওর, ননদ, আমি, সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান। যে রান্না করাটা মায়েদের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল, সেই রান্নাটাই এবার যজ্ঞে বা পূজাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। হিন্দুদের যে বিবাহ অনুষ্ঠান, এটাও যজ্ঞ করে এবং যজ্ঞ রূপে করা হয়। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে বলছেন, এই যে সন্তানোৎপাদন প্রক্রিয়া, এটাও যজ্ঞ।

এই কথাই ভগবান এই শ্লোকে বলছেন, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*, এই সংসারে সমস্ত কর্মই কর্ম বন্ধন, কর্ম আমাদের সংসারে বেঁধে দেবে। প্রায়ই লোকেরা জিজ্ঞেস করে, দয়া করে বলে দিন, আমাকে কি করতে হবে? কিছুই করতে হবে না, সবটাই তো আপনি করছেন, বাটা কোম্পানী যেমন জুতাতে নিজের নামটা মেরে দিয়ে branding করে দেয়, আপনাকেও শুধু brandingটা করতে হবে, এখানে যজ্ঞের ছাপটা মেরে দিতে হবে। শুধু branding করলেই হবে না, branding করতে গেলে কিন্তু কোয়ালিটি কন্ট্রোল অবশ্যই করতে হয়। নামকরা কোম্পানীরা যে কোন জিনিসে কিন্তু নিজের কোম্পানীর নামের ছাপ মারতে দেবে না। যে কেউ একটা জুতা বানিয়ে এনে দিলে বাটা কোম্পানী branding করবে না। ওই কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা আমাদের নিজেদের করে নিতে হবে, তারপর যজ্ঞের branding। স্নান করছি, যজ্ঞ; স্নান করার পর তারে কাপড় শুকোতে মেলছি, যজ্ঞ; ঠাকুরের পূজা অর্চনা করছি, যজ্ঞ; রান্না করছি, যজ্ঞ; খাওয়া-দাওয়া করছি, যজ্ঞ। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন সেন্টারে খাওয়ার আগে সবাই বলবেন, *ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্*, তখন খাওয়াটাই হয়ে গেল আহার-যজ্ঞ।

যজ্ঞ রূপে সব কাজ যখন হয়, তখন এটাই মুক্তির কারণ হয়। যদি কাজ যজ্ঞ রূপে না হয়, তখন ওই কাজটাই বন্ধনের কারণ হয়। কারণ সেখান থেকে ভোগ এসে যায়, ভোগ এসে গেলেই রাগ আর দ্বেষ এসে গেল। রাগ – প্রিয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, দ্বেষ – যেটা অপ্রিয়, সেটার থেক পালানো, এটাই বন্ধন হয়ে গেল। যদি বন্ধন থেকে বাঁচতে চাও, কয়েদী হওয়া থেকে যদি বাঁচতে চাও, সমস্ত কাজ যজ্ঞ রূপে কর। হে অর্জুন, এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এটা যুদ্ধ যজ্ঞ; যজ্ঞে লোকেরা বলিদান দেবে, এটাই যজ্ঞ। যুদ্ধের আগে মহাভারতের একটা জায়গায় কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে এই যুদ্ধের যে বর্ণনা করছেন, সেখানেও তিনি যুদ্ধকে যজ্ঞ রূপে বর্ণনা করছেন।

*তদর্থং কর্ম কৌন্তেয়*, হে অর্জুন, সেইজন্য তুমি কাজ কর। কিভাবে কাজ করবে? যে কোন কাজ যখন করবে, ঈশ্বরের জন্য আমি এই কাজ করছি, এই ভাব নিয়ে সব কাজ করবে। একটু

পরেই ভগবান বলবেন, কেন কাজ করবে? অপরের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কাজ করবে। ছোটবেলায় আমরা দেখতাম, ঠাকুরমা, দিদিমা, জ্যেঠিমারা সারাদিন কত কাজ করতেন। তাঁদের সেই কাজের মধ্যে ডুবে থাকাটা আমাদের মনের মধ্যে এখনও জ্বলজ্বল করছে। যদি আমরা কাজে ফাঁকি দিই, কাজ ঠিক ভাবে না করি, তার থেকেও খারাপ, যজ্ঞ রূপে করছি না, এতে অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। যদি কেউ সৎপুরুষ হন, তবে তাঁর বংশে দু চারজন খারাপ বেরোতে পারে; কিন্তু সে যদি খারাপ হয়, তাহলে কোন সম্ভবনা নেই যে, ভাল কেউ সেই বংশ থেকে বেরোবে। আম গাছের বীজ লাগালে, চারটে গাছ ভাল হবে, চারটা গাছ মন্দ হবে। আমের জায়গায় যদি বাবলা গাছের বীজ লাগানো হয়ে, সেখানে কোন দিন ভাল আম গাছ জন্মাবে না, কোন সম্ভবনাই নেই।

আমরা কিসের প্রার্থনা করি? যেটা আমাদের অভাব, সেটারই আমরা প্রার্থনা করি। যেটার অভাব নেই সেটার জন্য কেন আমরা প্রার্থনা করতে যাব! খ্রীশ্চান ফাদারকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ফাদার একজনকে জিজ্ঞেস করছে, 'ঈশ্বরের কাছে তুমি কি চাইবে'? সে বলছে, 'টাকা-পয়সা চাইব, বড় বাড়ি চাইব, একজন ভাল জীবনসঙ্গিনী চাইব'। ফাদার বলছেন, 'ছি ছি, ঈশ্বরের কাছে এসব জিনিস কি চাইতে হয়! তাঁর কাছে চাইতে হয়, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য'। ছেলেটি বলছে, 'যার যেটার অভাব, সে তো সেটাই চাইবে'। আমাদের কি শিক্ষা দেওয়া হয়? যে শিক্ষা বা জ্ঞানের আমার অভাব, সেটারই শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়।

গীতা কেন এত বারবার কর্ম করার কথা বলছেন? কারণ ভারতের লোকেরা প্রথম থেকেই কাজে ফাঁকি মারত। শিক্ষা ওটারই দেওয়া হয়, যেটা তার অভাব। যীশু ভালবাসার কথা বলছেন, প্রেমের কথা বলছেন। কেন বলছেন? তিনি জানেন, ওরা ওই রকমই, সারা দিন হিংসা করছে। যখনই শাস্ত্রে একটা জিনিসের শিক্ষা দেওয়া হয়, আর একটা জিনিস বারবার করে বলা হয়, তখন বুঝতে হয় ওই সমাজে ওটার অভাব আছে। আজও ভারতবর্ষে কেউ কাজ করতে চায় না, কিন্তু কাজের ফল চায়। ভোট এলেই নেতারা গিয়ে লোকেদের বলতে শুরু করবে, আমি আপনাদের এটা করে দেব, সেটা করে দেব। আমরা কি ভিখারী নাকি? আপনি কি মনে করছেন যে, আপনি না করলে আমাদের এসব কিছুই হবে না? আমরা নিজেরাই খেটে করে নেব। কিন্তু আমরা সবাই কাঙালীর মত চেয়েই যাচ্ছি। এই কমিউনিটি বলছে আমাদের জন্য সংরক্ষণ চাই, যাতে সহজে চাকরি পেয়ে যেতে পারে। অন্য এক কমিউনিটি বলছে, আমাদের জন্য এই জিনিসগুলো ফ্রীতে করে দেওয়া হোক। সবাই সব কিছু ফ্রীতে পেতে চাইছে। দেশটা যেন কাঙালীর দেশ হয়ে গেছে, কাজ কেউ করব না, কিন্তু সব কিছু চাই।

বাইবেলে যীশু খ্রীষ্ট খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন, Story of twenty talents। একজন বড়লোক, তার দুজন সেবক ছিল। একবার উনি দুজনকেই twenty talents দিলেন, একটা বড় অঙ্কের টাকা, কুড়ি হাজার কি, কুড়ি লাখ টাকা দিলেন। তুমি এই টাকাটা তোমার কাছে রাখ, আমি পরে চেয়ে নেব। এক বছর পর, উনি দুজনকেই ডেকে পাঠালেন, আমার টাকাটা ফেরত দাও। একজন সেবক ওই twenty talentsকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। বড়লোক খুব খুশী, দ্বিগুণ কি করে হলো? 'আপনি টাকাটা রাখতে দিয়েছিলেন, আমি সেটা ব্যবসাতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে মুনাফা মিলিয়ে এটা দ্বিগুণ হয়েছে'। মালিক তো খুব খুশী, তুমি পুরোটাই তোমার কাছে রেখে দাও। দ্বিতীয় সেবককে বলতে, সে সঙ্গে সঙ্গে দশটা দু হাজার টাকার নোট বার করে এনেছে। বড়লোকটি বলছে, 'কি ব্যাপার, একেবারে সেই নোটগুলোই ফেরত দিলে, যে নোটগুলো আমি তোমাকে দিয়েছিলাম'! 'না, আপনার দেওয়া জিনিস কিনা, তাই খুব সামলে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলাম'। 'তুমি একটা ফাঁকিবাজ, তুমি সব টাকা আমার ফেরত দাও'। যীশু তখন এটাই বলছেন, 'ভগবান আমাদের যেটা দিয়েছেন, সেটাকে যদি কাজে লাগানো হয়, তাহলে কাজে লাগিয়ে

যেটা লাভ হল, সেটা সমেত সবটাই তার কাছে থাকবে। যদি কাজে না লাগানো হয়, তাহলে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়'।

আমাকে আপনাকে সবাইকে ভগবান যে সুযোগ দিয়েছেন, সেই সুযোগকে ঠিক ভাবে কাজে না লাগাতে পারলে ভগবান পুরোটাই কেড়ে নেবেন। মানবজীবনে কর্মকে যদি যজ্ঞ-রূপে না সম্পন্ন করা হয়, ভগবান যেটা দিয়েছিলেন সেটাও কেড়ে নেবেন। কিন্তু আমাদের ভাব, ভগবান কেড়ে নিন, আমার কর্ম কেড়ে নিন, আমার কিন্তু তাতেও চলে যাবে। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্যই এই শাস্ত্রগুলি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? তিনিও মজা করে উত্তর দিলেন, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। এটা তো একটা পশুও জানে, তারাও তো আহার, নিদ্রা, মৈথুন সব সময় করছে। অন্য দিকে বুদ্ধিজীবিরা, যুক্তিবাদীরা বলবেন ভগবান বলে কিছু নেই, ভগবানকে কোথাও দেখা যায় না। এটা তো সবাই দেখছে, ভগবানকে কোথাও দেখা যায় না, এটাকে জানার জন্য কেন আমাকে শাস্ত্র জানতে হবে? শাস্ত্র সেই জিনিসটাকে নিয়েই বলে, যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, ইন্দ্রিয় সংযম করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভোগ-বাসনাতে না গিয়ে, ভিতরে কোন তৃষ্ণা না রেখে, হে অর্জুন, তুমি যজ্ঞ মনে করে সব কাজ কর। আমার আপনার সবার জন্য এটাই, যা কিছু আমরা করছি, সবটাই যজ্ঞ রূপে করতে হবে। একজন সন্ন্যাসী ভাই আমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে রোজ ক্লাশ নিচ্ছেন, ক্লাশ নেওয়ার আগে আপনি কি প্রস্তুতি নিয়ে যান'? আমি তাঁকে বললাম, 'দেখুন, ক্লাশগুলো আমার কাছে পূজা, আমি লেকচার দেওয়ার জন্য ক্লাশ নিই না, এটা আমার কাছে যজ্ঞ। যাঁরা শুনছেন ভাল, আমার শ্রোতা যদি কেউ না থাকে, তাতেও আমার কিছু আসে যায় না। এই ক্লাশ আমার কাছে পূজা, আমার কাছে যজ্ঞ, কারণ এর মাধ্যমে আমি নিজেকে উত্থান করছি'।

আমাদের শাস্ত্রও বলছে, শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা, এগুলোর দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক উত্থান হয়। যা কিছু করছি, দাঁত ব্রাশ করছি, যজ্ঞ; সবটাই যজ্ঞ। এইভাবে সব কাজ করলে আমাদের জীবন অন্য রকম হয়ে যাবে। এই যে জীবনের অন্ধকার বা অন্ধকারময় জীবন, হঠাৎ দেখা যাবে অন্ধকার সরে গিয়ে শুধু আলো আর আলো। এখন মনে যে এত কষ্ট, এত দ্বন্দ্ব, এত বিরোধ, সব কেটে যাবে। এখান থেকে ভগবান এবার নিয়ে আসছেন বেদের কর্ম, দেবতাদের কর্ম। এই জায়গাতে কিছু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস থাকাতে বুঝতে অসুবিধা হবে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।

*(সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সাথে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করে বলেছিলেন –এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনুর তুল্য হোক।)*

প্রজাপতি যখন জগৎ সৃষ্টি করলেন, মানুষ সৃষ্টি করলেন; তিনি তখন এক সঙ্গে অনেক কিছু সৃজন করলেন। প্রথমে তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মানুষ, তার সাথে অন্যান্য প্রাণী এবং এর সঙ্গে তিনি যজ্ঞের জন্ম দিলেন, যে যজ্ঞ আগেকার দিনে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সম্পাদন করা হত। যজ্ঞ সৃষ্টি করে ভগবান বললেন, কামধেনু যেমন সমস্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, কল্পতরু যেমন সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে, ঠিক তেমনি এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে পূরণ করবে। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান বলে দিলেন, তোমাকে এই সংসারে দিয়ে দিলাম। তোমার ইচ্ছা কিভাবে পূরণ হবে? তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা যজ্ঞ কর, কামধেনু যেমন সব ইচ্ছা পূরণ করে, এই যজ্ঞও কামধেনুর মত তোমাদের সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে।

হিন্দুদের মতে ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনটে জিনিস একসাথে হয়। ভগবানের সৃষ্টি আমাদের মত না। আমরা যদি বাড়ি বানাতে চাই, বাড়ি বানাবার আগে মনে একটা ইচ্ছার উদয় হয়, তারপর একটা প্ল্যানিং হয়, একটা নক্সা বানানো হয়, বাড়ি বানাবার সরঞ্জাম জোগার করা হয়, তারপর একটার পর একট ইট গেঁথে বাড়ি তৈরী করা হল। ভগবান এভাবে সৃষ্টি করেন না। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছাটাই কার্যে পরিণত হয়ে যায়। এই ইচ্ছাটা এক সঙ্গে তিনটে আকার নেয় –একটা জ্ঞানরূপ বা চিন্তন রূপ, দ্বিতীয় শব্দ রূপ, তৃতীয় বস্তু রূপ। আমার হাতে কলম, এই কলম একটা বস্তু, কলম একটা শব্দ এবং কলম একটা বিচার বা আইডিয়া বা জ্ঞান। যিনি কলম কখন দেখেননি, তাকে যদি কলম বলি, সে বুঝতে পারবে না। Idea, word and object, এই তিনটে এক, শুধু তিনটে স্তরে চলে। বস্তু হল এই সংসার, শব্দ হল আরেকটু উচ্চতর আর আইডিয়া, জ্ঞান হল আরও গভীরে।

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞানরাশি, এটাকে বলা হয় বেদ। বেদ বলতে আমরা জানি চারটে বেদ, ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব; কিন্তু বেদ তা না, যে কোন জ্ঞানকে, এমনকি স্বামীজী বলছেন, সমস্ত ধর্মের জ্ঞান বেদ। বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করলে আসে বিদ্ ধাতু, বিদ্ শব্দের মানে বিদ্যা বা জানা। ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে, মানে স্বতঃস্ফূর্ত, অত্যন্ত সহজ ভাবে সেই জ্ঞান বেরিয়ে আসে, সেটাই বেদ। বেদের দুটো রূপ, শব্দ রূপ ও জ্ঞান রূপ, দুটো মিশে আছে, বেদের যত মন্ত্র আছে তাতে দুটোই মিশে আছে। শব্দরাশিটা বেদ না, শব্দের পিছনে যে জ্ঞান রয়েছে, সেটাই আসল বেদ। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে বস্তু সমুদয়। এই বস্তু সমুদয় জ্ঞান রূপে ঈশ্বরের মনে অবস্থিত ছিল। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি শুধু বললেন, হোক, সব হয়ে গেল। আমরাও যদি সেই জ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাতে পারি, তখন বস্তু ছাড়াই সৃষ্টি করা যাবে। যোগশাস্ত্রও বলছেন, উচ্চমানের যোগীদের এই ক্ষমতা হয়ে যায়, ইচ্ছা মাত্রই তিনি বস্তু সৃষ্টি করে দিতে পারেন। ভগবান যেটা ইচ্ছা করেন, সেটাই হয়ে যায়, কোন কোন উচ্চমানের যোগীরাও পারেন, কিন্তু তোমরা তো আর এভাবে সৃষ্টি করতে পারবে না। তাহলে তোমরা কি করে পারবে? বলছেন, যজ্ঞের দ্বারা তোমরা সেই ক্ষমতা পেয়ে যাবে। যজ্ঞ যেন কামধেনু গাভী, কামধেনুর কাছে যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়।

সৃষ্টির প্রথম ভগবান বা প্রজাপতি কি করলেন, তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি করলেন, তার সাথে বেদেরও সৃষ্টি হল। সেই বেদের মধ্যে যজ্ঞ রয়েছে, আর মানুষকে বলে দিলেন, তুমি যজ্ঞ কর। গীতার এখানে যে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, বৈদিক যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। আমরা যে সমস্ত কর্মকে যজ্ঞ রূপে করার কথা বলছি, এই যজ্ঞ তা না। পরে পরে গীতা এর অর্থকে পাল্টে দিয়ে বলে দিলেন, সমস্ত কর্মকে তুমি যজ্ঞ রূপে কর। কিন্তু আগেকার দিনে, বিশেষ করে বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কামনা বা কামনাশূন্য হয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতেন, সেই আহুতিকে বলা হত যজ্ঞ। যজ্ঞ কিন্তু দুটো অর্থেই হয়, কোথায় কোন অর্থে বলা হয়েছে, সেটাকে বুঝে অর্থ বার করতে হয়। কামধেনু রূপী এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবে। সেইজন্য কি করবে?

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

*(এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের সংবর্ধনা কর এবং দেবতারাও তোমাদের বৃষ্ট্যাদি দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনপূর্বক অনুগৃহীত করুন। এইরূপে পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।)*

ভগবান যখন মানুষদের সৃষ্টি করলেন, তখন দেবতাদেরও সৃষ্টি করলেন, অন্যান্য প্রাণীদেরও সৃষ্টি করলেন। বিভিন্ন সময় আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছি, সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটা হল দেবযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ কেন করতে বলছেন? আমাদের আশেপাশে যাবতীয় যা কিছু চলে, সমস্ত

কিছুর পিছনে এক আত্মা রয়েছেন। যেমন আমার এই শরীরের পিছনে এক আত্মা আছে, যেটা আমাকে আমি বানায়। আমি মরে যাওয়া মানে, এই শরীরের ভিতরে যিনি জীবাত্মা, যিনি এই মনের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন, তিনি এই শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বব্যাপী আত্মা, জীবাত্মা ও দেহাত্মাকে নিয়ে আমরা বিরাট আলোচনা করেছি।

এই শরীরের পিছনে যেমন এক জীবাত্মা রয়েছেন; সর্বব্যাপী আত্মা তো রয়েইছেন, সর্বব্যাপী আত্মা তো সবারই সমান, কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সাথে যে জিনিসটা নিজেকে যুক্ত করেন, তিনি হলেন জীবাত্মা। ঠিক তেমনি, বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ উঠছে, চন্দ্র কিরণ দিচ্ছে, এদের সবার পিছনে যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছেন, এনাদের বলা হয় দেবতা। এই দেবতাদের সব সময় প্রসন্ন করতে হয়। দেবতারা এক-একজন ব্যক্তি না, এনার সবাই সেই ঈশ্বরীয় শক্তি, যে শক্তি ওই বিশেষ জায়গায় মূর্ত হয়ে রয়েছে। আমি, আপনি, তিনি সবাই আমরা নিজেদের এক একজন একক ব্যক্তি বলে মনে করি ঠিকই, কিন্তু আসলে তো তা না, আসলে সবাই সেই ঈশ্বরীয় সত্তা। সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আমার মনকে আশ্রয় করে সেই সত্তা 'আমি' অমুক হয়ে রয়েছি, সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আপনার মনকে আশ্রয় করে আপনি অমুক হয়ে রয়েছেন। সেই ঈশ্বরীয় সত্তা আরেকটি মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্র হয়ে রয়েছেন, সূর্য হয়ে রয়েছেন, অগ্নি, চন্দ্র আদি হয়ে রয়েছেন। এই দেবতারা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আগে আগে তাঁরা অনেক যজ্ঞ করেছেন, পূণ্য করেছেন, আজকে তিনি তাই আমার আপনার মালিক। আজকে যাঁরা মন্ত্রী হন, প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁরাও নিশ্চয় কোন পূণ্য কর্ম করেছিলেন বলেই আজ ক্ষমতার এই জায়গায় আসতে পেরেছেন। এই মুহূর্তে আমরা তাঁদের গালাগাল দিই আর যাই করি, আজকে তো তাঁরা আমার রাজা, তাঁর ইচ্ছা মতই আমাকে চলতে হবে।

ভগবান বলছেন, *দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ*, এই দেবতারা আর তোমরা পরস্পর জুড়ে রয়েছ। তোমরা দেবতাদের সমৃদ্ধ কর। কিভাবে? যজ্ঞ করে। যদি যজ্ঞ করতে থাক, তাতে দেবতাদের সমৃদ্ধি হবে। তখন দেবতারাও বিনিময়ে তোমাদের সমৃদ্ধ করবে। আমাদের ভাষায় এভাবে বলা যেতে পারে, যত ফ্যাক্টরি আছে, তার মালিক ও তার শ্রমিক, সবাই পরস্পর জুড়ে আছে, যেমন মা আর সন্তান জুড়ে থাকে, স্বামী আর স্ত্রী জুড়ে থাকে, গুরু আর শিষ্য জুড়ে আছে। এক অপরকে সমৃদ্ধ কর। শিষ্য যদি গুরুকে সমৃদ্ধ করে, পাল্টা গুরু শিষ্যকে সমৃদ্ধ করবেন। মা যদি সন্তানকে সমৃদ্ধ করে, সন্তানও মাকে সমৃদ্ধ করবে। ঠিক তেমনি তোমরা যদি দেবতাদের সমৃদ্ধ কর, দেবতারাও তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন। এই শ্লোকের সাথে আরও কয়েকটা শ্লোক জুড়ে আছে, পরে তাই এর আরও ব্যাখ্যা আসবে।

*পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ*, এক অপরের চিন্তা কর, পরস্পর পরস্পরের সমৃদ্ধি কিভাবে আসবে, সেই চিন্তা কর, তবেই তোমরা শ্রেয় পাবে। জীবনে আমরা শ্রেয় পাই না কেন, শুভ কেন জীবনে আসছে না? কারণ যাঁরা আমাদের মালিক, যাঁদের উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন চলছে, তাঁদের আমরা আরও সমৃদ্ধ করছি না। দিনরাত আমরা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুনছি, এরা কি কেউ পরস্পরের সমৃদ্ধি চায়?

আমরা সন্ন্যাসীরা বহু বছর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেন্টারে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। যেখানেই যান, সব জায়গায় আলাদা আলাদা রকম পরিস্থিতির সাথে তাঁদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও একটা জিনিস, সেন্টারের যিনি সেক্রেটারি বা অধ্যক্ষ, সেন্টারকে নিয়ে তাঁর যেটা ইচ্ছা, সেটাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁরা সব কিছু করেন। হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যক্ষের কোন কাজ কারুর পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ অধ্যক্ষের সমৃদ্ধিতে সব আশ্রমবাসীদের সমৃদ্ধি। একজন সন্ন্যাসীর যে আধ্যাত্মিক উত্থান হবে, যে কোন উত্থান সেন্টারের অধ্যক্ষের উপর নির্ভর করে। তার জন্য একজন সন্ন্যাসীকেও তাঁকে সমৃদ্ধ

করতে হবে। ভগবান বলছেন, সৃষ্টি করে প্রজাপতি, যিনি ব্রহ্মা, তিনি এটাই বিধান দিলেন, তোমাদের যজ্ঞে দেবতাদের সমৃদ্ধি হবে, বিনিময়ে দেবতারা তোমাদের সমৃদ্ধি দেবেন। এই *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ* যদি না হয়, তাহলে দুজনেরই ক্ষতি হবে। এই *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ*, অপরের কি করে মঙ্গল হতে পারে, এই চিন্তা-ভাবনা আজকাল নেই বলেই বর্তমান সমাজে বিভিন্ন সমস্যা।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

*(দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং এই দেবতাপ্রদত্ত বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।) (অনিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অপবিত্র)*

জেনে রেখো যা কিছু তুমি পেয়েছ, তা তুমি নিজের ক্ষমতায় বা কৃতিত্বে পাওনি, এটা দেবতাদের আশীর্বাদ; দেবতাদের আশীর্বাদেই মানুষ সব কিছু পায়। দেবতাদের এই ঋণ আমাদের সবাইকে দেবযজ্ঞের দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ যদি না কর, তাহলে তুমি যে দেবতাদের আশীর্বাদে এখন যা কিছু করতে পারছ, সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।

আমরা তিনটে স্তরে চলি, মানুষ, দেবতা আর ঈশ্বর। পরে পরে দেবতাদের ভাবটা অনেক ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দেবতারা কি আছেন? আমরা বলব, অবশ্যই আছেন, সমস্ত কিছুতে আছেন। সেইজন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞের একটা বিরাট স্থান এখনও আছে। এখনও পূজার সময় পঞ্চ দেবতার পূজা করা হয়, পঞ্চ দেবতাদের জন্য আলাদা নৈবেদ্য দেওয়া হয়। দেবতারা কোন কারণে যদি কুপিত হন, সংসারে অনেক রকম সমস্যা দেখা যাবে, সবাই এটা আমরা মানি। আবার অনেকে মনে করেন, আমি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাতেই আমার সব হয়ে যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। নবম অধ্যায়ে ভগবানও বলবেন, আমাকেই যদি তুমি উপাসনা কর, তাতে সব দেবতারাও সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। শিকড়ে জল দিলে পুরো বৃক্ষ জল পেয়ে যায়, কোন সন্দেহ নেই।

আমরা আগেও বলেছি, গীতা হল বেদের সার, বেদে যত দর্শন আছে, সমস্ত দর্শন এখানে আছে। উপনিষদের যত দর্শন আছে, সব এখানে রয়েছে। মহাভারতে যত দর্শন, সব এখানে রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য যে দর্শন, সাংখ্য, যোগ ইত্যাদি, গীতাতে রয়েছে। গীতা সমন্বয় শাস্ত্র, সব রকম মতবাদ, দর্শনকে সমন্বয় করে এই একটা জায়গা গীতাতে নিয়ে আসা হয়েছে। গীতা কোন কিছুকে বাদ দেন না। এই শ্লোকে যে কথা বলছেন, এটা বেদের ধর্ম। আমরা সব সময় প্রশ্ন করি বেদে কি আছে? বেদের মূল এটাই, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তার সাথে দেবতারাও আছেন। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করলে, দেবতারা আমাদের সমৃদ্ধি দেন। দেবতাদের সমৃদ্ধি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়।

ঠাকুর অধর সেনকে বারবার বলছেন, তুমি যে ডেপুটি হয়েছ, এটা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছ। সমাজে যখন কারুর কৃপাতে আমরা যদি অনেক কিছু পাই, তখন আমরাও চেষ্টা করি তাঁকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু উপহার দিতে। এখন একটা নূতন শব্দ এসেছে, আমিও আগে জানতাম না, এটাকে বলছেন, return gift। দূর্গাপূজায়, নববর্ষে আমাকে কেউ উপহার দিল, আমিও তাকে পাল্টা কিছু উপহার দিলাম। ভগবান যখন আমাদের কৃপা করছেন, তখন কি আমরা প্রতিদানে ভগবানের পূজা করছি? এখানে ভগবানকে নিয়ে বলছেন না, দেবতাদের নিয়ে বলছেন, তবে এটা ভগবানের উপরেও যায়। আমরাও ছোটবেলা দেখতাম, গ্রামের কিছু ভাল হলে, গ্রামের সবাই মিলে গ্রামের যে বিশেষ দেবতা, তাঁর মন্দিরে গিয়ে পূজা দিতে যেতাম। বেলুড় মঠেও বিশেষ ভাল কিছু হলে সন্ন্যাসীদের উদ্যোগে মন্দিরে ঠাকুরকে বিশেষ পূজা নিবেদন করা হয়।

ভগবান বলছেন, *তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো*, তুমি যদি এটা না করো, শুধু যদি তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দেহের তৃপ্তির জন্য কর, তাহলে তোমার এটা চুরি করা হয়ে যাবে, তুমি তখন হয়ে যাবে চোর। ভারতবর্ষের যে আজকে এত সমস্যা, কেন এই সমস্যা? কেন সবাই এত জ্বলেপুড়ে মরছে? একজন খুব সিনিয়র মহারাজ, পণ্ডিত মানুষ, উনি খুব মজা করে বলতেন, 'সবাই সবার থেকে পুড়ছে, গৃহস্থ গৃহস্থকে দেখে পুড়ছে, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে দেখে পুড়ছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে পুড়ছে, সন্ন্যাসী গৃহস্থকে দেখে পুড়ছে। সবাই সবাইকে দেখে পুড়ছে'। কারুর জীবনে কি শান্তি নেই? তখন আবার বলে, মরলে শান্তি। মরলে কোথায় শান্তি! প্রেতলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এক একজনের যা কর্ম, নিন্দুকগুলো মরে ছারপোকা হবে না কি হবে ভগবান জানেন, মশা হবে না ছারপোকা হবে কে জানে, তখন পিছন থেকে সবাইকে কামড়াতে থাকবে।

ভগবান এখানে বলছেন, যার যেটা প্রাপ্য সেটা যদি তুমি তাকে না দাও, তাহলে তুমি একজন চোর। শ্রীশ্রীমা কত সহজ ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন, একজন ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার পর রাখার সময় ঝাঁটাকে ছুড়ে ফেলছে; শ্রীশ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলছেন, দেখো, যার যেটা প্রাপ্য সেটা তাকে দিতে হয়, ঝাঁটাটারও একটা সম্মান আছে, ওরও একটা স্থান আছে, ওটাকেও ঠিক ভাবে রাখতে হয়। যার যেটা প্রাপ্য, তাকে যদি আমি না দিই, তাহলে কিন্তু আমি চুরি করছি, আমি চোর হয়ে যাব। চুরি করাটা যেমন পাপ, তেমনি যার যেটা প্রাপ্য সেটা তাকে না দিয়ে আমিও যেটা করছি, এটাও একটা বড় পাপ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

*(যে সদাচারগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপান্ন ভোজন করে।)*

এই জগতে যত ভোগ আছে, সব আমার জন্য চাই; মনের মধ্যে যাদের এই ভাব, তারা পাপী। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, এই পাপ থেকে তুমি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তুমি যা কিছু ভোগ করবে, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে যে কোন ধরণের ভোগ, সেটা *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ*, যজ্ঞের অবশিষ্ঠ রূপে ভোগ করবে। ভারতের এটা খুব প্রাচীন প্রথা, যজ্ঞ শেষ যেটা, সেটাই তুমি গ্রহণ করবে। যজ্ঞ শেষকে বলা হয় অমৃত, এই অমৃত যদি নিতে পার তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে, কারণ এই অমৃতই তোমাকে পবিত্র করবে। বাকি সমস্ত জিনিস তোমার জন্য পাপ।

আমাদের জীবনে কেন এত কষ্ট, কেন এত জ্বালা যন্ত্রণা? কারণ সারাদিন আমরা পাপ করে যাচ্ছি। এখানে আরও পাঁচ রকম পাপের কথা বলছেন। আগেকার দিনে জাতাতে গম পেষাই করা হত, এখন যেমন শিল-নোড়াতে মশলা পেশাই হয়, বা বাজার থেকে যে কোন জিনিস কিনছি, এতে প্রাণী হত্যা হচ্ছে। আমরা মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, ডিম খাচ্ছি, প্রাণী হত্যা হচ্ছে। আমরা ভাত খাচ্ছি, রুটি খাচ্ছি, এতেও প্রাণী হত্যা হচ্ছে। রান্না করতে গিয়ে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পুড়ে মারা যাচ্ছে, আমরা জানতেও পারছি না। বর্ষাকালে ডেঙ্গু হবে, তার জন্য মশা নিধন করতে হবে, মশা একটা প্রাণী, প্রাণী হত্যার জন্য পাপ হবে। কিন্তু কিছু করারও নেই, আমাদের বাঁচার জন্য মশা মারতে হবে। এই জান্তা-অজান্তা পাপ থেকে বাঁচার জন্য যজ্ঞ করতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা এই জায়গাতেই আসে। আটা পেষাই, উনুন জ্বালানো, পাত্রে জল ভরা, মশলা পেষাই করা, এই ধরণের কাজ করতে গেলে কিছু না কিছু জীবহত্যা জনিত পাপ হয়। এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য ঋষিরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করে দিলেন। যে কোন জিনিস, যা কিছু আমরা ভোগের জন্য করি, তাতে আমরা জান্তা-অজান্তায় অনেক প্রাণীর ক্ষতি সাধন করি, এটাকে কাটাবার জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না

করা হয়, তাহলে কিন্তু পাপ লাগবে। তোমার জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট কেন, এত হতাশা কেন, কারণ তুমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করছ না।

আমরা যখন ভাত, ডাল, রুটি খাই, তখন খাওয়ার শেষে পাতে যদি একটি শস্য দানা পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যজ্ঞ ভাব নিয়ে খাওয়া হয়নি। ঠাকুরের ভোগের বোঁদে, পায়েস যখন হাতে নিয়ে খাই তখন কত সাবধানে প্রসাদ গ্রহণ করি, আমাদের নজর থাকে হাত থেকে যেন গড়িয়ে একটিও বোঁদের দানা বা পায়েসের রস মাটিতে না পড়ে। কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ভোগের জিনিস, মাটিতে পড়লে কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। তাই কত যত্ন করে সাবধানে আর শ্রদ্ধাভক্তির সাথে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি। এখন আমরা যখন আহার করি তখন কি আমরা এই ভাব মাথায় রেখে খাচ্ছি যে এটা ঈশ্বরের প্রসাদ, নাকি আমি আমার ভোগের জন্যই খাচ্ছি?

যখনই আমি খাওয়ার আগে *ব্রহ্মার্পণং* করে গ্রহণ করছি তখন সেটা যজ্ঞ হয়ে গেল, তখন আর কিন্তু এটা ভোগের জন্য খাওয়া হচ্ছে না, খাওয়াটা পূজাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এখন এর একটি দানাও আর ডাস্টবিন বা নর্দমাতে যাতে না চলে যায় সেই দিকে আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এই ভাব নিয়ে যদি না করা হয় তাহলেই বুঝতে হবে আমাদের জীবনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। মঠে খাওয়ার সময় দেখা যায় যখন মহারাজদের দ্বিতীয়বার ভাত দেওয়া হয় মহারাজরা বলবেন – 'এই দেখবি দু'দানার বেশি যেন না পড়ে'। ব্রহ্মচারীরা, যাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁরাও এত চৌখস হয়ে যায় যে, ঠিক ততটুকুই দেবেন যতটুকু হাত দিয়ে মহারাজরা দেখাবেন। তার থেকে কয়েকটা দানা যদি বেশি পড়ে যায় মহারাজরা এমন চেঁচিয়ে উঠবেন যে কি একটা মহা অন্যায় কার্য হয়ে গেছে – 'বাঁদরামো করছ, ঠিক করে দিতে জান না'? ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমাদেরও মনে হত দুটো কি তিনটে দানা বেশি হয়েছে তার জন্য এত চেঁচামেচির কি আছে? কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরও একই অবস্থা হয়ে গেছে। ব্রেন এমন হয়ে যায় যে একটা দানা ভাত যদি পাতে ফেলতে হয় তখন যে কি প্রচণ্ড কষ্ট হয় চিন্তা করা যায় না। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক যজ্ঞ।

প্রকৃতির নিয়ম, যতটুকু দরকার তার থেকে এক চুল বেশি নেওয়া চলবে না। প্রয়োজনের বেশি যদি তুমি নিয়েছ তাহলে কিন্তু সেটা আর *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ* হল না। দ্বিতীয় হচ্ছে, *কিল্বিষঃ*, একটা কিছু খাওয়া মানেই তুমি কিছু পাপ করছ, মাছ খাচ্ছি মানে একটা মাছের প্রাণ গেল, ছাগল খাচ্ছি ছাগলের প্রাণ গেল; চাল, ডাল, আনাজ সবারই প্রাণ আছে, এতগুলো জিনিসের প্রাণ যাচ্ছে। শুধু এটুকুই নয়; ধান, গম, তরিতরকারী চাষ করতে কত গরীব লোককে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপর আমাদের মায়েরা কত কষ্ট করে যত্ন নিয়ে রান্না করেছে, আমার মুখের একটা গ্রাসের পেছনে কত হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম লেগে আছে। আমার প্রতিটি গ্রাসে এত পাপ লাগছে, এই পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? তখন গীতা বলছে, *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ*, তুমি যা কিছু গ্রহণ করছ সেটাকে যজ্ঞ রূপে গ্রহণ কর। আমার একটা নতুন জামা হয়েছে, আগে ঠাকুরকে নিবেদন করে বলা 'হে প্রভু, এই নূতন জামাটা তোমারই জিনিস, তুমিই আমার প্রয়োজনে পাঠিয়েছ, তুমি আগে গ্রহণ কর, তারপর আমি এর ব্যবহার করব'। তখনই ওই জামাটা প্রসাদী জামা হয়ে গেল, এটাই হয়ে যাবে যজ্ঞের অবশিষ্ট, যজ্ঞের অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করলাম। এই মনোভাব নিয়ে শুধু জামা কাপড়ই নয়, যা কিছু নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করছি সেটাই এই ভাব নিয়ে গ্রহণ করলে আর পাপ লাগবে না।

আমি যখন ভাত খেতে যাচ্ছি, খাওয়া শুরু করার আগে কিছু খাবার পাত থেকে আলাদ করে পশুপাখিদের জন্য রেখে দিলে সেটাও যজ্ঞ, ওটাও যজ্ঞের অংশ হয়ে গেল। দেখতে হবে এখানে কোন কিছুই যেন নষ্ট না হয়ে যায়। জীবন চালাতে গেলে আমাদের পাঁচ রকম ভাবে পাপ করা হয়, এই পাঁচ রকম পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মনুস্মৃতিতে পাঁচ রকম যজ্ঞের বিধান দেওয়া

আছে। বেদের যাবতীয় যত যজ্ঞ ছিল পরের দিকে গিয়ে এগুলো সব পাল্টে গেল, আর গৃহস্থদের জন্য এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা কর হল। প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ –উপাসনা, জপধ্যান বা শাস্ত্র পাঠ করা, এগুলো ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ –পূজা, অর্চনা ইত্যাদি করা, কোন দেবতাকে ফুল চন্দন দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া, ভোগ নিবেদন করা এগুলো হল দেবযজ্ঞ। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ –পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, খাবার আগে কিছু পিতৃদের নামে অর্পণ করে দেওয়া হয়, এটা অবশ্য আজকাল উঠে গেছে। চতুর্থ নৃযজ্ঞ; অতিথি সেবা, কাউকে যখন নিমন্ত্রণ করে সেবাদি করান হয় তখন সেটাই যজ্ঞ রূপে করা। শেষে পঞ্চম হল ভূতযজ্ঞ, যা কিছু রান্না হয়েছে তার থেকে কিছু গরু, কুকুর, বেড়াল, পাখিদের খেতে দেওয়া। কুকুর বেড়াল পাখিদের খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়াকে নষ্ট বলা হয় না, এটাও যজ্ঞের অঙ্গ। আমাদের মানবজীবন এই পাঁচটা যজ্ঞ দিয়ে বাঁধা, এর মধ্যে কুকুর, বেড়াল, পাখিদেরও স্থান আছে। এর পরের দুটো শ্লোক এক সঙ্গে চলে –

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

*(অন্ন থেকে প্রাণীদের শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘ থেকে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞধূম থেকে মেঘ সৃষ্ট হয় এবং যজ্ঞ (অপূর্ব, অদৃষ্ট বা কর্মফল) বেদবিধি থেকে উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হতে উৎপন্ন জানবে। বেদ অক্ষর পরমাত্মা হতে সমুদ্ভূত। অতএব সর্বার্থ-প্রকাশক বেদ সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।)*

সেই যে ভগবান, তিনি অক্ষর, তাঁর কখন কোন ক্ষয় হয় না। তিনি যখন সৃষ্টি করলেন, সেই সময় তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে বেদের জন্ম হল, আর এই বেদ নিজেই ব্রহ্ম। বেদকে তাই বলা হয়, বেদরূপী ব্রহ্ম। এখানে বলছেন *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*, বেদকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। বেদ হল সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের জ্ঞান হতে পারে, বেদ সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, সেইজন্য বেদ সর্বগত। অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সর্বগত নয়। যেমন বাইবেল, বাইবেল সমগ্র জ্ঞানরাশির একটা ছোট্ট অংশকে কেবল ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বেদ, এটাই জ্ঞান, সেইজন্য সর্বগত। একমাত্র বেদই সর্বগত, সব জায়গায় যায়, সব কিছুর অর্থ প্রকাশ করে। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব, এগুলোতে যখন আমরা নামছি, এনারা সেই জায়গাতে এসে কর্ম জিনিসটাকে পরিভাষিত করেন।

বেদের কাজই হল মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই ধর্ম আসে কর্মের মাধ্যমে, কর্ম আসে বিধি ও নিষেধ রূপে। বিধি – যেটা করতে বলা হয়, আর নিষেধ – যেটা করতে বারণ করা হয়। যত রকম কর্ম হতে পারে, যত রকম কাজের আমরা কল্পনা করতে পারি, বেদ সেটাকে প্রকাশিত করে। এর মধ্যে ঋত্বিক ও যজমান, এই দুজন মিলে যখন বিশেষ কোন কার্য করে, সেটাকে বলা হয় যজ্ঞ; মানে যজ্ঞ হল কর্মের একটা ছোট্ট অংশ। যার জন্য পরের দিকে এসে ওনারা সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞ রূপে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।

তাহলে তিনটে স্তর এসে যাচ্ছে, প্রথম স্তর ভগবান, দ্বিতীয় স্তর ভগবান থেকে বেদ এবং তৃতীয় স্তর বেদ সমস্ত কর্মের প্রকাশক, কিন্তু তার মধ্যে একটা বিশেষ যে কর্ম, সেটা হল যজ্ঞ। যজ্ঞের যে একটা বৈশিষ্ট্য, এটাকে বলা হয় অপূর্ব। কর্ম সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয় না। আমরা কোন কর্ম করলে সেই কর্মের ফল আমরা দেখতে পাই। যেমন একটা বীজ মাটিতে রোপণ করা হল, সঙ্গে সঙ্গে বীজ রোপণের ফল দেখা যাবে না। কিন্তু মাটিতে না রেখে যদি অন্য জায়গায় রাখা হয়, যেমন ছোলা ভিজিয়ে যদি রাখা হয়, দেখা যাবে দু-একদিনের মধ্যে ছোলাটা আকারে বড় হচ্ছে। তারপর দেখা গেল সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গমন হয়ে আস্তে আস্তে গাছের মত হয়ে গেল। মাটির তলায় যখন থাকছে, তখনও কিন্তু পর পর ফল দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই জগতে সমস্ত কর্মই ফল দেয়। যে বিষ

অনেক দিন পরে বিষক্রিয়া শুরু করে, যেমন আর্সেনিক আদি, সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু ফল হতে থাকে।

যজ্ঞের ফল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। তাহলে ফল দেওয়ার আগে পর্যন্ত যজ্ঞের ফল কোথায় থাকে? যজ্ঞ করার পর সেই যজ্ঞের ফল কর্মের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়, এটাকেই বলা হয় অপূর্বতা। কর্মফল প্রসবের পরিস্থিতি যখন অনুকূল হয়, তখন কর্ম ভাণ্ডার থেকে ফল দিতে থাকে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, এদের সবার প্রাণ অন্নগত। এরা অন্ন গ্রহণ করে, তাই এদের প্রাণন ক্রিয়া চলছে। অন্ন হওয়ার জন্য বৃষ্টি খুব দরকার, বৃষ্টি না হলে অন্ন হবে না। বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে, এটাকে বলা হয় পর্জন্য। এই পর্জন্যের সৃষ্টি হয় যজ্ঞ থেকে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, তিনি প্রসন্ন হলে প্রাণীদের বৃষ্টি দেন। এই কথা শুনে অনেকেই লাফিয়ে উঠে বলবে, আপনি কি আজগুবি কথা বলছেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন! সবাই জানে সমুদ্র থেকে মেঘের উৎপত্তি, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি, এর মধ্যে ইন্দ্র আবার কি করে ঢুকে পড়ল? ঋষিরাও জানতেন সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ তৈরী হয়। এই যে পুরো পদ্ধতির পিছনে যে শক্তি, সূর্যের তাপ সমুদ্রের জলকে বাষ্প করে টেনে নিচ্ছে, সেই বাষ্প থেকে মেঘ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি দিচ্ছে, এই পুরোটার পিছনে যে দিব্য শক্তি, সেই শক্তিকে বলছেন ইন্দ্র। আমরা এখানে শাস্ত্রের কথা বলছি, শাস্ত্র হল ঋষিদের মুখের কথা। ঋষিরা এভাবে সব কিছু দেখেছেন, আমাদেরকেও এভাবেই নিতে হবে, এখানে প্রশ্ন করার কিছু নেই।

এটাই এখানে বলছেন *অন্নাদ্ভবতি ভূতানি*, সমস্ত প্রাণীকুল এই অন্ন থেকে হয়েছে। *পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ*, এই অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘের বর্ষণ থেকে। *যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো*, এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে, যে শুভ কর্ম করা হয়, সেখানে যে আহুতি দেওয়া হয়, এই যজ্ঞধূম থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। যজ্ঞ হল অপূর্ব, যজ্ঞের ফল সাথে সাথে পাওয়া যায় না, যজ্ঞ করতে থাকতে হয়। সেইজন্য দেখা যায়, শুভকর্ম করলে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, সময় লাগে। *যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ*, সমুদ্ভবঃ মানে উদ্ভব, যজ্ঞের উদ্ভব কর্ম থেকে। *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*, যে সমগ্র কর্মের কথা বলা হল, এই কর্ম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভব হয়। এই ব্রহ্ম মানে বেদ, বেদরূপী ব্রহ্মতে কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্*, এই বেদ অক্ষর থেকে, পরমাত্মা থেকে উদ্ভব হয়েছে। বেদ কেন সত্য? কারণ বেদ পরমাত্মা থেকে এসেছে। যদিও আমরা জানি বেদ ঋষিরা রচনা করেছেন, কিন্তু সবটাই ঈশ্বরীয় কথা। যে ঈশ্বরীয় কথাগুলোকে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে জানতে পারেন, শিষ্য পরম্পরায় তাঁরা যেটা আমাদের জানিয়ে দেন, আমরা সেটাকেই বেদ বলি। কিন্তু অন্য দিকে বেদ হল সমস্ত জ্ঞানরাশি। *তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম*, সেইজন্য ব্রহ্ম *সর্বগতং*, সর্বব্যাপী। *নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*, এই বেদরূপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। আর তাই ভগবান নিজেই প্রতিষ্ঠিত। কারণ যজ্ঞে বলাই হয়, বিষ্ণুই হলেন যজ্ঞ।

*তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*, এই বেদ সব সময় যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এখন ব্রহ্ম বলতে যদি বেদকে ধরা হয় আবার ব্রহ্ম বলতে যদি বেদান্তবাদীদের ব্রহ্মকে নেওয়া হয় তাও একই অর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু অর্থের ধারাবাহিকতাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এখানে ব্রহ্ম বলতে বেদকেই বুঝতে হবে। কি অর্থ বলছেন? বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, তাই যজ্ঞ কর। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদ যজ্ঞকে জন্ম দিচ্ছে, যজ্ঞ মেঘকে জন্ম দিচ্ছে, মেঘ থেকে জল আসছে, জল থেকে অন্ন, অন্ন থেকেই তোমার এই অস্তিত্ব রক্ষা হচ্ছে। সেইজন্য তোমার এই অস্তিত্বের মূলে কে? সেই বেদ, এই বেদ আবার যজ্ঞে কর্ম রূপে অবস্থিত, তাই তুমি কর্ম কর। সেই বেদ কোথায়? পরমাত্মাতে। পরমাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তুমি পরমাত্মাতে অবস্থিত হও।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।

*(হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে।)*

এই যে বিশাল চক্র, চক্রটা কি? আমি কথা বলছি, কেন কথা বলতে পারছি? খাওয়া-দাওয়া করছি বলে। খাওয়া-দাওয়া কি করে সম্ভব হচ্ছে? চাষীরা চাষবাশ করে আমাদের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে বলে। চাষবাশ কি করে সম্ভব হচ্ছে? বৃষ্টি হয় বলে। বৃষ্টি কার জন্য সম্ভব হচ্ছে? ইন্দ্রের জন্য সম্ভব হচ্ছে। ইন্দ্র কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছেন? যজ্ঞ থেকে। যজ্ঞের কথা কোথায় বলা আছে? বেদে বলা আছে। বেদ কোথা থেকে জন্ম নিয়েছে? পরমাত্মা থেকে। যা কিছু হবে সব পরমাত্মা থেকে আসতে হবে। যদি কোন কিছু শেষ পর্যন্ত পরমাত্মাতে না নিয়ে যাওয়া যাবে, তখন সেটা আর যজ্ঞ হবে না। কিন্তু এই যে এত কথা বলা হল সব পরমাত্মাতে চলে গেল। তার আগে বললেন এই দুটো পথ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গকে কে দেখিয়েছেন? তখন ভগবান বলছেন, আমিই এই দুটো পথের কথা বলেছি, তখনই এই দুটো পথ স্বীকৃতি পেয়ে গেল। ঈশ্বর থেকে যদি না এসে থাকে তাহলে কিন্তু তার কোন দাম নেই।

সেইজন্য বলছেন, এই যে চক্র ঈশ্বর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, এই কর্মচক্রকে যে অনুসরণ না করে শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রমণ করে, তাহলে তার জীবন ধারণ বৃথা হয়ে যায়, এইটাই এখানে বলছেন *মোঘং পার্থ স জীবতি*। আমরা এর আগে যে জাগতিক মার্গের লোকের কথা বলেছিলাম এরা হচ্ছে ঠিক সেই অর্থে পুরোপুরি জাগতিক মার্গের লোক। যারা এই যজ্ঞের মাহাত্ম্যকে মানে না, বেদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, আর ঈশ্বর প্রবর্তিত চক্রের অনুসরণ করে না আর আমরা আজকে চক্র বলতে খাদ্য খাদকের যে চক্র সেটাকে মানছি, কিন্তু যারা এই চক্রকে মানে না, তাদের সমগ্র জীবনটা ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ জীবনে পর্যবসিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে এই চক্র হচ্ছে, ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে বেদ, বেদ থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি আদি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে আমার শরীর। এই চক্রটাকে আমরা বেশি অনুসরণ করি। ইদানিং ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলা হয়, কিন্তু এখানে অনেক আগেই এই ইকোলজিক্যালের যে ঠাকুর্দা তার ব্যালেন্সের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশবিদরা এখন ইকোলজিক্যাল ব্যালন্সের কথা বলছেন। কিন্তু এই ইকোলজিক্যালের কথা এরা তো সেদিন আবিষ্কার করল, ছাগল ঘাস খায়, ছাগলকে আবার বাঘ খায়, বাঘকে জঙ্গল রক্ষা করছে, বন থেকে আবার বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জলে আবার গাছ জন্মাচ্ছে, সবারই অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু এখানে সুপার ব্যালন্সের কথা কত আগেই বলা হয়েছে। আর শুধু এই দৃশ্যমান জগতকে নিয়েই নয়, অদৃশ্যমান জগতকে নিয়েও চলার কথা বলা হচ্ছে। তোমার আমার বুদ্ধি কতটুকু, এইটুকু তো বুদ্ধি, এই দৃশ্যমান জগতের বাইরেও এক বিশাল জগতের অস্তিত্ব রয়েছে তার খবর আমাদের কাছে নেই, সেই জগতের অনুসন্ধান কর, তারপর তুমি সেই জগতটাকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চল। এই দৃশ্যমান জগতকে এখানে কি বলছেন? তুমি এখন যেভাবে জীবন চালাচ্ছ, এতে তুমি পাপ করছ। জীবন চালাতে গেলে সবাইকে পাপ করতেই হবে। এই পাপ থেকে মুক্তি কিভাবে পাবে? যা কিছু করছ, খাচ্ছ, সব যজ্ঞরূপে কর এবং যজ্ঞের অবশিষ্টকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ কর। আর দ্বিতীয় কথা, তোমরা যে যজ্ঞ করছ সেটা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যুক্ত। তাই শেষ প্রান্তে যারা নীচে আছে আর উপর প্রান্তে যারা আছে এদের দুজনকেই তোমাকে দেখতে হবে। এখন যারা ভোগবৃত্তির মধ্যে পড়ে আছেন তারা বেশি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলে, এর উপরে বেশি কথা বলে না। যতটুকু দরকার তার বেশি নেওয়া ঠিক নয়, এটাকে এরা কিছুতেই চাইবে না, এরা বলে দরকার থাকুক আর নাই থাকুক সংগ্রহ করে রাখ পরে কাজে লাগবে। এর ফলে কারুর একদিকে ব্যাঙ্ক ব্যলেন্স বেড়েই যাচ্ছে, ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত বেড়েই যাচ্ছে, অথচ এগুলো একজনের একার পক্ষে ভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। অন্য দিকে লুটেপুটে নিচ্ছে, আবার

ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে মানেই না। সেইজন্য আমাদের এত কষ্ট। এত কিছু বলার পর বলছেন – *অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো – অঘ-আয়ুঃ*, এদের জীবনটা হচ্ছে পাপজীবন, *ইন্দ্রিয়ারামো*, যারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তারা বৃথাই জীবন ধারণ করে। তাহলে কি সবাইকে কাজ করতে হবে? না, সবাইকে কাজ করতে হয় না। ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন কাদের কাজ করতে হয় না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

*(কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্য নাই।)*

এই শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য না। কাজ কে করবে না? অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন, তুমি বলছ তুমি যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমাকে তো যুদ্ধ করতেই হবে বাপু। কর্ম একমাত্র কে করে না? কথামৃতে মাঝে মাঝে বর্ণনা আছে, ঠাকুর সমাধিতে আছেন, নিজে নিজেই হাসছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়েও স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, তিনি নিজেতেই নিজে তুষ্ট। গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোড় যেমন বুঁদ হয়ে থাকে, ঈশ্বর জ্ঞানে যিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, আত্মজ্ঞানে যিনি আত্মাকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, একমাত্র তাঁদেরই আর কোন কর্ম থাকে না। কারণ তিনি আত্মাকে নিয়েই তুষ্ট, জগতে তাঁর আর কোন চাহিদা নেই। *স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ*, আমাদের তৃপ্তি কিসে হয়, খাওয়া-দাওয়া, ইন্দ্রিয়ের ভোগ দিয়ে আমাদের তৃপ্তি হয়। আর আমাদের মধ্যে তৃষ্ণা রয়েছে, সেই তৃষ্ণার পুর্তি হলে আমাদের সন্তুষ্টি হয়। বলছেন, এনারা এই সব কিছুর বাইরে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন এগুলোর বাইরে। আর তার কোন কিছুর তৃষ্ণা নেই, ইচ্ছা, কামনা কোন কিছু নেই। তাহলে তিনি কি নিয়ে আছেন? সেই চৈতন্য, শুদ্ধ আত্মার জ্ঞানে একেবারে ডুবে আছেন, আত্মার আনন্দে মত্ত হয়ে আছেন। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, ভ্রমন যখন ফুলের উপরে বসে মধু পান করে তখন সে একটু গুন্ গুন্ করে, কিন্তু মধুপানে ডুবে একেবারে বুঁদ হয়ে গেছে। এনারা বাইরের জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না। যারা গাঁজা খায়, ড্রাগস নেয়, এরাও বুঁদ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বাইরের একটা জিনিসকে অবলম্বন করে বুঁদ হচ্ছে। কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা ভিতরে যিনি আত্মা, তাঁকে নিয়েই বুঁদ হয়ে আছেন।

নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

*(আত্মজ্ঞানীর ইহজগতের কর্মানুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কর্ম না করলেও তাঁর কোন প্রত্যবায় হয় না; এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোন প্রাণীতে তাঁর কোন প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই।)*

এখানেও আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর বর্ণনা করছেন। গীতা যেহেতু সবারই জন্য, সেইহেতু সবার জন্যই গীতাতে কিছু না কিছু বর্ণনা আছে। এই ধরণের যাঁরা আত্মজ্ঞানী, যেমন ঠাকুর ছিলেন, বলছেন, এই জগতে তাঁদের জন্য কোন কর্ম আর অবশিষ্ট থেকে যায় না, কোন দায়ীত্ব থেকে যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁরা কাজ করেন, পরে বর্ণনা আসবে, কেন তাঁরা কাজ করেন। সবচেয়ে বড় হল, কর্ম না করলে তাঁদের কোন পাপ হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম, সেখানে এসেছিল *প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*। যাদের আত্মজ্ঞান হয়নি, তারা কিছু কিছু কর্ম যদি না করে, তাহলে তাদের পাপ হয়। এটাই বলছেন *অকরণে প্রত্যবায়*, যদি না করা হয় তাহলে পাপ হবে। কিছু জিনিস আছে করলে পাপ, যেমন হিংসা, হিংসা করলে পাপ আর জপধ্যান যদি না করা হয় তাহলে সেটাও পাপ। তেমনি পূজা যদি না করে, তাহলে সেটা পাপ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না করা হয়, সেটাও পাপ। কিন্তু এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর জন্য আর কোন পাপ থাকে না। তাঁরা কিছু করলেও কিছু না, না করলেও কিছু হয় না, তিনি সব কিছুর পারে –*প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*।

*ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ, ব্যাপাশ্রয়ঃ* শব্দের অর্থ হয়, যখন আমরা কিছু ফল চাই, তখন অনেক কিছুর বিস্তার করতে হয় – ক্রিয়ার বিস্তার, কর্মের বিস্তার, কর্তার বিস্তার। আমি খেতে চাই, খাওয়ার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, এই যে বিস্তার, এটাকে বলে *ব্যাপশ্রয়ঃ। ন চাস্য সর্বভূতেষু,* এই জগতে যখনই আমরা কোন কিছু করতে যাই, তখন এর ওর অনেকের সাহায্য দরকার হয়, এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর কারুর থেকে কোন সাহায্যের দরকার হয় না। এমনকি যদি ধর্মশিক্ষাও দিতে হয়, তখনও তাঁদের শিষ্যর দরকার পড়ে না, কিন্তু তিনি নিয়ে নেন। এটাকে শেষ করছেন এই বলে,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯।।

*(অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।)*

হে অর্জুন, এই যে তোমাকে যুক্তিগুলি দেওয়া হল, পরে পরে এই ধরণের যুক্তি আরও আসবে। অনাসক্ত হয়ে, তার মানে কোন লোভে পড়ে, কোন মোহে পড়ে কাজ করবে না; কাজ করবে, এটা আমার দায়ীত্ব ভেবে। দেশের ইদানিং নেতাদের দিকে তাকালে মনে হয়, এরা কজন যে দেশের জন্য চিন্তা করে, কজন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে, আমাদের জানা নেই। সবাই মনে করে, রাজনীতি করা হল আমার কিছু প্রাপ্তির সাধনা। তা নয়, এটা আপনার দায়ীত্ব, দেশের ও সমাজের মঙ্গল কিভাবে করা যায়। আপনাকে যখন একজন মন্ত্রীর দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, বা একজনকে এসপি পদের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, একজনকে ডিএম পদের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, এখন আপনার এটা দায়ীত্ব, দায়ীত্ব বোধেই কাজ করুন। এরপরে ভগবান লোকসংগ্রহার্থে, আচার্য রূপে কাজ করতে বলবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে অনেক রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাচ্ছেন, অর্জুন এই যে তুমি বলছ বৈরাগ্য নিয়ে সন্ন্যাস নেবে, তোমার এই সিদ্ধান্ত সব দিক থেকে ভুল, এই কাজ তুমি করতে যেও না। এর আগে বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষ যেন তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেন ভারতের ক্ষেত্রে তমোগুণের কথা বলা হচ্ছে? করোনার জন্য এখন যে লকডাউন চলছে, বোঝাবার জন্য এটা ভাল উদাহরণ। আমরা কি কেউ এই লকডাউনের সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি? খুব জপধ্যান করছি, কিংবা অন্য কোন কাজে, কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়াশোনা করে জ্ঞান সমৃদ্ধি করার কাজ, কিংবা কোন একটা ভাষা শিখে নেওয়া, কোন একটা ভাল বইয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া? কোন কিছুতেই সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি না। পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সারাদিন টিভি সিরিয়ালের মধ্যে ডুবে থাকা, আর তা নাহলে করোনার নিউজ নিয়ে পড়ে থাকা। একই কথা রোজ টিভিতে শুনে যাচ্ছি।

আপনি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সফল কিনা কি করে বুঝবেন? বলা হয়, ওই ব্যাপারে যখন আপনি কাউন্টিং ছেড়ে দেবেন। একজন সফল লেখকের মনে থাকে না, আজ পর্যন্ত তাঁর কটা বই পাবলিশ হয়েছে। কিন্তু লেখক যদি বলে দিতে পারেন, জীবনে আজ পর্যন্ত কটা বই তিনি লিখেছেন, তাহলে বুঝতে হবে লেখক হিসাবে তিনি একজন সফল লেখক নন। করোনার এত কেস হচ্ছে যে, কারুরই মনে থাকছে না, সেইজন্য করোন আজকে সফল। ছেড়ে দিন, করোনার দিকে তাকাবার দরকার নেই, নিজের মত আপনি এগিয়ে যান। আমরা কেন এগোচ্ছি না? কারণ আমরা তমোগুণী, তমোগুণী হওয়ার জন্য আমাদের আজ এই অবস্থা। নিজের মত অনেক কিছু করে নেওয়া যায়। এখন তো আগেকার দিন না, ঘরে বন্দী হয়ে যাওয়া মানে একেবারে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

কয়েদী হয়ে গেলেন তা তো না। সবারই ফোন আছে, ইন্টারনেট আছে, ইচ্ছে হলে অনেক কিছুই করা যায়। গীতা মুখস্ত করা যায়, চণ্ডী মুখস্ত করা যায়, উপনিষদ মুখস্ত করা যায়। চাইলে নূতন একটা ভাষা শিখে নেওয়া যায়। আমরা বাঙালী, আমরা ইংরাজী ভাষাটা আরও আয়ত্ত করতে পারি, হিন্দী শিখতে পারি, সংস্কৃত শিখতে পারি। একটু চেষ্টা করলে কিছু না কিছু অবশ্যই করে নেওয়া যায়।

ভগবান এটাই বলছেন, কাজ কর, কাজ করে যাও। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরাই একমাত্র কাজ করেন না। আমরা কেউই ব্রহ্মজ্ঞানী নই, তাই আমাদের অনাসক্ত হয়ে কাজ করে যেতে হবে। অনাসক্ত হয়ে করা মানে, করতে বলেছি তাই করে দিলাম, খুব দায়সারা ভাবে করে দিলাম, অনাসক্ত ভাবে কাজ করা মানে তা না। অনাসক্ত মানে, যখন আমি কাজ করছি, এই কাজে আমি হলাম শ্রেষ্ঠ, কাজে আমার সেরাটা দেব। যখন আমি মনে করছি আমি এই কাজে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি কোন দিকে আর তাকাব না। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইকে একটা চিঠিতে লিখছেন, ভাই আমার মধ্যে যাই দোষ থাকুক, ঈর্ষা আমার মধ্যে নেই। কারণ তিনি এত গ্রেট হয়ে গেছেন যে, সেখানে কারুর সঙ্গে কোন হিংসা বা ঈর্ষার কোন ব্যাপারই আসতে পারে না। আপনি যে কোন একটা ফিল্ডে কি বলতে পারেন, আমি এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ? যেখানে দেখছেন আপনার সাথে কারুর কোন প্রতিযোগিতা নেই, তার মানে আপনি কর্মযোগ করেননি। কর্মযোগ ঠিক ভাবে করা থাকলে আপনি এত বড় হয়ে যাবেন যে, অন্য কারুর দিকে তাকাতে যাবেন না। বরঞ্চ আরও পাঁচজনকে আপনি আশ্রয় দেবেন। আমাদের ক্ষমতা যখন সীমিত থাকে তখনই আমরা অন্যদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যখন আপনি গ্রেট হয়ে গেছেন, তখন আপনি চিন্তা করার অবসরই পাবেন না যে, ও আমার থেকে এগিয়ে গেল কি করে?

শচীন তেণ্ডুলকার ক্রিকেটের এমন উচ্চতায় চলে গেছেন, সেখানে কে কটা সেঞ্চুরি করল, কত বলে করল, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। পেলে এত গ্রেট যে, কোন নূতন প্লেয়ারকে নিয়ে ফুটবল জগৎ মাতামাতি করছে, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। অর্জুনকে তাই ভগবান বলছেন, অনাসক্ত হও। কর্মে আসক্তি বলতে বোঝায় কর্ম ফলে আসক্তি। আমি সফল হব কিনা, আমি বেস্ট কিনা, সবাই আমাকে মানবে কিনা, সম্মান দেবে কিনা, এটার জন্য আমি কত টাকা পেলাম, খবরের কাগজে আমার নামটা হাইলাইট করল কিন, এগুলো বাচ্চারা করে। নূতন নূতন লিখতে শিখলে বাচ্চারা এবিসিডি লিখে মাকে চারবার, পাঁচবার করে দেখাবে, 'মা এটা আমি দারুণ লিখেছি কিনা বল'? এগুলো ছেলে মানুষী, বাচ্চারা এই রকম করে, তাদের জন্য ঠিক আছে। তুমি ওই ছেলে মানুষী ভাব থেকে বেরিয়ে এসো, বড় হও।

ভগবান এরপরেই রোল মডেলের উপর কয়েকটা কথা বলবেন। তুমি যদি শ্রেষ্ঠ হয়ে গিয়ে থাক, তাহলে রোল মডেল হও। তুমি যদি শ্রেষ্ঠ না হয়ে থাক, তাহলে তোমার নিজের উন্নতির জন্য চিত্তশুদ্ধির জন্য অনাসক্ত হয়ে কাজ কর। ইদানিং positivity নিয়ে, self improvement নিয়ে এত বই আসছে, কিন্তু সেখানে তারা একটা কথা বলে না, যেটা মূল কথা, তুমি কাজ কর। কাজ করতে নামলেই তোমার দশটা দোষ হবে, কাজ করলেই লোকেরা নিন্দা করে দশ রকম কথা বলবে। তোমার দশটা নিন্দা হচ্ছে মানেই, তুমি কাজ করছ। পাথরের কোন নিন্দা হয় না, যে কাজ করছে তারই নিন্দা হয়। যে কাজ করছে, তার প্রতি সবাই হিংসাগ্রস্থ হয়। আপনার কাজ নিয়ে, আপনাকে নিয়ে কজন হিংসাগ্রস্থ? আপনি কতজনকে জ্বালাতে পেরেছেন? লোকে বিরক্ত হয়ে বলবে, আপনার কি কোন কাজ নেই? সেটা হল আপনার success। এটাই আপনাকে ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

এরপর ভগবান আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন, তিনি নিজেও কাজ করেন। তিনি কাজ করেন বলেই এই সংসার স্থির আছে। তার সাথে বলবেন, তুমি যদি জ্ঞানীও হয়ে যাও,

সাধারণ লোকেদের বলো না যে, কাজ করতে নেই। এই ব্যাপারটা রামকৃষ্ণ মিশনে আগে ছিল, এখনও অল্প একটু আছে। সব মিলিয়ে কিভাবে কাজ করবে, কাজ কর, আর ঈশ্বরকে কাজের সব ফল অর্পণ করে দাও। আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাব নিয়ে সব কাজ কর। বক্তব্য এটাই, কাজ কর। কেন কাজ করবে আর কিভাবে কাজ করবে, এই দুটো জিনিসের উপর এবার আলোচনা করবেন –

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রেহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।

*(জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষি নিষ্কাম কর্ম করেই মোক্ষ লাভ করেছিলেন। সুতরাং লোসংগ্রহের নিমিত্তও তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত।)*

লোকসংগ্রহ এটি একটি খুব সুন্দর শব্দ। লোকসংগ্রহ মানে হয় লোকশিক্ষা, আমরা যে inclusiveness এর কথা বলি, inclusiveness মানেই হয় লোকসংগ্রহ, স্বামীজী বলছেন be and make, তুমি মহান হও আরও দশজনকে মহৎ কর। আরও দশজনকে সেই পথে নিয়ে চল। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আসাম, মণিপুর উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে ছেলেরা পড়তে আসে। আসামের একটি ছাত্রকে ওখানকার অধ্যক্ষ একবার জিজ্ঞেস করলেন 'অত দূর থেকে কি করে তুমি এখানে ভর্তি হলে'? ছেলেটি খুব সুন্দর একটা ঘটনা বলল, ওর বাবা পুলিশে কাজ করতেন। বাবার যে ব্যাঙ্কে এ্যকাউন্ট ছিল, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কাজে কর্মে খুব দক্ষ এবং তাঁর ব্যবহারটাও খুব ভাল। বাবা সেই ব্যাঙ্ক অফিসারকে একদিন জিজ্ঞেস করেছেন, 'স্যার আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন? আপনার এত কর্ম কুশলতা, আপনার এত ভদ্র ব্যবহার'। ব্যাঙ্কের অফিসার বললেন, 'আমি দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করেছি'। তখন ছেলেটির বাবা অফিসারকে বলছেন, 'আমার ছেলে এখন ছোট, আমিও ওকে ওই স্কুলেই পড়াতে চাই। আমার খুব ইচ্ছে আমার ছেলেও যেন কর্মে, ব্যবহারে আপনার মত হয়'।

তারপর বাবা খোঁজখবর নিয়ে ছেলেকে দেওঘর বিদ্যাপিঠে ভর্তির পরীক্ষায় বসাল। বিদ্যাপীঠে ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রান্তের ট্রাইবাল ছেলেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরে ছেলেটি ভাল রেজাল্ট করে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। এটাকে বলে লোকসংগ্রহ। আমার আপনার জীবনধারা এমন হবে, লোকে দেখে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোন বংশের, আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন, আপনি আপনার এই গুণগুলি কি করে অর্জন করলেন? তখন বলবে, আমিও এই রকম হতে চাই, আমার ছেলেকেও এই রকম ভাবে তৈরী করতে চাই।

হিন্দুদের এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম। মহাভারতে যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের সংলাপে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন, *কঃ পন্থা*, জীবনের পথ কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যে পথ দিয়ে গেছেন, সেটাই পথ। যীশু খ্রীষ্ট যে পথ দিয়ে গেছেন, সেটাই ধর্ম; ওনার কথাগুলিই বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান বুদ্ধ যে পথ দিয়ে গেলেন, সেটাই পথ। অন্যান্য ধর্মে একজন দুজন করে ঋষি হয়েছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম হল ধর্মের সমুদ্র, এখানে হাজার হাজার ঋষি হয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটা মূল ভাব রয়েছে। হিন্দুদের এত ঋষি, এত মত, এত পথ, তা সত্ত্বেও সবাইকে নিয়ে একটাই ধর্ম, হিন্দু ধর্ম। কারণ *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা*, মহাপুরুষের দেখানো পথকে অবলম্বন করে আমরা চলি।

ভগবান অর্জুনকে বোঝানর জন্য এটাই বলছেন, দেখো, তোমার আগে আগে যে মহাপুরুষরা এসেছিলেন, তাঁরাও এই পথ অবলম্বন করে গেছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা তাঁর বাবাকে এই একই কথা বলছেন, *অনুপশ্যযথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে*, আপনি পিছনের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন আপনার আগের আগের লোকেরা কেমন ধারা কর্ম করেছেন। ভগবান এখানে জনক রাজার

নাম বলছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন জনক, অশ্বপতি আদি নামে রাজা ছিলেন, এনারা সবাই কর্ম করতেন। স্বামীজী বলছেন, আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চাই না, আমাদের চাই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, যিনি শুধু কাজ আর কাজ, সব ফেলে আগে কাজ করার কথা বলতেন।

মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে ভক্তি করবেই, মানুষ প্রেম করবেই, ভগবানের সামনে মানুষ নতজানু হয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে বলবেই, হে প্রভু আমাকে এটা দাও, সেটা দাও; কারণ আমরা স্বভাবেই কাঙালী। আজকাল ইয়ং ছেলেমেয়েরা আজকে বিয়ে করছে, পরের দিন ডিভোর্স করে দিচ্ছে। আমেরিকাতে একটা ঘটনা আছে, যেখানে বিয়ে করল, ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিভোর্স করে দিল। কারণ, যখন মেলামেশা শুরু করছে, তখন দুজনই কাঙালী। ছেলেটাও ভালবাসা চাইছে, মেয়েটাও এ্যটেনশান চাইছে, তারপর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেখছে এক অপরকে নিংড়ে নিতে পারছে না; ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। আগেকার দিনে এই কাঙালীপনাটা ছিল না। শক্তি থাকতে হবে, আমি কাঙালী না। আমি এই পথে চলছি, তুমি যদি আমার সাথে চল খুব ভাল, যদি না চল, আমি একাই চলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান করছি, একলা চল রে, কিন্তু জীবনে যখন নামাতে হয়, তখন বলবে, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন চলবে না। তাহলে একলা চল রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। গান গাওয়ার সময় বলবে, কি সুন্দর গান, যেমন সুর, তেমন বাণী; কিন্তু জীবনে যখন পালন করতে যাবে তখন বলবে, তোমাকে ছাড়া জীবনে আমি অন্ধকার দেখছি, ভণ্ডামীর একটা সীমা থাকা দরকার।

ভগবান এটাই আটকাচ্ছেন, দেখ অর্জুন, জনক রাজা, অশ্বপতির মত যাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁরা সবাই কাজ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সব কিছু ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কুরুক্ষেত্রে ওই এত বড় যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত শান্ত মনে, ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু পরিচালনা করে নিজের সখা অর্জুনকে যুদ্ধে জয়ী করে চলে গেলেন, এটাই শক্তি। *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্*, জনকাদি পুরুষরা কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখানে আচার্য বলছেন, এর দুটো অর্থ হতে পারে, একটা হতে পারে কর্মযোগের পথ অবলম্বন করেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেখান থেকেই তাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছিল; আরেকটা অর্থ হতে পারে, আত্মজ্ঞান যদি আগে হয়েও থাকে, তাও তাঁরা কাজ করতে থাকলেন। যেমন ভগবান কৃষ্ণ, তিনি অবতার, তাও তিনি কাজ করতে থাকলেন। স্বামীজী, তাঁর সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি কাজ করা ছাড়লেন না। ঠাকুর, তাঁর সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি লোকশিক্ষা দিতে থাকলেন। তুমিও যদি আত্মজ্ঞানী হয়ে থাক বা অবতারও যদি তুমি হও, *লোকসংগ্রহমেবাপি*, লোকশিক্ষার জন্য *সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি*, তোমাকে কাজ করে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য পরিচালনা করে দেখিয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে এটাই দেখিয়ে গেলেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনাদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অর্জুন তুমি কেন বলছ যে, তুমি কাজ করবে না?

রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শকে স্বামীজী এই জন্যই আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ এদিক সেদিক দু চারটে কথা শুনে মনে করেন কর্ম থেকে বন্ধন আসে, উত্তরাখণ্ডের সাধুরা এখনও এই কথা বলে যাচ্ছেন। এগুলোই অপরিপক্ক মনের লক্ষণ। ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে বলছেন, অর্জুন, তোমার এখন দুটি অবস্থা, তোমার এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি; যদি আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে, তাহলে কর্মের মাধ্যমে তোমার চিত্ত শুদ্ধ কর। যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, তখন আদর্শ হিসাবে, রোল মডেল হওয়ার জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি এই যে চিত্ত শুদ্ধি করছ, মনকে অপবিত্র হতে দিচ্ছ না, সেই সময়েও তোমাকে এত উচ্চমানের, শ্রেষ্ঠ কাজ করতে হবে, যাতে লোকেরা তোমাকে দেখে বলবে, আমি আপনার মত হতে চাই।

ভাগবতের তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি; রাজা জনকের বংশে আশীর্বাদ ছিল, এই বংশের সবাই আত্মজ্ঞানী হবেন, তাদের সবাইকেই জনক বলা হত। আচার্য শঙ্কর এখানে দুটো সম্ভবনাই নিয়ে আসছেন। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়নি, তাঁরা কর্মযোগের পথ অবলম্বন করে সিদ্ধি পেয়েছিলেন, আর আত্মজ্ঞান যদি হয়ে যায়, তারপরেও তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য কাজ করতেন। তবে কিছু কিছু ব্রহ্মজ্ঞানী আছেন, যাঁরা আর কোন কিছুতেই থাকেন না, এর অবশ্য অন্য কারণ আছে। কিন্তু তুমি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তোমার উপর দায়ীত্ব আছে, লোকেরা তোমাকে দেখে প্রেরণা পাবে। যেখানে একটা গ্রুপ থাকে, যেমন ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, কেউ রাজনীতিতে আছে; সমভাবাপন্ন মন যেখানে একটা জায়গায় সমবেত হয়, তখন ওই দলটা তৈরী হয়। মহাভারতের যুদ্ধে যারা শৌর্য দেখাতে চাইছে, যুদ্ধের মাধ্যমে কীর্তি অর্জন করতে চাইছে, তারা সবাই সেখানে সমবেত হয়েছে। অর্জুন যদি হঠাৎ বলে, আমি এই যুদ্ধভূমি ত্যাগ করে চললাম, এটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে যাবে, এ কাজ করা যায় না। যারা বলে আমি কিছু করি না, এটা ভাল না। কিছু একটা কর, নিজের আত্মসম্মান ত্যাগ করে যে কোন কাজ কর, যে কোন একটা কজে নেমে যাও; দরকার হলে ঠেলাগাড়ি চালাও, রাস্থায় ভুট্টা বিক্রী কর। খালি থাকতে নেই, এক সেকেণ্ডও খালি থাকতে নেই, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে। চুপচাপ যে বসে আছে, তার থেকে ফ্রীতে কাজ করে দেওয়া ভাল। লোকসংগ্রহেরও প্রয়োজন আছে, নিজের মত ওটা করে নিতে হয়। কেন লোকসংগ্রহ করতে হয়?

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।

*(কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা তাই অনুসরণ করে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকেরাও তাই অনুসরণ করে।)*

শ্রেষ্ঠ পুরুষ, *মহাজনো যেনঃ*, যে মহাজনদের কথা বলা হল, তাঁরা যে রকম আচরণ করেন, বাকিরা সেই রকমই করে। ঠাকুর সেইজন্য খুব সাবধান থাকতেন, এমনকি বলছেন, আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি, তোরা তাহলে ঘুরে ঘুরে করবি। বড়দের দেখে সবাই শেখে, সেইজন্য খুব সাবধান থাকতে হয়। আপনি যদি এক পয়সা সরে যান, পিছনে যারা আছে তারা দশ পয়সা সরবে। সমাজে যাঁরা সম্মানিত, পরিবারে যাঁরা বড়, তাঁদের খুব বেশি সাবধান থাকতে হয়। তার সাথে আপনাকে নিজেকে সবার সামনে একটা আদর্শ রূপে দাঁড় করাতে হবে। ঈশ্বরদর্শন ছেড়ে দিন, গীতার জ্ঞান ছেড়ে দিন, কর্মযোগ-ভক্তিযোগ ছেড়ে দিন, তার জায়গায় একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা, আমি জীবনে অন্তত পাঁচ জনের জন্য রোল মডেল হব। কিন্তু আমরা সবাই ছোটদের বলি, জানো তোমার বয়সে আমি এই রকম ছিলাম।

একটা খুব মজার ঘটনা, দাদু নাতিকে বলছেন, জানো তোমার বয়সে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ক্লাশে ফাস্ট হতেন। ছেলেটাও পাল্টা জবাব দিয়েছে, দাদু, তোমার বয়সে উনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। আমরা বাচ্চাদের নানা রকম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি নিজে কি করছেন সেটা দেখুন। একটা পার্কে দুটো বাচ্চা ছেলে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করছে। পার্কে একজন খ্রীশ্চান ফাদারও ছিল। ফাদার গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দুজনে কি নিয়ে তর্ক করছ? একজন বলছে, আমরা প্রতিযোগিতা করছি কে কত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারে। ফাদার বলছেন, ছিঃ ছিঃ তোমার খ্রীশ্চান ছেলে হয়ে মিথ্যা কথার লড়াই করছ? আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, কক্ষণ আমি মিথ্যা কথা বলতাম না। ছেলেটি বলল, এই প্রতিযোগিতাটা আপনিই জিতলেন। এই বলে ফাদারকে এক ডলার দিয়ে দিল। বাচ্চা ছেলে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেনি, এর থেকে বড় মিথ্যা কথা হতে পারে না। দুমদাম কিছু বলতে নেই, রোল মডেল মানে রোল মডেল, একটা আদর্শকে নিয়ে থাকতে হবে। যেখানে যে পরিস্থিতিতে আছেন, চেষ্টা করুন, যদি ওই পথ না হয় এই পথ, এই পথ না হলে সেই

পথ। খালি ফাক্কা উপদেশে কিছু হয় না। যখন ভাবি আমি আর তো কিছু পারব না, তাহলে ঈশ্বরের পথেই যাই। সেখানেও তমোগুণী, বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

এরপর ভগবান নিজের কথা বলছেন; আমি এমনি এমনি তোমাকে বলছি না, আমি নিজেও রোল মডেল, আমি নিজেও সব সময় কাজ করছি –

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।

*(হে পার্থ, স্বর্গমর্ত্যাদি তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য নেই এবং আমার অপ্রাপ্তব্য বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই। তথাপি আমি লোক-কল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা কর্মে ব্যপৃত আছি; কর্মত্যাগ করিনি।)*

এই বাইশ নম্বর শ্লোক হল আমাদের সবার জীবনের আদর্শ। এই শ্লোকটাকে জীবনে যদি আনতে পারেন, আপনি মহৎ। মহত্ত্ব অনেক কিছু দিয়ে মাপা হয়, মহত্ত্ব অনেক কিছু দিয়ে হয়। নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট নোবল, স্বামীজী মার্গট বলে ডাকতেন, স্বামীজী বলছেন, Margot tell me how much you have suffered then I tell you how great you are, জীবনে তুমি কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছ, তাই দেখে আমি বলব তুমি কত মহৎ। কারণ কষ্ট সহ্য করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তাই তুমি মহৎ। এই শ্লোক হল জীবনের আদর্শ, এটাই মানুষকে আদর্শ পুরুষ বানায়, এটাই মানুষকে মহাপুরুষ বানায়।

ভগবান নিজেকে নিয়ে বলছেন, আমি কেন মহান। ভগবান তো মহান হবেন এতে কি আর বাহাদুরী, কিন্তু কাজের দিক থেকে দেখলে তখন অন্য রকম হয়ে যায়। এই তিন লোকে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে আমার কোন কর্তব্য নেই, আমি কারুর প্রতি দায়বদ্ধ নই, এবং আমি কোন বন্ধনে নেই। আমরা সবাই হাজারটা বন্ধনে আছি। কারণ এই সংসারে আমরা সবাই সবার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছি। আমরা নিজেদের গায়ের জোরে এর ওর দিকে ঠেলে দিয়ে জুড়ে যাচ্ছি। গায়ের জোরে বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসা মানেই তোমার বন্ধনে আমি পড়ে আছি। সন্তানের প্রতি একটা দায়ীত্ব হতে পারে, ঠাকুর বলছেন সন্তানের প্রতি কর্তব্য কত দিন, যত দিন তারা সাবালক না হয়ে যায়। বড় হয়ে গেছে, এখন আবার আপনার কিসের দায়ীত্ব, রিটায়ার করে বাড়ী এসেও আপনার দায়ীত্ব! আপনিও কি ধরণের মানুষ আর আপনার সন্তানও কি ধরণের মানুষ! কিসের দায়ীত্ব, কোন দায়ীত্ব নেই।

ভগবান বলছেন, তিন লোকে আমার কোন দায়ীত্ব নেই, অথচ *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, এই শব্দটা খুব সুন্দর একটা শব্দ, এই জগতে এমন কিছু নেই, যেটা আমি পেতে চাই, আর এমন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না। আমরা কেন নিচ্ছি না? কারণ আঙুর ফল টক, আমার পাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই টক। স্বামীজীর নামে তখন কলকাতায় বলা হত, উনি তো স্বভাবে সন্ন্যাসী না, অভাবে সন্ন্যাসী। বলতে চাইছে, লোকটা কিছু করতে পারল না, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। একেবারেই তা নয়। ভগবান এই কথাকে দমিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে? জগতে কিছু নেই যেটা আমি পেতে পারি না। আমাদের ভিতরে কোন দম নেই, কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু মুখে বড় বড় কথা। এই মানসিকতা দেশের সর্বনাশ করে রেখেছে। বাইশ নম্বরে ভগবান পরিষ্কার বলছেন, আমার কোন কর্তব্য নেই, দ্বিতীয় এই জগতে আমি কিছু চাই না। আমরাও খুব সহজে বলতে পারি, আমার কোন কর্তব্য নেই, কিন্তু এটাই আমাদের তমোগুণীর লক্ষণ। আমি কিছু পেতে চাই না, আমাদের জন্য এটা হল কাঙালীর ত্যাগ। যে কোন লোক বলতে পারে, আমার কিছু লাগবে না, কারণ আঙুর ফল টক।

তৃতীয় যেটা ভগবান বলছেন, কর্মযোগ মানে এটাই। *নানবাপ্তবমবাপ্তব্যং*, জগতে কোন জিনিস নেই, যেটা আমি পেতে চাই কিন্তু পেতে পারি না। আমি কোটিপতি হতে চাই, আমি কি

পারব কোটিপতি হতে? আগে তুমি কাজ কর, কাজ করে আগে ধর্মপথে তোমার শহরে সবচেয়ে বড় একজন ব্যবসায়ী হয়ে দেখাও। যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি করে এত বড় বিজনেসম্যান হলেন? তুমি বলতে পারবে, ধর্মপথ অবলম্বন করে। আগে তুমি এটা করে দেখাও তো, তখন বুঝব ধর্ম তোমার জীবনে ফলপ্রসু হয়েছে।

ছোটবেলায় আমরা একটা কাহিনী পড়েছিলাম, তবে কতটা সত্যি আমার জানা নেই। জাপানে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে একজন ভিক্ষু গেছেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য। জাপানের রাজা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বললেন, 'ইনি আমার মন্ত্রী, আগে তুমি এনাকে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা দাও। ছয় মাস পরে আমরা এনাকে দেখব, তখন যদি তাঁর সাংসারিক অভ্যুদয় হয়ে থাকে, তবে আমরা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করব। যদি না হয়, তোমাকে জাপান থেকে বার করে দেওয়া হবে'। তারপর সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু মন্ত্রীকে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গ মার্গ ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মের যা যা আছে সব শিক্ষা মন্ত্রীকে দেওয়া হল। তারপর দেখা গেল সত্যিই তাঁর ভাল হতে শুরু হয়েছে। তখন জাপানের রাজা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করলেন।

এই কাহিনী সত্য নাও হতে পারে, সেটা কোন ব্যাপার না, কিন্তু কাহিনীর ভাবটাই আসল। আচার্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের ভূমিকাতে, যেটাকে বলা হয় উপোদ্‌ঘাৎ, সেখানে আচার্য বলছেন, হিন্দু ধর্ম পরিষ্কার বলে দেয় ধর্মের কাজ অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। ধর্ম মানে শুধু ত্যাগ নয়, হিন্দু ধর্ম মানেই এই দুটো –অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করে আপনার কি জাগতিক উত্থান হচ্ছে? এই ধর্মকে অবলম্বন করে আপনি কি নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে প্রতিপন্ন করতে পারছেন? এই ধর্ম অবলম্বন করে আপনি কি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছেন?

অনেকে মনে করতে পারেন, আমি বড় বড় কথা বলছি। একেবারেই না, আমি এখানে আমার নিজের দু একটা কথা বলছি। আজকে আমার আট খানা বই লেখা হয়ে গেছে। এই বইগুলি এমন উচ্চ মানের যে, আমি জানি এই বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব না, এবং আমিও এটা আমার লেখা মনে করি না। ডঃ এপিজে আবদুল কালাম টিয়া বই পড়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন এই বইটা কে লিখেছেন। উনি আমাকে ফোন করলেন। ফোন করে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, Are you the author of Tiya? ডঃ কালাম ফোন করছেন, আমিও খুব খুশী। কিছু কথা বলতে বলতে উনি বললেন, Only a beautiful mind can write such a beautiful book। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, It is God's creation and God has beautiful mind। আমি কখন আমার বইএর জন্য কৃতিত্ব নিই না, আমি জানি এই বই লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এটা আমি জানি, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি ধর্ম পথে আছি এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারাতে বড় হয়েছি বলেই লিখতে পেরেছি। আমি ভাল করে জানি, এই ভাবধারার বাইরে থাকলে আমি কখনই এই বই লিখতে পারতাম না। আর যা কিছু হয়ে যেতে পারতাম, লেখক হতে পারতাম না।

আজ আমি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী, আমার জন্য এটা বিরাট বড় সম্মানের বিষয়; ঠিক তার নীচে রয়েছে আমার লেখালেখি। এই সৃজনশীলতা এসেছে শুধুমাত্র ধর্ম পথে থাকার জন্য। আপনি কি বলতে পারবেন ধর্মের কথা শুনে, ধর্ম পথে এসে আপনার কি কি ভাল হয়েছে? আপনি কি বলতে পারবেন আপনাকে দেখে আরও পাঁচজন অনুপ্রাণিত হচ্ছে? অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, দাদা আপনি কিভাবে এই জায়গায় পৌঁছালেন? তখন আপনি বলবেন, গীতা পড়ে, ধর্ম পথ অবলম্বন করে আজকে আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। ভগবান কর্মযোগে এটাই বলছেন, আমার কোন দায়ীত্ব নেই, আর নিজের জন্য আমি কিছু চাই না। এটা তামসিক অপদার্থের জন্য নয়, যার জন্য সে বলতে পারবে, আমার শক্তি দেখতে চাও, এই দেখ আমার শক্তি।

মহাভারতের যুদ্ধে তৃতীয় দিন ভীষ্ম যখন ভয়ঙ্কর সংহার শুরু করলেন, অর্জুন আর কোন প্রতিরোধ করে ভীষ্মকে আটকাতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, এবার দেখ আমার শক্তি। তিনি রথ থেকে নেমে পড়লেন, এই আমি ভীষ্মকে শেষ করে দিচ্ছি। এমন কোন কিছু নেই যেটা শ্রীকৃষ্ণ করতে চাইলে করতে পারবেন না।

এই জিনিসটা আমার আপনার জীবনে হওয়া খুব দরকার। শ্রীকৃষ্ণ নিজের তিনটে বৈশিষ্ট্য বলছেন, প্রথম কোন দায়ীত্ব নেই আমার, দ্বিতীয় আমার কোন কিছু লাগবে না এবং তৃতীয়, এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না। তা সত্ত্বেও আমি কাজ করা বন্ধ করি না, *বর্ত এব চ কর্মণি*, তবুও আমি কাজ করি। কারণ আমি যদি কাজ না করি –

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

*(হে পার্থ, যদি আমি অনলস হয়ে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হবে –অর্থাৎ অলস হয়ে কর্মত্যাগ করবে।)*

আমার কোন দায়ীত্ব নেই, তবুও আমি কাজি করি, কারণ আমি রোল মডেল। আমি যদি কাজ না করি, বাকি জগৎও কাজ করা ছেড়ে দেবে। ঠাকুর বলছেন, অবতারের একটাই কাজ, জ্ঞান ভক্তির শিক্ষা দেওয়া। আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন, ভগবান আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ধর্ম প্রতিষ্ঠা আর জ্ঞান ভক্তি শেখানো, একই জিনিস। ধর্মে জ্ঞান ভক্তি ছাড়া আর তো কিছু নেই। হয় লোকে দেখে আত্মাই আছেন, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা, আর তা নাহলে দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। মায়াকে যদি মানে, তাহলে দেখে ঈশ্বর বাদে সবই মায়া। আর যদি মায়াকে শক্তি রূপে দেখে, তখন দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এটাই ভক্তি। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নেই, এটাই জ্ঞান। সমস্ত শাস্ত্রের সার এই একটা সামান্য বাক্যে। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটাই জ্ঞান; আর ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এটাই ভক্তি। এই দুটো ভাবই কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসে।

*জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ*, আমি যদি বিচার করি, জীবনে বড় হতে আমাকে কে আটকালো, মহাপুরুষ হতে কে আমাকে আজকে আটকাচ্ছে? অন্যেরটা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমি নিজেরটা জানি, আমার জীবনে বড় হওয়া থেকে আমাকে বেশি আটকেছে আলস্য। আলস্য আমাকে অনেক কিছু হতে দেয়নি, আলস্য ছাড়া আর কিছু নেই যা আমাকে বড় হতে, মহাপুরুষ হতে আটকেছে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ভারত ভূমিতে আমাদের জন্ম, সেই ভারত ভূমিতে, যে পবিত্র ভূমিকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, যে কোন জীবাত্মা যখন মুক্তির পথে এগিয়ে চলে, সেই জীবাত্মাকে ভারতবর্ষে শরীর ধারণ করতে হয়। অন্য দেশে মুক্তি হয় না, মুক্তি হয় ভারতের পূণ্য ভূমিতে। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলছে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, *অমৃতস্য পুত্রা*, তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাকে কে মারবে, করোনা তোমাকে মারবে? করোনার মত একটা ভাইরাস, হাফ ডেড হাফ লিভিং, এর দম আছে তোমাকে মারবার? সমাজ তোমাকে মারবে, দম আছে? বাইরের লোক তোমাকে মারবে, দম আছে? কে তোমাকে মারে? তুমি নিজেই নিজেকে মারো। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, তুমিই তোমার বন্ধু, তুমি তোমার শত্রু। আলস্যকে ত্যাগ করে দিলে, তুমিই তোমার বন্ধু হয়ে গেলে; আলস্যকে ধরে রাখছ, তুমিই তোমার শত্রু হয়ে গেলে। ভগবান বলছেন, আমি কক্ষণ আলস্য আসতে দিই না, আমি সব সময় কাজ করছি। যদিও আমার কোন দায়ীত্ব নেই, কোন আকাঙ্খা নেই, এমন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না, তাও আমি কাজ করি।

মানুষ কিসের জন্য কাজ করে? কিছু পাওয়ার আশায়। পাওয়ার আশাটা না হয় ছেড়ে দাও, যদি তোমার কোন দায়ীত্ব না থাকে, যদি তোমার কোন লোভ না থাকে, তাহলে দেখো তুমি কি রকম মহাপুরুষ হয়ে যাও। ঠাকুর বলছেন, দুই পয়সার সন্দেশ আনতে দিলে, সেটাও চুষতে চুষতে নিয়ে আসবে। ঠাকুরের কাছে বসে দু-বেলা একটু জপ করেই পাঁচ খানা কামনা জানাবে; হে ঠাকুর আমার যেন এটা হয়, আমার যেন সেটা হয়। কেন আমরা এত কাঙালী? একে আলস্যে পড়ে আছি, আর একটু আলস্য ছেড়ে ঠাকুরের দুটো নাম যদি করি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামনাগুলি জানাতে শুরু করে দিই।

*মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*, সব মানুষ আমাকেই অনুসরণ করে। আমরা কথায় কথায় বলি, ঠাকুর এই রকম করেছিলেন, স্বামীজী এই রকম করেছিলেন। এরাই যখন কামারপুকুরে যাবে তখন খোঁজ করবে ঠাকুর কোন দোকানের জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, সেখান থেকে জিলিপি আর সাদা বোঁদে অবশ্যই কিনবে। জিলিপি আর সাদা বোঁদে কিনলে কামারপুকুর ভ্রমণ সার্থক হবে। দেওঘর গিয়েছিলেন? সেখানে মন্দিরে জপ করল কি করল না, সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ না, পেড়া নিয়ে এসেছেন কিনা সেটা আগে দেখা চাই। ঠাকুরের জীবন, স্বামীজীর জীবনকে আদর্শ করে জীবনে এগিয়ে যাওয়া, সেই দিকে কারুর দৃষ্টি নেই।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

*(যদি আমি কর্ম না করি, লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে এই সকল লোক উৎসন্ন হয়ে যাবে। আমি তখন বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব।)*

হে অর্জুন, আমি যদি কাজ করা বন্ধ করে দিই, এই সংসার উৎসন্নে চলে যাবে। এর দুটো অর্থ হয়, দশম অধ্যায়ের আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাবো, ভগবান সেখানে অনেক কিছু বলবেন। সেখানে বলবেন, এই জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুর সার আমি। শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে, সেখানে আমি আছি বলে এই শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে। পঞ্চম অধ্যায়েও ভগবান আবার বলবেন, সমস্ত কিছুতে আমি আছি, এমনকি খাওয়া-দাওয়া যে হজম হয়, সেটাও ঈশ্বরীয় শক্তিতেই হয়। পৃথিবী যে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না, ঈশ্বরীয় শক্তি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে বলে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। তিনি আছেন বলেই সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে চলছে, তা নাহলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যেত। সৃষ্টিটা ভগবানের তৈরী, এর দায়ীত্ব তাঁর, এই দায়ীত্ব সাংসারিক অর্থে না। অন্যান্য ধর্মে কোথায় ভগবান একবার পাঠিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি কাউকে দূত করে পাঠিয়েছেন। হিন্দু ধর্মই একমাত্র বলে, সৃষ্টি ভগবানের, তিনিই এই সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন। এই সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার জন্য ভগবান নিজেই নানা রকম লীলা করেন, কখন দেবলীলা, কখন মনুষ্যলীলা, কখন ঈশ্বরলীলা, আবার কখন অবতার লীলা। জাতক কথাতেও আমরা এই ভাব পাই, সেখানে দেখাচ্ছেন বিভিন্ন যোনিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। হিন্দুদেরও কুর্মাবতার, মৎস্যাবতার আছেন; এর মধ্যে আবার কিছু পণ্ডিতরা বিবর্তনবাদের থিয়োরী নিয়ে আসেন। বলতে চাইছেন সবটাই ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরই সব কিছুকে ধারণ করে আছেন।

*সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ*, ধর্ম স্থাপন যদি আমি না করি, তাহলে বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, কোন কিছুরই স্বকীয়তা বজায় থাকবে না, জিনিসগুলোর পবিত্র ভাবটাই চলে যাবে। ভগবানের কাজ হল সব কিছুকে শুদ্ধ পবিত্র রাখা, জিনিসটা যেমন ঠিক তেমন একেবারে শুদ্ধ থাকতে হবে। ব্রাহ্মণের কাজ জ্ঞানার্জন, ক্ষত্রিয়ের কাজ রক্ষা করা। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের কাজ করে, ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের কাজ করে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, সব এলেমেলো হয়ে যাবে। দেশের সীমান্তে যে সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা দিয়ে দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করছে, তারা যদি বলে

সিনেমার অভিনেতারা অভিনয় করে প্রচুর সম্মান পায়, অর্থও প্রচুর পায়, আমরাও অভিনয় করব। সব সৈন্যরা যদি বলে আমরা সিনেমায় এ্যাক্টিং করব, তাহলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভগবান কখন শাস্ত্র রূপে, কখন অবতার রূপে মানুষকে তার নিজ নিজ দায়ীত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেন। এটা না করলে সৃষ্টিটাই এলেমেলো হয়ে যাবে। এই এলেমেলো যাতে না হয়ে যায়, সেইজন্য ভগবানকে সব সময় কাজ করে যেতে হয়।

এখন কোথায় আছেন ভগবান? সব জায়গায় আছেন, *যো রাম দশরথ কা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা*। অণুতে অণুতে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনিই আবার দশরথের বেটা। এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন গ্রহে কোন অবতার হয়ে শরীর ধারণ করে কি লীলা করছেন, আমরা জানি না। এতটুকু জানি এই পৃথিবীতে তিনি স্থূল শরীরে নেই। কিন্তু আগে আগে বহুবার তিনি শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে লীলা করে গেছেন। এখন কোন যোনিতে কোথায় কি করছেন আমরা জানি না। যদি খুব বেশি এলেমেলো, বিশৃঙ্খলা হয়ে যায়, তখন তিনি এসে নাশ করেন।

করোনা কেন এসেছে? গ্লোবালাইজেশান আদি করে পৃথিবীতে দৈত্যকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবার সামলাও। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কিছু লোককে মরতে হবে, কারুর কিছু করার নেই। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন *কালোহস্মি লোকক্ষয়ংকৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, আমি কাল, লোকক্ষয় করার জন্য আমি এই রূপ ধারণ করেছি। অন্যান্য মতে, অন্যান্য ধর্মে যে যাই বলুক, আমাদের এখানে মৃত্যু ভগবানেরই রূপ। অনেক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বেশি হয়ে গেলে, তিনি কিছু লোককে মেরে সব আগের মত ঠিক রাস্থায় নিয়ে আসেন। এটা কি করে হতে পারে, ভগবান একদিকে সৃষ্টি করছেন, আর-একদিকে রক্ষণ করছেন আর আবার তাঁকেই এখন সংহার করতে হচ্ছে। ফলে এই যে বিরোধ হয়ে যায়, ভগবান কক্ষণ এটা চান না। জগতে যদি পাপের বৃদ্ধি হয়ে যায়, অধর্ম যদি বেশি মাত্রায় হয়ে যায়, তখন ভগবানকে নিজে এসে নাশ করতে হয়ে। কিন্তু ভগবান কখনই এ-ভাবে সব কিছু নাশ করে দিতে চান না। তিনি তাই সব সময় লেগে থাকেন, যাতে সব কিছু ঠিক মত চলে।

এরপরে ভগবান বলবেন, জগতের এটা স্বভাব যে, বিষয়ের দিকে মন সব সময় ধাবিত হবে। গীতা ভাষ্যের প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্কর সেইজন্য বলেছেন, জগতের স্থিতির জন্য ভগবান এসে নিজে সব ঠিক করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পর মানুষের মনে লোভ, কামাদি আবার চাগিয়ে ওঠে, যার ফলে মানুষ আবার অধর্মের পথ অবলম্বন করে। ভগবান আবার এসে তখন সব ঠিক করে দেন। ভগবান যদি সব সময় আমাদের পিছনে লেগে না থাকতেন, তাহলে এক অপরকে কেটে শেষ করে দিত। যেমন সবাই সবাইকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, কখন আমেরিকা হুমকি দিচ্ছে, কখন চীন হুমকি দিচ্ছে, কখন পাকিস্থান হুমকি দিচ্ছে, বলছে আমি এ্যটম বোমা ছেড়ে দেব। তার কারণ সবার মধ্যে আসুরিক বৃত্তি রয়েছে, সুযোগ পেলেই ওই আসুরিক বৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একমাত্র ভগবানই পারেন এভাবে সেভাবে ঠিক করে দিতে, এবং তিনি সব সময় করছেনও; কখন শান্তির বাণী দিয়ে, কখন করোনার মত মহামারী দিয়ে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই কথাই বার বার বলছেন, এটা মায়েরই রূপ, তিনি আবার রক্ষাও করেন। আর বলছেন, সেইজন্য যিনি আত্মবেত্তা হন, তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। তাঁর পাওয়ারও কিছু থাকে না, এমন কিছু নেই যে সে পেতে পারে না। তা সত্ত্বেও তিনি কাজ করেন। কিসের জন্য কাজ করেন? রোল মডেল, আদর্শ স্থাপনের জন্য কাজ করেন।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকির্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫।।

*(হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত হয়ে যেভাবে কর্ম করে, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য সেইভাবে কর্ম করবেন।*

*সক্তাঃ* মানে আসক্ত, বলছেন, আসক্ত পুরুষ যেভাবে কাজ করে, *চিকির্ষুঃ* মানে ইচ্ছা, আত্মবেত্তা লোকসংগ্রহের ইচ্ছাতে সেইভাবেই কাজ করেন। সাধারণ মানুষ, সাধক, সিদ্ধ আর অবতার, এই চারজনের মধ্যে কি তফাৎ? সাধারণ মানুষ ঘোর সংসারে পড়ে আছে, ওখান থেকে বেরোতে চায় না, সাধক হলেন যিনি ওঠার চেষ্টা করছেন, সিদ্ধ হলেন যিনি উঠে একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, অবতার হলেন, যিনি উপর থেকে নেমে সেই অবস্থায় আসেন। সিদ্ধ পুরুষ নীচে থেকে চেষ্টা করে একটা অবস্থায় পৌঁছান, অবতার চেষ্টা করে উপর থেকে নীচে এতটুকু নেমে আসেন, এটাই তফাৎ।

বড় বড় বিশাল আকারের বেলুন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, যদি বেঁধে না রাখা হয় বেলুন উড়ে বেরিয়ে যাবে। বেলুনের ভিতর বিশেষ গ্যাস এত ভরা আছে যে, ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন উঁচু জায়গা থেকে পাথর যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, পাথর সোজা নীচের দিকে নেমে আসবে। অবতার পুরুষ কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে, এটা সেটা করে কোন রকমে নিজেকে টেনে নীচে ধরে রাখেন। জ্ঞানীদের জন্য এটাই বলছেন, তোমার এটা দায়ীত্ব উপর থেকে টেনে নীচে নামিয়ে নিজেকে বসিয়ে রাখবে। আর একজন আসক্ত পুরুষ যেভাবে কাজ করে, জ্ঞানী পুরুষ সেভাবেই কাজ করবেন, যেমন স্বামীজী, তিনিও সেভাবেই কাজ করেছেন। আমরা নামযশের জন্য কাজ করি, কিন্তু তিনি লোকশিক্ষার জন্য কাজ করছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর ঠিক সেই ভাবেই উপদেশ দিচ্ছেন লোকশিক্ষার জন্য, যেভাবে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন বা তখনকার দিনের অন্যান্য নামকরা লোকেরা যেভাবে উপদেশ দিতেন, ঠাকুরও সেই ভাবেই উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি যেটা করছেন, ঠিক ঠিক লোকশিক্ষার জন্য করছেন। আমরা যেটা করি, আমরা ঠিক লোকশিক্ষার জন্য করি না, কিন্তু উদ্দেশ্য হল আমরা যাতে রোল মডেল হতে পারি।

অর্জুন প্রথমের দিকে ঘোষণা করেছিল যে, সে যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ না করে বরং সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মনে করিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি এই ভাবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করার সঙ্কল্প ত্যাগ কর; আমার কোন কিছুই পাওয়ার নেই, আমার কোন কর্তব্য নেই, তা সত্ত্বেও আমি নিজেও এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকি না। মানুষের মঙ্গলের জন্য, যাতে এই জগতটা স্থিতিশীল থাকে, সেইজন্য আমি কাজ করি। তুমিও লোকসংগ্রহের জন্য কাজ কর, এটা আমার কাজ নয়, ঠাকুরের কাজ, ঈশ্বরের কাজ ভেবে কর। তার মানে, তুমি যদি নিজেকে কাঁচা লোক মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি যদি নিজেকে পূর্ণজ্ঞানী মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, আর যদি তুমি অর্ধ কাঁচা মনে কর তাও তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও থাকবে না, তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। দেশ, সমাজ, জাতির কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য কাজ কর।

পরের শ্লোকে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন তোমার দায়ীত্ব, আসক্ত হয়ে যারা কাজ করছে, তাদের উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে দিও না যে, ‘সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাও’, ‘কর্ম ত্যাগ কর’, ‘তুমি সেই আত্মা’, এইসব কথা বলে তাদের বুদ্ধিভেদ করো না।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

*(জ্ঞানিগণ কর্মাসক্ত জ্ঞানহীনগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। তাঁরা অবহিতচিত্তে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীনদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।)*

আমাদের শাস্ত্রে *বুদ্ধিভেদ* একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বুদ্ধভেদ হল, মানুষের যে বুদ্ধি অর্থাৎ মন যেখানে বসে রয়েছে, ওটাকে হঠাৎ দুমদাম্ করে নাড়িয়ে দিতে নেই। তুমি অপদার্থ, তোমার

দ্বারা এটা হবে না, তুমি এটার যোগ্য না, তুমি পুরো ভুল পথে আছ, এই ধরণের কথা কখনই বলতে নেই। যদি কাউকে আমি সত্যিকারের ভাল করতে চাই, আগে তার স্তরে আমাকে নেমে আসতে হবে। অনেক আগেকার কথা, একজন বড় আইএএস অফিসার ছিলেন, সাধুদের খুব সম্মান করেতেন। আমরা কলেজে একসাথে পড়তাম। তিনি আমাকে বলতেন, 'স্বামীজী, আমরা জানি আমরা পাঁকে পড়ে আছি। আপনি যদি আমাকে বলেন, আরে ভাই তুমি তো পাঁকে পড়ে আছ। আমি তো জানি আমি পাঁকে পড়ে আছি, সেটা আবার নূতন করে শুনে কি হবে! আপনি যদি আমার পাঁকে নেমে আমাকে তুলে বার করে নিয়ে আসতে পারেন, তাতেই আপনার সুখ্যতি'।

যারা অজ্ঞ পুরুষ, ধর্ম তত্ত্ব যারা জানে না, তাদের মধ্যে তুমি নামো, তাদের মতই কাজ কর, সেখান থেকে আস্তে আস্তে তাকে উপরে নিয়ে আসো। স্বামীজী শিক্ষকের গুণের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একজন ভাল শিক্ষক ছাত্রের স্তরে নেমে যান, সেখান থেকে তাকে উপরে তুলে নিয়ে আসেন। বেশির ভাগ শিক্ষক উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, নীচে কিছুতেই নামবেন না, ওখান থেকেই শিক্ষা দিতে থাকবেন।

জিম করবেটের জীবনের একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে। জিম করবেটের বয়স তখন দশ এগারো হবে, তখনই তাঁর খুব সুনাম হয়ে গিয়েছিল যে তিনি ভাল শুটিং করতে পারেন। সেই সময় তিনি স্কাউটের মত কোন একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একবার প্যারেডে একজন বড় আর্মি অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এদের যিনি ট্রেনার ছিলেন, তিনি জিম করবেটের দিকে ইশারা করে বলতে চাইছেন, 'এই ছেলেটি আমাদের খুব ভাল শ্যুটার'। আর্মি অফিসার রাইফেল ধরিয়ে দিলেন। জিম করবেটা রাইফেল নিয়ে মাটিতে শুয়ে শ্যুট করছে, কিন্তু একটাও লক্ষ্যে বিদ্ধ করতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে ওই অত বড় আর্মি অফিসার এসে জিম করবেটের পাশে শুয়ে পড়লেন, ওর রাইফেলটা নিজের হাতে নিলেন এবং সাইটটাকে ঠিক করে দিলেন। বন্দুকে সাইট থাকে, তাতে দূরত্বটা মাপতে হয়, আমার টার্গেট একশ মিটারে নাকি দেড়শ মিটারে আছে। জিম করবেটের লক্ষ্যটা ভাল, কিন্তু এখনও দূরত্ব মাপার কৌশলটা রপ্ত করতে পারেনি। উনি জিম করবেটের পাশে শুয়ে পড়লেন, রাইফেলটা নিলেন, নিয়ে ওর সাইটটা ঠিক করে দিলেন, এবার জিম করবেট গুলি চালালেন, ধাঁই করে লক্ষ্যে গিয়ে লেগে গেল। এই হচ্ছে শিক্ষক, এই নয় যে তিনি হেসে বলছেন, দেখলে তো তুমি পারলে না, এই জিনিস শিক্ষককে কখনই করতে নেই। তুমি ওর স্তরে নেমে যাও। কিন্তু ওই আর্মি অফিসার কোন রকম নিন্দা না করে, ওর বন্দুকটা নিলেন, সাইট ঠিক করে দিলেন, তারপর সোজা লক্ষ্যে গুলি পৌঁছে গেল। *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, কাজে নেমে পড়, ওর জায়গায় নামো, নেমে সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসো।

উপদেশ দেওয়া যাদের অভ্যাস, যদিও উপদেশ দিতে সবারই ভালো লাগে, তাদের এই শ্লোকটিকে সব সময় মাথায় বসিয়ে নিয়ে উপদেশ দিতে হবে। স্বামীজী ভালো আচার্যের লক্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, শ্রেষ্ঠ আচার্য শিষ্য যেখানে পড়ে আছে আগে নিজে সেখানে নেমে আসেন, সেখানে নেমে আগে শিষ্যের হাত ধরেন, তারপর ধীরে ধীরে তাকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে থাকেন। আর প্রথম দিনেই যে আচার্য শিষ্যকে বলে দিল, তুমি এতদিন যাবৎ যা কিছু শিখে এসেছ সবটাই ভুল, তখনই বোঝা যাবে যে এই আচার্যের যারা শিষ্য তাদের কপাল মন্দ। একটা ক্লাশ ওয়ান/টুয়ের বাচ্চাকেও যখন কিছু শেখাতে যাবে সেখানেও এই শ্লোকটা প্রযোজ্য হবে।

অনেকেই হিরণ ম্যাক্সিনের নাম শুনে থাকবেন, যিনি মেশিনগান আবিষ্কার করেছিলেন। হিরণ ম্যাক্সিন আসলে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। পরে যখন দেখলেন এই মেশিনগানের সাহায্যে মানুষকে নির্বিচারে মারা হচ্ছে, তখন তিনি প্রায়ই দুঃখ করে আফশোষ করতেন, কেন যে আমি এই মেশিনগানের মত একটা জঘন্য মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে গেলাম। উনি নিজে একজন খুব বড়

বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু খ্যাতির সেই রকম উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারেনি। ছোট খাটো অনেক জিনিস তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওনার স্ত্রী ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ খ্রীশ্চান মহিলা। স্বামীজীর সাথেও এই ম্যাক্সিন পরিবারের দেখা হয়েছিল। হিরণ ম্যাক্সিন স্বামীজীকে দেখে খুব অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। ম্যাক্সিনদের বাড়িতে স্বামীজী খাওয়া দাওয়াও করেছিলেন। ওনার ছেলে পরে তার বাবার জীবনী লিখেছিলেন। ছেলেও পরে খুব নাম করেছিল, কিন্তু বাবার মত অত বিখ্যাত হননি।

হিরণ ম্যাক্সিনের এই ছেলে ছোটবেলায়, যখন তার ছয় কি সাত বছর বয়স, একদিন এক দোকানে গেছে, গিয়ে দেখে সেই দোকানদারের পোষা কুকুর খুব সুন্দর ফুটফুটে কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছে। একটা ধব্‌ধবে সাদা বাচ্চাকে ছেলের খুব পছন্দ হয়েছে। দোকানদারকে বলছে –এই বাচ্চাটা আমাকে দেবে? এটার কত দাম হবে? ছোট শিশু অত কিছু বোঝেও না। দোকানদার বলছে –হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিক্রী করব, এর দাম এক ডলার, কিন্তু সেই একটি ডলারের দুদিকেই মাথা থাকতে হবে। মানে ডলারের দুদিকে হেড, টেল থাকলে হবে না। আসলে দোকানদারের ঐ কুকুরের বাচ্চাটা বিক্রী করবার ইচ্ছে নেই। বাচ্চাটাকে কাটিয়ে দেবার জন্য ঐ রকম অবাস্তব কথা বলেছে।

ছেলে তো আনন্দে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। যাক, একটি তো ডলার, আর দুদিকেই হেড ঐ রকম একটা ডলার নিশ্চয় কখনও না কখন পাওয়া যাবে। বাড়িতে মাকে গিয়ে বলেছে, 'মা, আমাকে একটা ডলার দেবে যার দুদিকে মাথা আছে'? মা ছেলেকে খুব বকে দিয়েছে। ছেলের মন খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যে বেলা বাবা কাজ থেকে বাড়িতে এসেছেন, 'ছেলে গিয়ে বাবাকে ধরেছে, বাবা এক ডলারের একটা কয়েন হবে যার দুদিকে মাথা আছে, মা বলেছে ওরকম কয়েন নাকি হয় না'। বাবা ছেলেকে বলছেন – 'মা ঠিক জানে না, আচ্ছা দেখছি'। বলে তিনি পকেটে হাতড়ে খুচরো পয়সা গুলো নিয়ে এসে দেখছেন ওর মধ্যে ঐ রকম কোন কয়েন আছে কিনা। দেখে টেখে ছেলেকে বললেন, 'এখন এই যা খুচরো কয়েন আছে এর মধ্যে তো নেই, আচ্ছা কালকে আমি দেখব পাওয়া যায় কিনা'।

পরের দিন বাবা আবার কাজ থেকে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেছেন। ছেলে তো সারা দিন না ঘুমিয়ে, না খেয়ে কাটিয়েছে, ওর মাথায় খালি কুকুরের বাচ্চাই ঘুরছে। বাবাকে গিয়ে আবার ধরেছে, 'বাবা পেয়েছ'? বাবা – 'ও, ও, দেখছি দেখছি'। আবার পকেট থেকে খুচরো পয়সা গুলো ঘাটতে লাগলেন, ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ বললেন, 'এই তো এর মধ্যে একটা কয়েন রয়েছে দেখছি যার দুদিকেই মাথা'। ছেলেকে আর কে পায়, আনন্দে লাফাতে আরম্ভ করেছে। তারপর বাবা আর ছেলে দুজনে মিলে গেছে দোকানে, দোকানে গিয়ে দোকানদারকে ছেলে বলছে – 'এই যে দুদিকে মাথাওয়ালা এক ডলার নিয়ে এসেছি'। দোকানদার হাতে কয়েনটা নিয়ে দুদিকে উল্টেপাল্টে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যিই একটা ডলার যার দুদিকেই মাথা। দোকানদার তখন হিরন ম্যাক্সিনকে বলছে, এই কুকুরটাতো বিক্রীর জন্য রাখা হয়নি। হিরন ম্যাক্সিন খুব রেগে গেছে, আপনি তাহলে একটা বাচ্চার সাথে কেন এই ধরণের মজা করতে গেলেন, পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন যে এটা বিক্রী করবেন না। দোকানদার ক্ষমাটমা চাইল, কুকুরটা আর পাওয়া হল না। বাচ্চাটাও বাবার সাথে ফেরত চলে এসেছে।

এই ছেলে বড় হয়ে বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে বলছেন, বাবা বাচ্চার মনটাকে ভাঙবেন না। বাবা ছিলেন আসলে ইঞ্জিনিয়ার, তিনি দুটো কয়েনকে নিয়ে লেদ মেশিন দিয়ে মাঝখান দিয়ে চিড়েছেন, আর মেটালিক ফ্লুড দিয়ে দুটো মাথাকে সেঁটে দিয়েছেন। এমন ভাবে দুটো কয়েনকে জুড়েছেন যে কারুর ক্ষমতা নেই ধরার। ঐভাবে জুড়ে পকেটে করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু একবারও বললেন না যে আমি দুদিকে মাথাওয়ালা কয়েন নিয়ে এসেছি। যেই ছেলে ধরেছে তখন – ও, ও, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলেছিলে না, আচ্ছা দেখছি আজকে পকেটে পাওয়া যায় কিনা। এই হচ্ছে *ন*

*বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ*, বাচ্চাকে বাচ্চার নিজের ঐ অবস্থা থেকে তুলছেন। এরাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মহৎ শিক্ষক। নিজের সন্তান, নিজের শিষ্যকে যতক্ষণ এই রকম প্রশিক্ষণ না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন উন্নতি হবে না।

রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ গরীব মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য অনেক রেভলিউশারি আইডিয়ার কথা বলেন। আসলে Revolutionary Idea বলে কিছু হয় না, যারাই বলছে আমি একটা Revolutionary Idea দিচ্ছি, তখন বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। তোমার যদি আইডিয়া রেভলিউশানারি হয় তাহলে তোমাকে আগে ওদের স্তরে যেতে হবে, ঐ স্তর থেকে ওদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। তার আগেই যদি রক্তারক্তি বিপ্লব করে দিয়ে কোন ভাবে ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে সেই ক্ষমতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এইভাবে যত ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে সব ক্ষেত্রেই তার উল্টো প্রতিক্রিয়া এদেরকেই ইতিহাসের পাতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অনেক উগ্র বিপ্লবী নেতারাই পরে তাদের ভুলকে স্বীকার করেছেন।

মেঘালয় রাজ্য পুরো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ওখানে ছেলেরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়, মানে ঘরজামাই হয়ে থাকে, আর সন্তানের পরিচয় মায়ের নামেই হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের চেরাপুঞ্জী স্কুলে কলকাতা থেকে কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন। এরা এসে এই সব দেখে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন। স্কুলের ছেলেরা শুনে ঘাবড়ে গেছে। কিছু দিন পরে দেখা গেলে সব ট্রাইবাল মেয়েরা কাটারি হাতে স্কুলে এসে বলছে, 'কই সেই মাস্টার যে আমাদের হাজার বছরের প্রথাকে উল্টে দিতে চাইছে'। তারপর সেই শিক্ষককে কোন রকমে লুকিয়ে চুরিয়ে ওখান থেকে অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো কখনই করতে নেই, গীতায় এই জিনিসটাকেই করতে নিষেধ করা হচ্ছে, বুদ্ধিভেদ খুব খারাপ জিনিস, ইংরাজীতে বলা হয় unsettlement of faith। পুরনো বিশ্বাসের জায়গাটাকে একদিনেই কখন ভেঙ্গে দিতে নেই। সবারই একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ধ্যান-ধারণা থাকে, অনেক দিন ধরে তারা সেই চিন্তা ভাবনাটা করে আসছে, সেটাকে একদিনেই দুম্ করে উল্টে দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক।

তাহলে কি ভাবে করবে? ওই যে আগে যেমনটি বলা হল; *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, বাঃ বাঃ, দারুণ হয়েছে। এদের সমস্ত কাজে উৎসাহ দিয়ে নিজেকেও ঐ রকম কাজ করা শুরু করতে হয়। তারপর ধাপে ধাপে ওদেরকে উপরে তুলে নিয়ে আসতে হবে। স্বামীজীর আদর্শ শিক্ষক কি রকম হবে? শিক্ষক আগে ছাত্র যে অবস্থায় যে স্তরে আছে সেখানে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এখন বেশির ভাব শিক্ষকরা ঐ স্তরে যেতেই চান না, আর যারা যদিও বা যান তারা ছাত্রদের ঐ স্তরে নেমে গিয়ে ঐখানেই নিজে থেকে যান, ছাত্রকেও ওপরে আনেন না, নিজেও আর ওপরে আসেন না। একটা লোক যদি পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকে, তাকে কখনই বলা উচিৎ নয় যে তুমি তো পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে, দরকার হলে তুমিও ঐ পাঁকের মধ্যে নেমে পড়ে ওকে সেই পাঁক থেকে বার করে নিয়ে এসো।

তার আগে বলছেন, কারুর বুদ্ধিভেদ করো না, তার চিন্তা-ভাবনায় আঘাত দিয়ে হঠাৎ করে বলা যে, তোমার এগুলো একেবারেই ঠিক না। আগে তার মত তোমাকে হতে হবে, তার স্তরে তোমাকে নামতে হবে, তারপর সেই স্তর থেকে তাকে আস্তে আস্তে উপরে তুলে আনো। পরের শ্লোকে বলছেন, আসক্ত পুরুষ কে –

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

*(প্রকৃতির গুণত্রয় শরীরেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে পরিণত হয়ে লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। অহঙ্কার দ্বারা যাঁর চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে, তিনি 'আমি কর্তা' এ-রূপ মনে করেন।)*

সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ আছেন, অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য আর তার সঙ্গে প্রকৃতি রয়েছেন; এই প্রকৃতি জড় এবং পুরুষ চৈতন্য। প্রকৃতিতে প্রথম আসে মহৎ (cosmic mind), মহতের পরে আসে অহঙ্কার (cosmic ego), অহঙ্কার থেকে পর পর বেরিয়ে আসে পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়াদি ও মন। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্বকে বেদান্তও মানে। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব বিষয় আছে, ইন্দ্রিয় তার নিজের বিষয়ের দিকে ধাবিত হবে। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) আকাশ, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল এই পঞ্চ ভূতাদি থেকে নির্মিত। যেমন আকাশ থেকে শব্দের উৎপত্তি, আকাশ দিয়ে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় তৈরী, সেইজন্য কানের স্বভাবই হল শব্দের দিকে যাওয়া। চোখ অগ্নি থেকে তৈরী, রূপ অগ্নি থেকে আসছে, তাই চোখের স্বভাব রূপের দিকে ধাবিত হওয়া। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ছুটছে।

এটাকেই স্বামীজী বলছেন, puppy's play, কুকুরের বাচ্চাগুলি নিজেদের মত খেলতে থাকে, আমরা যদি ওই খেলার মধ্যে জড়িয়ে যাই, আমরাই মাঝখান থেকে কুকুরের কামড় খেয়ে যাব। ট্রেনে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া হতে হতে একজন আর-একজনকে বলছে, 'তোমাকে এমন ঘুষি মারব যে, তোমার চৌষট্টি পাটির দাঁত খুলে যাবে'। পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনি ভুল করছেন, দাঁত বত্রিশটা হয়'। তখন তাকে বলছে, 'আমি জানতাম তুমি আমাদের ঝগড়ার মধ্যে ঢুকবে, সেইজন্য আগে থেকেই আমি তোমার বত্রিশটা দাঁত যোগ করে নিয়েছিলাম'। আমরাও অকারণে যেখানে সেখানে জড়িয়ে পড়ি। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ওর মধ্যে যদি তুমি দুটো মিষ্টি কথা বলে বোঝাতে যাও, দেখবে দুজনে মিলে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়, এক অপরের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে। তুমি ইন্দ্রিয় নও, তুমি বিষয়ও নও, তুমি কেন ওর মধ্যে জড়াতে চাইছ! কিন্তু যে ওর মধ্যে জড়িয়ে ফেলে, যে মনে করে আমি করছি, এরাই আসক্ত পুরুষ, এরাই *বিমূঢ়াত্মা*, মূঢ়; এখনও তার জ্ঞান হয়নি। যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি জানেন, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর খেলা করছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী আর তাদের যে নিজ নিজ জিনিসগুলো শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এগুলোকে বলা হয় কার্য। আর এগুলোকে একত্রে নিয়ে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলি তার সাথে মন, সবটাকে বলে করণ –এই বিষয় আর ইন্দ্রিয় এক অপরের উপর লেগে আছে। *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*, যে এগুলোর সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়, আর মনে করে এটা আমি করছি, সে নিজেকে মনে করে কর্তা। এটাই সমস্ত অশান্তির মূল।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

*(হে মহাবাহো, সত্ত্বগুণের পরিণাম চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল, তমোগুণের পরিণাম রূপ ও রসাদি বিষয়সকলে প্রবৃত্ত আছে। কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ –এটা জেনে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন।)*

কিন্তু যিনি তত্ত্ববিদ্, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি জানেন কোন কাজই আমি করছি না, এখানে ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের খেলা চলছে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আকাশাদি পাঁচটি মহাভূত, তার সাথে শব্দাদি পাঁচটি বিষয়; মন, অহঙ্কার এবং মহৎ, প্রকৃতি বাদে এই মোট তেইশটা তত্ত্ব হয়, প্রকৃতিকে নিয়ে চব্বিশটি তত্ত। এই তেইশটি তত্ত্বকে বলে গুণবিভাগ। আর এদের যে এক অপরের উপর যে কাজ হয়, সেটাকে বলে কর্মবিভাগ। তত্ত্ববেত্তা জানেন, *গুণা গুণেষু বর্তন্ত*, গুণ গুণের উপর

কাজ করে। এই সংসার প্রকৃতির রাজ্যে, এই রাজ্যে এক অপরের সাথে খেলা করছে। এই খেলার মধ্যে তুমি কেন জড়াতে যাচ্ছ, ওরা ওদের মত খেলা করুক, তুমি ওখান থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে এসো। যিনি তত্ত্ববিদ, তিনি এই জিনিসটা ভাল করে জেনে গেছেন যে, গুণ গুণের উপর, বিষয় বিষয়ের উপর খেলা করছে, সেইজন্য তাঁরা এতে একেবারেই জড়ান না।

গরমের সময় মিষ্টি ঠাণ্ডা শরবৎ পান করে আমি বলছি, আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এখানেও সেই তিন গুণের খেলা, শরবৎ হচ্ছে রসতত্ত্ব থেকে তৈরী, আর জিহ্বা সেও রসতত্ত্ব দিয়ে তৈরী, রসতত্ত্ব রসতত্ত্বকে আস্বাদ করছে, আমি এখানে কোথায় জড়াচ্ছি! যিনি আত্মা, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর সাথে রসতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব এদের কোন সম্পর্কই নেই। চৈতন্য নিজেকে বোকার মত এগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করে কখন আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছে আবার কখন দুঃখ পেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চৈতন্য এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সব কিছু খেলার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে প্রকৃতির ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করছেন। চৈতন্য সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই চৈতন্য আছেন, কিন্তু জীবের শরীরে আশ্রয় করেন বলে তাঁর প্রকাশটা বেশি মনে হয়। এখন কোন কারণে চৈতন্য যদি এই শরীরের আশ্রয়টা ছেড়ে দেন তখন এই শরীর আর জড় পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এই চৈতন্যই যখন গাছের মধ্যে আশ্রয় করবেন তখন তিনি গাছের মতই আচরণ করবেন, যখন একটা পশুর শরীরকে আশ্রয় করবেন তখন পশুর মত ব্যবহার করবেন, মানুষের শরীরে আশ্রয় করবেন তখন মানুষের মত কাজ করবেন।

কিন্তু প্রাণ সেভাবে কাজ করবে না, যেমন টিউবলাইটেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে পাখাতেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি টিউবলাইটে পাখার মত কাজ করবে না, পাখাতে টিউবলাইটের মত কাজ করবে না। আমাদের শরীরে অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি যেভাবে রয়েছে এখানে প্রাণ যেভাবে কাজ করবে গাছের মধ্যে সেইভাবে কাজ করবে না। এখন যদি আমার শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তখন চৈতন্য শক্তি সেই শরীরের আশ্রয় ছেড়ে দেবেন কেননা এই শরীরটা তাঁর যন্ত্রস্বরূপ ছিল এখন সে যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেল, তাই এই যন্ত্রটাকে ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবেন? কোথাও যাবেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন।

চৈতন্য যে শুধু এই স্থূল শরীরের সাথে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন তাতো নয়, এই শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, যার সাহায্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, সেই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে আরও বেশি করে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন। যখনই স্থূল শরীরটা দিয়ে কোন কাজ করতে পারবেন না, তখনই সূক্ষ্ম শরীরটা সেই স্থূল শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা শরীরকে নিজের অপূর্ণ কামনা বাসনাকে মেটাবার জন্য দাঁড় করিয়ে নেবেন। আমার এই জামা প্যাণ্ট যদি ছিঁড়ে যায় তখন তো আমি উলঙ্গ ঘুরে বেড়াব না, আমি আর-একটা জামা প্যাণ্ট বানিয়ে নেব, এও ঠিক তেমনি আর-একটা শরীর বানিয়ে নেবে। কিন্তু শরীর বানাবার ক্ষমতা খুব কম, তাই একটা গর্ভকে বেছে নিয়ে সেখানে ঢুকে যেতে হয়। যোগীদের সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষমতা অনেক বেশি, সেইজন্য তাঁদের গর্ভে ঢোকার দরকার পড়ে না। উনি দেখছেন একটা পাথর পড়ে রয়েছে, ঐ পাথরকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, তিনি ঐ পাথরকে আশ্রয় করে নিজের জীবাত্মাকে ঐখানে ঢুকিয়ে নিয়ে তপস্যাতে ডুব দেবেন। এখন ঐ পাথর হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে আছে, যোগী ওর মধ্যেই ঢুকে গিয়ে ধ্যান করে যাচ্ছেন। অহল্যা যেমন পাথরের শরীরকে আশ্রয় করে পড়েছিলেন।

যোগীর উদ্দেশ্য ওই যে সূক্ষ্ম শরীর, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সেই শরীরটাকে বিনাশ করে দেওয়া। এই সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হবে না। চৈতন্য কখনই সূক্ষ্ম শরীরকে ছাড়তে পারেন না, কারণ তিনি এমন মায়া, মমতার সংস্কারে নিজেকে সূক্ষ্ম শরীরের সাথে এমন একাত্ম করে রেখেছেন যে, যত দিন না ঐ সংস্কারের বীজ পুড়ে ছাই হয়ে

যাচ্ছে তত দিন তিনি সূক্ষ্ম শরীর থেকে বেরোতে পারবেন না। মানুষ মারা যাওয়ার পর যে বলা হয় চৈতন্য বেরিয়ে গেল, আসলে চৈতন্য বেরোয় না, বেরোয় সূক্ষ্ম শরীরটা। যেদিন চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যান, তখন যে সূক্ষ্ম শরীর সমস্ত জড়ের উপাদান গুলিকে ধরে রেখেছিল সেগুলো আলাদা হয়ে যে যেখান থেকে এসেছিল সে সেখানে চলে যায়। প্রতি মুহূর্তে আমি যে নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন এই নিঃশ্বাসের বায়ু কোথায় যাচ্ছে? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম শরীরকে যখন আত্মা ছেড়ে দিচ্ছে তখন সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম উপাদান গুলি কোথায় যাবে? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেগুলো আবার একজন কেউ নিয়ে নেবে। আর আত্মা কোথায় যাবেন? কোথাও যাবেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন। মুক্তি বলতে এটাকেই বোঝায়, শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্য যখন এই সূক্ষ্ম শরীরটাকে ছেড়ে দেন তখনই তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন।

সূক্ষ্ম শরীরটা আসলে কি? হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়েছে, যেমন মন, মনের আবার হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান আছে, সেই রকম প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান, বুদ্ধির হাজারটা উপাদান, প্রাণের হাজারটা উপাদান, সব উপাদান নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরটা তৈরী হয়েছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে চৈতন্য নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। যতক্ষণ চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেবন ততক্ষণ এই সূক্ষ্ম শরীর যেমন যেমন চিন্তা ভাবনা করতে থাকবে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্থূল শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকবেন। এই ঘোরার সময় তিনি কিছু উপাদানকে ছেড়ে দেবেন আবার কিছু নতুন উপাদানকে গ্রহণ করবেন। যেমন যেমন ভালো কাজ করতে থাকবেন তেমন তেমন তাঁর সূক্ষ্ম শরীর পাল্টাতে থাকবে। যেদিন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন যে উপাদানকে এতদিন ধরে রেখেছিলেন সেই উপাদানগুলো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন একটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট লোহার ছোট ছোট টুকরোকে ধরে রেখেছে।

মনে করা যাক ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট হল চৈতন্য, তাঁর হঠাৎ জ্ঞান হল, জ্ঞান হতেই তাঁর মনে হতে লাগল –আরে আমি একি করছি কতকগুলো লোহাকে আমি ধরে রেখেছি! এখন যদি সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয় তখন লোহার টুকরো গুলো কোথায় যাবে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। এখন ঐ টুকরো গুলোকে কে ধরবে? অন্য কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ধরে নেবে। অন্য ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট না ধরলে কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, ঐখানেই পড়ে থাকবে। আজ হোক কাল হোক কোন না কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঐগুলোকে ধরে নেবে। এই রকম হাজার হাজার কোটি কোটি অনন্ত লোহার সমস্ত টুকরো সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পড়ে আছে। আর অসংখ্য ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঘুরে চলেছে, এখন এরা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী লোহার টুকরোগুলোকে ধরে নেবে। যদি নাই ধরে তাহলে বলা হবে প্রকৃতি নিজের মত আছে। এটাই অপরা প্রকৃতি আর পরা প্রকৃতি, যেটা সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান আলোচনা করবেন। এই পরা প্রকৃতি মানে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটও লোহা দিয়েই তৈরী, লোহার টুকরোও লোহা দিয়েই তৈরী হয়েছে, আবার একে অপরকে টানছে। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট আর লোহাকে উপমার জন্য ব্যবহার করা হল।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

*(প্রকৃতির গুণ দ্বারা ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের কর্মে আসক্ত হন, অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি –এইরূপ অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিৎ সেই অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচলিত করবেন না।)*

যারা মূঢ়, যারা অজ্ঞানী তারা প্রকৃতির এই গুণের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সিনেমা দেখতে দেখতে আমরা সেই সিনেমার চরিত্রে অভিনেতার অভিনয়, সিনেমার দৃশ্য, সিনেমার কাহিনীর মধ্যে আমরা এমন ডুবে যাই যে, ভুলে যাই যে আমরা সিনেমা দেখছি। কোন কিছুর চিন্তা করতে করতে আমরা সেই চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যাই। হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে

হারিয়ে যাই। তখন পাশ থেকে কেউ বলল, 'কি ভাবছ, কোথায় হারিয়ে গেছ'? ঠিক তেমনি, মহাপুরুষরা এসে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি তো প্রকৃতির খেলায় মোহিত হয়ে আছ। কোন ইয়ং ছেলে একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, কেউ তাকে সাবধান করার জন্য মনে করিয়ে দেবে –মোহিনীর মায়ায় তুমি কিন্তু ফাঁসতে চলেছ, সাবধান হয়ে যাও।

*তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ*, যাঁরা তত্ত্ববিদ, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাও যেন এদের বিচলিত না করে। তার মানে বলতে চাইছেন, আপনিও ওদের মত কাজ করুন, সেখান থেকে আস্তে করে অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মানুষকে তুলে নিয়ে আসুন। আমার কোন ডাক্তারী সমস্যা হয়েছে, কোন ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার ওষুধ দিলেন, হয়ত ভুল ওষুধ দিয়েছেন। রোগ সারছে না দেখে আর-একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান দেখেই বলে উঠবেন, 'এ কি করেছেন আপনি, এইসব ভুলভাল ওষুধ খেয়েছেন'? একজন ডাক্তারকে আমরা জানতাম, খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। উনি যখনই দেখতেন ভুল চিকিৎসা হয়েছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'এই ওষুধ অনেক দিন খাওয়া হয়েছে, এই ওষুধ এখন থাক, আজ থেকে আমি যে ওষুধগুলো দিচ্ছি সেগুলো খান'। উনি এত ভাল ডাক্তার ছিলেন যে, ওনার দেওয়া ওষুধ খেলে রোগী ভাল হয়ে যেত। কিন্তু কোন দিন বলতেন না, আপনার ভুল চিকিৎসা হয়েছে। খুব সুন্দর করে বলতেন, এই ওষুধ অনেক দিন খাওয়া হল, ঠিক আছে আজ থেকে এই ওষুধটা খাও। এটাই অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন, তুমি নিজেও কাজ কর, সাথে সাথে যাদের মন এই প্রকৃতির খেলাতে মুগ্ধ হয়ে আছে, তাদেরকেও তাদের অবস্থায় গিয়ে তুলে নিয়ে এসো। তা যদি না পারো, কখনই অন্তত তার বুদ্ধিকে বিচলিত করতে যেও না। এই শুদ্ধিটা কিভাবে হবে?

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০।।

*(পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করছি –এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।)*

হে অর্জুন, তোমার সমস্ত কাজের ফল আমার উপর অর্পণ করে দাও। ছোটবেলায় আমরা সবাই কম-বেশি খুব ফাঁকিবাজ ছিলাম, এমনিতেও বাচ্চারা বাড়ির কোন কাজ করতে চায় না। কোন কাজ যদি করতে বলা হত, বা কোন কিছু আনতে বললে জিনিসটা হয়ত নিয়ে আসবে, কিন্তু আনার পর জিনিসটাকে সামনে ফেলে বলবে, এই নাও তোমার জিনিস। তার ভাবটা এই –আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চেয়েছ, কাজ তো আমাকে করতেই হবে, তুমি বড়, আমাকে আদেশ করেছ, তাই এনে দিলাম। আনবে, কিন্তু ফেলে দিয়ে বলবে, এই নাও তুমি আনতে বলেছ এনে দিলাম। ঠিক তেমনি, কর্মফলটাও ভগবানের পায়ে ফেলে দিতে হয়। তুমি আমাকে এখানে নাচাচ্ছ? শ্রীরামচন্দ্রের নামে তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, হে রাম অনেক নাচিয়েছ, আর নাচিও না।

এই নাচ থেকে কিভাবে বাঁচতে হয়? প্রথমে কর্মের ফল ভগবানের চরণে অর্পণ করে দিতে হয়, প্রভু, ভাল-মন্দ যা ফলই হোক না কেন, তোমার চরণে অর্পণ করলাম, আমি আর ওখানে আসক্ত হব না। সেখান থেকে আস্তে আস্তে কর্ম থেকেও অনাসক্ত হয়ে যায়। পরে লোকসংগ্রহের জন্য এনারা কাজ করেন। এই ভাবটা কি? এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, কাজ করার সময় সব সময় তোমার এই ভাব থাকবে, আমিই এই কাজের কর্তা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য চাকরের মত কাজ করছি। ভৃত্য বা চাকর যদি খুব ভালভাবে কাজ করে, তাতে মালিক খুশী হন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, এই রকম ভগবান খুশী হলে আমাদেরও বলবেন, তুই আমার কাছে আয়, আমার পাশে বোস। ভগবান খুশী হয়ে গেলে, সালোক্য, সামীপ্য এই মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। তার জন্য কি ভাব থাকতে হবে? আমিই কর্তা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ করছি।

ঠাকুর বড়লোকের বাড়ির দাসীর কথা বলছেন, দাসী সব কাজই করে। বাবুর ছেলেকে বলবে, আমার রাম। কিন্তু জানে, আমার নিজের সন্তান দেশের বাড়িতে আছে। আমরা যে মহারাজের কাছে অনেক শিক্ষা পেয়েছি, তিনি আমাদের বলতেন, এই বাক্যটা সব সময় মনে রাখবে –*অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। আমি কর্তা অবশ্যই, কিন্তু প্রভুর ভৃত্য –এটাই হল ভক্তি ভাবে কর্মযোগ। জ্ঞান ভাবে কর্মযোগ তাহলে কোনটা? যেটা ভগবান আগে বললেন। প্রকৃতি প্রকৃতির নিজের মত কাজ করছে, আমি হলাম শুদ্ধ আত্মা, প্রকৃতির কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এটাই জ্ঞান ভাবে কর্মযোগ। কিন্তু এটাই যখন ভক্তি ভাবে আসে, তখন আমিই কর্তা।

এক সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বাশ্রমের বাড়িতে গেছেন, ওনারা বিরাট বড়লোক, তাদের বাড়িটাও রাজবাড়ির মত। মহারাজ যাওয়ার পরই বাড়ির মালিক বলছেন – আরে তোরা কে আছিস, মহারাজ এসছেন ভালো করে এক কাপ চা নিয়ে আয়। মালিক যে চাকরকে বলেছে, সেই চাকর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলল –এই, মহারাজ এসেছেন, দু'কাপ চা চাই। রান্নাঘরের চাকর তখন বাইরে যে দারোয়ান ছিল তাকে বলল –এই, মহারাজ এসেছেন, দু'কাপ চা নিয়ে আয় তো। দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে বলল –এই মহারাজ এসেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে দু'কাপ চা নিয়ে আয়। ড্রাইভার একটা ফ্লাস্ক নিল, গাড়ি স্টার্ট করে একটা দোকানে গিয়ে বলল –এই ভালো করে দু'কাপ চা বানিয়ে এই ফ্লাস্কে ঢেলে দে। ড্রাইভার চা নিয়ে ঠিক একই অনুক্রমে, দারোয়ানকে দিল, দারোয়ান রান্নঘরের চাকরকে দিল, রান্নঘরের চাকর মালিকের নিজস্ব চাকরকে দিল। মালিক কিন্তু এত কিছু জানেই না, সে জানে আমার রান্নাঘর থেকে চা এসেছে। দু'কাপ চায়ের জন্য কত টাকার তেল পুড়িয়ে, কত ঘুরে চা নিয়ে আসা হল। সরকারি অফিসে এই একই অবস্থা, বেশির ভাগ কর্মচারিরা বলে সরকারের কাছ থেকে তো সবাই মাইনে পাচ্ছে আমি কেন একা খেটে মরব। দ্বিতীয় হচ্ছে ভক্তরা বলে, সবই ভগবানের কাজ, তা ভগবানের অনেক লোক আছে, ভগবানের কাজ করার লোকের অভাব হবে না। বাড়িতে যদি তিন মহিলা থাকে তাহলে সে বাড়িতে কোন কাজ হয় না, তিনজনই বলবে আমি কেন করব, ওরাও তো আছে।

কিন্তু এখানে এই কথাগুলো কাকে বলা হচ্ছে? তুমি যদি মহৎ হতে চাও, তাহলে তোমার কখনই এই ধরণের মনোভাব থাকা উচিৎ হবে না। তোমার কাছে যে কাজটা এসে গেছে, বা যে কাজটা তুমি করবে বলে ঠিক করেছ, তখন সেই কাজে এটা ঈশ্বরের কাজ এই ভাব আনতে হবে, কাজের কর্তা আমি, আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই কাজটাকে দায়সারা ভাবে না; ভালো ভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিবিহীন ভাবে করতে হবে। যখন জপধ্যান করছি তখনও ঠিক এই একই ভাবে করতে হবে। জপধ্যানটাও ঠাকুরের কাজ, তাই আমাকে জো সো করে জপধ্যান করতে হবে। এক ভক্ত প্রায়ই মঠে আসতেন। অনেক দিন মঠে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এক মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই ভক্তটিকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কি হল, অনেক দিন মঠে আসছেন না'। ভক্তটি বলছে, 'তিনি ডাকলেই যাব'। তিনি ডাকলেই যাব বলা মানে? তার কিন্তু আর কর্তাবোধটাই নেই। গীতাতে স্পষ্ট করে বলছেন যে, তোমার কর্তবোধ থাকতে হবে, কিন্তু কি কর্তাবোধ? আমি ঈশ্বরের দাস। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন –আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়। আমি ঈশ্বরের দাস এই ভাবটাকে ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারলে তবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। ঈশ্বরের দাস এই ভাবের মধ্যে কাজের মধ্যে আমি কর্তা এই ভাবটাই লুকিয়ে আছে।

যশোদা বলছেন, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে কে দেখবে? এই দুটো জিনিস খুব তাৎপর্যপূর্ণ – আমি ঈশ্বরের দাস আর দ্বিতীয় আমি কর্তা। কাজ করার সময় আমার বোধ থাকবে আমি কর্তা, কাজ করব প্রভুর মত, ক্রীতদাসের মত কাজ করতে বলা হচ্ছে না। আগেকার দিনে বড় বড় জমিদারদের কিছু গোলাম থাকত, গোলামদের যা যা আদেশ করা হত, কারুর গলা কেটে দিতে হবে, কাউকে

গুম্ করে দিতে হবে, নির্বিশেষ চিত্তে গোলামরা সেই কাজ হাসিল করে দিত, গোলাম জানে আমি এই কাজ না করলে জমিদারের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। সেইজন্য কবিরের ভজনে বলছে – প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।

বাড়িতে খুব গণমান্য কোন অতিথি এসেছেন, বাড়ির মেয়ে চা বানাতে গেছে, মা দৌড়ে এসে বলছে – তুই সরে যা, গোলমাল করে দিবি, আমাকে বানাতে দে। মায়ের এই যে আমি কর্তা এই বোধটার কথাই ভগবান বলছেন, তার সাথে আর-একটা বোধ এটা ঠাকুরের কাজ, এই দুটো বোধ যদি যুগপৎ না থাকে তাহলে কিন্তু কর্ম বন্ধন হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি* সব কাজ তাঁরই, *সংন্যস্য অধ্যাত্ম-চেতসঃ*, মনে প্রাণে সচেতন ভাবে তুমি সব কর্ম আমাকেই সমর্পণ করে শোক মোহ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর। যুদ্ধটা আমার জন্যই করছ, যুদ্ধের যা ভালো মন্দ হবে সব আমারই হবে এই ভেবে তুমি শোক মোহ শূন্য হয়ে কাজে নেমে পর। যখন তুমি বুঝে নেবে যে এটা ঈশ্বরের কাজ তখন তুমি কাজটাকে ত্রুটিমুক্ত ভাবে করার জন্য কত সজাগ হয়ে যাবে। অথচ আমরা একটা সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল থেকে ভয়ে কত সতর্ক থাকি, অথচ ঈশ্বরের মত এত বড় একজন বস্ সর্বক্ষণ আমাদের মাথার উপর বসে আছেন তাঁকে কোন ভয়ই পাইনা।

এখনও হয় কিনা জানা নেই, কিন্তু আগেকার দিনে যে কোন সরকারী দপ্তরে যাঁরা খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন, তাঁরা নিজেকে মনে করতেন এই কাজের আমিই কর্তা, কিন্তু জানেন আমি সরকারের জন্য এই কাজ করছি, আমিই সেই ভারত সরকার। এখনও এই অনুভূতিটা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আছে কিনা জানা নেই। এরপর ভগবান খুব সুন্দর কথা বলছেন –

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ।।৩১।।

*(যাঁরা নিষ্কাম কর্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার এই মত সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাও ধর্ম ও অধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন।)*

যে এই ভাব নিয়ে কাজ করে আর জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ এত কিছু নাও করে, শুধু আমার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে, কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান, শুধু কৃষ্ণ না, যিনি শ্রীরামের ভক্ত তাঁর জন্যও তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের জন্যও তাই, ভগবান বুদ্ধের ভক্তের জন্যও তাই, তাঁর কথার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। তার সাথে বলছেন *অনসূয়ন্তঃ*, সংস্কৃতের '*অনসূয়ন্তঃ*' শব্দের ব্যাখ্যা আচার্য এইভাবে করছেন – যে গুণগুলো থাকে সেটার প্রতি দোষদৃষ্টি না থাকা। আমাদের সমস্যা হল, যাদের মধ্যে গুণ থাকে, তাদের মধ্যেও দোষ দেখি, এই দোষদৃষ্টি ত্যাগ করতে হয়। কেউ হয়ত ভাল গান করে, তাকে বলবে, গান করে ঠিকই কিন্তু ভাল জায়গায় তালিম পায়নি, একটা না একটা দোষ বার করবেই। গুণে দোষ দেখা আমাদের স্বভাব। ভগবান বলছেন, যাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁরা আমার মধ্যে দোষ দেখেন না। শ্রদ্ধার সাথে তাঁরা আমার এই মতকে মানে এবং এই পথে চলার জন্য নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে যান, এনারাও মুক্তি পেয়ে যান। যারা আমার মতকে মানে না, এবার ভগবান তাদের কথা বলছেন –

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২।।

*(কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ আমার এই বাক্যের নিন্দা করে এব তা পালন করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-মূঢ় ও পরমার্থভ্রষ্ট বলে জানবে।)*

যাদের মধ্যে নিন্দার ভাব আছে, এই মতের বিপরীত ভাবে আছে, *নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্*, তারা ঈশ্বরীয় কথা পালন করে না, ধর্মটর্ম সব ফালতু বলে উড়িয়ে দেবে। *সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্*, এরাই

আসল জ্ঞানরহিত; *বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ*, এদের বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে। শুভ বুদ্ধি ধর্ম থেকেই উদয় হয়, বই পড়ে শুভ বুদ্ধি হয় না, শুধু বিচার করে শুভ বুদ্ধি আসবে না, লোভ মোহের মধ্যে পড়ে থাকলে শুভ বুদ্ধি কখনই হবে না। অবিবেকীরা এভাবেই নাশপ্রাপ্ত হয়।

মূল বক্তব্য, অর্জুন তুমি কাজ কর, আর অপরের জন্য আদর্শ পুরুষ হও, তোমাকে দেখে যেন সবাই শিখতে পারে, উৎসাহ পায়। দ্বিতীয়, কিভাবে কাজ করবে? জ্ঞানমার্গে যদি কর্মযোগ কর, তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে, প্রকৃতিই সব কিছু করে, তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়দের বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে, তুমি ওর মধ্যে নিজেকে জড়াতে যেও না, সব সময় অনাসক্ত থাক। আর ভক্তি ভাবে যদি কর্মযোগ করতে চাও, তাহলে কাজ তুমি করবে, কিন্তু কর্মের সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দেবে, প্রভু তোমার চরণে সব অর্পণ করে দিলাম। এরপর যদি বাজে ফল হয়, তাতে তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই, আর ফল ভাল হলে উৎফুল্ল হওয়ারও কিছু নেই, কারণ কর্মের সব ফল তো তুমি আগেই আমাকে অর্পণ করে দিয়েছ।

তেত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত পাপ কি, মানুষ পাপ কেন করে, পাপ থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায়, এই প্রশ্নগুলিকে নিয়ে ভগবান আলোচনা করতে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ পাপকে খুব ভয় করে, বিশেষ করে অন্যান্য ধর্ম থেকে পাপের ভাবনা আমাদের মধ্যে এত বেশি ঢুকে গেছে যে, সব সময় আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি। ধর্মকে যদি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে একটা ধর্মের জন্ম ভারতে আর অন্য ধর্মটির জন্ম আরব, ইরান, ইজরাইল মিলিয়ে যে পশ্চিম এশিয়া, সেখানে। পশ্চিম এশিয়ার ধর্মগুলি হল, জহুদি, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও পার্সি। এই ধর্মগুলিতে, বিশেষ করে জহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম, এই তিনটি ধর্মে পাপ আর পূণ্যকে পরিষ্কার একটা লাইন দিয়ে টেনে দেওয়া হয়েছে। সব কটা ধর্মের মূল হল জহুদি ধর্ম, জহুদি ধর্মকে আধার করেই বাকি দুটি ধর্ম বেরিয়েছে। জহুদি ধর্মের মূল হল, ঈশ্বরের যে আদেশ, সেই আদেশকে যদি পালন না করা হয়, তাদের কাছে এটাই পাপ। আদম আর ঈভ স্বর্গে ছিলেন, ভগবান বলে দিয়েছিলেন, তোমরা এই আপেল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে না। কিন্তু তাঁরা ভগবানের আদেশ উল্লঙ্ঘন করে ফল ভক্ষণ করলেন, সেইজন্য তাঁদের স্বর্গ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যেতে হল।

সেখান থেকে পরে পরে ওনাদের যে ভগবান জেহোবা, জহুদিদের যত ধর্মগুরু আছেন, তাঁদের সাথে ভগবান জেহোবার একটা চুক্তি হল, যেটাকে ওনারা covenant বলেন; ভগবান বলে দিলেন, তুমি যদি আমার এই কথা মান, তাহলে তোমাকেও আমি এই রকম করে দেব। কথা দিয়ে কথা না রাখা, এটা একটা দোষ। জহুদিদের কাছে এটাই হয়ে গেল, তোমার পূর্বপুরুষরা ভগবানকে কথা দিয়েছিলেন, সেইজন্য এটা যদি না মান, এটাই পাপ। সেখান থেকে পরে এলো খ্রীশ্চান ধর্ম, ওনারা নিয়ে এলেন original sin, আদম আর ঈভ যে পাপ করেছিলেন, এটাই original sin, আর সবাই হল born sinner, জন্ম থেকেই সবাই পাপী। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যীশু এগুলোকে নিয়ে কোথাও কোন কথা বলেননি। নিউ টেস্টামেন্টের কোথাও যীশু এগুলোর উপর একটুও জোর দিচ্ছেন না। পরে খ্রীশ্চান ফাদাররা এসে original sinএর উপর খুব জোর দিতে শুরু করেন। এমনকি মার্টিন লুথার, যিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রবর্তক, আমাদের দৃষ্টিতে যিনি একজন ভাল সাধু ছিলেন, ভাল ক্যাথলিক ছিলেন; তিনিও চার্চগুলির দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দেখে চুপ থাকতে পারলেন না। এরপর তিনি ধর্মকে নিয়ে, পাপকে নিয়ে, মুক্তিকে নিয়ে, যীশু কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করেন, এসব নিয়ে বলতে শুরু করলেন। এটাই আস্তে আস্তে হয়ে গেল অন্য একটি ধর্ম। যুক্তি তর্ক দিয়ে যে একটা ধর্ম দাঁড়াতে পারে, চিন্তাই করা যায় না; তবে ভিত্তিটা মূল বাইবেল ছিল বলে বেঁচে গেল।

ইসলামের ক্ষেত্রেও একই জিনিস, কোরানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেটাকে পালন না করাটাই পাপ। হিন্দুদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি, যে অর্থে বিদেশী ধর্মে পাপ জিনিসটাকে

দেখা হয়, হিন্দুরা ওই ভাবে পাপকে দেখেন না। কারণ আমি যেটাকে ঠিক মনে করি, আপনি সেটাকে ঠিক নাও মনে করতে পারেন; আমার যে জীবনধারা, সেটা আপনার জীবনধারা নয়। যেমন, আপনারা যাঁরা এখানে গীতার কথা শুনছেন, বেশির ভাগই গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন। আপনাদের কাছে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, এটা পাপের কিছু নয়। ধর্ম আগেই এর অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী তা করতে পারেন না। তার মানে সন্ন্যাসীর জন্য যেটা পাপ, আপনাদের জন্য সেটা পাপ নয়। আবার অনেক কিছু আছে, যেটা আপনার কাছে পাপ, সেটা সন্ন্যাসীর কাছে পাপ না। তাহলে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল?

মহাভারত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন মহাভারত বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে এসেছে –ধর্ম কি। ওনারা তখন বলবেন, *মহাজনো যেন গতাঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যেটা করে গেছেন সেটাই ধর্ম। তাহলে ধর্ম কি, পাপ কি, ঠিক কি, ভুল কি? যদি আমরা বলে দিতে পারি পাপ কি, তাহলে আমরা পাপ থেকে মুক্তির উপায়ও বার করতে পারব। পাপ বলতে আমরা মনে করি, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবাই তিনটে জিনিস করি, এখানে হিন্দুদের কথাই বলা হচ্ছে, আমরা অন্য ধর্মে যাচ্ছি না; মা-বাবা বড়রা আমাদের কি শিখিয়ে দিয়েছেন, সমাজের যাঁরা গুরুজন, যাঁরা আদর্শ পুরুষ তাঁরা কি শিখিয়েছেন, এটা হল প্রথম। দ্বিতীয়, যদিও বেশির ভাগ লোকই শাস্ত্র পড়ে না, তাতে কিছু আসে যায় না, আপনি যে শাস্ত্র পড়েন, আমরা ধরেই নিচ্ছি এই কথাগুলো হল তাঁদের জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতা সম্পন্ন, যাঁরা ধর্ম পথে আছেন; যে শাস্ত্র আপনি পড়লেন বা পড়ছেন, সেখান থেকেও শাস্ত্রের কিছু কিছু জিনিস আপনার বোধগম্য হল।

শেষে গুরুর কাছে গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, মন্ত্র দীক্ষা নিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, এনারা important না, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাই এখানে গুরু। এখানে যে 'গুরু মহারাজজী' বলা হয়, ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা দিচ্ছেন, এনারা হলেন সেই মুখ, যেখান থেকে মন্ত্রটা বেরিয়ে এল। এই যে ঠাকুরের ভাবধারা, বা যেখান থেকে, যে কোন সম্প্রদায় থেকেই আপনি দীক্ষা নিয়ে থাকুন না কেন, তাঁদের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও তাঁদের নিজস্ব অনুশীলনের উপর কিছু কথা থাকে, সেগুলোকে নিষ্ঠার সাথে পালন করা, এটাই হল তৃতীয়।

এবার এই তিনটেকে মেলাতে হবে। কাদের সাথে বা কিসের সাথে মেলাতে হবে? সমাজের যাঁরা আদর্শ পুরুষ, মা-বাবা বা বড়দের কাছে থেকে ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মনের মধ্যে যে ভাব তৈরী হয়েছে এবং শেষে, আমরা যেখান থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং যেটা আমরা পালন করছি; এই তিনটেকে মিলিয়ে মানুষ নিজের মত একটা ভাব তৈরী করে নেয়।

এই জায়গাতে এসে হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়। একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ভাই, এটা করা কি পাপ? সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেবে, আমরা কোরানে বলা আছে এটা পাপ, তাই এটা পাপ। যদি তার কোন সংশয় হয়, তখন দেওবান্দাদির মত যেসব জায়গা আছে, সেখানে তার সংশয়ের ব্যাপারে জানাবে, আমার এই সমস্যা হয়েছে, বলুন কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না? ওনারা তখন কোরান, হাদিস এবং ওদের অন্যান যা যা ধর্মগ্রন্থ আছে, সেগুলোকে দেখে একটা বিচার দিয়ে দেবেন, এই সমস্যার ক্ষেত্রে এই এই বিচার। তখন বলবে, এই যে বিচার হল, এসব ক্ষেত্রে তোমার এই এই রকমটি করা ঠিক, আর এর বিপরীত করাটা পাপ।

হিন্দুদের এভাবে কোন কিছু ঠিক করা হয় না। আর হিন্দুদের তো একটা শাস্ত্র নেই, অনেক শাস্ত্র আছে। যেমন যাঁরা তন্ত্র মতে চলেন, তাঁরা আমিষ আহার করেন, শক্তি মতে যাঁরা চলেন তাঁরা

মাংস খান। পঞ্চ মকার সাধনে তাঁরা মদ মাংস সবই খান। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা এগুলোর কোনটাই খান না। মূল হল, আমার যিনি গুরুজন, আমি যে শাস্ত্রকে পালন করি, আমি যাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, এই তিনজনকে মিলিয়ে আমার মনে নিজের মত একটা ভাব তৈরী হয়ে যায়। আমি জানি আমার জন্য কোনটা ঠিক, আমি জানি আমার জন্য কোনটা ভুল। কদাচিৎ কখন সন্দেহ হয়, এটা কি ঠিক, এটা কি ভুল, তখন যাঁরা আমার পরিচিত গুরুজন তাঁদের আমি জিজ্ঞেস করি। যেমনি আমি উত্তর পেয়ে গেলাম, আমার যে বুদ্ধি, সে বিচার করবে, বিচার করে নিজের মত একটা আইডিয়া করে নেবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগত ভাবে এটা শুনে অনেকের হয়ত ভাল নাও লাগতে পারে। ঠাকুর বলছেন সত্য কলির তপস্যা, তাই ঠাকুরের ভক্তকে সত্য কথা বলতে হয় বা সত্যের অনুশীলন করতে হয়। আবার ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছেন, যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন, কারুর ভাল করার জন্য আরামসে মিথ্যা কথা বলে দেওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা, এই মিথ্যা কথা বলাতে নিজের কোন স্বার্থ না থাকলেই হল। অনেকে হয়ত মনে করতে পারে, যেহেতু উনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, সেইহেতু তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। ঠিকই তিনিও মনে করছেন, আমি আধ্যাত্মিক পুরুষ নই, কিন্তু আমি এই রকমই। এখানে আইডিয়াটা কি? আইডিয়াটা হল, যে আইডিয়াটা আপনি ভিতরে তৈরী করে নিয়েছেন, আপনার মধ্যে যে ভাব তৈরী হয়ে গেছে, যেখানে গিয়ে আপনার বাবা-মার দেওয়া ট্রেনিং, গুরুজনদের কথাগুলো, তার সাথে শাস্ত্র, যেটাকে আপনি অনুসরণ করেন এবং যাঁকে আপনি গুরুর আসনে বসিয়েছেন, তিনি দীক্ষা গুরু হন, শিক্ষা গুরু হন, তাঁদের কথাগুলো, এই সব কিছুকে মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা ভাব তৈরী হয়, এটাই হল আপনার আমার জন্য standard। এই standarকে যখন কেউ অতিক্রম করে তখন সেটা পাপ হয়। আশা করা যায় এই জিনিসটাকে আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি।

হিন্দু মতে পাপ কি? আমার মনে যে ভাব, যেমনি ওই ভাবকে কেউ অতিক্রম করবে, ওটাই পাপ। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ। আপনি বলতে পারেন, কেন, যে খুনী, খুন করতে তার মন তো খুঁত খুঁত করে না। ঠিক বলছেন, তার কাছে ওটা কোন পাপ না। কিন্তু এখন সে যেটা করছে, তার একটা ফল সে পাবে, আজ পাক কিংবা কাল পাক। দেখা যায়, যারা নামকরা ক্রিমিনাল, তারা অনেক সময় খুব কষ্ট পায়। আমরা এক জন্মের থিয়োরিকে মানি না, আমরা জন্মজন্মান্তর কে মানি। নামতে নামতে এতটাই অধঃপতন তার হয় যে, যখন সে বলে, নাঃ, আমি আর এই কাজ করব না। তখন তার সৎ পথে আসা শুরু হয়। সৎ পথে যখন আসা শুরু হয়, তখন তার ওই ভাবটাও ধীরে ধীরে আসতে শুরু হয়, যেখান থেকে সে পতন হয়ে হয়ে কোথায় পড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর বলছেন, কেল্লায় যেতে যেতে কত নীচে চলে এসেছেন, বোঝাই গেল না কত নীচে চলে গেছেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন, একটা সিঁড়িতে যদি বল ফেলে দেওয়া হয়, বলটা ড্রপ খেতে খেতে কোথায় যে নেমে চলে যায় বুঝতেই পারে না, নীচে পড়তেই থাকে। যে ডুবতে থাকে সে বুঝতে পারে না, কতটা ডুবে গেলাম।

কিন্তু আমরা এখানে এদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি না, আমাদের আলোচনা হল, যাঁরা ধর্ম পথে আছেন তাঁদের কথা। আপনার মনে একটা ভাব আছে, ওই ভাবটা পাল্টাতে থাকে। আপনি পাঁচ বছর আগে যে রকম ছিলেন, আজকে আপনি তা নন। এমনকি আপনি যেদিন থেকে গীতা শুনতে শুরু করলেন, তখন যেমন ছিলেন, আজ আপনি সেই রকম নন। যীশু বাইবেলে খুব সুন্দর বলছেন, It is better to marry than to burn, যীশু চাইতেন না তাঁর শিষ্যরা বিয়ে করুক। কিন্তু তার সাথে উনি বলে দিচ্ছেন, বিয়ে করে নাও বাবা, কামের জ্বালায় ভিতরে পুড়তে থেক না। উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া, অন্য কিছু না। এই ভাবটা আপনার মনে তৈরী হয়ে গেলে, এই ভাবটাই আপনাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। যেমনি কোন পরিস্থিতির কারণে এই

ভাবের সাথে যদি আপনাকে আপোষ করতে হয়, তখনই মন খুঁত খুঁত করতে থাকবে। মন একবার খুঁত খুঁত করতে শুরু করলে মন আপনাকে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না, এটাই পাপ।

কিন্তু এই যে আমরা মাঝে মাঝে আমার ভাব যেটা, সেটাকে অতিক্রম করে ফেলি, এটা কেন হয়? এই লক্ষণরেখাকে যাতে আমরা অতিক্রম না করি, তার জন্য আমরা কি কি করতে পারি? এবার তেত্রিশ চৌত্রিশ থেকে শেষ পর্যন্ত ভগবান এই জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করবেন। আমরা জানি কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কিন্তু ডাকাত যেমন সব ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি কোন একটা অদৃশ্য শক্তি এসে আমাদের মনকে টেনে ভুল পথে নিয়ে চলে যায়। পাপ কি? পাপ হল নিজের পথকে ছেড়ে দেওয়া? তাহলে কি আমরা নরকে যাব?

হিন্দুরা নরক বলে কিছু আছে কিনা জানেই না। প্রথমে মুসলিমরা এবং পরে খ্রীশ্চানরা আসার পর তাদের কাছ থেকে শিখে আমরা নরকের একটা ধারণা তৈরী করে নিয়েছি। বিধর্মীরা তো আমাদের পাতাল লোককে নরকের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা জানিই না নরক কি। আমাদের কাছে পাপ জিনিসটা হল অনেকটা এই রকম –হাওড়া স্টেশনে কিছু ট্রেন আছে যেগুলো পুরীর দিকে যায়, আবার কিছু ট্রেন আছে দিল্লীর দিকে যায়, কিছু ট্রেন আছে যেগুলো উত্তর ভারত, আসামের দিকে যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে জামসেদপুর যে ট্রেন যায়, সেটা ইস্টার্ন রেলওয়েজের প্ল্যাটফরম থেকেই ছাড়ে, তার পাশেই আবার দিল্লীর ট্রেন ছাড়ছে, তার পাশেই আবার আসামের ট্রেন ছাড়ছে। পাশাপাশি তিনটে প্ল্যাটফরমে তিনটে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, একটা আমাদের দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে, একটা পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে, একটা উত্তর দিকে নিয়ে যাবে। পাপ মানে কি? আমি যেতে চাইছিলাম পুরী, কিন্তু আমার মনে হল এই ট্রেনটা দেখতে খুব সুন্দর, আমি চেপে বসলাম।

আমার নিজেরই একবার এই জিনিস হয়েছিল, তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, বয়স অল্প, মাঝে মাঝে বিচিত্র জিনিস করে ফেলতাম। রাঁচি থেকে নিজের জায়গা দেওঘর আসছি। আমি জানি কোন বাস দেওঘর যাবে, তখনকার দিনের রাজ্য পরিবহনের লড়ঝড়ে বাস। দেখলাম একটা খুব ভাল লাক্সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আবার অন্য রুট দিয়ে যাবে। ভাল বাস দেখে উঠে পড়লাম, আরাম করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাব। দেওঘর পৌঁছাতে যেখানে আমার আট ঘন্টা লাগার কথা, সেখানে লাগল ষোল ঘন্টা। অনেক রাস্থা ঘুরে ঘুরে পৌঁছাল। তারপর আমি কান ধরলাম, আর না। এগুলোই হল রাস্থা পাল্টে নেওয়া। একটা ভাল কিছু দেখলাম উঠে পড়লাম, তারপর দেখছি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে, ফিরে আসতে আবার সময় লাগবে। মাঝখান থেকে যন্ত্রণা, আট ঘন্টার জায়গায় ষোল ঘন্টা, খাওয়া নেই দাওয়া নেই। পাপ মানে এটাই। আমি জানি এটা ঠিক, আমি যে এটা করতে চাইনা, তাও না; কিন্তু কি এমন একটা হয়ে যায়, টেনে অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়। আমি এমনটা করতে চাইছি না, কিন্তু মন টেনে সেই কাজটাই করতে ঠেলে দেবে। অনেক ইয়ং ছেলে তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে, এসে বলবে আমি ওর দিকে মন দিতে চাই না, কিন্তু কি করব আমি পেরে উঠছি না। এটাকেই ভগবান তেত্রিশ নম্বর শ্লোক দিয়ে বলয়র শুরু করছেন –

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩।।

*(জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন, অজ্ঞের কি কথা? প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; [এজন্যই মদুপদিষ্ট স্বধর্মাচরণ করতে পারে না] সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কি ফল হবে?)*

মানুষ নিজের প্রকৃতির মত সব কিছু করতে থাকে। প্রকৃতি কি? স্বীয় প্রকৃতিকে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর পরিভাষিত করছেন, *পূর্বকৃৎধর্মাধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ*। আমাদের হিন্দুদের আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কিছু ঘটনা আমাদের সত্যিই খুব আশ্চর্যের মনে হয়।

তার মধ্যে একটা হল, আচার্য শঙ্করের জীবন, যিনি তাঁর ষোল বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত ভাষ্য লিখে দিয়েছিলেন। এটা আমাদের কাছে অসম্ভব লাগে। ষোল বছর বয়সে জগৎ ও আধ্যাত্মিকতার এত পরিপক্কতা কি কারুর হতে পারে? ষোল বছর না হোক যদি তিরিশ বছরও ধরে নেওয়া হয়, কারণ এটা সবাই মানছে যে বত্রিশ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, সেখানে তিরিশ বছরকেও যদি মানা হয়, তাহলেও এই তিরিশ বছর বয়সে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা কি করে সম্ভব? এক হয় ঈশ্বর যদি নিজে এসে থাকেন, কিংবা ঈশ্বর নিজে যদি বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন, তবেই মানুষ এই বয়সে বৌদ্ধিকতায় ও জ্ঞানে এত বিচক্ষণ ও পরিপক্কতা লাভ করতে পারেন।

কি বলছেন আচার্য? *পূর্বকৃৎ*, আগের আগের জন্মে আপনি যে ধর্ম-অধর্মাদি পালন করেছেন; ধর্ম হল গুরুর কথা শুনে সেই অনুসারে এগিয়ে যাওয়া, অধর্ম হল সেই অনুসারে না করা; জগতে কোন মানুষ নেই যে ধর্ম পালন করে না, আর কোন মানুষ হয় না, যে অধর্ম পালন করে না। আজকে আমরা ঠাকুরকে বলছি অবতার, আমরা মানছি তিনি অবতার, আমরা এও মানছি, তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। কিন্তু ঠাকুরের ছোটবেলার দুষ্টুমির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, ওই দুষ্টুমিকে আমরা অধর্ম বলছি না, কারণ তখন তাঁর বয়স কম ছিল, কিন্তু এ-রকম অনেকেই অনেক কিছু করে থাকেন। এই ধর্ম ও অধর্ম মিলিয়ে মানুষের পুরো একটা সংস্কার তৈরী হয়। বলছেন, আগের আগের জন্মে আপনি যে ধর্ম ও অধর্মাদি পালন করে আপনার যে সংস্কারের পুঁটলিটা তৈরী হয়েছে, বর্তমান জন্মে এসে ওই সংস্কারের পুঁটলিটা অভিব্যক্ত হয়। আমার আগের আগের জন্মের ধর্ম ও অধর্ম কৃত সংস্কারের সবটাই কি এই জন্মে অভিব্যক্ত হচ্ছে? তা কখনই হয় না। আমার পিঠে একটা বড় বোচকা চাপানো আছে, যেটা চোখে দেখা যায় না।

এই শরীর একটা এটিএম কার্ড আর আমার যে সংস্কার বা প্রকৃতি, এটা হল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। এটিএম কার্ড লাগালে যেমনটি ব্যালেন্স আছে তেমনটিই বেরিয়ে আসবে। আবার অন্য দিকে আমি টাকা জমাচ্ছি, টাকা তুলছি, আবার জমা দিচ্ছি, সব জমছে। এটিএম লাগালে টাকা যদি থাকে টাকা বেরিয়ে আসবে। আমি চাইছি ভাল কাজ করতে, কিন্তু করতে পারছি না, ইচ্ছেই হচ্ছে না, কেন? কারণ ওই ব্যাপারে আগে এত বেশি অধর্ম করে রেখেছি, ধর্ম করতে চাইলেও আমি পারব না। আড় চোখে বদমাইশি করার দিকে তাকাবোই তাকাবো, উপায় থাকে না। এই ধর্ম আর অধর্ম, এটা প্লাস মাইনাস না, সমষ্টি রূপে একটা পোটলাতে জমিয়ে রাখা হয়েছে, যেটা এই জন্মে অভিব্যক্ত হচ্ছে। অনেক কিছু আছে, যেটা এই জন্মে অভিব্যক্ত হবে না। কারণ এত প্রচুর পরিমাণে মজুত হয়ে আছে যে, এক জন্মে সব অভিব্যক্ত হবার সুযোগই পাবে না। প্রচুর পরিমাণটা কি রকম?

জয়ললিতার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশী করতে এসে সাতশ জোড়া জুতা পেয়েছিল, তার মানে শাড়ি কত আছে ভগবান জানেন। কিন্তু বাড়ির বাইরে কোথাও যখন যান, একটা কি দুটো সুটকেশ নিয়ে যাবেন, সেটাতে করে সীমিত সংখ্যক শাড়ি জুতো নিয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে, তার স্টক শেষ হয়ে গেছে। এই শরীরটার কাজ হল সুটকেশটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। তার মানে সুটকেশটাই সব না, বাড়ির আলমারিতে বা গোডাউনে এখনও অনেক স্টক আছে। বাড়ি ফিরে আবার যখন নূতন যাত্রায় বেরোবে তখন সুটকেশে আরও নূতন ডিজাইনের, নূতন ফ্যাশানের শাড়ি ভরে বেরোবে। এটাকে বলে প্রকৃতি। সুটকেশের শাড়ি বা ড্রেসগুলিকে মনে রাখতে হবে, যেগুলো নিয়ে বেরিয়েছি, ওগুলোর মধ্যেই আমাকে ঘুর ঘুর করতে হবে। এরপর আবার নূতন জন্ম যখন আসবে, তখন নূতন প্রকৃতি আসবে। এই প্রকৃতিই আমাদের জ্বালিয়ে যাচ্ছে। আপনার অনেক কিছু থাকতে পারবে, কিন্তু ওটা অভিব্যক্ত হবে না; কর্ম মানে এটাই। কিছু কর্ম এই জন্মে বেরিয়ে যাবে, কিছু কর্ম আগামী জন্মে বেরোবে, কিছু কর্ম আছে যেগুলো গত জন্মে বেরিয়ে গেছে। আমি যদি চাই আমার এই জিনিসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করব, তাতেও আমি পারব না। কারণ আমার সুটকেশে ঐটাই আছে, ঐটাই আমাকে এই জন্মে বার করে নিয়ে এসেছে। এখানে জিনিসটাকে বোঝার আছে।

হিন্দু মতে স্বর্গ, পুনর্জন্ম, মুক্তির জ্ঞান আসে ঋষিদের কথা থেকে। ঋষি হলেন, যাঁর মন পবিত্র, যিনি ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেন, সেই সত্যগুলিকেই তিনি আমাদের দিয়ে যান। ঋষিদের এই সত্যগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন করার উপায় নেই, আর করতেও নেই। কারণ আমরা যদি প্রশ্ন করতে শুরু করি, তাহলে আমাদের পায়ের তলায় দাঁড়াবার কোন মাটি থাকবে না। আমরা নিউটনের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, ডারউইনের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, কার্ল মার্ক্সের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ঋষিদের কথাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্যদের মনে তাও কিছু লোভ ছিল, কিছু প্রত্যাশা ছিল। ঋষিদের মনে লোভ দূরে থাক, কোন প্রত্যাশাই ছিল না।

আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ, আজকের বিশ্বের ইতিহাসে বড় বড় বিখ্যাত যত ব্যক্তিদের নাম আমরা জানি, প্রত্যেকটি ব্যক্তি হলেন খুনী। আলেকজাণ্ডার একজন খুনী, জুলিয়াস সিজার একজন খুনী, চেঙ্গিস খাঁ একজন খুনী, স্ট্যালিন একজন খুনী, মাও একজন খুনী, এরাই হলেন জনসাধারণদের লীডার। এদের কথা শুনে এদের দেশ ও সমাজ লাফালাফি করছে। চেঙ্গিস খাঁ নিজের দেশে একজন আদর্শ পুরুষ। আর যাঁরা ঋষি, যাঁরা সবারই জীবনে শান্তি দিয়ে গেছেন, তাঁদেরকে মানব না?

চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডকে জয় এনে দিয়েছিলেন, একটা গৌরবের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত ব্যক্তির স্থান দিয়েছিল। সেই চার্চিল গান্ধীজীকে বলতেন naked Fakir, কোন দিন গান্ধীজীর সাথে দেখাই করলেন না। সেই বৃটেন সরকার আজ গান্ধীজীর নামে মুদ্রা বার করতে যাচ্ছে। কারণ গান্ধীজী ছিলেন শান্তির দূত, সর্বজনস্বীকৃত। আমরা কেন এই ঋষিদের কথা শুনব না! ঋষিদের কথা যে শুনতে চাইবে না, ধর্ম তার জন্য নয়।

কেউ যদি ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়, তবে তাকে নিউটন, আইনস্টাইনকে মেনে তারপর তাকে ফিজিক্সে এগোতে হবে। যে কোন বিষয়কে নিয়ে যদি কেউ পড়াশোনা করতে চায়, তাহলে সেই বিষয়ের যাঁরা ফাউণ্ডারস বা অথরিটি, সেই বিষয়ের যাঁরা বড় বড় পণ্ডিত, তাঁদেরকে আগে পড়তে হবে। পরে যখন সেও একজন বড় পণ্ডিত হয়ে যাবে, তখন সে বলতে পারবে যে, এই জায়গাতে আমি মানতে পারছি না, বদলে তখন সে একটা নূতন থিয়োরী নিয়ে আসবে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য, ঋষিরা যা যা বলে গেছেন, সবাইকে সেটা মানতে হবে। আপনিও যেদিন একজন মহাপুরুষ হয়ে যাবেন; যেমন ঠাকুর, তিনি প্রথম শুরু করছেন আমাদের সেই প্রচলিত মতকে অবলম্বন করেই, এরপর তিনি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে জয় করে নিলেন, তখন তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের আরও অনেক কিছু জিনিস দিলেন, আপনিও তখন দেবেন। প্রথমেই যদি কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, ধর্ম পথ তার জন্য নয়। ধর্ম পথে আগে গুরুর পাদপদ্মে মাথা নত করতে হয়। বাইবেলে যীশু একা বলে গেছেন, কোরানে মহম্মদ আল্লার কথা একাই বলে গেছেন। কিন্তু এখানে বিভিন্ন ঋষিরা একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলে গেছেন। শুধু পতঞ্জলি যোগ দর্শনেই না, বেদান্তেও সেই একই কথা, অন্যান্য দর্শনেও সেই একই কথা ঋষিরা বলছেন। কি সেই কথা?

সৃষ্টিতে যবে থেকে আপনি এসেছেন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত যা ভাল-মন্দ করেছেন, সবটারই সংস্কার আপনার কাঁধে পুটলি করে চাপিয়ে দেওয়া আছে। এক-একটা জীবন যখন আসে, তখন কিছু সংস্কার যেটা সেই দেহের উপযোগী এবং সমাজের জন্য যেটা উপযোগী, সেই সংস্কারগুলিই বেরোবে। আপনার ভিতর যে হিংস্র ভাব, সেটা এই দেহে বেরোবে না। কিন্তু কদাচিৎ যদি আপনি সিংহ দেহ নিয়ে জন্মান, তখন আপনার জমে থাকা হিংস্র ভাবটা বেরিয়ে আসবে।

অনেক সময় দেখা যায়, যে পরিবারে, যে সমাজে আমি আছি, সেখানে আমার কিছুই ভাল লাগে না। কারণ আমার যে সংস্কারগুলো জমে আছে সেটা সেখানে খাপ খাচ্ছে না বলে বেরোতে পারছে না। এতে অনেক মানসিক সমস্যা তৈরী হয়। তখন কায়দা করে তার মনের ইচ্ছাটা বার করতে হয়ে, তোমার কি ভাল লাগে, বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী তার আচরণ করার সুযোগ করে দিতে হয়। কারণ আমরা তো পরিস্থিতিকে পাল্টাতে পারব না, কিন্তু তার ভিতরের শুভ সংস্কার যা আছে, সেটাকে বার করার ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, তোমার প্রকৃতিই এই রকম, তুমি চাইলেও এর অন্যথা কিছু করতে পারবে না। শেষে অষ্টম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান আবার এই কথাই বলবেন, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তুমি যে বলছ তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নেবে, তুমি যে বলছ ব্রাহ্মণদের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে, এখন হয়ত তুমি সাময়িক উত্তেজনায় এই পথে যাবে, কিন্তু দুদিন পরেই তুমি তোমার স্বভাবে আবার ফিরে আসবে। কারণ তোমার প্রকৃতিতেই আছে যুদ্ধ করা। বেড়াল বলে মাছ খাব না কাশী যাব। কিছু দূর গিয়ে যখন খিদে পাবে তখন সে কি খাবে, ওই মাছের দিকেই তাকে যেতে হবে। প্রকৃতি কখন পাল্টায় না।

প্রকৃতি যদি নাই পাল্টায় তাহলে আমরা সবাই ভাল কি করে হব? তাহলে আমি কি চক্রের মধ্যে বাঁধা হয়ে পড়ে থাকব? নাগরদোলায় যেমন ঘুরতেই থাকে, এভাবেও কি আমাদের সবাইকে ঘুরতে হবে? আমি নাগরদোলা থেকে নামতে চাইছি, কিন্তু ঘুরেই যাচ্ছে। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। আমি বেরোতে চাইলেও এর থেকে বেরোতে পারব না। সেই সুখ-দুঃখ আমাকে নাচাতে থাকবে, শুভ-অশুভ আমাকে দিয়ে কাজ করাতে থাকবে, বেরিয়ে আসতে পারব না। আর এই প্রকৃতি, যেটা আমাকে বেঁধে দিয়েছে, এই প্রকৃতি আমারই সৃষ্টি করা। ভগবান কিছু দেন না, কেউ কিছু দেয় না। কথা কথায় আমরা বলি, তুমি আমার জীবনটা সর্বনাশ করে দিয়েছ, কেউ কারুর সর্বনাশ করে না। মেয়েরা বিয়ের পর বলে, এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা বিফলে গেল। একজন আবার মজা করে বলছেন, তোমাকে বিয়ে করার থেকে ভাল হত, যদি একটা রাক্ষসকে আমি বিয়ে করতাম। স্বামীও খুব রসিক লোক, সে তার প্রত্যুত্তরে বলছে, আপনজনের মধ্যে কি বিয়ে হয় গা? আমি মনে করছি এই লোকটা আমার শেষ করে দিয়েছে; কেউ শেষ করে না, নিজেই নিজেকে শেষ করে। জন্মজন্মান্তর ধরে যে ধর্ম-অধর্ম আমরা নিয়ে এসেছি, কিছুটা এই জন্ম থেকে এনেছি, এই প্রকৃতি আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। এই প্রকৃতি নাকে দড়ি দিয়ে আমাদের নাচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বাঁচব কি করে? গীতাই বলে দিচ্ছেন –

*প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি*, হে অর্জুন, তুমি চেষ্টা করলেও এই প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। ঠাকুরও বলছেন, জীব একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। তারপর আবার বলছনে, ইস্ক্রুপ মারা, যাতে খুলতেও না পারে। কোথায় বাঁধা? কামিনী-কাঞ্চনে? না, আমার প্রকৃতিতে, আমার স্বভাবে। তাহলে উপায় কি, বাঁচব কি করে? তখন বলছেন, উপায় আছে, এটা থেকে বাঁচা যায়। কি ভাবে –

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।

*(সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। কিছুতেই এদের বশীভূত হবে না। কারণ, এই দুটি জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল।)*

আমরা সবাই ইন্দ্রিয় দিয়েই সব কাজ করি, চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি; ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। খুব সাধারণ উদাহরণ, একজন

গান খুব ভালবাসেন। তিনি এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি বললেন, 'আমি আর গান করব না, আমি আমার পুরো মনটাকে ঈশ্বরের দিকে দেব'। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন গণিতজ্ঞ সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি গণিত ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। আরে ভাই, তাহলে তুমি সন্ন্যাসী হলে কেন? সন্ন্যাসী হয়েছ মানেই, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিছু ছেড়ে এখন বলবে, আমি ঠাকুরের পায়ে এলাম। তোমাকে যদি ওই লাইনেই বড় কিছু হতে হয়, তাহলে তুমি এখানে এলে কেন? যিনি গান খুব ভালবাসতেন, সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর কানে যদি কোন ভাল গান ভেসে আসে, ওনার মনটা স্বাভাবিক ভাবেই সেই গানের দিকে যাবে। কারণ তাঁর প্রকৃতিতেই রয়েছে গানের প্রতি আকর্ষণ, গানের দিকে মন যাবেই। গান একটা ধ্বণি, সেই ধ্বণি তাঁর যে ইন্দ্রিয় কর্ণ, সেখানে যখন স্পর্শ করবে, ভাল গান হলে সে তখন মনে মনে নিজেকেই বলবে, বাঃ খুব সুন্দর গান তো।

আমার চোখ দৃশ্য দেখতে ভালবাসে, সুন্দর চেহারা দেখতে ভালবাসে, যাকে ভালবাসি তার দিকে দৃষ্টি যাবেই। *ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে*, এই যে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের এক অপরের প্রতি আকর্ষণ, এর মাঝখানে বসে আছে সমস্ত সমস্যার মূল – রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে আসক্তি, একটা জিনিসকে ভাল লাগা; দ্বেষ মানে একটা জিনিসকে অপছন্দ করা। আমরা জন্মজন্মান্তর ধরে যে ধর্ম ও অধর্ম করে আসছি, এর ফল হল – কিছু জিনিস আমাদের ভাল লাগে, কিছু জিনিস আমাদের খারাপ লাগে। খারাপ জিনিস থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, আমার খারাপ লাগা জিনিস অন্যের হয়ত ভাল লাগে। যেমন অনেকের মদ্যপান করতে ভাল লাগে, অনেকে তো কল্পনাই করতে পারে না। অনেকের কাছে শুটকি মাছ খুবই উপাদেয় একটা খাদ্য, আবার অনেকের নাকে গন্ধ গেলেই বমি করতে শুরু করে দেবে। এক-একজনের এক-এক রকমের প্রবৃত্তি।

তাই বলে শুটকি মাছ যাদের খুব উপাদেয় তারা কি ভাল? একেবারেই না। শুটকি মাছের গন্ধে যাদের বমি আসে, তারা কি ভাল? একেবারেই না। তারা এক রকম, ওরা আর-এক রকম। সেখানে বসে আছে ভাল লাগা আর ভাল না লাগা। একটা ভাব তৈরী হয়ে যায়, এর উপর আগে আমরা আলোচনা করছিলাম। যেমন আমি ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, আমার এবার একটা ভাব তৈরী হয়ে গেল। সন্ন্যাস হওয়ার আগে কিছু জিনিস আমি আমার বাড়িতে শিক্ষা পেয়েছিলাম, সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর আরও কিছু শিখলাম, ঠাকুরের ভাবধারায় থেকে, সাধু সঙ্গ করে আরও কিছু শিখলাম। সব কিছু মিলিয়ে আমার একটা ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার যে বর্তমান জীবনযাত্রা চলছে, সেখানে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলো রয়েছে, আর আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে আছে রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিসের প্রতি প্রীতি, কিছু জিনিসের প্রতি অপ্রীতি। রাগ আর দ্বেষ, প্রীতি আর অপ্রীতি – এটা হয় কামের জন্য, যার আর-একটা নাম কামনা বা তৃষ্ণা।

যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন, আমি যে পথে যাচ্ছি, সেখানে এই পথে এই জিনিসটা করা যায় না। কিন্তু এটাও জানেন, আমি যে পথে যাচ্ছি, সেই পথে আমার প্রলোভন তৈরী করতে অনেক উপকরণ আসবে। তখন সেখানে কি করতে হয়? নিজের রাগ ও দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এই জিনিসটা বুঝতে আমাদের হয়ত অসুবিধা হচ্ছে। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অনেক আগেকার কথা, আমাদের এখানে একজন খুব জ্ঞানী মহারাজ ছিলেন। তিনি একটা বড় সেন্টারে বদলি হয়ে যাচ্ছেন, ওই মঠে প্রচুর মহিলা ভক্তরা আসে, আর খুব সম্ভ্রান্ত লোকেদের জায়গা। তখন যিনি যাচ্ছিলেন তাঁকে বলে দেওয়া হল, দেখ তুমি ওই সেন্টারে যাচ্ছ, ওখানে অনেক মেয়ে মহিলারা আসে। তারা দেখতে সুন্দরী, ওদের উপর তোমার যে চোখ পড়বে এটা বাইচান্স, কারণ এটা তোমার প্রকৃতি। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমি ফিরে দেখতে চাই, এটা হল তোমার কাম –এই

জায়গাটাকে আটকাতে হবে। চোখে পড়ে যাওয়াটা হতেই পারে, ভাল লাগল, হতেই পারে; কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখাটা হবে কাম থেকে। এটাকে কিভাবে আটকানো হয়? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরুর কথা শুনে এই জীবনে সেই শক্তিটাকে অর্জন করতে হয়।

যাঁরা স্বামীজীর জীবনী খুব ভাল ভাবে পড়েছেন, সেখানে স্বামীজী তাঁর জীবনের একটা ঘটনা মজা করে লিখেছেন। তিনি মজা করে লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, তবে আমরা ওটাকে সত্যি ভাবেই নিই। স্বামীজী প্যারিসে গেছেন। প্যারিসের রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মহিলাকে দেখলেন, মহিলা দেখতে এত সুন্দর যে, স্বামীজী নিজেই বলছেন, এত রূপসী মেয়ে আমি কোন দিন দেখিনি। স্বামীজীর মন এমন ট্রেনিং প্রাপ্ত যে, যতক্ষণে তিনি ভেবেছেন মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখটা একটা বানরের মুখে পাল্টে দিয়েছে। উনি যে ঘুরে দ্বিতীয়বার দেখবেন, মন সেই অনুমতিটা দিল না। স্বামীজী কলকাতায় বড় হয়েছেন, সৌন্দর্য বোধ আছে, সবই আছে। শেষে যখন দেখলেন একজন সত্যিকারের রূপসী, মন মেয়েটির রূপটাই পাল্টে দিয়েছে।

ভগবান এখানে বলতে চাইছেন, এই যে জগৎ, জগৎকে তুমি পাল্টে দিতে পারবে না। এই জগৎ পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, তুমি এটাকে পাল্টাতে পারবে না। তোমার ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি তত্ত্বকে দিয়ে তৈরী, এটাকেও তুমি পাল্টাতে পারবে না। পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই পাঁচটি তত্ত্বের দিকে দৌড়াবে, এটাকেও তুমি আটকাতে পারবে না। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এদের পরস্পরের যে ভালবাসা, এটাকেও তুমি আটকাতে পারবে না। আটকাতে পারবে তোমার রাগ আর দ্বেষকে। এর জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, খাটতে হবে, যদি তোমার ধর্ম পথে চলার আগ্রহ থাকে, এক উচ্চতর জীবনের প্রতি তোমার যদি আগ্রহ থাকে, তুমি যদি জীবনে মহৎ হতে চাও, তাহলে তোমাকে এই রাগ আর দ্বেষকে যেভাবেই হোক আটকাতে হবে। কারণ *তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ*, এই দুটো পরিপন্থি, এরা ডাকাত, তোমার সব কিছু ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগে, এখনও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায় যে, ট্রেনে হঠাৎ ডাকাত উঠে যাত্রীদের কাছ থেকে সব ছিনতাই করে নিয়েছে। রাজধানীর মত ট্রেনে ডাকাতি করা সম্ভব না। তারও অনেক আগে, লোকেরা পায়ে হেঁটে, ঘোড়া করে, রথে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাতায়ত করত। পথে ডাকাতরা তাদের সর্বস্ব ছিনতাই করে নিত। রাস্থা থেকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে চলে যাবে। এটাই এখানে বলছেন *পরিপন্থিনৌ*, তোমার পথ থেকে টেনে অন্য পথে নিয়ে যাবে। *তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ*, ধারে কাছে এই রাগ আর দ্বেষকে আসতে দিয়ো না। জগৎ তোমার হাতে নেই, ইন্দ্রিয় তোমার হাতে নেই, এদের স্বভাব হল এরা নিজের বিষয়ের দিকে যাবেই। কিন্তু শাস্ত্র যদি তুমি নিয়মিত শ্রবণ করে থাক, সাধু-মহাত্মাদের কথা যদি তুমি নিয়মিত পালন করে চলো, এতে তোমার মধ্যে একটা শক্তি তৈরী হবে, যে শক্তি দিয়ে তুমি এই রাগ আর দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আমরা ওই মহারাজের যে কথা বললাম, প্রথম বার চোখ পড়তেই পারে, তাকে তুমি প্রশংসা করতেই পার। দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা মানে, এবার তুমি বিপদে পড়ে গেলে।

একবার এক মহারাজ অন্য এক মহারাজের কাছে একটা সুন্দর পেন দেখেছেন। দেখে উনি বললেন, 'বাঃ পেনটা খুব সুন্দর তো'। সুন্দর বলাতে উনি মহারাজকে বললেন, 'তোমার পেনটা পছন্দ হয়েছে, ঠিক আছে তুমি নিয়ে যাও'। শুনে এই মহারাজ বলছেন, 'মহারাজ আমি ওই বয়স পেরিয়ে এসেছি যে, কোন জিনিস যদি ভাল লাগে সেটা আমাকে নিয়ে নিতে হবে'। আমাদের এই সমস্যা হয়, আমরা impersonally একটা বস্তুকে appreciate করতে পারি না। Appreciate করা মানেই এই নয় যে, ওটাকে নিয়ে নিতে হবে। এক সময় আমি ছাপড়াতে ছিলাম, সেখানে কোন মেয়ের পোষাক দেখে হয়ত বলে দিলাম, 'বাঃ খুব সুন্দর তো ড্রেসটা'। একজন আমাকে সাবধান করে দিলেন, 'মহারাজ এভাবে মেয়েদের পোষাকের appreciate করতে যাবেন না, এতে ওরা

প্রশ্রয় পেয়ে যাবে'। তারপর থেকে বলাই বন্ধ করে দিলাম। বুঝতেই পারছিলাম না, কিভাবে কথা বলতে হয়, আমাদের সেই ট্রেনিংটাই নেই। কারণ লোকে মনে করে, আপনি কিছুর appreciate করেছেন মানেই, আপনি ওটাকে ধরে নিতে চান।

শাস্ত্র এখানে আমাদের সবাইকে সাবধান করার জন্য এটাই বলতে চাইছেন, রাগ আর দ্বেষ থেকে যদি নিজেকে না বাঁচাতে পার, তুমি খুব বিপদে পড়বে। এই রাগ আর দ্বেষের দুটোরই বাবা-মা হল তৃষ্ণা। আচার্য এখানে খুব সুন্দর প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলছেন। প্রতিপক্ষ ভাবনা মানে, যে জিনিসটা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে তার বিপরীত জিনিস দিয়ে আটকানো।

আচার্য বলছেন, *তদা শাস্ত্রদৃষ্টিঃ*, আচার্যের ভাষা এত সরল, এত সুন্দর যে, কিছু বলার নেই। যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে সংগ্রাম করছেন, তাঁর নাম *শাস্ত্রদৃষ্টিঃ*। তিনি এখন গীতা জানেন, কথামৃত জানেন, তাঁর দৃষ্টি এখন শাস্ত্রে চলে গেছে। ফলে তিনি যখন যে কোন জিনিসকে বিচার করবেন তখন বিচার করবেন শাস্ত্রের দৃষ্টি দিয়ে। তখন আপনাকে বলতে হবে, আমার শাস্ত্র এটা নিষেধ করছে, আমি এই কাজ করতে পারি না। মনে যদি চাঞ্চল্য আসে, আসুক। সন্ন্যাসীদের মনেও অনেক ধরণের চাঞ্চল্য আসতে পারে, অনেক রকম বাসনা আসতে পারে, এগুলো কোন ব্যাপারই না, তখন তাঁকে এগুলোকে শুধু সাক্ষী হয়ে লক্ষ্য করতে হয়, এটাই একমাত্র পথ।

মনের মধ্যে অনেক রকম বাসনার উদয় হতেই পারে, যেমন আমার মনে হঠাৎ ইচ্ছে হল আমি হিমালয়ে যাব। আমি জানি হিমালয়ে যাওয়া আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। মনের এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা গুলিকে শুধু লক্ষ্য করে যেতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ওই বাসনা নিজে থেকেই চলে যাবে। কিন্তু যদি আমি ওই বাসনাকে রাগের সঙ্গে লেজুড় করে জুড়ে দিই, এবার ওই চিন্তা আমাকে টেনে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাবে। টাকা জোগড় কর, টিকিটের বন্দোবস্ত কর, যাওয়ার ব্যবস্থা কর, থাকার ব্যবস্থা, কত কিছু এসে জুটে যাবে। আর এটাই হয়ে যাবে অশাস্ত্রীয়, কারণ, আমার উপর যে কাজের দায়ীত্ব দেওয়া আছে, সেই দায়ীত্বকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে হিমালয়ে।

ভগবান বলছেন, এই জীবনযাত্রার যাত্রাপথে ঠিক ঠিক পরিপন্থি হল রাগ আর দ্বেষ। জীবন আমাদের এভাবেই চলবে, সংসার এভাবেই চলবে, আমাদের ইন্দ্রিয় এভাবেই চলবে। এই রাগ আর দ্বেষ বসে আছে আমাদের মনের মধ্যে, এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কেন পারবেন না? কারণ আপনি শাস্ত্রদৃষ্টি নন। নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, নিয়মিত সাধুসঙ্গ করুন, এইভাবে করতে করতে যখন আপনি শাস্ত্রদৃষ্টি হয়ে যাবেন, তখন আপনার মধ্যে সেই শক্তি হবে, যে শক্তি দিয়ে এই দুটোকে বশে আনতে পারবেন। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলতে শুরু করলে, ঘোড়া লাফালাফি করে আপনাকে পিঠ থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে। অনুশীলন করে করে ঘোড়ার লাগাম টানার শক্তি যখন হবে, তখন আপনি দুর্দান্ত ঘোড়াকেও বশে এনে আরামসে ঘোড়াকে নিজের ইচ্ছামত চালাতে পারবেন। রাগ আর দ্বেষ দুর্দান্ত ঘোড়াও না, এরা হল ডাকাত; ডাকাত শব্দকে ইংলিশে বলে হাইওয়ে মেন্, ওয়ে লেন, *পরিপন্থিনৌ* শব্দটাই চলে গেছে। অন্য রাস্তায় নিয়ে যাবে, তারপর গলায় দড়ি দিয়ে একটা টান মারবে, সব শেষ। আপনি কি এটা চান? ভাল করে বিচার করে দেখুন, মনে কি কখন কোন জিনিসের প্রতি বা কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ উদয় হয়েছে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পেয়েছিলাম এই শ্লোক –*ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি*, ইন্দ্রিয় জগতে যে বিচরণ করে, তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। কেন টেনে নিয়ে চলে যায়? কারণ আপনার প্রকৃতি ওই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ নিয়ে আসছে। বাঁচব কি করে? রাগ আর দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ কর। যেমনি দেখলাম জোর বাতাস উঠেছে, সামাল সামাল রব ওঠাও, তখনই প্রতিপক্ষ ভাবনা নিয়ে আসতে হবে। কারণ আর-একটু যদি বড় হয়ে যায়, আর এদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।

আচার্য বলছেন, *তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থম্ অপি অন্যথা*, মানুষ যখন রাগ আর দ্বেষের খপ্পরে পড়ে যায়, মানুষ তখন শাস্ত্রের অর্থটাকেও বিপরীত ভাবে দেখে। শ্রীশ্রীমাকে একজন এসে বলছেন, 'মা বিয়ে করাটা কি খারাপ? ঠাকুরও তো বারণ করেননি'। মা শুনে বলছেন, 'না না বাবা, বিয়ে করা খুব ভাল'। ছেলেটি চলে যাবার পর একজন বলছেন, 'মা আপনি কি করে এই কথা বলতে পারলেন'। মা বলছেন, 'বাবা পুরো কথামৃতে বিয়ে করা নিয়ে সে ওই একটা কথাই দেখলে! ঠাকুর যে এত ত্যাগের কথা, সন্ন্যাসের কথা বলছেন, সেটার দিকে তার দৃষ্টি নেই'। কারণ ওখানে গিয়ে ওর মনটা বসে গেছে। রাগ আর দ্বেষকে মনের মধ্যে বেশি খেলা করতে দিতে নেই। রাগ আর দ্বেষ যখন চেপে বসে, মনে যখন এই ভাব এসে যায়, তখন কি হয়? আমাকে দিয়ে অধর্ম করাবে। এখন অধর্ম আমরা যে অর্থে বলি, অধর্ম ঠিক সেই অর্থে হয় না। প্রথমের দিকে আমরা বললাম, যে অর্থে পাপকে বোঝা হয়, হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেই অর্থে পাপ হয় না। ঠিক তেমনি অধর্ম জিনিসটা আমরা বলছি ঠিকই, ধর্মের বিপরীত মানেই অধর্ম। কিন্তু ঠিক ঠিক অধর্ম যে অর্থে আমরা মনে করছি, অধর্ম সেই অর্থে হয় না, অধর্ম আসলে পরধর্ম।

যে কোন পরধর্ম সেটা অধর্ম। আমরা যেমন প্রথমের দিকে বললাম, গৃহস্থরা যারা সংসারী, বিয়ে করেছে, স্ত্রী সঙ্গ করছে, সন্তানোৎপাদন করছে, এতে তো কোন দোষ নেই, এটাই সংসারের ধর্ম। একজন সন্ন্যাসী সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সংসারকে ছেড়ে দিয়েছেন। সামারসেট মঙ নিজে খ্রীশ্চান ছিলেন, কিন্তু খ্রীশ্চানদের উপর খুব খাপ্পা ছিলেন। তাঁর উপন্যাস Of Human Bondage, খুব বিখ্যাত বই; সেখানে যে হিরো সে কিভাবে ধর্ম থেকে সরে এসেছে দেখানো হয়েছে। একজন খ্রীশ্চান ফাদারের বর্ণনা করছেন। একজন মা বাচ্চাকে কোলে করে ব্যাপ্টিজিম করাতে নিয়ে গেছে। বিরাট লম্বা কাহিনী। শেষে বাড়ি ফিরে এসে মা বাচ্চাটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হৈ হৈ পড়ে গেছে। তখন দেখে ওদের ঘরের ভিতরেই বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে আছে, আর ওই ফাদার খাটে মাথা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কাহিনীটা এখানেই শেষ। অর্থ হল, সে খ্রীশ্চানদের ক্যাথলিক ফাদার হয়ে গেছে, বিয়ে করতে পারবে না, প্রোটেস্টান্টদের তাও বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোথাও তার মনে থেকে গেছে পুত্রৈষণা, আমার সন্তান হোক। কিন্তু সে খ্রীশ্চান ফাদার, বিয়ে করতে পারবে না। ওই রকম ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে, ওই ইচ্ছাটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে।

তাহলে কি সন্তান পাওয়ার ইচ্ছাটা কি খারাপ? প্রায়ই লোকেরা বলে সংসার কি খারাপ? সংসার কেন খারাপ হতে যাবে। এটা একটা ধর্ম, ওটাও আর-একটা ধর্ম। গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতার জন্য সত্যাগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একবারও বলেননি যে, দেশের মিলিটারিরাও শত্রুর আক্রমণের সময় সত্যাগ্রহ করবে। মিলিটারির কাজ যুদ্ধ করা, সরকার চেষ্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়। কিন্তু একবার যুদ্ধ লেগে গেলে সেখানে আর কোনও ছাড়াছাড়ি নেই। যুদ্ধ করাটা হল সৈনিকদের ধর্ম, শান্ত ভাবে থাকা এটা সাধারণ মানুষের ধর্ম। সাধারণ মানুষ কখনই আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। কারণ এটা পরধর্ম। আইন পালন করবে পুলিশ, আইন পালন করবে আদালত। ওরা যদি না করে, তাহলে মানুষই চেষ্টা করবে ব্যবস্থাকে পাল্টাতে। আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কেউ কাউকে মানবে না, আইন এই জন্যই হয়েছে, যাতে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। সেইজন্য ঠিক ঠিক অধর্ম বলে কিছু হয় না।

শত শত হাজার হাজার ধর্ম হতে পারে। যে গুপ্তচর ভারতের হয়ে পাকিস্থান বা চীনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, তার কাজ মিথ্যা কথা বলা, তার কাজ ধরা না পড়া। আমরা কি তার ধর্ম নিতে পারি? কখনই পারি না। আমাদের ভারতীয় গুপ্তচররা যদি পাকিস্থানে গিয়ে সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র হয়ে যায়, তখন তার কি অবস্থা হবে? আগামীকালই কাশ্মীর ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, শুধু কাশ্মীর যাবে না, আরও কত কিছু অঘটন হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলা একজনের ধর্ম, মিথ্যা কথা

বলা আর-একজনের ধর্ম। আমার যেটা ধর্ম, আমাকে সেই ধর্মকে ধরে রাখতে হবে। রাগ আর দ্বেষের তোড় যখন আসে, তখন এই দুটো মানুষকে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়ে পরধর্ম পালন করার দিকে নিয়ে যায়।

অর্জুনেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে, অর্জুন এখন স্বধর্ম ছাড়তে চাইছেন। কেন চাইছেন? জীবনের প্রতি তাঁর মায়া এসে গেছে, দ্রোণ, ভীষ্ম এনারা আমার আপনজন, আমি কি করে এদের বধ করব! আমি এনাদের বধ করতে পারি না। রাগ-দ্বেষ অর্জুনকে গ্রাস করে নিয়েছে, আর তাতেই তাঁর স্বধর্ম শেষ। স্বধর্ম ত্যাগ করে অর্জুন পরধর্ম নিতে চাইছেন, এটাই পাপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বধর্ম শব্দটা একবার এসেছিল, এখানে আবার এসেছে। কর্তব্য কি, দায়ীত্ব কি? এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যেই আসে। কর্তব্য হল আমার আপনার ধর্ম। তার মধ্যে একটা বিশেষ সময়ে যেটা করণীয়, সেটাকে দায়ীত্ব বলে। আমার কর্তব্য হল সমগ্র মানবজাতির প্রতি, সেখান থেকে নিজের দেশের প্রতি, রাজ্যের প্রতি, নিজের অঞ্চলের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এবং নিজের প্রতি। যিনি ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর কোন দায়ীত্ব থাকে না।

মনু বলছেন, উপর থেকে নীচে যদি এমন হয়ে যায় যে, দেখা যাচ্ছে কোন বাড়ির স্বার্থে একটা গ্রামের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তখন সেই বাড়িকে ত্যাগ করতে হবে। একজনের জন্য যদি বাড়ির সর্বনাশ হয়ে যায়, তাহলে সেই বাড়ির সদস্যকে ত্যাগ করতে হবে। যদি দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি আসে, যেখানে মানবিকতা রয়েছে আর আমার নিজের স্বার্থ রয়েছে, সেখানে তুমি মানবিকতার জন্য কর। আগেকার দিনে যুদ্ধভূমিতে যুদ্ধ চলছে, একজন শত্রুপক্ষের সৈনিক মারা যাচ্ছে, কিন্তু সে একটু জল চাইছে, যে সৈন্য তার সাথে যুদ্ধ করছিল, সেই এগিয়ে গিয়ে তাকে জল খাইয়ে দিল। মহাভারতের কৌরব পাণ্ডব দু পক্ষ যুদ্ধ করছে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যে হয়ে গেলে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে, তখন এদিককার বৈদ্য ঐদিকে যাবে। এমনকি রাম রাবণের যুদ্ধে, সুষেণ রাবণের যে বৈদ্য, তিনি রামের দিকে এসে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তার মানে, যুদ্ধ যুদ্ধের জায়গায় আছে, মানবধর্ম নিজের জায়গায় আছে। এটা থেকে স্বধর্ম পরিভাষিত হয়। আমরা স্বধর্মে যাচ্ছি না, খুব সহজ ব্যাপার, আমার মন জানে কি করণীয়, আমার শরীরও সেই রকম করে। আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার কথাবার্তা আর আমার ক্রিয়াকর্ম, এই তিনটে যেন এক লাইনে থাকে, এটাই ডিউটি।

একজন একটা চাকরি করছে, চাকরি করা হয় অর্থ উপার্জনের জন্য, কিন্তু সেখানেও কিছু দায়ীত্ব এসে যায়। যেমন একজন পুলিশ, পুলিশের দায়ীত্ব সমাজে আইনশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ করা। তার সাথে তার দায়ীত্ব হল, নিজের বাড়ির লোকজনদের দেখাশোনা করা, তার সাথে নিজের ভাল করা। এর মধ্যে একটা ডাকাতি হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার এসে তাকে বলে দিল, তোমাকে ভার দেওয়া হল এই ডাকাতকে ধরার, তখন এটা হয়ে গেল দায়ীত্ব। দায়ীত্ব আসে, আমি আগে আগে যা করেছি, সেটাকে বেঁধে একটা জায়গায় নিয়ে আসা; কর্তব্য আমাকে জীবনে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। সমস্ত দায়ীত্ব মিলে হয় কর্তব্য, তার মধ্যে একটা দায়ীত্ব পালন করাটা হল দায়ীত্ব। কামনা-বাসনার তোড়, রাগ-দ্বেষের তোড় যখন জোর ধাক্কা মারে তখন মানুষ, দায়ীত্ব, কর্তব্য, সব ভুলে যায়। অর্জুনের কর্তব্য হলে ক্ষত্রিয়ের, দায়ীত্ব হল যুদ্ধ করা, দুটোই তার উড়ে গেল; আমি যুদ্ধ করব না, আমি বৈরাগী হব। তার মানে, অর্জুনের স্বধর্ম চলে গেল, কর্তব্য ও দায়ীত্বও উভয়েই স্বধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে চলে গেল। ভগবান সেইজন্য অর্জুনকে সাবধান করার জন্য বলছেন –

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।

*(স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্মসাধনে নিধনও কল্যাণকর; কিন্তু অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ বলে বিপজ্জনক।)*

তোমার স্বধর্মে যদি দোষও থাকে, তুমি জানবে, সব ধর্মেই কিছু না কিছু দোষ আছে; আর অপরের ধর্মের হয়ত অনেক কিছু ভাল আছে। কবিতায় বলছেন, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। আমি যে মহারাজের কথা বলেছিলাম, গৃহস্থ গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে, মনে হয় সে কত ভাল আছে, তার কত সুখ। এগুলো বাচ্চা বয়সে হয়। বাচ্চারা বলে আমি ডাক্তার হব, আমি ফাইটার প্লেনের পাইলট হব, আমি অমুক হব। তুমি আর বাচ্চা নেই, তোমার একটা বয়স হয়ে গেছে, একটা পথ তুমি বেছে নিয়েছ, এই পথে হয়ত দোষ আছে, অনেক দুর্গুণও আছে, স্বধর্মে যত দোষ থাকুক, যত দুর্গুণ থাকুক; আর অপরের ধর্মকে যত ভাল মনে হোক, তুমি তোমার স্বধর্মকে কখনও ত্যাগ করতে যেও না।

*স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ*, স্বধর্মে তুমি যে পথ নিয়েছ, নিজের ধর্ম পালন করতে করতে মরে যাও তাও অনেক ভাল, death in the line of duty; *পরধর্মো ভয়াবহঃ*, তোমার জন্য পরধর্ম হল ভয়াবহ, ওই দিকে তুমি যেও না। কারণ পরধর্ম নিয়েছ মানেই তোমার জন্য নরকের সদর দরজা খুলে গেল। নরকের সদর দরজা কেন খুলে যাবে? আগে বল তুমি নিজের ধর্ম ছাড়ছ কেন? কারণ রাগ আর দ্বেষ, কোন কিছু তোমার খুব ভাল লাগছে, কোন কিছু থেকে তুমি পালিয়ে যেতে চাইছ। রাগ সব সময় আসে কাম থেকে, তোমার ভিতরে কামনা-বাসনা গিজ্ গিজ্ করছে। কাম আসে অবিদ্যা থেকে, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম। ভিতরে অজ্ঞান তাই মনে কামনা জাগে, কামনা জাগলে, ওই কামনা পুর্তির জন্য মানুষ কাজ করে। তুমি নিজের ধর্ম ছেড়ে পরধর্মে যে যাচ্ছ, ঠাকুর বলছেন, পরের স্বামী রসরাজ; নিজের স্বামীকে ছেড়ে পরের স্বামীকে যদি রসরাজ বলে মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমার মনে কামনা আছে। নিজের স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ, স্বামীকে ভাল লাগছে না, তার মধ্যে রস নেই। পরের স্বামী রসরাজ, রসে টগবগ করছে। কেন? তার প্রতি তোমার অনুরাগ হয়ে গেছে। এটা ঠাকুরের বর্ণনা। নিজের স্বামীর প্রতি দ্বেষ, অপরের স্বামীর প্রতি রাগ কেন হয়েছে? তোমার ভিতরে কামনা রয়েছে।

কাম মানেই অবিদ্যা ভরে আছে, অবিদ্যা মানেই এবার তোমাকে নাচাবে। অবিদ্যা কক্ষণ তোমাকে উঁচু যোনিতে নিয়ে যাবে না, স্বাভাবিক ভাবেই নিম্ন যোনিতে নিয়ে যাবে; সাপ হবে, বিছে হবে। অবিদ্যা নরকের দিকে নিয়ে যাবে, মুক্তির দিকে না নিয়ে এই সংসারের মধ্যেই ঘোরাতে থাকবে। আমাদের কর্ম আমাদের নিয়ে যায় না, আমি যত বাজে কর্মই করি না, সেই কর্ম কক্ষণ আমাকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে অবিদ্যা। মানুষের যে দুরবস্থা, যে দুর্গতি হয়, কর্মফলের জন্য হয় না, হয় অবিদ্যার জন্য। ঈশোপনিষদে বলছেন, *অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাহহৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ*, যিনি নিজের হনন করেন, তিনি *অসূর্যা* নামের লোকে গমন করেন। হনন করার অর্থে বলছেন, তিনি অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছেন। জন্ম নিল, ধর্ম অধর্ম করে জীবন কাটিয়ে দিল, তারপর একদিন মরে গেল, তার মানে নিজেকে হনন করল। তুমি যদি বিদ্যা অর্জন করে নিতে তাহলে তোমার মুক্তি হয়ে যেত। বিদ্যা অর্জন করলে না, আত্মজ্ঞান লাভ করলে না, সেইজন্য যতবার জন্ম নিয়ে মরছ, এরজন্য দায়ী তুমি নিজে, এটাই আত্মহত্যা। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেলাম বা বিষ খেয়ে মরে গেলাম, এটাই আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা কেন পাপ? আত্মহত্যা মানেই রাগ আর দ্বেষ, যদি না কোন medical condition থাকে। কিছু লোকের medical conditionএর জন্য অনেক কিছু হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে, এখানে আমরা medical conditionsকে আনছি না। আমরা আলোচনা করছি, যেখানে রাগ আর দ্বেষ থেকে মানুষ আত্মহত্যা করে। প্রায়ই দেখা যায়, বাবা ছেলে কিংবা মেয়েকে ফোন দিল না, গলায় দড়ি দিয়ে দিল। রাগ দ্বেষ মানেই কাম, জোরাল কাম মানে জোরাল অবিদ্যা,

জোরাল অবিদ্যা মানেই তার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, সে মরবেই। অবিদ্যা খুব বেশি থাকলে সে এবার exclusive হয়ে গেল, inclusive আর থাকছে না। বিদ্যা মানেই সে inclusive, আত্মজ্ঞান মানেই সে inclusive। বাকি সবটাই exclusive। আত্মহত্যা করেছে মানেই সে exclusive, সে যেই হোক। কেন exclusive? হয় সে কোন জিনিস থেকে পালাতে চাইছে বা কোন জিনিস পেতে চাইছিল, পেল না বলে হতাশা, হতাশা থেকে আত্মহত্যা। আগেও বলা হয়েছে যে, এই রাগ দ্বেষ সব সময় হয় কাম থেকে; কাম সব সময় হয় অবিদ্যা থেকে। অবিদ্যা হওয়া মানে সে দেহসর্বস্ব, দেহকে নিয়ে সে নাচানাচি করবেই, তা নিজের দেহই হোক বা অপরের দেহ হোক। এরা এই নিজেকে মারবে, আবার এই জন্মাবে। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে সাবধান করছেন, *শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।* পাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও, স্বধর্মে সর্ব অবস্থায় অবস্থান করে থাক।

এতক্ষণ আমরা বিস্তারিত ভাবে পাপ জিনিসটা কি, আলোচনা করলাম। আমরা আলোচনা করলাম অন্যান্য ধর্মে পাপকে কিভাবে দেখা হয় এবং পাপের কি নিদান হতে পারে, পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্জুন আবার প্রশ্ন করছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই অধ্যায়ের শেষ দিকেও অর্জুন প্রশ্ন করছেন। এই নয় যে তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রশ্ন করবেন। এর পরের অধ্যায়ে প্রথমের দিকেই প্রশ্ন করবেন। একটা বিষয়কে শুরু করার জন্য প্রশ্ন করা। যদি কেউ ভাল প্রশ্ন করেন, সেখানে আচার্য যে উত্তর দেন, সেটা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। যে কোন আচার্য, যত ভালই আচার্য হন, উনি সবটাকে মিলিয়ে উত্তর দিতে চান। ভাল প্রশ্ন মানে ভাল মন, ভাল মন মানে শ্রোতা খুব ভাল। ভাল শ্রোতা না থাকলে বক্তাও সেই রকম বক্তব্য রাখতে পারেন না। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যে দুটো সিরিজ বোঝা খুব কঠিন, একটা হল দেববাণী (Inspired Talks), যেটা বাছাই করা কয়েকজন শিষ্যদের সামনে বলেছেন। আর দ্বিতীয় হল জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ তিনি লণ্ডনে বলেছিলেন। সেই সময় বৃটিশদের প্রচুর পড়াশোনা ছিল, চিন্তা-ভাবনাও গভীর ছিল, স্বামীজী তাই বলতে পেরেছিলেন। ভারতীয়দের সামনে উনি বলতেই পারতেন না। প্রশ্ন করার জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে। বিষয়টা যদি আগে জানা থাকে, সেখানে কোথাও গিয়ে কোন জিনিস তার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, আচার্য তখন তাকে ঢেলে দেন। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। ভগবান পাপ নিয়ে, জীবন নিয়ে বলে যাচ্ছেন, অর্জুন শুনে যাচ্ছেন। এবার তার মনে একটা প্রশ্ন উঠল –

অর্জুন উবাচ
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

*(অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, হে কৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপানুচরণে প্রবৃত্ত হয়?)*

অর্জুন ভগবানের কাছে জানতে চাইছেন, হে ভগবান মানুষ কিভাবে, কোন শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে পাপানুচরণে প্রবৃত্ত হয়? *প্রযুক্তঃ* শব্দের মানে, নিযুক্তি যেভাবে হয় সেইভাবে প্রযুক্তি। আচার্য এটাকে বর্ণনা করছেন এইভাবে – *রাজা ইব ইতি উক্তো*, রাজা যেমন আদেশ করেন, রাজা আদেশ করলে তাঁর কর্মচারীর ক্ষমতা নেই যে না করবে। ঠিক তেমনি, ওটা কি এমন সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে পাপক কর্মে নিয়োজিত করে? শুধু এই উত্তর জানলেই হবে না, এই পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি, সেটাও অর্জুন স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইবেন।

প্রশ্নের মধ্যেই আর-একটি প্রশ্ন সমাহিত রয়েছে। আমরা খুব সহজেই বলে দিই, ঠাকুরের নাম কর, কৃষ্ণের নাম কর সব পাপ কেটে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, হাততালি দিয়ে হরিনাম কর সব

পাপ পাখি উড়ে যাবে, ঠিকই বলছেন। কিন্তু গীতা শাস্ত্র যখন চলে, তখন দেখা যাবে এনারা পদে পদে যুক্তি দিয়ে চলেন। কোন কাজ করার পর আমাদের অনেকেরই মনে হয়, যে কাজটা করলাম, এটা ভুল কাজ। করতে চাই না, তবু করে বসি। অথচ আমরা ভক্ত, আমরা জপধ্যান করি, তা সত্ত্বেও কেন এ-রকম হয়? আমি করতে চাই না, তবুও কিছু একটা এমন আছে, যেটা আমাদের ঠেলে করিয়ে দেয়। সন্ন্যাসীদের কাছে এসে ভক্তরা প্রশ্ন করেন, আমি এ-রকম করে ফেলেছি, কি করব একটু বলে দিন। সন্ন্যাসীরাও বুঝতে পারছেন, তার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু করে ফেলেছে। তার এই পাপ বোধ ভিতরে থাকলে তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ করে দেবে। সেইজন্য ওনারাও কিছু একটা বলে দেন, রোজ একটা অধ্যায় করে চণ্ডী পাঠ কর, পাপ কেটে যাবে; বা হনুমান চালিশা পাঠ কর পাপ কেটে যাবে; বা গীতা পাঠ কর কেটে যাবে। কই কাটে না তো।

একটা প্রচলিত শ্লোক আছে, ঠাকুরও বলছেন, যদিও এটা মহাভারতে নেই, সেটা হল দুর্যোধনের খুব নামকরা কথা, *জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি,* হে কৃষ্ণ আমি জানি ধর্ম কি, মানে কোনটা ঠিক, কিন্তু ওই দিকে যাওয়ার আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রযুক্ত হল যখন অন্য কেউ করায়, আর প্রবৃত্তি হল যখন নিজে থেকে করে। আর অধর্ম জিনিসটা কি সেটাও আমি জানি, কিন্তু মন ওই অধর্ম থেকে সরে আসতে চায় না। মহাভারতে এই শ্লোকটা নেই, বরঞ্চ মহাভারতে পদে পদে দুর্যোধন বলছে, আমি যা করছি ঠিক করেছি। কিন্তু পরে পরে আমরা কাহিনীটা এমন বানিয়ে দিলাম যে, মনে হবে যেন দুর্যোধনের মত এমন পাপী আর হয় না। কিন্তু দুর্যোধনের চিন্তাধারা অন্য রকম ছিল, আর তার যুক্তিও ছিল কেন সে ঠিক।

যাই হোক, এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।* 'প্রযুক্ত' শব্দটা এত সুন্দর আর এত উপযুক্ত যে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমি চাইছি না, কিন্তু কোন একটা শক্তি আমাকে দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এখানে তাদের কথা বলছেন, যারা পাপ করতে চায় না, অথচ তাকে দিয়ে করাচ্ছে। পরে তাঁদের কথা বলবেন, জ্ঞানী পুরুষ, যিনি আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও পাপ করেন, এটা ভুল করা না, পাপ। আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করেছিলাম অন্যান্য ধর্মে পাপ মানে, ঈশ্বরের যে আদেশ, সেই আদেশকে লঙ্ঘন করা। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর থেকে আদেশ হয় না, আদেশ গুরু থেকে হয়। উপনিষদে বলছেন, *ইত্যাদেশ,* গুরু এই আদেশ করছেন, ভগবানের আদেশ না। গুরু আমাদের কাছে সেই ঈশ্বরীয় কথা বলেন, সেই শাস্ত্রীয় কথা বলেন, সেইজন্য গুরুর কথা অমান্য করা যায় না। গুরুর কথাকে লঙ্ঘন করাই পাপ, অধর্ম। গুরু বললেই আমাদের বিরাট একটা সার্কেল হয়ে যায়, বাবা, মা, জ্যেঠা, কাকা, জ্যেঠিমা, কাকিমা, দাদা, দিদি, যাঁদের আমরা সম্মান করি; আবার যাঁরা আমাদের শিক্ষাগুরু, দীক্ষা গুরু, সবাইকে মিলিয়েই আমরা গুরু বলি। আমরা খুব খোলাখুলি এবং আমরা খুব বেশি ডায়নামিক। এর একটা আবার ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম আছে, যেমন সাইকেল, সাইকেল যদি কোন কিছুর সাপোর্টে না দাঁড় করানো হয়, সাইকেল উল্টে পড়ে যাবে। কিন্তু সাইকেল যখন চলছে, তখন পড়ে না, ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম। হিন্দু ধর্ম হল ডায়নামিক ইক্যুউলিব্রিয়াম, অন্যান্য ধর্ম হল স্ট্যাটিক, বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। ফলে লোকেরা হিন্দু ধর্মকে বুঝতে না পেরে নিন্দা করে। যাঁরা এই কথাগুলো প্রথম শুনছেন, তাঁদের আগে থেকে হয়ত অনেক কিছুর ধারণা হয়ে আছে, সেই ধারণার সাথে এই কথাগুলো খাঁচে খাঁচে বসবে না, ফলে মনে অনেক রকম প্রশ্ন আসবে। সেইজন্য আমরা বারবার এই কথা আলোচনা করছি।

প্রথম কথা হল, অজান্তে আমার কিছু একটা ভুল হয়ে গেল, কিংবা আমি একটা জিনিস জানি না বলে ভুল হয়ে গেল, এটা খুব সহজ ব্যাপার। অন্য দিকে হল, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করলাম বলে পাপ হয়ে গেল। অন্য ধর্মে পাপ, এদিকে হয়ে গেল ভুল। হিন্দুরা যখন পাপ বা অধর্মের কথা বলেন, এটা হয়ে যায় মাঝামাঝারি। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরের কোন আদেশ কখন লঙ্ঘন

হয় না, কারণ হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরের কোন আদেশ নেই। তার সাথে বলছেন, এটা ভুল বশতঃ করছি না, আমি জানি এটা ঠিক করছি না, আমি করতেও চাই না, মন যেন বুঝতেও চায় না। এ-রকম কেন হয়? ভগবান এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন –

প্রথম হল আমরা যখন ভুল করি, একটা হল অজান্তায় ভুল; দ্বিতীয়টা হল জানতামই না যে এই জিনিসটা ভুল। আমাদের ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে এত আইন আছে যে, মজা করে বলা হয়, আপনি রাস্থা পার হচ্ছেন, পুলিশ চাইলে এমনিই আপনার নামে দশটা কেস ঠুকে দিতে পারে। বেশির ভাগ মানুষ জানেও না যে, এই ধরণের কোন আইন আছে। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করা। এখানে দুটোর কোনটাই বলা হচ্ছে না। যেটা আমি জানি, অজান্তায় হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও পথ থেকে সরে আসছি। আমরা আগেও আলোচনা করেছি, হিন্দুদের কাছে পাপ বা অধর্ম হল – আপনি একটা পথ নিয়েছেন, সেই পথটা আপনি ছেড়ে দিলেন। ঠাকুরের সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে একজন দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নেওয়ার পর মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজা আমি যদি একশ আটবার করে জপ না করি, তাহলে কি হবে'? মহারাজ বলছেন, 'যেটা হওয়ার ছিল, সেটা হবে না'। জপধ্যান করলে আপনার মন শুদ্ধ হবে, মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে, আপনার জ্ঞান ভক্তি বৃদ্ধি হবে। আপনি করলেন না, আপনার মন শুদ্ধ হবে না, আপনার জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য কোনটাই হবে না। আমরা যাতে জপ করি, সেইজন্য গুরু বলে দেন, জপ না করলে পাপ।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়, *অকরণে প্রত্যবায়*, যদি না কর তাহলে সেটা পাপ। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ আর-এক ভাবে বলছেন; জিনিসটা একই। তুমি চাইলে তুমি ধর্ম পথে এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তুমি চেষ্টা করছ না, এটাই অধর্ম, এটাই পাপ। আবার সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অন্য অনেক কিছু হয়ে যায়। যেমন খুন করা, শীলহানি করা, ইত্যাদি, এগুলো আরও অনেক গভীর হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে আমরা এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছি। আসলে কিন্তু সবটাই পথভ্রষ্ট। পাপকে যে অর্থে আমরা মনে করি, হিন্দুরা ওই অর্থে পাপকে পাপ মনে করে না। আমাদের কাছে সবটাই ভুল, কোনটা বড় ভুল, কোনটা ছোট ভুল। আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে রাস্থা ভুল হয়ে গেল, আধ ঘন্টার জায়গায় এক ঘন্টা পর গন্তব্যস্থলে পৌঁছালাম, এটা একটা ছোট ভুল হয়ে গেল। একটা হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, গাড়িটা ডিগবাজী খেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল, এখানেও পথ ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু ওই গাড়িকে ঠিক করতে আমার দম বেরিয়ে যাবে। দুটোই পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট বিভিন্ন ভাবে হতে পারে।

এখানে ভগবান এবার বলছেন। 'ভগবান' শব্দটাকে নিয়ে আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করছেন, ভগবান বলতে কি বোঝায়। প্রথমের দিকে অবতার তত্ত্ব আলোচনা করার সময় আমরা 'ভগবান' শব্দকে নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এখানে বিষ্ণুপুরাণ থেকে আচার্য উদ্ধৃত করছেন, *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাধ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতিরণা।।* 'ভগ' মানে ঐশ্বর্য, 'বান' মানে আছে, ভগবান মানে যাঁর ঐশ্বর্য আছে। কয়টি ভগ? ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য। কি কি? 'ঐশ্বর্যস্য', তাঁর সব সময় ঐশ্বর্য থাকবে; 'সমগ্রস্য', তাঁর ঐশ্বর্য কখন ক্ষয় হয় না। তার সাথে 'ধর্মস্য', 'যশসঃ', 'শ্রিয়ঃ', ধর্ম, যশ ও শ্রী। শ্রী শব্দের একটা অর্থ লক্ষ্মী, সাধারণ অর্থে শ্রী বলতে আমরা মনে করি, যেখানে একটা শ্রী ভাব বিদ্যমান, যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ। ঠাকুর বলতেন দারিদ্রী যেন না থাকে, অভাব থাকতে পারে কিন্তু সেখানে একটা শ্রী আছে। আর তার সাথে রয়েছে বৈরাগ্য ও মোক্ষ, এই ছয়টি জিনিস ভগবানের সঙ্গে সব সময় থাকে। একদিকে তাঁর ঐশ্বর্য আছে, অন্য দিকে রয়েছে তাঁর বৈরাগ্য। রাজা জনক অনেকটা এই রকমই, তাঁর একদিকে অঢেল ঐশ্বর্য, অন্য দিকে বৈরাগ্য আছে।

আমি যদি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করি, আর গীতার কথা শুনে শুনে যদি মনে হয় আমিও ভগবানের সন্তান, তাহলে কিন্তু আমারও এই ছয়টি ঐশ্বর্য থাকতে হবে। কেউ যদি মনে করে সে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, যদি সে ঠিক ঠিক মনে করে আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঠিক ঠিক যদি মনে করে গীতা শুনছে, ঠিক ঠিক যদি মনে করে আমি হিন্দু, তাহলে কিন্তু তার এই ছয়টি ভগ থাকতে হবে। প্রথমে তার ঐশ্বর্য থাকতে হবে, সে হয়ত অভাবগ্রস্ত, কাঙালী, কিন্তু তার ঐশ্বর্য থাকবে। তার সঙ্গে তার ধর্ম থাকবে, যশ থাকবে। লোকেরা জানবে, সে সবার থেকে আলাদা, তার পিছনে যে লোকেরা দৌড়াবে তা না, মানুষ তার সঙ্গ লাভ করতে চাইবে, তার সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করবে। তার সঙ্গে থাকবে শ্রী, দেখলেই মনে হবে ইনি একজন শ্রীযুক্ত, শ্রীমান; তার চেহারা যেমনই হোক, তাকালেই মানুষ ওই চেহারার প্রতি আকর্ষিত হবে, ইনি শ্রীমান, বিশ্রী না। আর বৈরাগ্য ও মোক্ষ, তার ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু কোন কিছুতে আসক্তি নেই, ভিতরে বৈরাগ্যের ভাব।

রাজা জনকের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করার জন্য ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গেছেন। শুকদেবের মনে হচ্ছে, রাজা জনক সব সময় এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আছেন, ইনি আর কি ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন। একদিন রাজা জনক শুকদেবের সাথে অদ্বৈত জ্ঞানের আলোচনা করছেন। সেই সময় একটা শোরগোল পড়ে গেল, রাজমহলে আগুন লেগে গেছে, রাজা জনকই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খুব জোর রব উঠেছে আগুন আগুন করে। শুকদেব শুধু একটা কৌপিন পরে থাকতেন। একটা কৌপিন পরতেন আর আর-একটা কৌপিন শুকোত। সাধু সন্ন্যাসীরাও তাই, তাঁরা একটা ধুতি পরেন, আর আর-একটা ধুতি শুকোয়, সাধুদের এটাই সম্পত্তি। শুকদেব ওই রব শুনে উঠে দৌড় লাগাতে গেলেন কৌপিনটাকে বাঁচানোর জন্য। রাজা জনক জিজ্ঞেস করছেন, 'কোথায় চললেন'? শুকদেব বলছেন, 'আমার কৌপিনটা শুকোচ্ছে, ওটাকে গিয়ে আগে বাঁচাই'। রাজা জনক খুব হেসে এই কথা বলেছিলেন – *মিথিলায়াম্ প্রদগ্ধায়াম্ ন মে দহ্যতি কিঞ্চন*। পুরো মিথিলা যদি পুড়ে পুরো ছাই হয়ে যায়, আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। অর্থ হল, হে শুকদেব, তুমি একটা কৌপিনকে নিয়ে চিন্তা করছ, সেখানে পুরো মিথিলাও যদি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। এটাই হয়ে গেল – ঐশ্বর্য এবং তার সাথে বৈরাগ্য। আমাদের হল কাঙালীর বৈরাগ্য, ভিখারী দুটো টাকা চাইতে এলে মনে হবে যেন আমার সব কেড়ে নিতে এসেছে। বাজারে এক আঁটি শাক কিনবে, সব্জীওয়ালীর সাথে একটা টাকার জন্য এমন দরাদরি করবে যে মনে হবে, ওই একটা টাকা বাঁচাতে পারলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। রিক্সাওয়ালার সাথে এক টাকা, দু টাকার জন্য খিচির মিচির থেকে ঝগড়া, গালাগালি শুরু করে দেবে। এরা কিসের হিন্দু, কোথায় তোমার ঐশ্বর্য, কোথায় তোমার বৈরাগ্য! কোনটাই নেই।

বলে যে, শাস্ত্র শুনলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়, কারণ শাস্ত্র অধ্যয়নটাও একটা যজ্ঞ কিনা। যজ্ঞে যখন দক্ষিণা প্রদান করা হয়, তখন যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তবেই ওই যজ্ঞ ফল দেয়। ইন্টারনেটে যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁরা কি করে দক্ষিণা দেবেন, দেওয়া যায় না। তাহলে কি দক্ষিণা দেওয়া হয়? *যৎ পঠিতং তৎ গুরুয়ে সমর্পিতম্*, হে আচার্য, আপনার কাছে যা শিখলাম, দক্ষিণা রূপে আপনাকে এটা ফেরত দিলাম। দক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল, নিজের উপর কোন বোঝা চাপা থাকল না। একটা মজার প্রচলিত কাহিনী আছে, এক গ্রামে ভাগবৎ পাঠ হত, সেই গ্রামের এক বৃদ্ধা এক হাতে লণ্ঠন আর আরেক হাতে একটা লাঠি নিয়ে ঠক ঠক করে ভাগবৎ শুনতে যেত। ঝগড়া চেঁচামেচি করে সবাইকে ঠেলে সামনে গিয়ে বসত। বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। একদিন পাঠক মহাশয় বৃদ্ধাকে বলছেন, 'বুড়িমা, তুমি তো রোজ এসেই ঘুমিয়ে পড়ো, কিছুই তো শোন না'। বৃদ্ধা বলছে, 'তাতে কি হয়েছে বাবা, কানে ভগবানের দুটি কথা তো যাচ্ছে'।

গীতার এই কথাগুলো শুধু কর্ণকুহরে প্রবেশের জন্য নয়, এগুলো বাস্তবিক জীবনে নামানোর জন্য। কোথায় আপনার ঐশ্বর্য, কোথায় আপনার যশ? পাড়ার লোকেরাও আপনাকে জানে কিনা ঠিক

নেই, কোথায় গেল আপনার যশ? আরও উচ্চস্তরে যদি বলেন আপনি সাধন ভজন করছেন, সাধনা করছেন; লোকেরা এসে বলে, 'মহারাজ আমার না এই এই অনুভূতি হচ্ছে'। মহারাজরা রেগে বলে দেন, 'আপনি একজন ভাল মাথা খারাপ রোগের ডাক্তারকে দেখান। অনুভূতি হচ্ছে না ঘেচু হচ্ছে। যদি কিছু অনুভূতি হয়, তাহলে কি হবে?

*উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।।* প্রথমটা হল আপনি আধ্যাত্মিক নন, আপনি একজন হিন্দু। এবারে আপনি যদি একজন আধ্যাত্মিক হিন্দু হন, তাহলে আপনার কি কি থাকতে হবে? এর আগে ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা বললেন, এখন ভগবানের ছয়টি গুণ বলছেন। কি কি গুণ? ভগবান জানেন সৃষ্টি কিভাবে হয়, প্রলয় কিভাবে হয়, আপনিও এটা জানবেন। আর *ভূতানামাগতিং গতিম্*, জীবের যে জন্ম, মৃত্যু, জীবের যে পরলোক গমন এটাও ভগবান জানেন, আপনিও জানবেন। আর তার সাথে আপনি জানবেন মায়া কি, অবিদ্যা কি, বিদ্যা কি, মোক্ষ কি।

'ভগবান' বলতে আমরা কি বুঝি, এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য শঙ্কর বিষ্ণু পুরাণের ষষ্ঠ কাণ্ড থেকে এই দুটি শ্লোক নিয়েছেন। যদি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে সেটা হবে প্রথম শ্লোক, আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে হলে দ্বিতীয় শ্লোক। যিনি আধ্যাত্মিকতার সাধন-ভজনের স্তরে আছেন তাঁর জন্য প্রথম শ্লোক, আর সাধন-ভজন করে করে যিনি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে গেছেন তাঁর জন্য দ্বিতীয় শ্লোক। কি বলছেন দ্বিতীয় শ্লোকে, সৃষ্টির উৎপত্তি ও সৃষ্টির বিনাশ, জীবের উৎপত্তি ও জীবের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে অবিদ্যা কি, বিদ্যা কি, মোক্ষ কি, এই ছয়টিকে জানা। আধ্যাত্মিক হলে এই ছয়টি জিনিস জানা যায়।

রাজযোগেও এই একই কথা বলা হয়েছে, যেমন যেমন ধ্যানের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকবেন, তাঁর মধ্যে এই শক্তিগুলি এসে যাবে। এই শক্তি গুলি কারুর মধ্যে আসার আগে তাঁকে অবশ্যই, ঠাকুর আর মা ঘনঘন দর্শন দিচ্ছেন, চোখের সামনে আলো দেখা, জ্যোতি দেখা, কানে ঘন্টাধ্বণি শোনা, এগুলোকে মাথা থেকে পুরোপুরি নামিয়ে দিতে হবে। এই ধরণের কথাগুলো শুনলে আমাদের কাছে আজব লাগতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তব। আচার্য এই দুটি শ্লোক বলার পর বলে দিচ্ছেন, যিনি এটাকে জানেন, *স বাসুদেব ভগবানিতি*, তিনিই হলেন বাসুদেব, তিনিই ভগবান কৃষ্ণ। এই অর্থে ঠাকুরও বাসুদেব। এবার ভগবান খুব সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, পাপ কেন হয়, আসলে বলতে যাচ্ছেন কোন শক্তি, আমি করতে চাই না, তাও যে শক্তি ঠেলে আমাদের দিয়ে পাপ করায়। ঠাকুর বলছেন, মা আমাকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন; আর আমাদের জীবনে কে যেন পাপের রাশ ঠেলে দেয়; শ্রীভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

*(শ্রীভগবান বললেন –এটা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং এটাই ক্রোধ। এই সংসারে কাম আর ক্রোধকে মহাশত্রু বলে জানবে।)*

*ইহ* মানে এই সংসারে, কারণ ভগবানের উপর পাপ কোন কাজ করে না। সৃষ্টিতে, এই সংসারেই পাপ কাজ করে। *কাম এষ ক্রোধ এষ*, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজ্ঞায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহ-ভিজায়তে*, বাষট্টি, তেষট্টি এই দুটি শ্লোকে কাম আর ক্রোধের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কামনা, মনের ভিতরে যে ইচ্ছাগুলি জমে আছে, এটাই মানুষকে দিয়ে পাপ করায়। আর ওই কামে যখন বাধা পড়ে মানুষ তখন ফোঁস করে ওঠে, এটাই ক্রোধ। কামে বাধা পড়লে দুটো

জিনিস হয় –তার যদি ক্ষমতা না থাকে মন বিষন্নতায় ভরে যাবে, অবসাদ এসে যাবে আর ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে সে ফোঁস করে উঠবে।

এই কাম আর ক্রোধ কোথা থেকে আসে? বলছেন *রজোগুণসমুদ্ভবঃ*, রজোগুণ থেকে এই কাম আর ক্রোধ আসে। আমরা আগে আগে সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ নিয়ে একটু একটু আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে হল, তমোগুণীরা নিদ্রা আলস্যে পড়ে থাকে। কিন্তু সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে সব সময় এক সঙ্গে থাকে, সব কিছুতে থাকে, সবারই মধ্যে থাকে। ঠাকুরকে আমরা শুদ্ধ সত্ত্বগুণী বলি ঠিকই, কিন্তু একটু হলেও পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তমোগুণ থাকতেই হবে, না থাকলে ঘুমই হবে না। ঘুম সাধারণ ভাবে তমোগুণের জন্যই হয়। যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন তাঁদের ঘুম কমে যায়, কারণ জপধ্যান করার ফলে সত্ত্বগুণ বেড়ে যায়। তমোগুণে মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে না, কিন্তু হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, এই ধরণের লম্বা লম্বা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। রজোগুণী জগৎ জয় করার জন্য কাজে নেমে পড়ে।

কাম জিনিসটা, ইচ্ছা জিনিসটা খুব আশ্চর্যের। মানুষের মনে যখন কোন কিছুর জন্য কাম হয়, তখন সে রজোগুণকে বাড়ায়। মানুষের মনে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা জাগলে তবেই সে কাজে নামে। জীবন ধারণের জন্য এই দুটো জিনিস লাগে, হয় ইচ্ছা বা কাম আর নয়তো কর্তব্য। এই ইচ্ছা থেকেই শুরু হয় কর্ম, কর্ম করা মানেই কামের আরও বৃদ্ধি হবে। অনেক আগে আমরা অবিদ্যা, কাম ও কর্মের উপর আলোচনা করেছিলাম। তীর্থ করার ইচ্ছা এটা একটা শুভ কামনা, কিন্তু এটাও মানুষকে দিয়ে কর্ম করায়। একমাত্র আমি যখন নিজের দিকে এগোতে চাইছি, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছি, তখন এটা কামনার মধ্যে আসবে না। কামনা মানে সব সময়ই হয়, আমি যেটা নই, সেটাকে পেতে চাইছি। ঈশ্বর তো আমার ভিতরের, তিনি তো বাইরের কিছু না। কর্ম মানেই রজোগুণ, কাম বাড়তেই থাকে। ঠাকুর গল্প বলছেন, একজন সাধুর কৌপিন ইঁদুরে কেটে দেয়, খুব সমস্যা হয়ে গেছে। ইঁদুরকে শায়েস্তা করার জন্য একটা বিড়াল পুষলেন। বিড়ালের জন্য রোজ দুধ চাই, দুধের জন্য একটা গরু আনতে হল, এই করে করে দেখা গেল এক কৌপিন কে ওয়াস্তে পুরো একটা মহল বানিয়ে ফেলল। সেইজন্য বলছেন, কাম এটা হল *মহাশনো*, প্রচণ্ড খিদে, এর কখন পেট ভরে না। আচার্য বলছেন, এই যে রজোগুণ, সংসারী লোকেরা বলে, *তৃষ্ণায়া হি অহং কারিত ইতি দুঃখিতানাং*, যারা সেবা কাজে লেগে আছে, তারা খুব দুঃখ করে বলে, তৃষ্ণার জন্যই আজ আমার এই দুরবস্থা। যে যাই বলুক, এই তৃষ্ণার শেষ হয় না, এটা *মহাশনো*। এর পেট এমনই যে, এর পেট কখন ভরে না, যতই দিতে থাক, ওর পেট ভরবে না। আর এই কাম মহাপাপী। কারণ মানুষ যখন কাম দিয়ে প্রেরিত হয়, তখনই সে পাপ করে। আমরা দেখছি মানুষ পাপ করছে, কিন্তু এই পাপ করাচ্ছে কাম, সেইজন্য কাম হল পাপী। হিন্দীতে খুব সুন্দর বলে, পাপী পেট কে লিয়ে। পেট কি করে পাপী হবে, পাপী হল কাম।

শুধু যে পাপী তাই না, *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্*, এই কামকেই তুমি তোমার শত্রু মনে করবে। তোমার মনে যে ইচ্ছাগুলো আছে, এটাকেই শত্রু মনে করবে। কেন শত্রু মনে করবে –

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

*(যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেই রকম কামনা দ্বারা এই বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে।)*

এখানে তিনটে উদাহরণ নিয়ে এসে বলছেন, কাঠে আগুন দিলে সেখানে আগুন জন্মায় ঠিকই, কিন্তু সেই আগুন ধুয়ো দিয়ে ঢাকা থাকে; আবার আয়না, অনেক দিন ব্যবহার হয়নি, ধুলোতে

আর্শি ঢাকা পড়ে যায়, ফলে দর্পণে আমরা আমাদের মুখ বা চেহারা পরিষ্কার দেখতে পারব না। আর গর্ভ জরা দিয়ে ঢাকা থাকে, সংস্কৃতে এটাকে বলে *উল্বেন্*। বলছেন, আসল জিনিসটা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে, ঠিক তেমনি আসল যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান ঢাকা থাকে কাম দিয়ে। তার মানে, আমার আপনার, এর ওর সবার ভিতরে সেই জ্ঞান পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, আত্মজ্ঞান সবারই ভিতরে আছে। কিন্তু সবারই এই জ্ঞান কাম দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে আবৃত। ইচ্ছা যদি না থাকত, কামশূন্য, বাসনাশূন্য যদি হত, তাহলে আমরা সবাই আত্মজ্ঞানী হয়ে যেতাম। সৃষ্টি যে আছে, তার মানেই তার ভিতর কোন কামনা আছে। এই কামনা আছে মানেই, আমাকে আপনাকে পাপের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ আমরা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছি, আত্মা, ঈশ্বর, জ্ঞান কোনটাই তো বাইরে নেই, সব আমাদের ভিতরেই। কিন্তু ওটাকে ঢেকে দিয়েছে কামনা দিয়ে। ফলে মানুষ নিজের স্বরূপকে জানতে পারে না। কামনা পুর্তির জন্য মানুষ বস্তুর পিছনে, ব্যক্তির পিছনে, নামযশের পিছনে দৌড়েই চলেছে। এই দৌড়ানর ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে পাপ করছে।

পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, এর উপর একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পরে ভগবান আবার বলবেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু কে? এখানে যেমন বলছেন, *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্*, একেই তুমি শত্রু বলে জানবে; আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয় আলস্য। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমের দিকে ভগবান বলছেন, *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্*, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে আছে, কিন্তু মনে মনে অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছে, যাদের আলস্য আছে তারা সবাই এই রকমই হয়, কোন কাজ না করে বসে বসে শুধু বড় বড় স্বপ্ন দেখে। এটা থেকে মানুষ যদি বেরিয়ে আসতে পারে, তখন সে আমার আপনার মত হয়ে যায়। আমি, আপনি কি রকম? আমি আপনি হলাম, যারা দিনগত কর্মক্ষয় করে যায়। একটু বিচার করে দেখতে হবে, আমরা আলস্য ছেড়ে দিয়েছি কোন সন্দেহ নেই। আলস্য যদি না ছাড়তে পারতাম, ঠিক টাইমে এই ক্লাশ শুরু করতে পারতাম না, ঠিক টাইমে আপনারাও শুনতে আসতে পারতেন না। কিন্তু আমরা সবাই দিনগত কর্মক্ষয় করে চলেছি। আমরা সবাই এটাই করি, সকালে উঠলাম, দাঁত ব্রাশ করলাম, চা খেলাম, খবর কাগজ পড়লাম, যা যা রোজ করতে হয় যতটুকু দরকার করলাম, মায়েরা যাঁরা আছেন তাঁরা একটু রান্না করলেন, দাদারা বাজার থেকে সবজি কিনে এলেন, খাওয়া দাওয়া করল, অফিসে গেল, বাড়ি এলো, টিভি দেখল, খেয়ে শুয়ে পড়ল, আবার আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত। সবাই মোটামুটি এইভাবে দিনগত ভাবে কর্মক্ষয় করে চলেছে। যারা আলস্যে আছে, যারা দিনগত কর্মক্ষয়ে আছে, এদের পক্ষে পাপ নাশ অসম্ভব। কারণ আলস্যে যারা আছে, তারা পাপ করবেই, আর দিনগত কর্মক্ষয়ে যারা আছে তারাও পাপ করবেই। এদের কোন উপায় নেই, শুনতে হয়ত অত্যন্ত খারাপ লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য।

তৃতীয় আরেকটা হয়, একটা আদর্শকে নিয়ে জীবনে যখন মানুষ এগোতে শুরু করে। আমাদের চারটে পুরুষার্থ – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটে পুরুষার্থকে আমরা এখন নূতন ভাবে সাজিয়েছি – বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। 'বিদ্যা' মানে, যে কোন বিদ্যার প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে এগিয়ে যাওয়া। 'সম্পদ', সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা। 'সেবা', সবার প্রতি সেবার ভাব; ঠাকুর বলছেন দয়ার ভাব। আর রইল 'ত্যাগ', ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দেওয়া। এই চারটেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, সেবা করার আগে জানতে হয় কিভাবে সেবা করতে হয়। আমি তখন বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী হয়ে ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। একদিন দেখছি মন্দিরের পাশে ট্যাপ খোলা, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, আমাকে সেবা করতে হবে, গিয়ে ট্যাপটা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করতেই দেখছি, ওদিক থেকে একজন এসে চেঁচাতে শুরু করেছে, 'আপনাকে কে বলেছে ট্যাপ বন্ধ করতে'? আমি বললাম 'ট্যাপ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে'। তখন বুঝলাম, মন্দিরের চারিপাশে

যে ড্রেন গুলো আছে, সেগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, তাই জল ছাড়া হয়েছে। আমি ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে আচার্যকে বললাম, 'দেখুন সেবা করতে গেলাম, বকুনি খেয়ে গেলাম'। উনি বললেন, 'মুর্খের মত সেবা করতে গেলে কেন? মুর্খের মত সেবা করতে গেলে এই রকমই হবে'।

সেবার জন্যও জ্ঞান দরকার। জ্ঞান অনেক রকম আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল আত্মজ্ঞান। যিনি আত্মজ্ঞানকে আদর্শ করে নিয়েছেন, তিনি সেই জ্ঞানের দিকে এগোলেন। সেখান থেকে নামতে নামতে সবটাই জ্ঞান। এই চারটে পুরুষার্থ বা বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ, যেমন ধরুন বিদ্যা, যে কোন বিদ্যা, যে গান ভালবাসে, সে নিজেকে গানের মধ্যে উৎসর্গ করে দিক, আপনি আঁকতে জানেন, আপনি বাজনা বাজাতে পারেন, গ্রাফিক ডিজাইন জানেন, ফটোগ্রাফি জানেন, কম্প্যুটারের প্রতি আগ্রহ আছে, নিজেকে উৎসর্গ করে দিন। একটা কোন আদর্শ যদি জীবনে এসে যায়, এবার পাপের সাথে লড়াই হবে। জীবনে যদি কোন একটা আদর্শ না থাকে, কেন বেঁচে আছি, এই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার কাছে পরিষ্কার না থাকে, তাহলে জানবেন পাপকে আপনি কোন দিন অতিক্রম করতে পারবেন না। পাপকে জয় করার প্রথম উপায় আলস্য ত্যাগ, দ্বিতীয় দিনগত কর্মক্ষয় ত্যাগ এবং তৃতীয় একটা আদর্শ গ্রহণ। আদর্শ যদি গ্রহণ না করা হয়, তাহলে পাপের সাথে লড়াই করে পেরে উঠবেন না।

আদর্শকে নিয়ে যখন এগোতে শুরু করল, আর তখনই কিন্তু সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের মধ্যে বাচ খেলতে থাকবে। এবার এর মধ্যে যখন কোন কাম আসবে, কোন প্রলোভন আসবে, তখন নিজেকে মনে করাতে হবে, এটা মারাত্মক বিপজ্জনক, আমাকে গিলে নেবে, *মহাশনো*। ঠাকুর সেইজন্য বলতেন, যারা একটা পথ নিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য কামিনী হল বিঘ্ন। তার উল্টোদিকে, মেয়েরা যারা একটা পথ নিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য বিঘ্ন হল পুরুষ, খেয়ে ফেলবে।

দেওঘরে একবার আমার এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি কখন মনে হয়নি, ঘর-সংসার করলে কেমন হত'? আমি বললাম, 'এখন তো কোন প্রশ্নই উঠছে না। দশ বছর আগের কথা যদি বল, যেটাকে তুমি কামাদি বলছ, এলে প্রথমেই আমার মাথায় আসবে, ওরা যে প্রাইস ডিমাণ্ড করবে, তা যে কোন জিনিস হতে পারে, যেমন আমি একটা ভাল জুতো কিনতে চাইছি, কিন্তু ওর একটা দাম আছে, আমাক টাকা জোগাড় করতে হবে, কোথা থেকে আমি এত টাকা পাব'। ঠিক তেমনি জগতে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর একটা প্রাইস ট্যাগ থাকবে। যেমন আলু কিনতে গেলে তারও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। ঠিক তেমনি সংসার যদি করতে চায়, তার একটা প্রাইস ট্যাগ আছে, সন্ন্যাস যদি করতে চান, তারও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। এবার যখন কেউ একটা আদর্শকে নিয়ে শুরু করল, এবারে সে পথ ছেড়ে যে একটু কামের দিকে যাবে, মনে করতে হবে ওখানে একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। আপনি কি সেই মূল্যটা দিতে রাজি আছেন? আপনার মনে হবে, এটা সম্ভব না। আমেরিকাতে Tuskegee University আছে, ওখানে প্রথমের দিকে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার প্রফেসর ছিলেন। উনি নিগ্রো ছিলেন, গাছপালা ভালবাসেন। আমেরিকাতে চিনা বাদামে উনি বিপ্লব এনে দিলেন। আজকের দিনে চিনা বাদামের যা কিছু আমরা পাই, সব ওনারই করা। উনি সারা জীবন অকৃতদার থেকে গেলেন, আর তিনি এই কথাই বলতেন, গাছপালা আমার প্রাণ; গাছপালার দিকেও মন দেব আবার আমার স্ত্রীর দিকেও মন দেব, আমার পক্ষে সম্ভব না। আদর্শবান পুরুষ, যার একটা আদর্শ আছে, আমরা এখানে ধর্মের আদর্শের কথা বলছি না, যেমন এই জর্জ ওয়শিংটন কার্ভার, গাছপালা ছাড়া কিছু জানেন না, যেমন আইনস্টাইন, ফিজিক্সের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন, এটাই আদর্শ।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব নামকরা বড় পদার্থ বিজ্ঞানী। উনি ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিট্যুইট অফ টেকনলজিতে ফিজিক্স পড়াতেন। ওনার একবার ইচ্ছে হল, এখানে মাইনে কম অন্য জায়গায় চলে

যাব। খুব কম বয়সে ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন, খুব ট্যালেন্টেড ছিলেন, আমেরিকার এ্যটমিক বোম্ব প্রজেক্টে ছিলেন, পরে নোবেল প্রাইজ পান। তিনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় আটশ ডলার পেতেন। তিনি এক বন্ধুকে লিখলেন, বন্ধু যে ইউনিভার্সিটিতে আছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলল আমরা এক হাজার ডলার দেব, তুমি চলে এসো। ফাইনম্যান নিজের হেডকে গিয়ে বললেন, হেড শুনে বলে দিলেন, এখানে কাজ করা মানে বিয়ে করে নেওয়া, এখান থেকে তুমি ছেড়ে যেতে পার না। তোমাকে আমরা বারশ ডলার দেব। ওকে জানালো, ওখান থেকে জানালো চৌদ্দশ ডলার দেব। এখানে জানাতে বলল পনেরশ ডলার দেব। ফাইনম্যান খুব সুন্দর একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। গ্রীকদের একটা কাহিনী আছে Balaam's Ass, রাস্থা দিয়ে একটা গাধা যাচ্ছে, দুদিকে ঘাস দেখছে। যখন রাস্থার ওইদিকে যায় তখন দেখছে অন্য দিকটায় ঘাস বেশি আছে, তখন গাধাটা সেদিকে চলে আসে। এখানে এসে যখন ঐ দিকে তাকায় তখন মনে করে ঐ দিকেই বেশি ঘাস আছে। সারাটা দিন গাধাটা রাস্থার এধার আর ওধার করে যাচ্ছে, খাওয়া আর হয় না। ফাইনম্যান বলছেন, এখানে কিন্তু ওই গাধার মত অবস্থা নয়, এখানে সত্যি সত্যি টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

তখন তিনি ভাবছেন, এত টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি হয়ত একটা ভাল বাড়ি ভাড়া নেব, সেখানে কোন একজন মিস্ট্রেসকে রাখব। আর সারাদিন ওকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকব, বিশ্বাসী কিনা, নাকি অবিশ্বাসী। এই করে করে আমার ফিজিক্স করাটা বন্ধ হয়ে যাবে, মাথায় খালি ওই মেয়েটি ঘুরতে থাকবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওনার ডিপার্টমেন্টাল হেডকে গিয়ে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না, অতিরিক্ত একটা পয়সাও আমার লাগবে না। ওই আটশ ডলারেই তিনি ওখানে থেকে গেলেন। ওনার প্রাণের জিনিস হল ফিজিক্সের জ্ঞান আহরণ করা, উনি সমস্ত কিছুর সাথে আপোষ করবেন এই ফিজিক্সের জন্য। তা সত্ত্বেও কাম আসছে, কিন্তু তখন বিচার আনছেন, আমার যেটা প্রিয় সেটাই আমার আসল, ওটাকে ভেবে ভেবে তিনি ওখান থেকে পিছিয়ে আসছেন। গীতার এখানে যে আলোচনা চলছে, এই আলোচনা কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য হচ্ছে না। এটা হচ্ছে, যাঁরা একটা আদর্শ নিয়ে নিয়েছেন। কেন?

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চল।।৩৯।।

*(হে কৌন্তেয়, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এটা অনলের মত দুষ্পূরণীয়। এই তৃষ্ণারূপ কাম দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে।)*

এটা কার জন্য বৈরী? বলছেন, জ্ঞানীদের জন্য বৈরী। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে মুর্খ, সে তৃষ্ণাকে কখন শত্রু মনে করে না। যাঁরা শাস্ত্র কথা শুনছেন, তাঁদের দেখে সাধারণ মানুষ হাসে, সারাদিন কি সব শুনছে। আপনাদেরই হয়ত বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে শুনতে হয় –আরে ভাই এটা তো সবার জানা আছে ভগবান আছেন, তিনি দেখছেন, সকাল বিকেল একটু তুলসী বাতাসা জল দিয়ে দিলে, একটু ধূপধুনো দিয়ে দিলে, এরপর আর কি দরকার! এদের তৃষ্ণার পুর্তি হলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আজকাল তো পাড়াতে হিন্দু ধর্ম নাম শুনলেই হা হা করে সব হাসবে, হিন্দু ধর্ম নিয়ে কেউ যদি কিছু বলে, ওর পিছনে সবাই ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে যাবে, এই দেখ একজন মুর্খ পাওয়া গেছে। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে প্রধানমন্ত্রী যখন ভূমি পূজা করলেন, সেটাকে নিয়ে লোকেরা বলতে শুরু করল secularism is dead। Secularism is dead, এই কথা যে আমরা প্রথম শুনছি তা না, কদিন বাদে বাদেই এই কথা বলা হয়। আমরা ভাবি secularismএর কত দম, কিছু দিন বাদে বাদেই আবার বেঁচে উঠছে। বাবরি মসজিদ যখন ভাঙা হল তখনও বলল, secularism is dead, মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখনও বললেন secularism is dead, সুপ্রীম কোর্টের রায়

যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেল, তখনও বলল secularism is dead। কি সাংঘাতিক জিনিস, secularism মরে যাচ্ছে আবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমিও মজা করে লিখলাম, অন্যান্য ধর্মের ফেস্টিভেলেসে আর ওদের পবিত্র জিনিসে যদি যান, তখন কিন্তু secularism মরে না। কিন্তু হিন্দুদের ফেস্টিভেলসে বা মন্দিরে যদি যান, secularism is dead। ঠিক তেমনি কেউ যদি হিন্দুদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে, তখন ব্যঙ্গ করে বলবে, চলো চলো দেখবে চলো, আলিপুর চিড়িয়াখানায় যেমন অনেক জন্তু আছে, আমাদের পাড়াতেও অনেক জন্তু আছে, যারা ধর্ম করছে।

এদের তৃষ্ণার পুর্তি হলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এদের কাছে সুখ হল কামিনী কাঞ্চনের সুখ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখ। এরা স্পর্শ সুখ পেতে চায়, গন্ধের সুখ পেতে চায়, রসের সুখ পেতে চায়। চোখ দিয়ে প্রিয়জনকে দেখবে, সুন্দরকে উপভোগ করবে, প্রিয়জনের কন্ঠস্বর শুনবে, মধুর সঙ্গীত শুনবে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী? পরে আর-এক জায়গায় বলবেন, জ্ঞানী অনেক প্রকার হয়, যাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়; যাঁরা বিচার করে করে বুঝেছেন ঈশ্বর কি, তাঁরাও জ্ঞানী; আবার যাঁরা এই পথে সদ্য নেমেছেন, তাঁরাও জ্ঞানী। যাঁরা এখন এই শাস্ত্র কথা, গীতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, তাঁরাও কিন্তু জ্ঞানী। জ্ঞানী না হলে এ-সব কথা শুনতেই চাইবেন না। আমরা এমনিতে মনে করি, জ্ঞানী মানে যার সমস্ত জ্ঞান আছে। জ্ঞানী মানে তা না, যাঁরা এই পথ নিয়েছেন তাঁদেরও জ্ঞানী বলা হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য ঠিক এই কথাই বলবেন। যিনি আত্মজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন, তাঁর কাছে কাম কেন বৈরী হতে যাবে, তাঁর কিসের ভয়! তাহলে এই কথা কাদের জন্য বলছেন? যাঁরা জ্ঞানপথের পথিক, জ্ঞানের চেষ্টায় যাঁরা লেগে আছেন, আমি আপনি সবাই, তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে। এনাদেরই শত্রু কাম। যে আলস্যে পড়ে আছে, তমোগুণী, তার জন্য কাম শত্রু নয়। যারা ভোগ করতে চায়, ইন্দ্রিয় সুখ, কামিনী কাঞ্চনের সুখ যে পেতে চায়, তার জন্য কাম তো মিত্র। এই কাম জ্ঞানীদের জন্য শত্রু।

যদি আপনি সত্যিকারের মনে করেন, আমি প্রায়ই ভুল কাজ করে ফেলি, মাঝে মাঝে পাপ কাজ করে ফেলি; তাহলে আপনার জন্য প্রথম হল আলস্য ত্যাগ, দিনগত কর্মক্ষয় থেকে বেরিয়ে এসে জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে আসতে হবে। আদর্শকে নিয়ে যখন চলতে শুরু করবেন, তখন দেখবেন বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা চলতে থাকবে। রিচার্ড ফাইনম্যানের যে গল্পটা বলা হল, ঠিক তেমনি আমাদের এদিকে একবার টানছে, আবার ওদিক থেকে টানছে। তখন মনকে মনে করাতে হয়, আমি কিন্তু কোন অজুহাতেই আদর্শকে ছাড়তে পারব না, নিজেকে এটা বারবার মনে করাতে থাকলে তখন আপনি আস্তে আস্তে আগের জায়গায় ফেরৎ চলে আসবেন।

আর এই পাপ জিনিসটা, আমরা এখানে যেটার আলোচনা করছি, এটা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। সাধারণ লোকেদের কাছে কামিনী কাঞ্চনের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ, আলস্য, দিনগত পাপক্ষয়, এগুলো পাপ নয়। যেমন একজন ক্রিমিনাল, যে খুন করে বেড়াচ্ছে, তার কাছে এটা পাপ নয়, সে মনে করছে আমি ঠিকই করছি। একজন লম্পট চরিত্রহীন লোক যখন মেয়েদের শীলহানি করে, তখন সে মনে করে না যে, আমি কোন ভুল কাজ করছি, তার কাছ এটাই আনন্দের। এখানে গীতায় যে জ্ঞানীর কথা বলছেন, এই জ্ঞানী হলেন যাঁরা ধর্মপথের পথিক। বিশেষ করে যাঁরাই জ্ঞানের সাধক, এটা তাঁদের জন্য।

যে কোন জিনিস যেটা বিঘ্ন রূপে সামনে আসে, সেটাকে সরিয়ে দিতে হয়। আপনি বুঝতে পারছেন এই কাজটা করলে আমার জ্ঞানলাভের পথে বিঘ্ন হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আপনি সেই কাজ করেন, আচার্য বলছেন, *জ্ঞানী হি জানাতি অনেন অহম্ অনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্বম্ এব ইতি*, জ্ঞানী পূর্ব থেকেই জানেন, এই কাম আমাকে অনর্থের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি করতে চাই না। যদি আপনার মনে এই বোধ এসে থাকে, আমি করতে চাই না, তাও আমি করছি, আপনি জানবেন

আপনি আধ্যাত্মিক পথে অনেক এগিয়ে গেছেন, কারণ বাকিরা এটাও বুঝতে পারে না। সে যে জানে না, তা না, সে মনে করে আমি যা করছি ঠিকই করছি, যা হবার হবে। একদিকে স্বার্থপর, অন্য দিকে মিথ্যে কথা বলবে, লোকেদের ঠকাবে, বলবে, বেশ করেছি। 'আরে ভাই, জীবন এভাবে চলে', এটাই তাদের ভাষা। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানী মানে যিনি এই পথে চলতে শুরু করেছেন, তিনি হা হুতাশ করেন আর মনে মনে বলেন, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম এত খারাপ যে, এখনও আমার ভিতরে এমন কাম, আমাকে দিয়ে এইসব ভুল কাজ করিয়ে যাচ্ছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে ইচ্ছা শক্তিটা বাড়ে, ওই ইচ্ছা শক্তি দিয়েই কাম দমন হয়।

কেউ যদি মনে করেন যে, একটা খুব উচ্চমানের কথা শুনবে আর সব ঠিক হয় যাবে, এভাবে হয় না। আধ্যাত্মিক জমিতে এই ইঞ্চি মাটি দখলের জন্য চাই তীব্র সংঘর্ষ, তীব্র সংগ্রাম। কিসের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে, এটাকে জানতে হয়। তার সাথে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়, সেটাকেও জানতে হয়, তবেই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আপনি যদি এটা বুঝে থাকেন যে, আপনার দ্বারা মাঝে মাঝে ভুল কাজ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। জীবনে একটা আদর্শ থাকলে ভুল কাজগুলো আরও বেশি ভিতরে বাজে। যারা মুর্খ তারাই মনে করে তৃষ্ণা আমার বন্ধু। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা মনে করে এই তৃষ্ণাই আমার সর্বনাশ করছে, কবে যে এই তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাব! এবার কামনা জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন।

কামের রূপটা কি রকম? কাম জিনিসটাকে আচার্য পরিভাষিত করছেন। প্রথমে বলছেন, ইচ্ছা হল কামের স্বরূপ, দ্বিতীয় কাম বহু কষ্টে পূর্ণ হয়। যে কোন জিনিস যদি আমি পেতে চাই, একটা সন্তানও যদি কেউ পেতে চায়, কত রকমের ঝামেলা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, এই টেস্ট, সেই টেস্ট, কত রকমের ওষুধ, তারপর দুশ্চিন্তা স্ত্রী সুস্থ থাকবে কিনা, সন্তানের জন্মটা ঠিক ঠিক ভাবে হবে কিনা ইত্যাদি। আর কাম হল অনলের মত দুষ্পূরেণ, সহজে এর পূরণ হয় না, তৃপ্তি হয় না। আগুনে যত যাই দেওয়া হোক তার আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, খেয়েই যাবে আর জ্বালিয়ে যাবে। বলছেন, এই যে জ্ঞান, এই যে আত্মজ্ঞান, বা যে কোন জ্ঞান যদি কেউ পেতে চায়, এই জ্ঞানকে কামনা-বাসনা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ফলে মানুষ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জ্ঞানীদের জন্য এটা নিত্য বৈরী, চিরশত্রু।

শ্রেয়োকে যদি পেতে হয়, তাহলে প্রেয়কে ত্যাগ করতে হবে। কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমরাজ প্রথমেই নচিকেতাকে বলছেন, শ্রেয়ো আর প্রেয়ো এই দুটো সবারই জীবনে আসে, প্রেয়ো মানে যেটা আমার ভাল লাগে; শ্রেয়ো মানে যেটা আমার জন্য ভাল। যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁরাই শ্রেয়োকে বরণ করেন। আর প্রেয়ো? সবাই এর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। শ্রেয়োর পথ সবার জন্য নয়। পাপ থেকে মুক্তি পেতে চান কি? তাহলে জ্ঞানের পথ অবলম্বন করুন, আর হা হুতাশ করুন, কেন আমার সঙ্গে এমনটা হল। সেইজন্য খ্রীশ্চান পরম্পরায় অনুশোচনা ও স্বীকারোক্তির ধারণা নিয়ে আসা হয়েছে। যখন কেউ গিয়ে যীশুর সামনে স্বীকারোক্তি করছে, তার মানে তার মনে একটা গ্লানি বোধ হচ্ছে। এই করেই মানুষ ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে।

প্রথমে দেখালেন কাম, পরের ধাপে দেখালেন কোথা থেকে পাপ জন্ম নিচ্ছে, কাম থেকে জন্ম নিচ্ছে। আচার্য বলছেন, *কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো*, এই কাম থাকে কোথায়? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *জ্ঞাতে হি শত্রোঃ অধিষ্ঠানে সুখেন শত্রুনিবর্হণং কর্তুং শক্যতে*, শত্রুর লুকোন আস্থানাটা যদি জানা থাকে, তবে গিয়ে শত্রুকে নাশ করা সহজ। আমাদের আগে জানতে হবে শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে। সাপ কোন গর্তে ঢুকে আছে জানলে, ওকে মারা সহজ। তেমনি এই কামকে যদি নাশ করতে হয়, তাহলে আগে জানতে হবে ব্যাটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। এবার ভগবান বলছেন –

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানামুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষা জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

*(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলে কথিত হয়। এদের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত করে কাম দেহাভিমানী জীবকে ভ্রান্ত করে।)*

আমাদের যে বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, আর তার সাথে মন আর বুদ্ধি, আমাদের পুরো পদ্ধতিটা চলে এই তিনটেকে নিয়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। যার কাছে সব রকম তথ্য এসে পৌঁছায়, সে হল মন, আর ওই তথ্যটা ঠিক না বেঠিক, এটাকে যে নিশ্চিত করে বলে দেয়, সে হল বুদ্ধি। মনকে বলা হয় সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা, আর বুদ্ধিকে বলে নিশ্চয়াত্মিকা, নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছে এটা আমাকে করতে হবে বা এটা আমার করা উচিৎ হবে না। মনে একটা চিন্তা এলো, আজ বাজার যেতে হবে, আবার চিন্তা এলো, না, আজ না গিয়ে কাল গেলে হবে, আবার চিন্তা করতে লাগল, নাঃ বাজারে গেলেই হয়, যাব কি যাব না, এটাই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক, এটাই মন। আর যখন বলছে যেতেই হবে, বা বলছে এই কাজ একেবারেই করা যাবে না, যে এটা ঠিক করে দিচ্ছে তার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি তৈরী হয় বিচার দিয়ে, শাস্ত্র শ্রবণ করে এবং গুরুজনের কথা শুনে। মন পুরোপুরি চলে তথ্য সরবারহের উপর, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য যেমন যেমন আসছে, সেই তথ্য দিয়ে মন কাজ করে। বুদ্ধি কাজ করে, যেটা আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে, সেটার উপরে।

তাহলে আমরা কি বুঝলাম? কাম আর ক্রোধের তিনটে বাসস্থান, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি। আমাদের এই বাইরের চোখ, কান, নাক এগুলো ইন্দ্রিয় নয়, আসল ইন্দ্রিয় হচ্ছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ু কেন্দ্রে অবস্থিত, আর এগুলো হচ্ছে তার যন্ত্র। মন আর বুদ্ধিরও কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্কে। ইন্দ্রিয়ের যত যন্ত্র এগুলো নার্ভ সেন্টারের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে বসে আছে। এই মস্তিষ্কেরই একটা বিশেষ কাজকে ইন্দ্রিয় বলা হচ্ছে, আর-একটা বিশেষ ধরণের কাজকে মন বলছে, সেই মস্তিষ্কেরই আর-একটা বিশেষ কাজকে বুদ্ধি বলা হচ্ছে। এই মস্তিষ্কই যখন স্থূল শরীরের মাধ্যমে বাইরে থেকে তথ্য আহরণ করে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে পাঠাবার কাজ করছে তখন তাকে বলছে ইন্দ্রিয়। মস্তিষ্ক যখন চিন্তা ভাবনা রূপে কাজ করছে, এটা করব কি করব না, ওখানে যাবো কি যাবো না, এই ধরণের যে চিন্তাগুলি করছে এটাকে বলা হচ্ছে মন। এরাও তথ্য আহরণ করছে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে চিত্ত। আর মনকে যখন বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে, এটাই ঠিক, এই ঠিক করে দেওয়ার কাজটা হচ্ছে বুদ্ধির। এই চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার, এদের মধ্যে অহঙ্কার সব সময় রাগ আর দ্বেষ থেকেই আসে। অহঙ্কার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করায়। যদি অহঙ্কারের নাশ করতে বলা হয় তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কেননা অহঙ্কারের কিছু করার নেই, আর চিত্তের কাজ শুধু বৃত্তি তৈরী করা। অহঙ্কারটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা, এর বাস হচ্ছে এই তিনটেতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে।

যে খেতে খুব ভালোবাসে, সে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন পেলেই সেখানে চলে যাবে। বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়াতে কার বড় ভূমিকা? তার দুটো পায়ের। পা দুটো যদি বলে দেয় আমি যাবো না, তখন তো আর তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়া হবে না। এখন সে যদি বলে আমি আর ভোজ খেতে যাব না, তখন পাকে বলে দেবে আমার পা যাবে না। রাগ আর দ্বেষ কোথায় ঢুকে আছে? মন আর বুদ্ধিতে। মন বলছে যাবো কি যাবো না, বুদ্ধি বলছে এবারের মত চল। বুদ্ধি যখন বলে দিল তখন আর কোন সমস্যাই নেই। এখন যদি কোন কারণে পা খোঁড়া হয়ে যায় তখন বুদ্ধি বললেও যেতে পারবে না, এগুলো হচ্ছে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। এখন যিনি সাধক তাঁকে বলা হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়গুলোর ছুটোছটি দাপাদাপি বন্ধ করতে হবে। তাহলে কি সাধক চোখে ফেট্টি দিয়ে, কানে সিসা ঢেলে, পা খোঁড়া করে চুপ করে বসে থাকবে? না, এগুলো করতে বলা হচ্ছে না। মস্তিষ্কে যে

প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঐটাকে আটকে দিতে বলা হচ্ছে, যেমন বাইরে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা আসছে, সেই উত্তেজনা নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে গিয়ে সে ঠিক সেই উত্তেজনাটা বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, এই বাইরে ছুঁড়ে দেওয়াটাকে আটকাবার কথা বলা হচ্ছে। তার থেকে আরও বড় ব্যাপার হল এই প্রতিক্রিয়ার সাথে যখন কামনা বাসনাগুলো জুড়ে যায় তখন সাধককে পুরো বিধ্বস্ত করে দেয়। তাহলে উপায় কি?

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানাং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্।।৪১।।

*(হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূ এই কামকে পরিহার কর।)*

পাপ থেকে কিভাবে আমরা বাঁচব? আগে একটা আদর্শ রাখার কথা বলা হয়েছিল, জীবনে একটা আদর্শ রাখলে পাপ থেকে বেরোন যায়। গীতা এখানে বলছে, *তস্মাৎ ত্বম্*, হে অর্জুন তুমি যদি এটা থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে *ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য*, আদৌ মানে সবার আগে, সবার আগে তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়মন্ কর। একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখলাম, ইচ্ছে হল গালটা টিপে আদর করি, তার মানে তোমার মধ্যে শোভন অধ্যাস আছে, সুন্দর জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আছে। চোখের সামনে সুন্দর একটা বাচ্চা এসে যেতে পারে, আসতেই পারে। এবার আমার ইচ্ছে হল ওকে আদর করি, প্রথমে চোখের মাধ্যমে বাচ্চার চেহারাটা ভিতরে গেল, মনকে সে বলল, কি সুন্দর বাচ্চা। মন এবার হাতকে বলল, একটু ছুঁয়ে দেখ। এতক্ষণ সবটাই মনের মধ্যে চলছে, দ্বিতীয় ধাপে হস্তেন্দ্রিয় এগিয়ে গিয়ে বাচ্চার গালে হাত দিল, এবার কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্যন্ত ঠিক আছে, কিছু করার নেই, কারণ একটা তথ্য এসে গেছে, তথ্য অনবরত আসতেই পারে। পরের ধাপটাই আসল, কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, কর্মেন্দ্রিয় যেন না এগোয়। এমন যেন মনে না হয় যে, হাত-পা যেন আপনার না। আপনার ইচ্ছা বিনাই হাত-পা চলছে, যেমনি শুনল ওই পাড়াতে মারামারি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাবে। এটাকেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বলছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ করুন। প্রথমে কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ।

এখান জ্ঞান মানে, শাস্ত্র পড়েছেন, পড়ার পর যখন আত্ম-অনাত্ম, বিদ্যা-অবিদ্য এই তফাৎ গুলো বুঝে নিলেন, এটাকে বলে জ্ঞান। আর এটাকেই যখন বিশেষ ভাবে জানা হয়, অর্থাৎ যখন প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তখন সেটা হয়ে যায় বিজ্ঞান। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে; খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়াটা বিজ্ঞান। যে জিনিসটাকে শুধু দেখেছে, এটা জ্ঞান। বলছেন, তুমি এটা বুঝে নাও, এই পাপ তোমার যেটা কল্যাণপ্রাপ্তি হওয়ার পথে বাধক, সেটাকে নাশ করবে।

কামেরও একটা প্রাইস ট্যাগ আছে। এখানে আবার আমাদের একটু পিছনের দিকে যেতে হবে, যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, বিষয়ী লোকেরা মুর্খ, তারা বিষয় সেবন করতে পারলে খুব খুশী হয়। অসুররা গন্ধ শুঁকে খায়, মদের গন্ধেই অনেকের নেশা ধরে যায়, এটা আসুরিক বৃত্তি। মানুষ জিহ্বা দিয়ে খায়, স্বাদকে আস্বাদ করে। দেবতারা দৃষ্টি দিয়ে খায়। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের একটা ঘটনা আছে। তখন তিনি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। একদিন ওনার সেবক কলকাতায় গেছেন। এদিকে মহারাজের দুপুরের খাবার সময় হতে যাচ্ছে, এখনও দশ মিনিট বাকি আছে। মহারাজ বলছেন, 'কলকাতায় গেছে, আমাকে বলে গেছে সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে, কিন্তু এখনও ফিরছে না তাই চিন্তা হল, কারণ, আমি কতটুকু খাই ওই জানে'। কল্পনা করা যায়, উনি জানেন না উনি কতটুকু খান। কি খান সেটা তাঁর পাচকরা জানে। কিন্তু কতটুকু খান এটা জানে ওনার সেবক।

ওনার খাওয়াটা পুরোপুরি ডিউটির মধ্যে চলে গেছে, সেখানে যে কোন গন্ধ বোধ, রূপ বোধ থাকবে, কোন কিছুই নেই।

তাই বলে কি জ্ঞানীর কাম ও ক্রোধ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সাধারণ মানুষের কাম ক্রোধ আর জ্ঞানীর কাম ক্রোধের পার্থক্য শুধু গভীরতা আর স্থায়ীত্বে। জ্ঞানী বুঝতে পারেন আমি রেগে গেছি, অজ্ঞানী বা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেনা যে আমি রেগে গেছি। কাম নেই ক্রোধ নেই একমাত্র মরা মানুষের। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরও ক্রোধ হবে, স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে এতো উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একদিন পিতামহ ভীষ্ম এমন প্রবল পরাক্রমে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন যে অর্জুন সামলাতেই পারছিল না, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রেগে গিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে 'আজকেই ভীষ্মদেবকে শেষ করে দেব' বলে রথ থেকে যেই নেমে পড়েছেন, অর্জুন গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'আপনি এ কি করতে যাচ্ছেন প্রভু'। অর্জুন যেমনি বললেন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন। আর অর্জুন যদি নাও বলত তাহলে কি হত? কিছুই হত না, আরও দু'পা গিয়ে নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে চলে আসতেন। কাম ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে এটাই। কাম আর ক্রোধ যে কখনই আসবে না সেটা বলা হচ্ছে না। কাম আর ক্রোধ উঠবে না যে বলা হচ্ছে, এর অর্থ হচ্ছে উঠলেই জ্ঞানী সজাগ হয়ে যান।

আবার অনেক সময় এনাদের ক্রোধ যখন ওঠে তখন প্রয়োজনে সেই ক্রোধকেও প্রকাশ করতে হয়। শ্রীরামচন্দ্রও ক্রোধকে প্রকাশ করেছেন, মহম্মদও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটার পেছনে অন্য কারণ আছে। লোভ জনিত, স্বার্থজনিত কোন ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে না, এখানে সবটাই হচ্ছে পরমার্থের জন্য, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যই আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং যুদ্ধে আমার ক্রোধকেও প্রকাশ করতে হচ্ছে। এই জিনিস গুলোকে কেউ মুখে বলে দিলে ধরতে পারবে না। যেমন যেমন সে সাধন জীবন যাপন করবে তেমন তেমন এগুলোও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব উত্তর কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কাছ থেকেই আসে। ভালো করে জপ ধ্যান করলে ঠাকুরই সব উত্তর দিয়ে দেবেন। আর এটা অত্যন্ত বাস্তব কথা।

কারণ যে কোন উত্তর যদি ঠাকুরের মুখ থেকে সাক্ষাৎ না আসে ওই উত্তরে কোন দিনই আমাদের সংশয় দূর হবে না। যেদিন ঠাকুর সামনে বসে শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষাটাই শিক্ষা আর বাকি সব অসার, সেইজন্যই বলা হয় সব বিদ্যাই অপরা বিদ্যা, একমাত্র পরা বিদ্যা সেটাই যেটা ভগবান নিজে শিক্ষা দেন। বেদ, গীতা, উপনিষদ, কথামৃত সবই অপরা বিদ্যা। তার মানে আগে গুরু যেটা বলে দিয়েছেন, শাস্ত্র যেটা বলছেন সেই কথাতে আপাততঃ বিশ্বাস রেখে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে, সাধনা করে করে ঠাকুরের দর্শন করে, দর্শন মানে চোখ বন্ধ করে বাইরেও অন্ধকার ভেতরেও অন্ধকার দেখা নয়, সামনে এসে ঠাকুর বলবেন – বল তোমার আজ কি প্রশ্ন। আমার এই প্রশ্ন। ঠাকুর বলবেন এই প্রশ্নের এই উত্তর, তখন পরিষ্কার হবে, তার আগে হবে না।

সুফি সাধকদের জীবনী পড়লে, খ্রীশ্চান মিস্টিক সাধকদের জীবনী পড়লে দেখা যাবে, সবাই এই একই কথা বলছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও শঙ্করাচার্য এই কথাই বলছেন। গীতা পড়ে গীতা কি বলতে চাইছে এটাকে ধারণা করার নাম জ্ঞান, আর ঠাকুর এসে যখন নিজে বলবেন তখন ওটাই বিজ্ঞান। ঠাকুর না আসা পর্যন্ত বিজ্ঞান হবে না। ঠাকুরই বলছেন জ্ঞানী ভয় তরাসে, জ্ঞানী সব সময় ভয়ে থাকে কখন পতন হয়ে যাবে ঠিক নেই। এই দেখছি বিরাট সাধু, কত লেকচার, কত ভক্ত, কি সুন্দর সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন; তার কিছু দিন পরে খবরের কাগজে ঐ সাধুর নামে একটা কেচ্ছা বেরিয়ে গেল। এটাই স্বাভাবিক, বিজ্ঞানী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পতনের সম্ভবনা থাকবেই, তবে হ্যাঁ, অজ্ঞানীর থেকে তিনি অনেক উপরে। যারা জ্ঞানীদের পতন দেখে তির্যক দৃষ্টিপাত করে, তাদের বোঝা দরকার যে তারা বহু জন্মেও ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে না যেখানে উনি পৌঁছে

গেছেন। এই পতনের পর জ্ঞানী এবার যেখানে এগিয়ে যাবেন, সেখানে পৌঁছান আমাদের মত সাধারণের লোকের পক্ষে সম্ভবই নয়।

জ্ঞানী যত উপরে উঠবেন ততই তাঁর পা টলমল করে পড়ে যাবার সম্ভবনা বেশি হবে। আমরা যখন পায়ে হাঁটছি তখন পা স্লিপ করে পড়ে যেতে পারি। এখন যদি চার ফুটের রণপা নিয়ে হাঁটি তখন পড়ে যাওয়ার ভয়টা আরও বেড়ে গেল। আর যদি পনের ফুট লম্বা রণপা নিয়ে হাঁটি, তখন ব্যালেন্স আরও কঠিন হয়ে যাবে। যদিও আমাকে বিরাট উঁচু দেখাচ্ছে কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আমার পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর রণপাটাকে যদি একশ ফুট করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার ব্যালেন্স কিন্তু তখন পুরো টলমল করবে, যখন তখন পড়ে যেতে পারি, আর পড়া মানে মুখ থুবড়ে পড়ে কি হবে ভাবাই যাবে না। আমার উদ্দেশ্য এই রণপা দিয়ে বিরাট উঁচু একটা পঁচিলকে ডিঙিয়ে ওই আনন্দের ফোয়ারার কাছে যাওয়া। পাঁচিলটাকে যদি কোন রকমে টপকে যেতে পারি তাহলে তো কেল্লা ফতে হয়ে গেল; কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার ভয় থাকবে। এটাই জ্ঞানীদের সমস্যা। এই সমস্যার ব্যাপারটা সাধারণ লোকেদের ধারণার বাইরে। এই যে এখানে ভগবান বললেন -*পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্; জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্*, বলতে চাইছেন এই ধরণের পাপ কর্ম তোমার জ্ঞানকে তো নাশ করেই দেবে আর সাথে সাথে *বিজ্ঞান নাশনম্* মানে বিজ্ঞানী হতে দেবে না। বিজ্ঞানীর কখন নাশ হয় না, যাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে গেছে আর তাঁর কখন নাশ হবে না।

এই পাপ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বসে আছে, মন ও বুদ্ধিতে বসে আছে। একটা কোন কিছুর আইডিয়া এলেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। স্মৃতিতে এসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, স্বপ্নে এসে জ্বালায়। আমরা সাধু সঙ্গ করি না, শাস্ত্র আমরা পড়ি না, ঈশ্বর চিন্তন করি না বলে বুদ্ধিও সেই রকম তীক্ষ্ণ হতে পারে না; বুদ্ধিতেও সেই রকম জোর নেই। ঠাকুর দুই চাষার গল্প বলছেন। দুই চাষা ক্ষেতে জল আনার জন্য সকাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে। একজনের স্ত্রী এসে বলল, 'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, এত বেলা গড়িয়ে গেছে, এখন স্নান করে খেয়ে নেবে চলো, পরে করলে হবে'। সেই চাষা সব শুনে বলল, 'তুই যখন বলছিস, তাহলে চল বাড়ি যাওয়া যাক'। এই চাষার আর ক্ষেতে জল আনা হল না। অন্য চাষার স্ত্রীও এসে এই কথা বলতেই, সে কোদাল তুলে বউকে তেড়ে গিয়ে বলছে, 'তোকে কেটেই ফেলব; জানিস না, দু বছর খরাতে জলের জন্য চাষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এ বছর ছেলে মেয়ে কি না খেয়ে মরবে'? এটা হল স্থির বুদ্ধির দৃষ্টান্ত। না মানে না, সেখানে আর কোন কথা চলবে না।

এসব কথা শুধু জানা থাকলেই হবে না, এই কথাগুলিকে কি আপনি কাজে লাগাতে পারছেন? যদি না লাগাতে পারেন, তার মানে আপনার বুদ্ধি দুর্বল। বুদ্ধিকে সবল করার জন্য আপনার নিয়মিত সাধুসঙ্গ দরকার, নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন দরকার, নিয়মিত আপনার জপধ্যান দরকার, আর জীবনে প্রচুর মার খাওয়া দরকার, প্রচুর মার যদি না খান, পথে কোন দিন আসবেন না। বলছেন প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ কর, আর কামরূপ শত্রুকে ভাল করে চিনে রাখ। আমরা বুঝতে পারি, আমার মনে চাঞ্চল্য আসছে। আসলে যাঁরা দীর্ঘ দিন প্রচুর জপধ্যান করেন, একটা সেশনে অন্ততঃ দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা যদি নিত্য বসা হয়, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় আমার মনে এই চিন্তা উঠছে, যেমনি চিন্তা উঠল সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তাকে উড়িয়ে দিতে হয়, তবে গিয়ে শক্তি বাড়ে।

স্বামী তুরিয়ানন্দজীর একটা বর্ণনা আছে, একদিন তিনি বসে নিজের মত হেসে যাচ্ছেন। একজন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ হাসছেন কেন'? মহারাজ বলছেন, 'আমি মনের খেলা দেখছি, মনের খেলাগুলিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছি'। জিনিসটা সত্যিই খুব মজার, আমরাও এই জিনিসটা করতে পারি। মনকে লক্ষ্য করতে থাকছি, এক্ষুণি কি ভাবছিলাম, তার আগে কি

ভাবছিলাম, তারও আগে কি চিন্তা এসেছিল, এটা করতে করতে এক সময় দেখছি মনটা আবার ছুটে পালিয়ে গেছে। আবার মনকে টেনে এনে মনের লীলাখেলা দেখতে লাগলাম। এইভাবে কিছু দিন অভ্যাস করলে বোঝা যায়, মন কিভাবে লীলা করে। পরের শ্লোকে বলছেন এগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব কিভাবে?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২।।

*(স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় থেকে মন এবং মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা।)*

এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য শ্লোক। ইন্দ্রিয় থেকে মন সূক্ষ্ম, মন থেকেও সূক্ষ্ম হল বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে সূক্ষ্ম প্রকৃতি আর প্রকৃতি থেকেও সূক্ষ্ম হলেন সেই ঈশ্বর। বেদান্ত যে সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করে, তাতে বলা হয় ঈশ্বরই আছেন, তাঁরই দুটো প্রকৃতি পরা ও অপরা বা চৈতন্য বা জড় রূপে বলা হয়, যার কথা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলবেন। এই জগতে প্রকৃতি প্রথম যখন খেলা শুরু করে তখন সমষ্টি মন সবার উপরে। সেখান থেকে সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে নামতে শুরু করে, এবং ক্রমশ স্থূল হতে থাকে। আমাদের যে ব্যষ্টি মন, এই মন অত্যন্ত স্থূল, ফলে আমরা যে ভোগ করি সেটাও অত্যন্ত স্থূল। আমাদের যে সমস্যাগুলি আসে, সেই সমস্যাগুলিও অত্যন্ত স্থূল। সাধনা শুরু করার পর মন আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম হতে শুরু হয়, সেখান থেকে আরও যত সূক্ষ্ম হয়, তখন প্রকৃতির সব কিছুকে একটা একটা করে জয় করতে করতে এগিয়ে যেতে হয়। এখন যে অবস্থায় আমরা আছি, এটা অত্যন্ত স্থূল অবস্থা, সেইজন্য এই অবস্থায় প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করতে হয়। সবাই বলে, আমার মন খুব চঞ্চল, আমি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব বলে দিন। প্রথম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মধ্যে প্রথম হল বাণী, সবার আগে বাকসংযম দরকার। বাকসংযম থেকে বাকি ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, আহার সংযম, নিদ্রা সংযম ইত্যাদি। প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা একটা করে সংযম করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করে। প্রথমেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মাউন্ট এভারেস্টে এমনি এমনি ওঠা যায় না, ধাপে ধাপে উঠতে হয়।

ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি এই সব কিছুর মালিক আত্মা। তোমার প্রধান সমস্যা তৈরী করছে তোমার রাগ আর দ্বেষ। তাই এই রাগ ও দ্বেষকে নিয়ন্ত্রণ কর। আপাতদৃষ্টিতে এই রাগ ও দ্বেষকে সংযত করার সহজ উপায় বিষয় থেকে সরে আসা। কিন্তু এটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়, এই রাগ ও দ্বেষই আবার রূপ পাল্টে অন্য ভাবে আসবে। তাই বলা হচ্ছে আগে ইন্দ্রিয় সংযম কর। ইন্দ্রিয় সংযম হল, যেমনি খবর পেলাম ওখানে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখনই জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে আটকে দাও। এটা যদি করতে না পার তাহলে মনের মধ্যে যা সঙ্কল্প বিকল্প আসছে আসুক, কিন্তু আমি এটা করব না। এটাকেও যদি না আটকাতে পার তাহলে তুমি যেটা শেষে ঠিক করে নিয়েছ যে ওখানে যাব, এই ঠিক করাটাকে আটকাও।

আগেকার দিনের শিক্ষিত মার্জিত পুরুষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের বুদ্ধিটা ছিল পরিমার্জিত। বুদ্ধি মানে আমরা যে অর্থে বিষয়ীর বুদ্ধি মনে করি সেই intelligence এর কথা বলা হচ্ছে না। শাস্ত্র আর আচার্যের কাছে শুনে শুনে যে পরিমার্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিকে বলছে decision making faculty, এত পরিষ্কার ছিল যে তাঁদের বুদ্ধি কোন অনিয়ম বেনিয়মের মধ্যে কখন যাবেই না। যেমন আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, আমাদের যদি বলা হয় গরুর মাংস খেতে, তাহলে আমরা আঁৎকে উঠব, তার মানে গরুর মাংস খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে বুদ্ধি সেটা পরিষ্কার, এখানে সঙ্কল্প-বিকল্প কখনই উঠবে না, ইন্দ্রিয় এই ব্যাপারে কোন স্বাধীনতাই পাবে না, ইন্দ্রিয়ের সামনে বিষয় থাকুক আর নাই থাকুক গরুর মাংসের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। অথচ

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে তারা এখন চুটিয়ে গরুর মাংস খেতে শুরু করেছে। এখানে এদের কাছে শাস্ত্রের কথাতে শ্রদ্ধা নেই, বুদ্ধি দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমবার বীফ্ মুখে দিতে তারও মন অবশ্যই চঞ্চল হবে। একবার যখন মুখে তুলে নিয়েছে, তখন বুদ্ধির উপর তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেল। অথচ এদেরই বাবা মা যাঁরা ভারতে আছেন তাঁরা বীফ্ খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। ভারতবর্ষে বীফ্ খাওয়ার নামে সরকারের পতন হয়ে যাবে। ভারত যখন কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল, তখন সেখানে সেখানে ক্রীড়া মন্ত্রীকে লিখিত ভাবে নোটিশ দিতে হয়েছিল যে, No beef will be served, অথচ আমাদের সন্তানরা আমেরিকাতে গিয়ে বীফ্ খাচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে আমি তার বাইরে যাব না, তখন ইন্দ্রিয়, রাগ, দ্বেষ, কামক্রোধাদি আমাকে কিছুই করতে পারবে না। আর এই শাস্ত্র প্রমাণের উপর একটাই আছে, সেটা হল আত্মজ্ঞান। আমি যদি সব সময় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকি, প্রতিষ্ঠিত না হলেও যদি আত্মজ্ঞানের চিন্তন মনন নিয়ে সব সময় থাকতে পারি, তাহলে কখনই এই শত্রুগুলো আমাকে কোন গোলমালের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তো বিশুদ্ধ আত্মা, আমি এগুলো কেন করতে যাব, এই ভাবকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে কখনই কোন গোলমাল হবে না।

বুদ্ধি হচ্ছে সবার মা। একটা ছাগল, তার দুটো তিনটে বাচ্চা, ছাগলকে যদি ধরে নিই তখন বাচ্চাগুলো নিজে থেকেই তাদের মায়ের পেছনে পেছনে যাবে। ইন্দ্রিয়গুলি হল মনের বাচ্চা, মনের মা হল বুদ্ধি। বুদ্ধিকে যদি একবার ধরে নেওয়া যায় তাহলে সব কটা পথে এসে যাবে। কিন্তু যদি আমরা আত্মজ্ঞানকে সব সময় ধরে রাখি, এখানে আত্মজ্ঞান বলতে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে না, আত্মজ্ঞানকে এখানে আত্মবুদ্ধি রূপেই বলা হচ্ছে –আরে আরে আমি এগুলো কি করছি, আমি তো সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য; এই বুদ্ধি করা। বিশুদ্ধ আত্মা কখনই রাগ ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হবেন না। যখনই মনে হবে আমি যে এই কাজটা করছি, এটা আমি রাগ ও দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয়ে করছি, যেমন আমার বাড়ির দরকার নেই কিন্তু একটা বাড়ি কিনছি, গাড়ির দরকার নেই গাড়ি কিনছি, তখন আমি চিন্তা করছি কি করব, কিনব কি কিনব না, কেনাটা কি ঠিক হবে, তখনই স্মরণ করতে হবে আরে এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি তো আত্মজ্ঞানের পথিক, আমি কেন রাগ ও দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে এগুলো কিনতে যাব। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তার এগুলো শোভা দেয় না। এই চিন্তা যখন হতে থাকবে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনের ছবিটা পুরো পাল্টে যাবে, তখন কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কথাই শাস্ত্রে আছে, তাই শাস্ত্র আর আত্মজ্ঞানী একই জিনিস।

আমাদের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত সংশয় উপস্থিত হয়, আমি এটা করব কি করব না, আমি সেখানে যাব কি যাব না, এই ধরণের সংশয় হওয়া মানে আমি decision making faculty তে এখনও পিছিয়ে আছি। এই decision making খুব সহজ ভাবে হয় যদি আমি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই, আমি বিশুদ্ধ আত্মা, আমার এখন সেই বোধ হয়নি, কিন্তু আমি ঐ পথের পথিক, তাই আমি আমার মনকে চঞ্চল হতে দেব না। কিসের থেকে চঞ্চল হতে দেব না? রাগ আর দ্বেষ থেকে, কারণ আত্মাতে রাগ আর দ্বেষের কোন স্থান নেই। আমি এমন কোন কাজ করব না যেটা রাগ আর দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত।

এই সব বলার পর ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি এটা জানো, সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছেন আত্মা। মনকে আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরের দিকে নিয়ে যাও, তবেই ঠিক ঠিক কাম জয় হবে; আর এই ভাবে যখন তুমি এগোতে থাকবে, তখন কি হবে –

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩।।

*(হে অর্জুন, শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করে বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মাকে এইরূপে জেনেই অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে জ্ঞান দ্বারা মূলোচ্ছেদপূর্বক বিনাশ কর।)*

কামের এত বিশেষণ রয়েছে যে, *দুরাসদম্*, বোঝা যায় না, জানা যায় না; কামের আর-একটা বিশেষণ। এটাও কাম, ওটাও কাম, সেটাও কাম; তার সাথে বলছেন, কাম এভাবে নাশ হয় না। যদি কামকে নাশ করতে চাও, তাহলে আগে তোমার ইন্দ্রিয়কে জয় কর, তারপর মনকে জয় কর, তারপর তোমার বুদ্ধিকে জয় কর, সেখান থেকে সমষ্টি মনকে জয় কর। সেখান থেকে তোমাকে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে আত্মাতে গিয়ে নিবাস করবে। যেদিন তুমি আত্মাতে গিয়ে অবস্থান করবে সেদিনই তোমার কাম নাশ হবে। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, প্রভুর নাম করে যাও। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর নাম করেই যাচ্ছে, কিন্তু কারুরই কিছুই তো হচ্ছে না। কারণ প্রভুর নামের সাথে সংযমের পদ্ধতিটাও সেই একই।

কি সেই পদ্ধতি? *এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা*, আগে তুমি ভাল করে বুঝে নাও আত্মাই শেষ কথা, ঈশ্বরই শেষ কথা। তখন আত্মা দিয়ে আত্মাকে স্তম্ভন কর, নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে যেমন আটকে দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আত্মা দিয়ে আত্মাকে মানে, শুদ্ধ মন দিয়ে অশুদ্ধ মনকে নিয়ন্ত্রণ কর। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়ে আবার আলোচনা করবেন। মনকে আত্মাতে সমাধিস্থ কর। বলতে চাইছেন, মনকে যদি একটা উচ্চ আদর্শের দিকে না নিয়ে যেতে পার, মন পাপ করবেই। মন যদি সব সময় ঈশ্বরে সমাহিত না থাকে, মন যদি সর্বদা আত্মজ্ঞানে সমাহিত না থাকে, মন যদি একটা উচ্চ আদর্শ না নিয়ে থাকে; পাপ হবেই, কিছু করার নেই।

মনকে পাপ কাজ থেকে সরিয়ে এনে একটা কোন উচ্চ আদর্শে যদি না রাখা হয়, মন এদিক সেদিক দৌড়াবেই। বাচ্চাদের যদি একটা দায়ীত্ব না দেওয়া হয়, বাচ্চা বাড়িতে উৎপাত করবেই। মন হল অত্যন্ত দুর্দান্ত দুরন্ত বাচ্চা ছেলে, ওকে তাই কোন না কোন কাজে লাগিয়ে রাখতে হয়, না লাগালে মন পাপ করবেই। পাপকে যদি জয় করতে হয়, তার একটাই উপায়। আত্মার ব্যাপারে জানো, ঈশ্বরের ব্যাপারে জানো, সেখানে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসো, আর ওখানে মনকে লাগিয়ে রাখো। এর শুরু হয়, ইন্দ্রিয় জয় করা থেকে, ইন্দ্রিয় জয়ের পর চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। সেই নিয়ন্ত্রিত মনকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখতে হয়, সেখান থেকেই পাপের নাশ হয়। তার আগে পাপ কমে ঠিকই, কিন্তু পুরো নিয়ন্ত্রণ হয় না।

যারা প্রথম প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসেন তাঁদের কাছে শাস্ত্রের সব কথা নূতন মনে হলেও তাঁদের মনে এই বোধ হয় যে, যা কথা শুনছি এগুলো যেন অন্য কোন উচ্চ জগতের কথা। এনারা বোধ করে থাকুন আর নাই থাকুন, মানুন নাই মানুন কিন্তু এটা মনে হবে যে এগুলো যা শুনছি সব অন্য জগতের কথা। আর যারা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাদের কাছে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছেন যে একটা উচ্চ সত্তা কিছু আছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে। এখন তাদের যদি কোন সমস্যা আসে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সংশয় আসে, এই কাজটা করব কি করব না, তখন কি হবে - *এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা*, এই বুদ্ধিকে *পরং* দিয়ে, *পরং* হচ্ছেন আত্মা, আত্মা দিয়ে বুদ্ধিকে একেবারে *সংস্তভ্যাত্মাননাত্মনা*, নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে, আত্মা যেন বুদ্ধিকে গলা টিপে ধরে বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে। এই আত্মভাবটাকে দৃঢ় করার কথাই বলা হচ্ছে। আত্মভাব দৃঢ় হয়ে গেলে যে বুদ্ধি বলছিল করব কি করব না, সে তক্ষুণি বলে দেবে কি করতে হবে। বুদ্ধির পরে যে মন রয়েছে সে তো এই আত্মভাবের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না, ফুঁ মেরেই উড়িয়ে দেবে।

এখানে বলছেন *জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্*, দুর্জয় শত্রু হচ্ছে কামনা-বাসনা, এই কামনা-বাসনাগুলোকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। কিভাবে ভস্ম করবে? ইন্দ্রিয় সংযম কর, ইন্দ্রিয় সংযমে ভস্ম হবে না, তবুও মন্দের ভালো। ইন্দ্রিয় সংযমের থেকে আরও ভালো হবে তোমার মনকে বশে নিয়ে এসো। মনকে বশ করলেও সমস্যা থেকে যাবে, এরও উপরে আছে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ কর। কিন্তু আত্মজ্ঞানের অনুশীলন যদি তুমি কর তাহলে এই পুরো ব্যাপারটাই চিরদিনের মত মিটে যাবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কোন দিন আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না, বিরক্ত করবে কিন্তু তোমাকে কাবু করে দিতে পারবে না, বিজ্ঞানীর অবস্থায় যতক্ষণ না যাবে, প্রত্যক্ষ দর্শন যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পতনের সম্ভবনা থাকবে। পতন হয়ে গেলেও তুমি শেষ হয়ে যাবে না, ওখান থেকেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার তুমি চলতে থাকবে।

এরপর আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসের ধারণাটাকে নিয়ে আসবেন। এতক্ষণ দেখান হল কাজ কিভাবে হয়, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে কখনই কাজের প্রশংসা করা হয় না। পুরো গীতার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কখন যোগ হয় না। কিন্তু এই জগতে যত লোক আছে তাদের ৯৯.৯৯৯% লোক জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত নয়। সেইজন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে কর্ম করতে। কর্ম করতে গেলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পুরো আসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। এর পর শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্মে যে কর্ম করার কথা বলছে সেগুলো করা। স্বধর্ম করতে করতে যখন মন আর-একটু পরিষ্কার হল তখন অনাসক্ত ভাব নিয়ে কাজ করা শুরু করতে হবে। অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে করতে যখন মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল এইবার তুমি কাজ কমাতে শুরু কর। কাজ কর্মে বেশি না জড়িয়ে তোমার মনটাকে এবার আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। মন যখন আত্মজ্ঞানে পুরো বসে গেল, তখন তোমার জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান লাভের পর এবার তুমি সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তোমাকে কিন্তু আবার কাজ করতে হবে। তোমাকে কিন্তু পুরোপুরি কাজকর্ম ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে থাকতে বলা হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী, যীশু, মহম্মদ এনারা সবাই কাজ করে গেছেন। তুমিও কাজ ছাড়বে না, কিন্তু এটা তোমাকে জেনে রাখতে হবে যে কাজটা হচ্ছে সিঁড়ি মাত্র, কাজ কখনই উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধির আর যোগবুদ্ধির কথা বলেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু এই যোগবুদ্ধিটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

**ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগ নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।**

চতুর্থ অধ্যায়

# জ্ঞানযোগ

গীতা ঠিক ঠিক বুঝতে হলে গীতার ক্লাশগুলো প্রথম থেকে শুনতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা অধ্যায় এক অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে। অনেক কিছু আছে যেগুলো আগে সংক্ষেপে বলা হবে, এবং পরে বিস্তারে বলা হবে। আবার কিছু আছে যেগুলো আগে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে এখন সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। গীতা হল সমস্ত বেদের সার, গীতা হল Mannual of Spirituality, Mannual of Hindu Religion। সেইজন্য গীতার সব কথা মনে রাখা সম্ভব না, সব কথা মনেও থাকে না। তাহলে কি সব কথা জানা দরকার আছে? অবশ্যই দরকার। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, আমরা এই ধর্মে জন্মেছি, এই ধর্মেই মরব, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধর্মে ছিলেন, আমাদের পরের প্রজন্মে যারা আসবে তারাও এই ধর্মে থাকবে। সেইজন্য গীতার সব কিছুই জানা দরকার। জ্ঞান জিনিসটা নিজেই একটা ফল। অনেকে বলে গীতা পড়ে কি হবে? গীতা পড়ে গীতার জ্ঞান হবে। জ্ঞান মানুষকে যতটা পবিত্র করে, অন্য কিছু পবিত্র করে না। গঙ্গা জল, জগন্নাথ প্রভুর আটকে প্রসাদ, বৃন্দাবনের রজ যেভাবে পবিত্র করে; এদের থেকে ঢের বেশি পবিত্র করে জ্ঞান। যার জন্য আমরা দেখতে পাই, পুরো বিশ্বে জ্ঞানীদের সম্মান অনেক বেশি। জ্ঞানই মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য যে পশুপাখি আছে, তারাও হিংস্র হতে পারে, তারাও নিজের এলাকায় রাজা হতে পারে; কিন্তু জ্ঞান জিনিসটা একমাত্র মানুষেরই হয়।

প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্করের কথা আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ। সেই বেদ কি বলতে চাইছেন? বেদের বক্তব্য খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে যদি আনা হয়, তাহলে দেখা যাবে বেদ দুই প্রকার ধর্মের কথা বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে বেদ আমাদের সেই শিক্ষা দেন, সেই আদেশ দেন, যেখানে মানুষ যজ্ঞযাগ করে, পূজা-অর্চনা করে, প্রার্থনা করে ঈশ্বরের দিকে এগোবে। দ্বিতীয় হল নিবৃত্তিলক্ষণ, যেখানে মানুষ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরলাভের দিকে, মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি করতে করতে ধীরে ধীরে মানুষ নিবৃত্তির দিকে চলে যায়। প্রথমে সবাইকে পুরো দমে কাজ করতে হবে। এরপর কর্মফলের প্রতি যে ইচ্ছা, সেটাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়। বেলুড় মঠ থেকে যাঁরা দীক্ষা নেন, তাঁদের গুরু বলে দেন, সকাল বিকাল দু বেলা জপ করবে। যারা জানে না, বোঝে না, তারা প্রশ্ন করবে, দীক্ষা নিয়ে কি হবে, দীক্ষা নিয়ে আমার কি লাভ হবে? বাড়ীতে অনেক অসুখ বিসুখ চলছে, দীক্ষা নিলে কি সব অসুখ সেরে যাবে? যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা জানবেন, গুরু তাঁদের এই ধরণের কোন কথা বলে দেননি। এমনকি গুরু দীক্ষা দিয়ে বলে দেন, মন্ত্র জপ করবে, জপ করার পর জপের ফল প্রভুর চরণে সমর্পণ করে দেবে। হে ঠাকুর, আমি এই একশ আট জপ করলাম, আমার যেন এটা হয়ে যায়, এই ভাব নিয়ে কেউ জপ করে না। যাঁরা কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তাঁরাও এ-রকম করেন না। এটাই ফলের আশা না করে, নিষ্কাম ভাবে জপ করা। গুরু বলে দিয়েছেন জপ করতে, জপ করছি; দ্বিতীয় আমার জপ করতে ভাল লাগে, তাই জপ করছি। এটাকেই বলে কর্মযোগ। যে কোন কাজ, অফিসে কাজ করছি, ডাক্তারখানায় রোগী দেখছি, ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজ, সব কাজে এই মনোভাব –আমাকে করতে হবে, দুটো টাকা আয় করতে হচ্ছে, সেইজন্য করছি, এর বেশি আর কিছু না।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে যখন ফলত্যাগ হয়ে যায়, ফলত্যাগ থেকে মন শুদ্ধ হয়ে যায়। মন শুদ্ধ হয়ে গেলে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মত্যাগ হয়ে যায়। মানুষ তখন জ্ঞাননিষ্ঠায় চলে যায়। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মায়, ঈশ্বর ভিন্ন সে আর কিছু চায় না। এখান থেকেই আসে জ্ঞান, আর এই জ্ঞান থেকেই আসে বিজ্ঞান। এগুলোকেই বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে

বলা হয়েছে, কিন্তু জিনিসটা যা হওয়ার, তা এটাই হয়। আগে জোর কদমে কাজ, কাজ করতে করতে কর্মফল ত্যাগ, কর্মফল ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ। সেখান থেকে কর্মের প্রতি যে আসক্তি বা দায়ীত্ব বোধ, এটা কমে যায়। তার মানে কাজ করাটা কমিয়ে দেয়। কাজ করা যদি বন্ধ করে দেয়, মানুষ পাগল হয়ে যাবে। করোনার সময় কোন কাজ ছিল না, সবাই কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। কাজ না করে মানুষ থাকতে পারে না। মন আমাদের এত চঞ্চল যে, বাহ্যিক কোন অবলম্বন না থাকলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব না। কিন্তু যাঁরা সাধক তাঁদের এ-জিনিস হবে না। তাঁরাও কাজ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একটা নিষ্ঠা আছে, সেই নিষ্ঠা বাড়তে বাড়তে এত দৃঢ় হয়ে যায় যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ির বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ধীরে ধীরে তার কাজ কমিয়ে দেয়। এখানে কাজের প্রতি স্পৃহা, কাজের মাধ্যমে আমি এটা পাব, সেটা পাব, এই মনোভাবটা শেষ হয়ে যায়। আশির দশকে আমাকে নরেন্দ্রপুর সেন্টারে কাজ করতে হয়েছিল। তখন আমার বয়স কম। ওখানে একজন খুব সিনিয়র মহারাজ ছিলেন, নরেন্দ্রপুর সেন্টার গড়ে তোলার পিছনে তাঁর বিরাট বড় অবদান। আমি শুনেছিলাম উনি নরেন্দ্রপুর সেন্টারের গোড়াপত্তনে প্রচুর কাজ করে গেছেন। বর্তমানে তাঁর শরীর চলে গেছে। কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পরেও উনি সপ্তাহে একদিন সেন্টারে আসতেন। ওনাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এখানকার কাজকর্ম গুলো একটু দেখে দিতে। উনি বলে দিলেন, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। তখন আমার মাথায় শুধু এই চিন্তা আসত, উনি কাজ ছাড়া থাকেন কি করে! এখন সেই কথা ভেবে নিজের উপর হাসি পায়। তখন বয়স কম ছিল, রজোগুণ ভিতরে টগবগ করে ফুটছে, ভাবছি মানুষ কাজ ছাড়া থাকে কি করে। এখন এই বয়সে এসে পিছনের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যাই, এত কাজ করতাম কি করে। কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যদি মন না যায়, আত্মজ্ঞান লাভের দিকে যদি মন না যায়, তাহলে মন কিন্তু এলেমেলো হয়ে যেতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দুটোরই বর্ণনা করলেন। ভগবান দুটি অধ্যায়ে বলতে চাইছিলেন, তুমি কাজ কর, কাজকে যজ্ঞ রূপে কর, ফলের প্রতি আসক্তি রেখো না, এভাবে চললে তোমার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। শুদ্ধ মনের একটা প্রচণ্ড শক্তি থাকে, এই মন ইচ্ছে করলে যে কোন জিনিস করায়ত্ত করে নিতে পারে। মন শুদ্ধ হওয়ার পর এবার আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, এই জিনিসটাই ভগবান আগের দুটো অধ্যায়ে বললেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এসে ভগবান এবার জ্ঞানযোগের স্তুতি করছেন। হঠাৎ জ্ঞানযোগ কেন এসে গেল? কারণ কর্মযোগ মানুষকে সন্ন্যাসের প্রতি, সব কিছু ত্যাগের প্রতি একটা প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। যখন সব কিছু ত্যাগ হয়ে গেল, কাজ করল, ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করল, সব ফল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করা হল; এরপর ধীরে ধীরে ঈশ্বরে পুরোপুরি মনকে নিয়ে গেল। আমি অনেক ভক্তকে দেখেছি, এত শাস্ত্র পড়ে, এত কথামৃত পড়ার পর কোন মহারাজের সঙ্গে দেখা হলে আনন্দে বলতে থাকেন, মহারাজ আমার নাতি ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছে। নাতি ক্লাশ থ্রীতে পড়ে। একজন ভক্তের জন্য এটা কি কোন কথা হল? ক্লাশ থ্রী, ক্লাশ ফোর, মাধ্যমিকে ফার্স্ট হল, এট একটা কোন কথা হল? আপনার সন্তান হয়েছে, আপনার পবিত্র দায়ীত্ব হল তাকে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া, আপনি তাকে শ্রেষ্ঠতম ট্রেনিং দেবেন, গান, বাজনা, খেলা, জুডো, মারপিট সব কিছুর শিক্ষাই দেবেন। এরপর তার যেমন জ্ঞান, তার যেমন সংস্কার, সেভাবে তার জীবন তৈরী হবে।

এই যে আপনি বলছেন, আমার নাতি ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছে, আপনি কি বলতে চাইছেন? স্বামীজী আমি এমন কাজ করেছি, তার কি সাংঘাতিক ফল দেখুন। আপনি আশা করেছিলেন যে,

আপনি আপনার জপধ্যানের ফল একদিন পাবেন; এদিকে আপনি চাইছেন, আমার মন যেন ঠাকুরের দিকে যায়। আপনার যদি কোন কষ্ট হয় অবশ্যই ঠাকুরকে বলবেন, ঠাকুর বড় কষ্ট চলছে। সন্ন্যাসীদেরও অনেক কষ্ট আসে। কিন্তু এই সাধারণ সাধারণ জিনিস নিয়ে, ছেলেকে তৈরী করে নরেন্দ্রপুরে, দেওঘরে ভর্তি করে দিলেন, তাতেই মনে করছেন বিরাট বড় কিছু একটা করে ফেলেছি। বাবা-মার এটা দায়ীত্ব। কর্মফল ত্যাগে এটাই বলতে চাইছেন। কর্মফল ত্যাগ মানে, যিনি কর্ম করলেন, তাঁর কর্মফলের দিকে আর দৃষ্টি নেই। দেখতে হবে, কাজ করার সময় সে মন প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে কিনা, এটাই কর্মযোগ। ছোট ছোট ঘটনাতে কখন লাফাচ্ছে, কখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে পড়ছে। আজকে ফার্স্ট হল বলে লাফাচ্ছে, কাল যখন ফার্স্ট হতে পারবে না, তখন ভেঙে পড়বে।

গীতাতে এই উপদেশই দিচ্ছেন, কাজ কর, কাজকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে মন প্রাণ দিয়ে করতে হবে; ফল যাই হোক, সেটার দিকে তাকাতে যেও না। কারণ তোমার উদ্দেশ্য হল, জ্ঞাননিষ্ঠা অর্জন করা। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, ওই জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা, ওই জ্ঞানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া, যেখান থেকে ওই জ্ঞানটা তুমি পাবে; আর ওই জ্ঞান পেলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এটাই, বাকিগুলো কোন উদ্দেশ্যই না।

এই জ্ঞানের কথা কি ভগবান অর্জুনকে নূতন কিছু বলছেন? না, এটা পরম্পরাতে চলে আসছে। পরের দিকে এটাকেই বলা শুরু হল, পরম্পরা বিদ্যা। যে কোন বিদ্যা যদি ভগবান থেকে না এসে থাকে, মানুষ সেই বিদ্যা গ্রহণ করতে চাইবে না। ইদানিং চারিদিকে অনেক গুরুর আবির্ভাব হয়েছে, টিভি, সোস্যাল মিডিয়াতে সবাই অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছেন। আগেও এ-রকম স্বঘোষিত গুরু ছিলেন। এঁদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'আপনি যে কথাগুলো বলছেন, যে মতের কথা বলছেন, এর শুরু কোথা থেকে? আপনি কার কাছ থেকে এই কথা শিখেছেন'? 'আমি আমার ধ্যানের গভীরে গিয়ে শিখেছি'। আমরাও হাতজোড় করে বলে দেব, 'আপনার বিদ্যা আপনার কাছেই থাক, আমার লাগবে না'। বিদ্যা যদি সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে না এসে থাকে, চিরন্তন কাল থেকে যদি না চলে এসে থাকে, তাহলে এই বিদ্যাকে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ যে বিদ্যা ভগবানের কাছ থেকে আসেনি, বুঝতে হবে সেই বিদ্যা মানুষের মন থেকে এসেছে। পুরো পাশ্চাত্য দর্শন, পুরো পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানুষের মন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে বিদ্যা মানুষের মন থেকে জন্ম নিয়েছে, সেই বিদ্যাতে একটা অভাব থাকে, অনেক দোষ থাকে, ভরসা করা যায় না, আগামীকাল এই বিদ্যা পাল্টে যাবে। যে বিদ্যা ভগবান থেকে এসেছে, সেটাই একমাত্র সত্য, সেটাই একমাত্র ঠিক, সেটাই গুরু পরম্পরায় চলতে থাকবে। এই জিনিসটাকেই ভগবান প্রথম শ্লোকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

*(শ্রীভগবান বললেন –আগের অধ্যায়ে উক্ত নিষ্ঠাদ্বয়াত্মক এই অব্যয় যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম; সূর্য স্বীয় পুত্র মনুকে এবং মনু তার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এটা বলেছিলেন।)*

হে অর্জুন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যে যোগের কথা তোমাকে বললাম, আগে আমি এই বিদ্যার কথা সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য হলেন বেদে দ্বাদশ আদিত্যের একজন। ভগবান তাঁকে এই যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই জন্যই তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিলাম, সৃষ্টি যখন করেছি, তাই সৃষ্টির দায়ীত্বটাও আমার। মা-বাবা সন্তানের জন্ম দেন, সন্তানের প্রতিপালনের দায়ীত্ব বাবা-মায়ের। সন্তান ভাল কাজ করলে তাদের লাফালাফি করার কিছু নেই। খারাপ কিছু হয়ে গেলে দেখতে হবে বাবা-মা কোন দোষ করেছিল কিনা, ভুল কিছু করেছিল কিনা, কিছু খামতি থেকে গিয়েছিল কিনা। ভগবান বলছেন, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শক্তি স্থাপন করার জন্য আমি এই বিদ্যাটা দিয়েছিলাম।

আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন যুদ্ধ জয় করল, তাতে বৈজ্ঞানিকদের বিরাট বড় অবদান ছিল। এমনকি বর্তমান কালেও যত যুদ্ধ হয়, সেখানেও বৈজ্ঞানিকদের বা টেকনোক্র্যাট, ইঞ্জিনিয়ারদের বিরাট ভূমিকা থাকে। যত স্যাটেলাইটস, বন্দুক, তোপখানা, মিসাইল থেকে এ্যারোপ্ল্যান পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছুতে বৈজ্ঞানিকদের অবদান রয়েছে। আগেকার দিনের মত ঘোড়ার পিঠে লড়াই করার দিন চলে গেছে। ইরাকের যুদ্ধে আমেরিকা দেখাল, তারা দূরে সমুদ্রের মাঝখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে একটা করে মিসাইল ছুঁড়ে যাচ্ছে, আর এক একটা করে ইরাকের শহর ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবই ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পরে আমেরিকার বড় বড় সংস্থা, যারা রিসার্চ করে, তাদের টাকা দরকার, সরকার সাহায্য না করলে হবে না। ফিনেন্স মিনিস্ট্রিতে গেছে টাকার জন্য, টাকা না হলে রিসার্চ করা যাবে না। মিনিস্ট্রি থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এই যে সরকার থেকে এত টাকা দেওয়া হবে, এতে সরকারের কি লাভ হবে? আমাদের দেশের যে সেনাবাহিনী, এতে এদের কি কিছু উপকার হবে? যিনি মিনিস্ট্রিতে গিয়েছিলেন, তিনি খুব নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, আমরা যে রিসার্চ করছি, এই রিসার্চ যুদ্ধে কোন সাহায্য করবে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু যে বিদ্যার আমরা চর্চা করছি, বিদ্যার যে স্তরে আমরা আছি, এই বিদ্যাকে রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করা হয়। খুব দামী কথা। যুদ্ধ কেন করা হয়? এই যে বিদ্যার সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা হয়। কারণ যদি এই বিদ্যাকে রক্ষা করা না হয়, এই বিদ্যা একদিন নাশ হয়ে যাবে। বিদ্যা একবার নাশ হয়ে গেলে পুনরায় ফিরে আসতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল, সেই সময় ব্রাটার্ণ্ড রাসেলের ঠিক একই কথা আছে। একজন ইয়ং সোলজার এসে ব্রাট্রার্ণ্ড রাসেলকে বলছে, 'আমরা ওখানে যুদ্ধ করছি, আপনি এখানে বসে বসে কি করছেন'? ওই ইয়ং সৈনিকের সাথে ব্রাট্রার্ণ্ড রাসেলের একটা বিরাট আলোচনা আছে। তিনি সেই সৈন্যকে বলছেন, 'তুমি কিসের জন্য যুদ্ধ করছ'? এখান থেকে আলোচনা শুরু করে অনেক কথা বলতে বলতে শেষে বলছেন, 'তুমি যুদ্ধ করছ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য, The idea of Britain এটা রক্ষা করার জন্য, আমি সেটাতেই যোগ দিচ্ছি'। কেউ যদি এসে বলে, গীতা পড়লে, জানলে আমার কি পেট ভরবে? কোন ভাবেই পেট ভরবে না। কিন্তু পেট ভরা হয় যাতে আমরা গীতাটা ভাল করে পড়তে পারি। বাইরের লোকেরা এটাই বলবে, গীতা পড়লে কি আমার পেট ভরবে? খালি পেটে কি ধর্ম হয়? কখনই খালি পেটে ধর্ম হয় না, ভুখে ভজন ন হোয়ে গোপালা, পেটে খিদে নিয়ে গোপালের ভজন করা যায় না। পেটের খিদে মেটানো হয় এই জন্য, যাতে আমরা এই সংস্কৃতির রক্ষা করতে পারি, এবং এই সংস্কৃতিকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। লে আর লাদাকে কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সবাই জানে, ওই ঠাণ্ডার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা কিসের জন্য এত কষ্ট করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওখানে পড়ে আছে? The idea of India, ভারতের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য। শুধু এক খণ্ড ভূমির জন্য নয়, কটা প্রাণের রক্ষার জন্য নয়। প্রাণের বলিদান যখন দেওয়া হয়, সমস্ত রকম সুখ, আরামকে যখন বিসর্জন দেওয়া হয়, তখন একটা আদর্শের জন্যই দেওয়া হয়। সেই আদর্শ হল একটা সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক, যাঁরা এই সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেন, তাঁদেরকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। আমরা এখানে এই আলোচনায় যাচ্ছি না, কে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ, কে কর্ম থেকে ব্রাহ্মণ। লিবারাল, সেকুলারিস্ট অনেক আছে, দুনিয়ার সব প্রতারকরা জুটে কত কি বলে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে একটা বই বেরিয়েছে, সেখানে তুলোধুনো করে দেখিয়েছেন, যত জন নামকরা লিবারাল আছে, এরা কত দুষ্ট লোক ছিল। যারা লিবারাল শব্দ ব্যবহার করে এরা প্রত্যেকে ভিতরে ভিতরে অনেক দুর্নীতি ও ধান্দা চালিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান কালের লিবারালরাও তাই। তারা বলবে, ব্রাহ্মণ

জিনিসটা খারাপ; আমরা ওই বিতর্কে যাচ্ছি না। আমাদের কাছে হল সংস্কৃতি, তা বিজ্ঞানের সংস্কৃতিই হোক আর ইট তৈরী করার সংস্কৃতি হোক, যাঁরা এই সংস্কৃতিতে অবদান রেখে যান, তাঁরাই ব্রাহ্মণ।

সংস্কৃতি জিনিসটা কি? যে কীর্তি স্থাপন হয়, তা দেশকালকে ছাপিয়ে যায়। খোজা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো খুব সুন্দর। খোজা নাসিরুদ্দিন একদিন বাথরুমে গান করছিল। গান করতে করতে তার মনে হল সে খুব সুন্দর গান করে। একদিন বলল 'আমি গান করব'। একটা সভা হল, লোকজন অনেক এসেছে। এবার সে গান করবে। গান শুরু করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'আরে বাথরুমটা কোথায়, বাথরুম না হলে আমি তো গান করতে পারব না। এখানে আগে একটা বাথরুম দাঁড় করাও, তবেই না আমি গান করব'। বাথরুমে সবাই গান করতে পারে, বাথরুমের গান মানে বাথরুমেই আবদ্ধ, এটা আর যাই হোক, সংস্কৃতি না। সংস্কৃতি মানে মেঘমল্লার, দীপক রাগ, বা আরও আগে থেকে পরম্পরা ধরে যে রাগ চলে আসছে। কোন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন যিনি আজ থেকে পনেরশ বা দু হাজার বছর আগে একটা রাগের সৃষ্টি করলেন, পরম্পরা ধরে আজ একজন শিল্পীর কণ্ঠ দিয়ে সেই রাগের মুর্ছনা শ্রোতার হৃদয়কে অনুরণিত করছে। কোথায় কোন জঙ্গলে তিনি এক সময় যে সঙ্গীতের রচনা করলেন, সেই সঙ্গীত আজ দেশ কালকে ছাপিয়ে গেল। তখন এই কলকাতা শহরের জন্ম হয়নি, সেই কলকাতার লোকেরা আজও সেই গান করছে, সেই গান শোনার জন্য রাত জেগে বসে থাকে। কীর্তি যেটা দেশকালকে ছাপিয়ে যায়, এটাই সংস্কৃতি, এছাড়া আর কিছু সংস্কৃতি হয় না। আমি আজ যা কিছু করে থাকি, ওটাই যদি দেশকালকে ছাপিয়ে যায়, তবেই ওটা হবে সংস্কৃতি, তা নাহলে ওটা একটা সাধারণ কর্ম, এর কোন দাম নেই।

এই সংস্কৃতিতে যিনি অবদান রাখেন, সমৃদ্ধ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। এনারা বিদ্যার প্রতি এমন ভাবে সমর্পিত থাকেন যে, নিজের রক্ষাটুকু নিজে করতে পারেন না। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সমৃদ্ধ করতে হলে তাঁকে তো রক্ষা করতে হবে, এই রক্ষাটা করেন ক্ষত্রিয়রা। বৈশ্য, শূদ্র এনারা খালি জোগান দেন। ঠিক ঠিক জাতি বলতে দুটি, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শব্দটা প্রথমের দিকে ছিল না, বেদে শব্দটা হল রাজন্য। ব্রাহ্মণ হল যিনি সংস্কৃতি দিচ্ছেন, আর ক্ষত্রিয় যিনি এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করছেন। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, এছাড়া তৃতীয় আর কোন জাতি হয় না। আমাদের যত বিজ্ঞানীরা আছেন, সবাই ব্রাহ্মণ; যত ডাক্তার আছেন, সবাই ব্রাহ্মণ; অবশ্য যদি তিনি বিদ্যার প্রতি সমর্পিত থাকেন। মূল হল যিনি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এনাদের রক্ষা করার জন্য ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণদের খাওয়া-পড়া যেন ঠিক ভাবে চলে, এই জিনিসটার দেখার কাজ বৈশ্যদের, আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সব কিছু দেখাশোনার কাজ যারা করে, তারা শূদ্র, এর এখন নূতন নাম হয়েছে Service Sector।

ক্ষত্রিয়ের যদি শক্তি না থাকে, ব্রাহ্মণদের রক্ষা হবে কোথা থেকে! যার পরিণাম আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, বাইরের দেশগুলি থেকে মুসলমানরা এসে মন্দির ধ্বংস করল, এর ওর গলা কাটল; উদ্দেশ্য, ভারতের সংস্কৃতিকে নাশ করে দেওয়া। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তখনকার দিনে অত বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছয় মাস ধরে পুড়তে থাকল। শুধু যে মানুষের গলা কেটেছে তা না, পুরো একটা সংস্কৃতিকে উড়িয়ে শেষ করে দিল। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সেই শক্তি যদি থাকত, তাহলে কি ভারতের এই পরিস্থিতি কখন হতে পারত! ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে এই শক্তি আসবে, ভগবান শিক্ষা দিয়ে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই শক্তিকে দাঁড় করিয়ে দেন। কি ভাবে?

*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*, বলছেন যোগের ফল *অব্যয়ম্*, এই ফলের কখন নাশ হয় না, যোগের ফল অবিনাশী। যাঁরা গীতার কথা মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবনে একটুও যদি নামানোর চেষ্টা করেন, দেখবেন এর ফল অব্যর্থ, ফল দেবেই দেবে। ভগবান নিজের মুখে বলছেন, এর ফল অব্যয়, কখন নাশ হয় না। এমন কি এর শেষ যে পর্যায় মোক্ষ, সেই

মোক্ষফল দেবেই দেবে। ভগবান বলছেন, আমি এই বিদ্যা সূর্য দেবতাকে দিয়েছিলাম। তিনি আবার তাঁর পুত্র মনুকে এই বিদ্যা শেখালেন। মনু নাম বললেই আমাদের অনেক সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে এবং আমাদের পরম্পরায় অনেক মনুর নাম পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে মনু আসছে, সৃষ্টির কাজকে তরাণ্বিত করার জন্য ব্রহ্মা মনু ও শতরূপা নামে দু-ভাগে নিজেক বিভক্ত করেছিলেন, সেখানেও এক মনুকে আমরা পাই, আবার সূর্য পুত্র সেও মনু। সেই মনুর পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু। পুরাণে অনেক পরম্পরার উল্লেখ আছে, সেখানেও একজন মনু আছেন। এখানে ভগবান সূর্যের পুত্র মনুর কথা আমাদের বলছেন।

ভগবান বলছেন, *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ*, এই পরম্পরাতে চলছে। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ একটা স্তর পর্যন্তই যেতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই বিদ্যা ভগবান থেকেই আসে। দ্বিতীয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোন একটা সময়, কোন একটা জায়গায় হঠাৎ দুম্ করে কারুর মাথায় একটা জ্ঞান এসে গেল, অন্যান্য ধর্মে যেমন হয়ে থাকে, যেখান থেকে বলা হয়, এই ধর্ম কে জন্ম দিয়েছেন, অমুক লোক। হিন্দু ধর্ম এভাবে হয় না, হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম, সনাতন কাল থেকে এই ধর্ম চলে আসছে। যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় থেকেই এগুলো সনাতন সত্য। সনাতন সত্য হওয়ার জন্য, এই সত্য ভারতবর্ষে যেমন সত্য, আফ্রিকাতেও সত্য, আমেরিকাতেও সত্য, এই সত্য বিশ্বের সমস্ত জায়গায় সত্য। খ্রীশ্চানরা বলছেন, যীশু ভগবানের পুত্র, আমি যদি না মানি তাহলে কি হবে? কাহিনী সেখানেই শেষ। কিন্তু এই কর্মযোগ, এটা একটা সিদ্ধান্ত, নিউটনের সূত্রগুলি যেমন একটা শাশ্বত সত্য, তেমনি এগুলোও সনাতন সত্য। হিন্দু ধর্ম কারুর কথার উপর চলে না, এমনকি ভগবানের কথার উপরেও চলে না, হিন্দু ধর্ম একমাত্র চলে সনাতন সত্যের উপর। ভগবান শুধু এই সনাতন সত্যকে বলে দিলেন, বাপু এটা সনাতন সত্য, এই সত্যকে পালন করলে তোমার মঙ্গল হবে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ।।২।।

*(হে পরন্তপ, ক্ষত্রিয়-পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হয়েছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ এর সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে।)*

ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক আদর্শ রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি, এর নীচে আর কোন কথা চলে না। যিনি ব্রহ্মর্ষি তিনি বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত, তার সাথে তিনি ঋষি। তাঁরা নীচে যাঁরা রাজা, তাঁরাও ঋষি ছিলেন, যেমন রাজা জনক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি আর রাজর্ষির নীচে আর কোন ঋষি হয় না। আমরা যাঁরা এই কথা শুনছি, আমাদের সবার দায়ীত্ব হয় আমাকে রাজর্ষি হতে হবে, নয়তো ব্রহ্মর্ষি হতে হবে। এই কর্মযোগের বিদ্যা ও তার মন্ত্র রাজর্ষিদের কাছে ছিল। কিন্তু পরে পরে সব রাজা আমাদের মতই হয়ে গেছে, ভিতরে সেই শক্তি নেই, দম নেই। তাই *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ*, কালের গতিতে এই বিদ্যা নাশ হয়ে যায়। শুধু আধ্যাত্মিক বিদ্যাতেই না, প্রত্যেক বিদ্যাই একটা সময় নাশ হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের প্রায়ই বাইরে থেকে শুনতে হয়, আপনাদের মধ্যে কজন বিবেকানন্দ হয়েছেন? আমি যখন রামকৃষ্ণ মঠে জয়েন করি, বাড়ি লোকেরা আমাকে বলতে শুরু করলেন, কজন তোমাদের এখানে বিবেকানন্দ হয়েছে? তখন অত বুদ্ধি ছিল না বলে কোন জবাব দিতে পারিনি। এখন হলে বলে দিতাম, ফিজিক্স পড়ে কজন আইনস্টাইন হয়েছে? একজন বিরাট কিছু হয়ে যান, তারপর সবাই বিদ্যাটা তাঁকে ভাঙিয়ে খেতে থাকে, তারপর বিদ্যাটা একটা সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমের দিকে এই বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করেছি। মানুষের মনে লোভ, মোহ এসে যায়, যার ফলে শক্তিটা নাশ হয়ে যায়। ভগবান বলছেন, বিদ্যাটা আমি দিয়েছিলাম বাপু, কিন্তু যাঁরা নিয়ে গেছেন, তাঁরা দুর্বল, দুর্বল বলে তাঁরা বিদ্যাটা ধরে রাখতে পারলেন না।

*পরন্তপঃ* মানে যিনি পরকে তাপ দেন, এখানে অর্জুনকে বলছেন *পরন্তপঃ*, পর মানে শত্রু। যারা আমাদের শত্রু, তাদের তাপ দিতে হয়, যে আমার শত্রু তাকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে হবে, তাপ দিতে হবে। এসব কথা শুনলে আমাদের বিচিত্র মনে হবে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রই এই কথা বলছেন, যে শত্রু তাকে কোন ভাবে ছাড় দিতে নেই, সব সময় তাপ দিতে হবে, *পরন্তপঃ*। অর্জুনের একটা নাম পরন্তপ, কৃষ্ণেরও নাম পরন্তপ, কারণ তিনিও পরকে তাপ দিতেন। দুর্বল কে? আচার্য দুর্বলের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলছেন, *দুর্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্*, ঠিক ঠিক দুর্বল তারাই যারা অজিতেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের কাছে যখন এই উচ্চ ধারণাগুলি যাবে, তারা সেটা ধরে রাখতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, সিংহীর দুধ যদি এমনি হাড়িতে রাখা হয়, হাড়ি ফেটে যায়। শোনা যায় যে, সিংহীর দুধের ঘনত্ব খুব ভারী, কাঁচা হাড়িতে রাখলে হাড়ি ফেটে যায়। আমাদের মন হল কাঁচা হাড়ি, এইসব উচ্চ ধারণাগুলি এলে আমাদের মনটা ফেটে যাবে। লোকেরা হল পুরুষার্থরহিত, তাদের মধ্যে পুরুষার্থ নেই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের প্রতি যাদের জীবন সমর্পিত নয়; অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণে নেই, মনের নিয়ন্ত্রণ নেই, আর জীবনে কোন আদর্শ নেই; এই ধরণের লোকেরা যখন শাস্ত্র পড়ে, তখন পুরো জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীজী যে বলছেন, গীতা পড়া থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, ফুটবল খেললে তবে তুমি গীতা কিছু বুঝতে পারবে, আসলে এখানে স্বামীজী শক্তির কথা বলতে চাইছেন। শক্তি যদি না থাকে, ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই, মন নিয়ন্ত্রণে নেই, আর জীবনে কোন আদর্শ নেই, সে কি শাস্ত্র বুঝবে! এসব কথা শুনলে আমাদের মন খারাপ হবে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। আমাদের কাছে এসে বলবে, মহারাজ বিবেকচূড়ামনি পড়ালে হয় না। কি হবে বিবেকচূড়ামণি পড়ে, আপনার বোঝার ক্ষমতা আছে? বোঝার যদি ক্ষমতা থাকতে, এই শাস্ত্র পড়ানোর আর দরকার হত না। এই শাস্ত্রগুলি সব গুরুমুখী বিদ্যা। বিবেকচূড়ামণি গুরুমুখী বিদ্যাই না, প্রকরণ গ্রন্থ। উপনিষদ, গীতা এগুলো গুরুমুখী বিদ্যা, গুরু ছাড়া বোঝা যায় না। যে কোন শাস্ত্র বুঝতে হলে আগে দেখুন এই কটি জিনিস আপনার মধ্যে আছে কিনা, প্রথম আপনার জীবনে কি কোন আদর্শ আছে, দ্বিতীয় আপনি কি জিতেন্দ্রিয়, আপনার মধ্যে কি সেই শক্তি আছে, মনে জোর আছে। এই তিনটে গুণ আপনার মধ্যে আগে নিয়ে আসুন। ভগবান নিজে দুঃখ করছেন, দেখ, আমি এই শিক্ষা দিয়েছিলাম, তাতেও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আবার এসেছি, তোমার মধ্যে এই গুণগুলি আছে, তাই তোমাকে আমি দিচ্ছি।

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।

*(তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এইজন্য তোমাকে আজ এই পুরাতন যোগই বললাম। কারণ এ অতি গূঢ় রহস্য।)*

হে অর্জুন, আগে আগে যে যোগের শিক্ষা আমি সূর্যকে দিয়েছিলাম, সেই বিদ্যা শোনাবার জন্য আমি আবার এসেছি। তুমি আমার ভক্ত; ভক্ত মানে যেখানে ভালবাসা আছে, তুমি আমাকে ভালবাস, আর তুমি আমার সখা। গুরু উপরে শিষ্য নীচে, এখানে তা না, এখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ঠাকুর ও স্বামীজীর যে সম্পর্ক, সেখানে গুরু ও শিষ্য, কিন্তু তার সাথে দুজন দুজনের বন্ধু। আমি একজন মহারাজের কাছে একটা বর্ণনা শুনেছিলাম, ঘটনাটা আমি কোথাও পড়িনি, আমার জানাও নেই। উনি কোথায় শুনেছিলেন, পরম্পরায় শুনেছিলেন কিনা, তাও জানা নেই। বলছেন, স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে আছেন। একদিন কোন কারণে তিনি নৌকা করে কলকাতায় যাচ্ছেন। নৌকা করে বরানগর ঘাটে নেমে কলকাতায় যাবেন। বরানগর ঘাটে নেমেছেন, সেখান থেকে বড় রাস্থার উপর বরানগরে ফাগুর বিখ্যাত কচুরির দোকান আছে। ঠাকুরের নাকি ফাগুর দোকানের কচুরি খুব পছন্দের

ছিল। স্বামীজী দেখছনে তখন ফাগুর দোকানে গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। সেই দেখে স্বামীজী এক চ্যাঙাড়ি কচুরি কিনে কলকাতায় না গিয়ে আবার বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। মঠের সাধুরা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, স্বামীজী কলকাতায় না গিয়ে আবার ফিরে এলেন কেন? স্বামীজী কাউকে কিছু না বলে সোজা পুরনো মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে কচুরির চ্যাঙাড়ি রাখলেন, কোন মন্ত্র নেই, কিছু নেই ঠাকুরের সামনে রেখে বলছেন, 'খাও ইয়ার'। এই ঘটনাটা যখন শুনলাম তখন আমার এতো ভাল লেগেছিল যে, কি আর বলব।

এটাই এখানে বলছেন, *ভক্তোঽসি মে সখা চেতি*, গুরু আর শিষ্য কিন্তু দুজনের মধ্যে বন্ধুর ভাব। জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীর নামে বলতেন my friend, অবশ্য তিনি দীক্ষা নেননি, কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত বলে গেছেন, স্বামীজী আমার বন্ধু। পুরো গীতার বক্তব্য হল জ্ঞানযোগ; বলছেন এই জ্ঞানযোগ অত্যন্ত গুহ্য, ধারণা করা যায় না। হে অর্জুন, তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমি আমার সখা আবার তুমি আমার শিষ্যও। ভালবাসা মানে, যেখানে ভাল বাসা বাঁধে, পাখি যেমন বাসা বাঁধে, যেখানে ভাল, সবটাই শুভ, সবটাই ভাল যেখানে বাসা বাঁধে সেটাই ভালবাসা। বন্ধু যিনি হন, যিনি সখা, সেখানে ভালবাসা সবচেয়ে বেশি। সন্তান মাকে সব কথা বলে না, বাবাকে তো বলবেই না, স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে সব কথা বলে না, মাও সন্তানকে সব কথা বলে না, বন্ধুকে সব কথা বলে। মা যদি বন্ধু হন, স্ত্রী যদি বন্ধু হয়, স্ত্রী অবশ্য সব কথা স্বামীকে কক্ষণ বলে না, বলা ঠিকও নয়; বন্ধু হলে সব কথা বলা যায়, বন্ধুর মত জিনিস হয় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি বন্ধু হয়, বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। মা মনে করে আমার সন্তান বন্ধু, কিন্তু ওটা হয় না, বন্ধু পুরো আলাদা জিনিস। ভাগবতে উদ্ধব সংবাদে আছে, সেখানে উদ্ধব বলছেন, কৃষ্ণের সব গুহ্য কাজ আমি করি, মায়েরা সন্তানের কোন গুহ্য কাজ করে না, ভাই বোনের জন্য, বোন ভাইয়ের জন্য করে না, বন্ধুরা করে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও সখা দুটোই।

চার নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় অবতার তত্ত্ব। প্রথমের দিকে আমরা অবতার তত্ত্বকে নিয়ে হাল্কা একটু আলোচনা করেছিলাম, এবার পুরোদমে অবতার তত্ত্বকে নিয়ে বলবেন। পরে সপ্তম অধ্যায়ে আবার অবতার তত্ত্বে ঢুকে যাবেন। অর্জুন সব কিছু মেলাতে পারছেন না, থেকে থেকে ভগবান দুম্ দুম্ করে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, অর্জুনও তাই জিজ্ঞেস করছেন –

অর্জুন উবাচ
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।

*(অর্জুন বললেন –আপনার জন্ম তো অনেক পরে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হয়েছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলেন, তা কি করে বুঝব?)*

হে কৃষ্ণ, আপনি আমার সখা, আমি আপনার শিষ্য, সব ঠিক আছে, কিন্তু ইক্ষ্বাকু সেই কবেকার লোক, মনু তাঁরও আগেকার, সূর্য দেবতা তারও অনেক আগেকার। আমরা জানি এই সেদিন আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি বসুদেবের সন্তান, আপনি দেবকীনন্দন, কিন্তু আপনি কি এই এলেমেলো কথা বলছেন, আপনি নাকি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন! *অপরং অর্বাগ্ বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম*, আমরা সবাই জানি বসুদেবের গৃহে আপনার জন্ম, আর আপনি বলছেন আপনি নাকি সূর্যকে এই যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, এটা কি করে সম্ভব?

অনেকেই বলে থাকেন, আচার্য ঘোর অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতই ভারতবর্ষের ঠিক ঠিক ধর্ম। অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত নিয়ে লোকেদের মাথায় অনেক ভুল ধারণা বসে আছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সবটাই অদ্বৈতের মধ্যেই আছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আচার্য শঙ্কর একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত।

একবার গীতা পড়লে বোঝা যায় আচার্য শঙ্কর কত বড় ভক্ত। আচার্য বলছেন, *যা বাসুদেবে অনীশ্বরাসর্বজ্ঞশঙ্কা মূর্খানাং*, যারা মুর্খ, বর্তমান কালের মুর্খ, যারা ইউনিভারসিটিতে পোস্টার লাগিয়ে হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নামে নোংরা নোংরা কথা বলে যাচ্ছে, এই মুর্খদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি? এই যে বাসুদেব, বসুদেবের সন্তানকে বাসুদেব বলা হয়, এই শ্রীকৃষ্ণ অনীশ্বর, ঈশ্বর নন, আর তিনি সর্বজ্ঞ নন। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবটাই জানেন। এই আশঙ্কা মুর্খদেরই হয়। এটাকে নিবারণ করার জন্য অর্জুনের এই প্রশ্ন। ভগবান নিজে যদি না বলেন তিনি ভগবান, ততক্ষণ তিনি ভগবান না। আমরা কি করে জানব তিনি অবতার কিনা? অবতারের একটাই লক্ষণ, অবতার বুক ঠুকে বলেন, আমি অবতার। একমাত্র ভগবানই বলেন, হ্যাঁ আমি ভগবান। এ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ হয় না। আর তিনি এটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলেন না, তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজনকেই বলেন। সেই সময়কার যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, তাঁরা জানেন, ইনি অবতার। এছাড়া তিনি বিভিন্ন লোককে তাঁদের ধ্যানের গভীরে বা ধ্যানের বাইরে তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ প্রকাশ করেন।

একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখব, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে বিভিন্ন রূপ দেখিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, এই দেখ আমি ঈশ্বর। ঠাকুরও কত মানুষকে ধ্যানের সময়, ধ্যানের বাইরে দর্শন দিচ্ছেন। আর যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না যে, আমি অবতার। নিজের কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যকে বলছেন, যেমন নরেনকে বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানিং এই দেহে রামকৃষ্ণ। ঠাকুর একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, দেখ, যে রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানিং রামকৃষ্ণ। নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, তারপর একটা অবস্থায় ঠাকুর নরেনের সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বলে যাচ্ছেন, আমি জানি আপনি সেই নরঋষি, যিনি যুগে যুগে আসেন মানব কল্যাণের জন্য। বলে ঠাকুর কাঁদছেন। আর নরেন মনে মনে বলছেন, লোকটি নির্ঘাৎ বদ্ধ পাগল, এই ছিল নরেনের সিদ্ধান্ত, শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। অর্জুনেরও একই অবস্থা, পরে গিয়ে বলবেন, আপনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, আমার মনে নেই, আর-একবার একটু বলবেন? যাই হোক ভগবান এবার বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

*(শ্রীভগবান বললেন –হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সকল জানি; কিন্তু তুমি তৎসমুদয় বিস্মৃত হয়েছ।) [কারণ ধর্মাধর্মাদি দ্বারা তোমার জ্ঞানশক্তি সমাবৃত এবং মায়াধীন; কিন্তু আমি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ও মায়াধীশ বলে আমার জ্ঞানশক্তি সর্বদা অনাবৃত]*

হে অর্জুন, তোমার অনেক জন্ম হয়েছে, আমারও অনেক জন্ম হয়েছে। আমার সব জন্মের কথা মনে আছে, তোমার কিন্তু কোন জন্মের কথা মনে নেই। আমি জানি কারণ আমি ভগবান। এই সৃষ্টিতে আমি অনেকবার এসেছি, তুমিও অনেকবার এসেছ, তোমার কিছু মনে নেই, কারণ তোমার মন মায়া মেঘে আবৃত। কিন্তু আমি ভগবান, আমাকে কেউ আবৃত করতে পারে না, *তান্যহং বেদ সর্বাণি*, আমি তাই আমার আগের আগের সব জন্মের কথা জানি। সেইজন্য ঠাকুর নরেনকে বলতে পারছেন, আমি জানি তুমি সেই নরঋষি; নরেন জানেন না। হে অর্জুন, তোমার মন পূণ্য আর পাপ, এই জ্ঞানে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমার ক্ষেত্রে সেটা হয় না। তাই না, আমার মন বলে কিছু নেই, আমি শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য হওয়ার জন্য আমার পূণ্য পাপ হয় না, ধর্ম অধর্ম হয় না। সেইজন্য আমার জ্ঞান সব সময় যেমনটি আছে তেমনটিই থাকে।

আচার্য দেখাচ্ছেন ভগবান জিনিসটা ঠিক কি, *অহং পুনঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদ্ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ*, আচার্য এত কম শব্দের মধ্যে এত আইডিয়াস ঠেসে দিতেন যে কল্পনাই করা

যায় না। গদ্যের মাধ্যমে যেন পদ্য রচনা করে যাচ্ছেন। তার আগে অর্জুনের নামে বলছেন, *ধর্মাধর্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ*, তোমার যে জ্ঞানশক্তি ধর্ম ও অধর্ম দিয়ে প্রতিবদ্ধ, বাঁধা আছে। *অহং পুনঃ* আর আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবসম্পন্ন, এই কারণে আমার জ্ঞানশক্তি আবরণরহিত, সেইজন্য আমি সব কিছু জানি।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে অনেকবার বলছেন, ধর্মের কথা যুক্তি দিয়ে, ন্যায় শাস্ত্র দিয়ে বোঝান যায় না। ধর্মের কথা জানার একমাত্র উপায় শাস্ত্র প্রমাণ। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে পুনর্জন্ম আছে কি নেই? আমাদের কাছেও এর কোন সঠিক যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই? কেন নেই? যুক্তি দিয়ে জন্মান্তরকে কখনই প্রমাণ করা যাবে না। এর একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র। এখন যদি কেউ এসে বলে আমি শাস্ত্র মানি না, তখন তাকে বলতে হয়, ভাই তোমাকে শাস্ত্র মানতে হবে না, আর পুনর্জন্মও মানতে হবে না। পুনর্জন্ম মানলে আর পুনর্জন্ম না মানলে জীবনের এমন কোন পরিবর্তন আসবে না ঠিকই; তবে হ্যাঁ, যদি তুমি ধর্ম পথে এগোতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে পুনর্জন্ম মানতে হবে। যদি পুনর্জন্ম না মান তাহলে ধর্ম পথে আসার তোমার কোন প্রয়োজনই নেই। মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এই মতকেই যারা বিশ্বাস করে তারা ধর্ম পথে কেন আসবে? মানুষের বয়স হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না, চোখে কম দেখে, কানে শোনে না, খেলে হজম করতে পারে না, কাশতে পারে না, কাশলে বুকের দম ফুরিয়ে যায়, তার উপর বাড়ির লোকের নানান রকমের গঞ্জনা। এই যে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে বেঁচে থেকে এত কষ্ট পাওয়ার কি আছে?

কেন মরতে চাইছে না? কারণ কোথাও তার মনে একটা চিন্তা ধাক্কা মারছে, মরে গেলে আবার হয়ত আমাকে জন্মাতে হবে। এই চিন্তা কোথা থেকে আসছে? শাস্ত্র থেকে আসছে। ধর্ম প্রমাণ, অধ্যাত্ম প্রমাণ, পুনর্জন্ম প্রমাণ এই সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে শাস্ত্রকে ভিত্তি করে। এখন আমি আপনি যদি শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস না করি তাহলে এগুলোও আমাদের মানতে হবে না। পশুরাও তো কিছু মানে না, তাদের শরীর ইন্দ্রিয়ের নির্দেশেই চলছে। তাই বলে কুকুর বেড়ালরা কি আনন্দে নেই, তারাও দিব্যি আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করছে, সন্তান উৎপাদন করে যাচ্ছে। তাদের না আছে টেনশান, না আছে ব্যাঙ্ক ব্যলান্সের চিন্তা, না আছে অসুখ বিসুখের চিন্তা, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জন্মালে মরতে হবে মরে আবার জন্ম নিতে হবে এই নিয়ে তাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, আমার যদি ধর্ম অধর্ম নাই থাকে, পূণ্য পাপ যদি নাই থাকে, তাহলে আমার জন্ম হল কি করে? সেই রকম প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, ভগবান অবতার হন কি করে? পরের শ্লোকে ভগবান পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ধর্মাধর্মাতীত নিত্য ঈশ্বরের জন্ম কিভাবে সম্ভব।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

*(আমি জন্মরহিত, অলুপ্তজ্ঞানশক্তি-স্বভাব এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও সমস্ত জগৎ যার বশীভূত আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়া দ্বারা যেন দেহধারণ করি।)*

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে একটা খুব সহজ উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যখন কোথাও যান, তখন তাঁদের আগে পিছে অনেক সিপাহী থাকে। প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন, তাঁর দেহরক্ষী সিপাহীরা সেইদিকেই যাবে। মৌমাছিদের ক্ষেত্রেও তাই হয়, রানী মৌমাছি যেদিকে যাবে বাকি মৌমাছিরা সেদিকে যাবে। একজন কুখ্যাত কট্টর আতঙ্কবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার সাথেও অনেক সিপাহী আছে। কিন্তু সিপাহীরা যেদিকে যাবে কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে। সিপাহী দুটো ক্ষেত্রেই আছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আছে, কয়েদীর সঙ্গেও আছে। কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে, পুলিশ তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে। আর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে, পুলিশকে সেইদিকেই যেতে হবে, যেদিকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন। অবতার আর

জীবের মধ্যে এই তফাৎ। অবতার যেদিকে যাবেন, মায়া তাঁর পিছনে পিছনে চলবে। জীবের ক্ষেত্রে, মায়া যেদিকে যাবে জীবকে মায়ার পিছনে পিছনে যেতে হবে। মায়া কি? পাপ পূণ্যের বন্ধন, ধর্ম ও অধর্মের বন্ধন; এই মায়া কোমড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমরা না যেতে চাইলেও যেতে হবে।

কর্মের ব্যাপারে জীব আর ঈশ্বরের কি তফাৎ? ধরুন একজন কোন একটা দোষ করেছে। জজ সাহেবের সামনে বিচার চলছে। বিচার শেষে জজ সাহেব বলে দিলেন, ছ-মাসের জেল হল তোমার অথবা দু হাজার টাকা জরিমানা। দোষী ব্যক্তি কি বলবে? হয় ছ-মাসের জেল দিয়ে দিন, বা দু হাজার টাকার জরিমানা নিয়ে নিন। আমরা সবাই এই ধর্ম অধর্মে বাঁধা, আমাদের কর্ম বলে দেয়, হয় এটা নয় ওটা। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্ত, তাঁর উপর এটা খাটবে না। ঠাকুরের উপর এটা খাটবে না, তাঁর ধর্ম নেই, তাঁর অধর্ম নেই, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই, শ্রীরামের ক্ষেত্রেও তাই। কম্প্যুটারে যেমন জিরো আর ওয়ান, হয় জিরো নয় ওয়ান, তৃতীয় কিছু নেই। অবতারের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনটাই খাটবে না। শ্রীরামচন্দ্র বালি বধ করলেন, সীতাকে বনবাসে পাঠালেন, এতে শ্রীরামচন্দ্রের পূণ্যও হবে না, পাপও হবে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে কি করলেন, কাকে মারলেন, কাকে মারতে সাহায্য করলেন, এসবে তাঁর কিছু হয় না, তিনি অবতার। আমাদের দৃষ্টিতে পাপ পূণ্য হয়। সেইজন্য তিনি প্রাণপন চেষ্টা করেন, যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তেমনই থাকে, যেমনটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ওটা ভাঙতে হয়।

এবারে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। *অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্*, হে অর্জুন আমি হলাম যত জীব আছে, সমস্ত জীব, সমস্ত ভূতের ঈশ্বর। *অজোঽপি*, আমার কখন জন্ম হয় না, আমি অজ। ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পূণ্যের শক্তিগুলো পিছনে *ঠেলে* আমাদের দিয়ে যেমন সব কিছু করাচ্ছে, ভগবানের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয় না। তিনি ইচ্ছা করলে যেখানে খুশী, যে কোন গর্ভে জন্ম নিতে পারেন। তিনি মৎস্যাবতার হয়েছেন, তিনি বরাহ অবতার হয়েছেন, নরসিংহ অবতার হয়েছেন, যে কোন অবতার হতে পারেন, তাঁর কাছে এটা কোন ব্যাপারই না। তিনি কখন রাজপ্রাসাদে জন্ম নিতে পারেন, কখন কারাগারে জন্ম নিতে পারেন, আবার কখন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে জন্ম নিতে পারেন।

তার সাথে তিনি ঘাসের ছোট্ট একটা টুকরো থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত যা কিছু আছে, সব কিছুর 'আমি'র নিয়ন্তা। *অব্যয়াত্মা*, আমার জ্ঞানশক্তি কক্ষণ ক্ষয় হয় না। জ্ঞান সব সময় আমার জাগ্রত থাকে। তা সত্ত্বেও আমি আমার মায়া, যে মায়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালায়, সেই মায়াকে আমি নিজের অধীনে রেখে জন্মগ্রহণ করি। জীব হল মায়াধীন, আর ঈশ্বর হলেন মায়াধীশ। ঈশ্বর হলেন মায়ার মালিক, তিনি শুধু বলে দিলেন, মায়া আমি একটু ভিতরে যাচ্ছি, মায়াও সঙ্গে সঙ্গে আপ্যায়ন করে বলবেন, প্রভু আসুন আসুন। মায়ার ফলে কি হয়, মানুষ স্বয়ং বাসুদেব স্বরূপ, কিন্তু মায়ার জন্য সে নিজের স্বরূপকে জানতে পারে না। আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু জানতে পারছি না, কারণ মায়া আবরণ দিয়ে রেখেছে। ফলে কি হয়, আমি যে শরীর ধারণ করি, এটা আমার লীলা।

আচার্য বলছেন, *দেহবান্ ইব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ*, সাধারণ মানুষের যেভাবে জন্ম হয়, আমার সেভাবে জন্ম হয় না। তাহলে কি এটা মিথ্যা? একেবারেই মিথ্যা না। যিনি অনন্ত তাঁর কি কখন জন্ম হতে পারে, যিনি অনন্ত তাঁর কি কখন মৃত্যু হতে পারে? তিনি চিরন্তন, এটা সত্যও না, মিথ্যাও না। সত্য এই জন্য নয়, অনন্ত কখন জন্ম নেবে না। মিথ্যা কেন নয়? কারণ বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য এটাকে বলা হয় লীলা। তিনি কখন শরীর ধারণ করেন; আর তিনি কেন আসেন?

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।

*(হে ভারত, যখন প্রাণিদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি স্বীয় মায়াবলে যেন দেহবান্ হই, যেন জাত হই। সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই।)*

আচার্য ধর্ম কি পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, *বর্ণাশ্রমাধিলক্ষণস্য প্রাণিনাম্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য*, যেটা মানুষের কল্যাণ করে; অর্থ, কাম আর তার সাথে ধর্ম, যার দ্বারা এই জগতে মানুষের সাক্ষাৎ উন্নতির কারণ হয়। ধর্ম পালন করে যদি কারুর সাংসারিক ক্ষতি হচ্ছে দেখা যায়, তাহলে এটা কখনই ধর্ম হতে পারে না। ধর্ম পালন করে যদি ভাল উপার্জন না করতে পারে, নিজেকে যদি রক্ষা করতে না পারে, তাহলে এটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানেই অভ্যুদয়, ধর্ম পালন করলে এখন যে অবস্থায় আছে তার থেকে অনেক ভাল হবে। যদি ভাল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার ধর্মে কিছু গোলমাল আছে। আর তার সঙ্গে নিঃশ্রেয়স, সব কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের জন্য বেরিয়ে এসেছে। অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স, এটাকেই বলে ধর্ম। এই ধর্মে যখন গ্লানি হয়, যখন দেখা যায় মানুষ অভ্যুদয়ের দিকে যাচ্ছে না, নিঃশ্রেয়সের দিকে যাচ্ছে না, তখনই এটা হয়ে যায় মৃত্যুধর্মা। মৃত্যুধর্মা মানে, জন্মাল আর মরল, মরে আবার জন্ম নিল, আবার মরল। তার সাথে মনে করে মৃত্যুতেই সব শেষ।

ধর্মের এই দুরবস্থা যখন হয়, তখন *অভ্যুত্থানমধর্মস্য*, অধর্ম মানে এটাই, অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স হয় দুটোই, নয়তো দুটোর মধ্যে কোন একটা যখন নীচে নেমে যায়, ভগবান তখন অবতার হয়ে আসেন। যেমন আমেরিকা, অভ্যুদয় করেই যাচ্ছে, নিঃশ্রেয়সটা পুরো উড়ে গেছে। ভারতবর্ষে অভ্যুদয়ও নেই, নিঃশ্রেয়সও নেই। ভগবানকে তখন আসতে হয়। ভগবান যখন আসেন, তখন *তদাত্মানং সৃজাম্যহম্*, তখন আমি নিজেকে রচনা করি। সাধারণ জীবের মত তাঁর জন্ম হয় না। আবার হঠাৎ ম্যাজিকের মত দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন, 'আমি ভগবান তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি আবির্ভূত হলাম', এভাবেও তিনি আসেন না। সাধারণ ভাবে মানুষ যেভাবে আসে, তিনিও সেই একই পদ্ধতিতে গর্ভ দিয়েই আসেন। তাঁকেও ছোটবেলা অ-আ-ক-খ শিখতে হয়।

এসে তিনি কি করেন? ধর্মের যখন গ্লানি হয়, ধর্ম বলতে, যেটা মানুষের জন্য অভ্যুদয়, আর যেটা মানুষের জন্য নিঃশ্রেয়স, সাংসারিক উত্থান আর সন্ন্যাস, দুটোই সমান ভাবে চলতে হবে; দুটোরই যখন হানি হয় তখনই ধর্মের গ্লানি হয়। *বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্*, যে শক্তি এই দুটোকে নাশ করছে, সেই শক্তিটাকে ঈশ্বর অবতার হয়ে এসে দাবিয়ে দেন। সংসার মানে সব কিছুই থাকবে, আম গাছও থাকবে, বিষবৃক্ষও থাকবে; মানুষের মধ্যে ভাল মানুষও আছে, দুষ্ট মানুষও আছে, আবার সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছে সব ধরণের প্রাণী আছে। কিন্তু এমন কিছু হয়ে যায়, যার জন্য মানব সমাজে, প্রকৃতিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ত্যাগের ভাব কমে গিয়ে শুধুই ভোগের মধ্যে মানুষ ডুবে যায়। কিংবা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যার দ্বারা অভ্যুদয় আসবে, সেই অভ্যুদয় কমে যাচ্ছে, ভগবান তখন নিজেই আসেন, এসে জিনিসটাকে ঠিক করে দেন। কপিল মুনিকে আমরা অবতার মনে করি, তিনি এলেন সাংখ্য দর্শনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এমন একটা practical method হবে, যেটা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারবে, কপিল মুনির আসে সেটা ছিল না, তিনি এসে ওটা দিয়ে দিলেন। আবার অসুরগুলো যখন খুব শক্তিশালী হয়ে গেল, সমুদ্র মন্থন করে অমৃত বার করতে হবে, ভগবান তখন কুর্মাবতার হয়ে এলেন, তিনি সমুদ্রের নীচে গিয়ে বসলেন,

সমুদ্র মন্থন করে অমৃত বার করে আনলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে তিনি ত্যাগ জিনিসটাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কিভাবে?

স্বামীজী ঠাকুরের নামে স্তোত্রে বলছেন, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরু শরণং ভবৈদ্যম্*, সংশয়রূপ রাক্ষসকে তিনি মহাস্ত্র দিয়ে বধ করলেন। যেভাবে রাম রাবণকে বধ করলেন, যেভাবে কৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন, ঠাকুরও সেইভাবে এই সংশয়রাক্ষসকে বধ করলেন। ভবিষ্যতে যদি কোন পুরাণকার আসেন, তিনি এই সংশয়কে একটা অসুর রূপ তৈরী করে দেবেন, কোন একটা চরিত্র দাঁড় করিয়ে তাকে অসুরের রূপ দিয়ে দিলেন, আর ঠাকুর এসে সেই অসুরবধ করবেন। কিভাবে বধ করবেন? জ্ঞানশক্তি দিয়ে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা শুধু অস্ত্র দিয়েই অসুর নিধন করছেন না, মাঝে মাঝে 'হুম্' এই বীজমন্ত্রের এই হুঙ্কার দিয়েই কত অসুর বধ করে দিলেন। ঠাকুরও জ্ঞানশক্তি দিয়ে শুধু হুম্ করলেন, নাশ হয়ে গেল সংশয় রাক্ষস।

ইদানিং কালের যে লিবারাল, যুক্তিবাদীরা গলা ফাটিয়ে ধর্মের নামে কত গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে, এদেরই পূর্বজরা ঠাকুরের সময়েও ছিল, তখন এনারাও ধর্মের সব কিছুতে সংশয় করত। ঠাকুরের কোন প্রথাগত লেখাপড়া নেই, অতি সাধারণ এক জীবন, সেই জ্ঞানশক্তি দিয়ে তিনি আর-একবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন যে, ধর্মই সত্য, অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স; এই দুটি ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কথামৃতে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুর গৃহস্থের মঙ্গলটা যে কত জরুরী এবং কিভাবে তাদের মঙ্গল হবে, সেটাকে নিয়ে কত ভাবে আলোচনা করছেন।

*সম্ভবামি যুগে যুগে*, কারণ মানুষ লোভে পড়ে, মোহে পড়ে একটা সময় ধর্মকে ছাড়বেই। ধর্মকে ছাড়লেই বিনাশের রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে। সাথে সাথে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যে মানুষ নিজেকেই কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে যায়, সেখানে সমাজকে, ধর্মকে কি করে সেই মানুষ সামলাবে! ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া কি সামলানো যায়; বিশেষ করে শিক্ষা, ঈশ্বর ছাড়া সামলানো যায় না। সমস্যা যদি একটা স্তর থেকে বেশি হয়ে যায়, মানুষ আর সামলাতে পারে না। যুগে যুগে ভগবানকে তাই এসে ধর্মকে রক্ষা করতে হয়।

*পরিত্রাণায় সাধুনাং*, সাধু শব্দের মাধ্যমে শুভ শক্তির কথা বলছেন। অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স, এই বিদ্যাকে যাঁরা ধরে আছেন এবং এই বিদ্যাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এনারাই সেই শুভশক্তির প্রতিভু, এনারাই সাধু। এই পুরো জিনিসটাকে, অর্থাৎ আমার জন্ম, আমার কর্ম সমূহকে যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের কি হয়? পরের শ্লোকে ভগবান তাঁদের কথাই বলছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৯।।

*(হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার অলৌকিক মায়িক জন্ম ও সাধুপরিত্রাণাদি অপ্রাকৃত কর্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।)*

মুক্তির সহজ উপায় কি? যিনি জেনে গেলেন, আমার যত জন্ম, আমার যত কর্ম, সবটাই দিব্য, সবটাই লীলা, দেহান্তে তিনি আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। আমরা ঠাকুরের জপ করছি, ঠাকুরের ধ্যান করছি, এতে কি আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে? কোন দিন হবে না। গুরু আমাদের বলে দিয়েছেন ইষ্টের ধ্যান করতে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির ধ্যান করতে বলেননি, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির উপরেও ধ্যান করতে বলেননি। সাধনা মানেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার ভিতরে যে শুদ্ধ আত্মা আছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আমার সামনে প্রকট হবেন। ছবির ধ্যান করলে মরে আমি ছবিই হব। মূর্তির ধ্যান করলে মরে একটা ফসিল হব আর চৈতন্যের চিন্তা করলে চৈতন্য হবে। জপধ্যান করছে, কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণকে এখনও চৈতন্য রূপে না দেখে ছবি রূপে, মূর্তি রূপে দেখছে, এই কথা বললে অনেকে বুঝতেও পারেন না, কি বলতে চাইছি।

*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, আমার জন্ম দিব্য, আমার কর্ম দিব্য, এটাকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, ভাসা ভাসা জানলে হবে না। আমরা তো জানি শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কই আমাদের তো মুক্তি হচ্ছে না। মুক্তি হচ্ছে না, কারণ তত্ত্বতঃ আমরা জানি না। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব জিনিসটা কি, অবতার তত্ত্ব জিনিসটা কি, এটা যেন বোধ হয়। এই জন্যই গীতা শাস্ত্রাদি পড়া। সাধনা কেন করছি? জপধ্যান কেন করা হয়? যাতে এই তত্ত্ব বোধ হয়। এটাই ভগবান বলছেন, *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, যে ব্যক্তি এটা ঠিক ঠিক জেনেছে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, সামনে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন, ঠাকুর সেখানে বলছেন, এই ছোকরাদের শুধু এটুকু জানলেই হবে, তারা কে আর আমি কে, এবং এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক। খুব সহজ কথা, আমি তো জানি আমি কে, আমি জানি ঠাকুর কে, এই তো হয়ে গেল, আর কি লাগবে। মুক্তি তো আমার হয়ে গেল। না, এগুলো সব মুখের কথা, তত্ত্বতঃ আমাদের জানা নেই। সাধনা কিভাবে হয় রাজযোগে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*, অর্জুন তুমি ভাল করে জেনে নাও যে, যিনি আমার জন্ম দিব্য, আমার কর্ম দিব্য, এটাকে তত্ত্বতঃ জেনে গেছেন, তাঁর এই দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার পর আর জন্ম নিতে হয় না। কারণ দেহান্তে তিনি আমাকেই পেয়ে যান, চৈতন্যের চিন্তা করে করে চৈতন্য হয়ে গেছেন কিনা। যতক্ষণ মনের এলাকায় আছে, ততক্ষণই জন্মমৃত্যুর খেলা চলবে। চৈতন্যের সাথে যখন এক হয়ে গেল, তখন আর কিসের  জন্ম, কিসের মৃত্যু। উপনিষদে যেমন আছে, ভগবানকে যিনি আত্মা রূপে ধ্যান করেন, তাতেও তাঁর মুক্তি হয়। সেই আত্মা জগৎকে ভগবান রূপে যখন নিয়মন করেন, সেই ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, সেই অবতারকে যদি কেউ তত্ত্ব রূপে জেনে যায়, ভগবানের তত্ত্বটাকে যদি জেনে যায়, তাতেও তাঁর মুক্তি হয়ে যায়। উপনিষদের উপর গীতার এটাই বৈশিষ্ট্য, উপনিষদে সোপাধিক ঈশ্বরের বর্ণনা নেই। অবতারের পূজা করে মানুষ যে মুক্তি পেতে পারে, উপনিষদে আমরা এটা পাই না, এই জিনিসটা গীতাতেই আসে। হিন্দুদের জীবনে অবতারের পূজা অর্চনা এখন একটা খুব আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নয় নম্বর শ্লোকের মূল ভাব হল, যে আমাকে ঈশ্বর রূপে জানে, যে জানে আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি সব সময় বিদ্যমান, যে জানে আমার সমস্ত কর্ম দিব্য। দিব্য মানে, যেখানে ভগবানের কোন অহং ভাব নেই। এই দুটো – জাগতিক আর দিব্য। ভারতে মায়েদের স্থান অনেক উপরে, সেখানে একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে কলেজে পড়ে, লেখাপড়ায় ভাল, তার রূপের, গুণের, বিদ্যার সবাই প্রশংসা করবে, কিন্তু সম্মানের ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান দেবে না। কিন্তু ওই মেয়েই যখন মা হয়ে যাবে, এবার সমাজে, পরিবারে সে একটা উচ্চ সম্মান পাবে। কারণ মাতৃভাবের মাধ্যমে তার মধ্যে দিব্য ভাব এসে গেছে। একজন সত্যিকারের সাধক, সাধনা করে করে যিনি উপরে উঠে গুরুর স্থানে পৌঁছে গেছেন, তার সাথে ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন আর যে কোন মা, এই তিনজনের মধ্যে দিব্য ভাব থাকে, অন্য আর কারু মধ্যে থাকে না। কেন দিব্য ভাব থাকে? কারণ এই কয়জনের কাজে অহংতা আর মমতা, অর্থাৎ আমিত্ব জুড়ে থাকে না। মা যখন তার ছোট্ট শিশুকে খাওয়াচ্ছে, দেখাশোনা করছে, তখন সেখানে কোন আমিত্ব থাকে না। আমিত্ব না থাকার জন্য, নিজের ব্যক্তিত্বটা সন্তানের দেখাশোনায় পুরো ঢেলে দেয়। এটা একমাত্র ঈশ্বর পারেন, আর খুব উচ্চমানের সন্ত মহাত্মারা পারেন। সাধারণ স্তরের সাধুরা পারবেন না, আর মানুষ তো পারবেই না। মা তখনই পারে, যখন সে তার সন্তানকে দেখছে। সেই মহিলার যদি কারুর প্রতি মাতৃভাব এসে যায়, এই মাতৃভাব যে কোন মানুষের প্রতি আসতে পারে, তার বাবার প্রতি আসতে পারে, তার স্বামীর প্রতি থাকতে পারে, তার নিজের গুরুর প্রতিও মাতৃভাব থাকতে পারে; গুরুকে সন্তান রূপে দেখছেন, তার ভালমন্দ সব দেখাশোনা করছেন, এনারা হয়ে গেলেন দিব্য।

শুধু একটা তফাৎ থাকে, অন্যান্য জায়গায় এনাদের দিব্য ভাব নাও থাকতে পারে, কিন্তু যিনি অবতার, তাঁর কোন কাজে কোথাও কোন আমিত্ব থাকে না। রাজযোগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনকে বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানে মনকে আবার চারটে ভাগে ভাগ করে বলছেন, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। এই অহঙ্কার মানে যখন কোন কিছুর সাথে আমরা জুড়ে যাই। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসলে তোমার সাথে জুড়ে যাব। আমি তোমাকে পছন্দ করি না, পছন্দ না করলে তোমার কাছ থেকে সরে চলে আসব। আমি জীবনে এটা চাই, সেটা চাই; এগুলো সব অহঙ্কার। অহঙ্কার এটা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, বাংলা অহঙ্কারের সাথে মেলালে হবে না। যিনি এটা বুঝতে পারেন, তাঁর এই শরীরের নাশ হয়ে গেল, মৃত্যুর পর আর তাঁর পুনরাগমন হয় না, মুক্ত হয়ে যায়। শেষ সময়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়েও যদি এই জ্ঞান হয়, তাহলেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য শ্রীশ্রীমা বলছেন, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। এর অর্থ হল, যদি আপনি ঠাকুরকে ঈশ্বর ভাবে সাধনা করে থাকেন, সারা জীবন যদি নাও হয়, শেষ সময়ে আপনার হবেই। কিন্তু যদি মনে করেন, আপনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, বেলুড় মঠে আসেন, খিচুরি প্রসাদ খাচ্ছেন, বাতাসা প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছেন, পাঁচ টাকার প্রণামী দিয়ে যাচ্ছেন, এভাবে কোন সম্ভবনা নেই। যিনি ঠাকুরকে *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, যাঁর এই বোধ আছে যে, ঠাকুর দিব্য, তাঁর জন্ম দিব্য, তাঁর কর্ম দিব্য, তাঁর সব কিছু দিব্য, ঠাকুর ভগবান, এই ভাব নিয়ে যে সারা জীবন সাধনা করে আসছেন, তাঁর সারা জীবনে কিছু না হলেও মৃত্যুর সময় অবশ্যই তাঁর মুক্তি হবে।

দিব্য বললে বুঝতে হবে অনন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, যিনি ভগবান, তিনি এই রকম দেহ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি শুধু এই ছবিটুকুই নন; তিনি অনন্ত, ঠাকুরের ধ্যান করা মানে এই ছবির ধ্যান না, শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনন্ত, ওই অনন্তের ধ্যান করতে হবে। ঠাকুরের যে অনন্ত ভাব, তাঁর যে অনন্ত মূর্তরূপ, যেটাকে বর্তমান কালে ছবি তুলে রাখা হয়েছে, এই ছবি মনে করানোর জন্য, ইনিই সেই। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামের ছবি বা মূর্তি কল্পনা দিয়ে নির্মিত, কিন্তু ব্যাপারটা সেই একই। শ্রীরামের কত প্রকার মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের কত রকম মূর্তি, শিবের কত রকম মূর্তি, কোনটা ঠিক? সবটাই ঠিক, কারণ উদ্দেশ্য হল সেই অনন্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিও সেই একই জিনিস। যাঁরা শ্রীরামের বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির উপর ধ্যান করেন, যে যার ধ্যান করে সে সেটাই হয়। ঠাকুরও বলছেন, যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। ছবি বা মূর্তির ধ্যান করলে, সেও ছবি হয়ে যাবে বা একটা ফসিল হয়ে যাবে। তাহলে কি করতে হবে? তুমি দিব্যকে জানো। ছবি বা মূর্তিটা দিব্য নয়, অনন্ত নয়, বিগ্রহ অনন্ত নয়, ছবি বা বিগ্রহ শুধু আমাদের সেই অনন্তকে মনে করিয়ে দেয়। এরপর দশ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০।।

*(আসক্তিরহিত, ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত, মদ্‌গতচিত্ত ও আমারই শরণাগত (কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ) বহু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পরাশুদ্ধি লাভ করে ব্রহ্মভাব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন।)*

নয় আর দশ নম্বর শ্লোক দুটো একসাথে চলে। আমরা নয় নম্বর শ্লোক নিয়ে এতক্ষণ বলে এসেছি। যে কোন মানুষের এই তিনটে জিনিস থাকে, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব এবং সিদ্ধান্ত; আমার আপনার সবারই এই তিনটে জিনিস থাকবে। ব্যক্তি কোন কাজে আসে না, আমি যাকে ভালবাসি তাকে ব্যক্তি রূপে দেখছি, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। বাচ্চা তার মাকে ব্যক্তি রূপে দেখে। সেই বাচ্চা বড় হওয়ার পর বলে, জানো আমার মা এই রকম বলতেন, বা আমার বাবা এই রকম করতেন, অথবা বলছে আমার মার মত মা নেই বা আমার বাবার মত বাবা হয় না। এবার কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপর চলে এসেছে। এখান থেকে আরও উপরে চলে গেল, যেটা খুব কম ক্ষেত্রে হয়, তখন সে সিদ্ধান্তের উপর

চলে আসে। আজকেই একটা খবর আছে, যদিও এই টপিকের উপর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বললে জিনিসটা পরিষ্কার হবে।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার থাকার সময় তাঁর একটা চশমা, সেই বিখ্যাত রাউণ্ড রিমের চশমা কোন একজন ইঞ্জিনিয়ারকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। সেই ইঞ্জিনিয়ার গান্ধীজীকে কোন ব্যাপারে উপকার করেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এই উপহার দিয়েছিলেন, মনে রাখার জন্য অনেকেই এই রকম নিজের ব্যবহৃত কিছু জিনিস দিয়ে থাকেন। সেই চশমাটা এতদিন পড়েছিল, যার কাছে ছিল সে জানতও না, এটা কি, কার এটা। তবে একটা নোট ছিল, সেখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই নামটা লেখা ছিল। কিভাবে কিভাবে এই চশমা অকশানে গেছে, আজকে সেই চশমা আড়াই কোটি টাকায় বিক্রী হয়েছে। যার কাছে চশমাটা ছিল, সে প্রায় ডাস্টবিনে ফেলতে যাচ্ছিল, কিভাবে কিভাবে ওই লেখাটার দিকে তার নজর পড়ে যায়। একটা মানুষ নিজেকে তুলে এমন সিদ্ধান্তের উপরে নিয়ে গেছেন যে, দেড়শ বছর পর তার ওই চশমার দাম আড়াই কোটি টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধান্তের প্রতিনিধিত্ব করেন? আমি যখন ধ্যান করব কিসের উপর ধ্যান করব? এখানে বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপ্রিতাঃ*, অনেক আগেকার যেসব ঋষিরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আমার চিন্তন করে করে আমাতে চলে এলেন বা আমার সঙ্গে মিশে গেলেন। তার মানে দাঁড়ায়, তাঁরা কৃষ্ণ ভাবকে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো সেদিনকার, অর্জুন বলছেন, সূর্যের জন্ম কত আগে আর আপনার জন্ম তো আমার জন্মের কয়েক বছর আগে হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আগের আগের ঋষিরা আমার চিন্তন করে করে আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়েছে। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব, এই ভাব তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই আছে। তাহলে এটা বুঝতে হবে যে, ইদানিং শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি বা মূর্তি বেরোচ্ছে, এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, কারণ ওই রূপে বসুদেবের বাড়িত শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। কিন্তু এখানে যা বলা হচ্ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, তিনি তারও অনেক আগে থেকেই আছেন।

এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, এর প্রত্যেকটি শ্লোক আমাদের মোক্ষে নিয়ে চলে যেতে পারে। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ বলতেন, গীতার এক একটি শ্লোকের উপর এক মাস ধ্যান করলে তবে সেই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট হবে। যদি কেউ গীতা বুঝতে চায়, একটা বই কিনে অর্থটা দেখে নিল, নিজের মত বুঝে নিল, হয়ে গেল। ব্যাখ্যা যদি চায়, গীতার উপর অনেকের ব্যাখ্যা আছে, যে কোন একটা ব্যাখ্যা ধরে ধরে পড়ে নিলেই হয়ে গেল। আর ধারণা যদি করতে চায়, তাহলে আগে নিজেকে শান্ত করতে হবে, মনে প্রশ্ন ওঠাটা বন্ধ করতে হবে। যেটা শুনছেন, সেটাকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অনুধ্যান করুন, তবে যদি গীতার কৃপায় শ্লোকের অর্থ ধারণাটা স্পষ্ট হয়। আমাদের রাম মহারাজ ছিলেন, যাঁর কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কি একটা কথায় আমি বললাম, 'বিভিন্ন কারণে এখন অত পড়াশোনা করতে পারছি না'। তিনি শুনে বললেন, 'বইগুলোকে ঝাড়তে থাকবে, তাতেও শাস্ত্র কৃপা হবে'। মূল কথা, শাস্ত্র যদি কৃপা না করে, আমরা কোন দিন ধারণা করতে পারব না। মোক্ষশাস্ত্র কোন ফিজিক্স, বায়োলজি না যে, আমি পড়লাম, শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেন আর সব বুঝে গেলাম। গীতা যদি আমাদের উপর কৃপা করেন, উপনিষদ যদি আমাদের কৃপা করেন, তবেই আমরা ধারণা করতে পারব। সাধনা তার অনেক পরে শুরু হয়।

তাহলে কি করতে হবে? প্রথমে শ্রদ্ধার সাথে শুনে যাও। কারুর কৃপা পেতে গেলে আগে তার পায়ে গিয়ে পড়তে হয়। গীতাতেই ভগবান পরে বলবেন, *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*, তাঁর পায়ে গিয়ে লম্বা একটা সাষ্টাঙ্গ দাও, তাঁর সেবা কর, তারপরে প্রশ্ন করবে। একটা ঘটিকে ট্যাপের তলায় উল্টো করে রেখে দিয়ে বলে যাচ্ছে, ঘটিতে জল ভরছে না কেন। পাত্রটাকে একটু সোজা করে রাখুন। এই সোজা করে রাখাটা হল শ্রদ্ধা। ভগবান বলছেন, আগে আগে লোকেরা

আমার ভাবকে নিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, ওই কৃষ্ণ নন। তাহলে কোন কৃষ্ণ? যিনি সিদ্ধান্তকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ভগবানের সিদ্ধান্ত একটাই, তিনি অনন্ত। ঈশ্বরের একটাই পরিভাষা, ঈশ্বর অনন্ত, এছাড়া আর কিছু পরিভাষা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ আগেও অনন্ত ছিলেন, যখন দেহ ধারণ করলেন, তখনও অনন্ত, যখন লীলা সম্বরণ করলেন, তারপরেও তিনি অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত, এত অনন্ত কোথা থেকে হল? এনারা সবাই এক একটা অনন্তের মুখ। শ্রীরামচন্দ্র সেই অনন্তের উপর একটা মুখোস, শ্রীকৃষ্ণও তাই, শ্রীরামকৃষ্ণও তাই। দিব্য বলতে এটাই, নয় নম্বর শ্লোকে যখন বলছেন *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, দিব্য মানেই বলতে চাইছেন, তুমি জানো তিনি অনন্ত। যিনি অনন্ত, তাঁর কখন জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে বলতে শুরু করেছেন, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।* তাঁর জন্ম নেই, তাঁর মৃত্যু নেই, এটাই এখানে নয় নম্বর শ্লোকে বলছেন। ওখানে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এখানে অবতার তত্ত্ব বলতে গিয়ে বলছেন, কিন্তু দুটো একই কথা, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এর পরে পরেও একই কথা বলবেন। আর আমরা যখন বলি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, তখনও আমরা এই একই কথা বলি। ঈশ্বর অনন্ত, আত্মা অনন্ত, এই অনন্ত ভাবকে যদি ধরা হয়, তাহলে অনন্তের জন্ম কোথায় হবে! অনন্ত কি কাজ করবে, কোথায় কাজ করবে? এই ভাব যদি দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। আমরা বেশির ভাগ ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তির উপর ঘুর ঘুর করছি, খুব হলে ব্যক্তিত্ব। যেমনি বলছি 'শ্রীমা এই কথা বলেছেন', তেমনি এটা ব্যক্তিত্বে চলে গেল; একটা গুণ নিজের উপর এলো। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন যদি পেতে চাই, তাহলে অনন্ত রূপে যদি চিন্তা করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবের উপর যদি চিন্তা করা হয়, যে ভাবটা ধ্যাতার মনকে আস্তে আস্তে অনন্তের দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে না হলে ঈশ্বর দর্শনের দিকে এগোন যাবে না। এই কথা আমরা বলছি না, শাস্ত্র এই কথা বলছেন, ঠাকুরও বলছেন, স্বামীজীও বলছেন।

দশ নম্বর শ্লোকে পরম্পরার কথা বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ*, যদি আপনি ঈশ্বর দর্শন করতে চান, যদি আত্মজ্ঞান পেতে চান তাহলে আগের আগের ঋষিরা যেভাবে পেয়েছেন, আপনাকেও সেই ভাবে পেতে হবে। বলছেন, রাগ, এই রাগ বাংলা রাগ না, রাগ মানে অনুরাগ; ভয় আর ক্রোধ, মানুষের মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে আর সে যেটা পেতে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, তখন ক্রোধ হয় আর ক্ষমতা না থাকলে ভয় হয়। বলছেন, এই তিনটে, অনুরাগ, ভয় আর ক্রোধ যার চলে গেছে, কোন কিছুতে আসক্তি নেই, কারুর প্রতি ক্রোধ নেই, আর কাউকে সে ভয় করে না, তার থেকেও কেউ ভয় পায় না; এই ধরণের *বীতরাগভয়ক্রোধা* ঋষিরা আমাকেই অর্থাৎ আমার ভাবকেই আশ্রয় করেছিলেন। আমি কাউকে ভয় করি না, এখানে একটা ঔদ্ধতের ভাব আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন ঔদ্ধত থাকে না।

দেওঘরে মণিপুরের এক ছাত্র ছিল, মণিপুরের অনেক ছেলে দেওঘরে বিদ্যাপীঠে পড়তে আসত। এই ছেলেটি পরে আইএএস হয়েছিল। দেওঘর থেকে আমি যখন চলে আসি, ঠিক সেই বছরই দেওঘরে ভর্তি হয়েছিল। ২০১১ সালে ইম্ফলে আমাকে একটা আমন্ত্রণে যেতে হয়েছিল, সেখানে ওই ছেলেটিও এসেছে, তখন সে আইএএস হয়ে গেছে। ছেলেটি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। পরে ওর অনেক কাহিনী শুনলাম। ছেলেটি যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, সেই জেলা ছিল জঙ্গি অধিষ্যুত, জঙ্গিদের উৎপাত লেগেই থাকত। এই ছেলেটি কোন সিকিউরিটি ছাড়া চলাফেরা করত, অফিসে কেউ না এলে নিজে গিয়ে অফিস খুলত। ওকে যদি কেউ বলত, তুমি এভাবে কোন সিকিউরিটি ছাড়া চলাফেরা করছ, জঙ্গিরা যখন খুশী তোমার জীবন নিয়ে নিতে পারে। ও একটা কথাই সবাইকে বলত, আমি তো ওদের ভালর জন্যই কাজ করছি, আমাকে কেন মারতে যাবে!

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সিকিউরিটি নিয়ে চলাফেরা করার কথা বললে তাঁকেও একই কথা বলত। ছেলেটিকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল, পুরোপুরি কাজের প্রতি উৎসর্গিকৃত। কোন জঙ্গি যদি ছেলেটির কোন ক্ষতি করে, অন্য জঙ্গিরা সেই জঙ্গিকে মেরে দেবে।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় নারায়ণপুরে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটা সেন্টার আছে, ওটা হল বিরাট নকশাল বেল্ট। ওই সেন্টার থেকে আদিবাসীদের জন্য প্রচুর কাজ হয়। প্রথমের দিকে কিছু কিছু অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু পরে ওরা বুঝে গেল, সন্ন্যাসীরা আমাদের ভালর জন্য আছেন। তারপর থেকে নকশালরা আমাদের কোন বিরক্ত করত না। সেই নিয়ে আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ উলটে সন্ন্যাসীদের সন্দেহ করত। নকশালরাও আমাদের অনেক সময় সন্দেহ করে। কিন্তু সবাই বুঝে গেছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা নিউট্রাল। সন্ন্যাসীরা কোন কিছুতেই নেই, কংগ্রেস সরকার তাতেও আমরা, কম্যুনিস্ট সরকার তাতেও আমরা, বিজেপি সরকার তাতেও আমরা। কারণ জনসাধারণের মধ্যে আমরা যে কাজ করি, সেটা সবার ভালর জন্য, সেখানে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। সেইজন্য ভয়ের কিছু থাকে না, তুমি যদি আমাকে মেরে দাও, তোমারই ক্ষতি, আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। তখন কোন ভয় কাজ করে না। ভয় থাকে সেখানে, যেখানে স্বার্থ আছে; যার স্বার্থ নেই তার কিসের ভয়! স্বার্থ না থাকলে ক্রোধ কোথা থেকে আসবে! আমরা প্রায়ই শুদ্ধ মনের কথা বলি, শুদ্ধ মন বলতে কি বোঝায়? শুদ্ধ মন মানে, কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ নেই, কোন কিছুর প্রতি ক্রোধ নেই, কোন জিনিসের থেকে ভয় নেই। এই ধরণের মন যাঁদের হয়, এনারাই হলেন সাত্ত্বিক মানুষ, ভাল মানুষ। এই ধরণের মনই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।

ঈশ্বর দর্শন কি রকম? বলছেন, *মন্ময়া*, আমার দিকে যাঁর পুরো মন চলে এসেছে। কি রকম চলে এসেছে? আচার্য বলছেন, *ব্রহ্মবিদ্ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ*, *ব্রহ্মবিদ্*, যাঁর এই জ্ঞান হয়ে গেছে, আমিই সেই ব্রহ্ম, যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, আমি ঈশ্বরের সাথে পুরো এক। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র নিয়েছেন মানে, আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক, তা সে সন্তান রূপেই হোক, শিষ্য রূপেই হোক, যে রূপেই হোক। নবম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান বলবেন, *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, ভগবান বলছেন, আমি এই জগতের মা, আমি এই জগতের বাবা, আমি এই জগতের পিতামহ। আপনি এর মধ্য থেকে যে কোন একটা ভাব নিয়ে নিন, তবে আপনার গুরু আপনাকে যে ভাবের কথা বলে দিয়েছেন, সেই ভাবকে ধরে রাখাটাই উচিৎ।

সন্ন্যাসীদের কাছে এসে অনেকেই দুঃখ করে বলেন, জীবনে খুব অশান্তি, এই রোগে ভুগছি, এই শোকে জর্জরিত, এর থেকে বেরোবার উপায় কি? ঠিকই, জীবনে অনেক অশান্তি। কি উপায় আপনাকে বলব, আমারই খাওয়া-পড়া কোন রকমে জোটে, আমি কি আর বলব? আমার যিনি ইষ্ট তিনি ক্যান্সারে মারা গেলেন। স্বামীজীর হাজারটা রোগ, ঊনচল্লিশ বছরে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা পায়ের বাতে এমন কষ্ট পেতেন যে, তাঁকে পা টেনে টেনে চলত হত, বসার সময় পা ছড়িয়ে বসতে হত। আমার জীবনের এই তিনজনই আদর্শ, তাঁদেরই এই অবস্থা, আপনাকে আমি কি বলব! কিন্তু যেটা আমি বলতে পারি, এনাদের তিনজনরই বৈশিষ্ট্য হল, ঈশ্বরে পুরোপুরি তন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, ওর মধ্যে ডুবে থাকা। আমরা সবাই দেখেছি, মা যত অসুস্থই থাকুন, সন্তানের যদি কিছু দরকার পড়ে, ওই কষ্টের মধ্যেও কোন রকমে উঠে, সন্তানের জন্য একটা কিছু করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার শরীর খারাপ, আপনার অভাব আছে, কিন্তু আপনার মনটা তো ফ্রী, আপনি তো পাগল নন।

জর্জ অরওয়েল, বিরাট বড় লেখক, কম্যুনিজমের উপর লেখা ওনার একটা বিরাট স্যাটায়ার আছে। কিন্তু তার থেকেও ওনার বিখ্যাত বই হল '1984'। সেই বইতে তিনি একটা ধারণা নিয়ে এলেন, thought পুলিশ। কম্যুনিস্ট শাসিত রাজ্যে কোন কিছুকে নিয়ে কোন কথা কেউ বলতে চায়

না, সাধারণ জিনিসকে নিয়েও বলতে যাবে না। কিন্তু জর্জ অরওয়েল আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, সেখানে নিয়ে এলেন থট পুলিশ। কারুর মনের মধ্যেও যদি কিছু গোলমাল থাকে, সেটাকেও পুলিশ ধরে নিচ্ছে যে এরা বিপ্লবের চিন্তা-ভাবনা করছে। তাতেই সবাইকে গ্রেফতার করে নিচ্ছে। এই রকম কি আমাদের জীবনে কিছু আছে? কিছু নেই, আমরা ফ্রী। আপনার মধ্যে ঈশ্বরের চেতনা আনতে কে নিষেধ করেছে! আপনি জপধ্যান করতে পারছেন না, মানলাম, না পারারই কথা। বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিরিশ পেরোলে ফর্সা। তিরিশ বছরের মধ্যে জপধ্যান করা যদি না শুরু করে থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। লোকেরা এখানে দীক্ষাই নিতে আসেন সত্তর বছর বয়সে। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, মন কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? যখন নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল, তখন মনকে পুরো ছেড়ে রেখেছিলেন। যখন যৌবন ছিল, জোশ ছিল, তেজ ছিল, তখন কোন জপধ্যান, সাধন-ভজন করলেন না আর বৃদ্ধাবস্থায় এসে বলছেন, মন কি করে নিয়ন্ত্রণ করব।

একজনকে আমরা জানতাম, উনি কম বয়সে ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন। ব্যাচেলার ছিলেন, একটা ইন্টেলেকচুয়াল জীবন-যাপন করলেন, গ্রাহাম গ্রীনের মত ইংল্যাণ্ডের খুব নামকরা লেখকদের সাথে তাঁর পরিচিতি ছিল। তারপর ইংল্যাণ্ডের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বেশি টাকা-পয়সাও নিয়ে আসতে পারেননি, কিভাবে সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে এখন এখানে-সেখানে খুঁজছেন কোথায় থাকা যেতে পারে, কোথায় একটা কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিভাবে কিভাবে আমার সাথে পরিচয় হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতায় আপনার কি পরিচিত কেউ নেই'? 'হ্যাঁ আছে, ভাইরা আছে, ভাইপোরা আছে। কিন্তু ছোটবেলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, ভাইপোরা শুনেছে কেউ একজন ছিল। ভাই দেখিয়ে দিল, আমাদের ছোট ফ্ল্যাট, কোথায় তোমাকে রাখব'? ওনার এখন পচাত্তর মত বয়স, এই বয়সে উনি চাকরি খুঁজছেন। সময় থাকতে থাকতে জীবনকে আমরা গড়ে তুললাম না, পরে বলছি, আমার এই সমস্যা কেন? সমস্যা তো আজকে না, এই বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন অনেক বছর আগে, সেই বিষবৃক্ষ এখন ফল দিচ্ছে। আপনি জপধ্যান হয়ত করতে পারবেন না, কিন্তু ঈশ্বর চেতনাটা কেন জাগিয়ে রাখতে পারবেন না?

সারাদিনে যে কাজই করবেন, ঠাকুরের নাম করতে করতে করুন। ঠাকুরের কোন গান, রামকৃষ্ণ শরণম্ রামকৃষ্ণ শরণম্ করুন, রামকৃষ্ণ চেতনা থেকে যেন সরে থাকতে না হয়। আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ*, আপনি ঈশ্বরের সাথে অভেদ। নিজেকে পুরো অভেদ মনে না করতে পারলেও, একটু তো চেষ্টা করতে হবে। গীতা মোক্ষশাস্ত্র, গীতার কথা শুনে একটু যদি চেতনা না জাগে, তাহলে এসব কথা শোনা বৃথা। দ্বিতীয় কথা, গীতা হিন্দু ধর্মের সার, গীতা বেদের সার। সেইজন্য গীতা ধারণা করা তো দূরের কথা, বোঝা অত্যন্ত কঠিন। গীতাকে যত বিস্তারে নিয়ে যাওয়া হবে, ততই বাড়তে থাকবে, কারণ সমস্ত বেদের সার হল গীতা। আমরা তাও চেষ্টা করছি খুব সংক্ষেপে যতটা বলা যায়।

*মদ্ভাবমাগতাঃ*, ভগবান বলছেন, আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। কবে প্রাপ্ত হয়? *বীতরাগভয়ক্রোধা*, আসক্তি, ভয়, ক্রোধ বর্জিত; *মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ*, আমার প্রতি মদ্‌গত চিত্ত আর আমাকেই আশ্রয় করে থাকে, আমাকে ছাড়া অন্য কোন দিকে যায় না, শুধু জ্ঞাননিষ্ঠাতে থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, যার ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। এটা করলে কি হয়? ভগবান এখানে তপস্বীদের কথা বলছেন, যাঁরা অনেক আগে কম বয়স থেকে শুরু করেছেন। *মদ্ভাবমাগতাঃ*, তারা আমার ভাব প্রাপ্ত হয়ে যায়। ঈশ্বরের ভাব কি? অনন্ত, ঈশ্বরের একটাই পরিভাষা, ঈশ্বর অনন্ত। রামকৃষ্ণলোক কি? অনন্ত। ব্রহ্মলোক কি? অনন্ত। বৈকুণ্ঠধাম কি? অনন্ত। আর সালোক্য সামীপ্য? না, একেবারে সাযুজ্য, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এটাই মুক্তি। এই ব্যবস্থা কি কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে হয়েছে? না, চিরদিন এভাবেই চলে আসছে। *বহবো*, আগের আগের ঋষিরা এই ভাবকে

আশ্রয় করে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। কি চলছে? ঈশ্বর অনন্ত, যিনি অনন্ত, তাঁর সাধনা করতে হলে তাকেও অনন্ত হতে হবে। যেমন বলা হয়, *শিবভূত্বা শিবেম যজেৎ*, যদি আপনি জীবসেবা করতে চান, তাহলে নিজেকে শিবজ্ঞান করুন, অপরকেও শিবজ্ঞানে সেবা করুন। সেই রকম, অনন্তের পূজা যখন করা হবে, তখন নিজেকেও অনন্ত মনে করতে হবে। যিনি অনন্ত, তাঁর কি কখন, আসক্তি, ভয়, ক্রোধ থাকতে পারে, তার কি কখন আলস্য থাকতে পারে! একদিকে ব্যক্তি, আর-একদিকে ব্যক্তিত্ব, অন্য দিকে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত একটাই, তিনি অনন্ত। এটা আগে থেকেই চলে আসছে, আর এই ভাবে কত লোক মুক্তি পেয়ে গেছেন।

এখন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, হে প্রভু, আপনি পক্ষপাত করেন। যার মধ্যে রাগদ্বেষ নেই, যে আপনাকে আশ্রয় করে আছে, তাকে আপনি মুক্তি দিচ্ছেন, বাকিদের কি আপনি মরার জন্য ছেড়ে রেখেছেন? ঠাকুরকে একজন বলছেন, মহাশয় ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আছে। ঠাকুর রেগে গিয়ে বলছেন, তোমার তো খুব বেণে বুদ্ধি। আচার্যও এখানে প্রশ্ন তুলছেন, আপনার তো বৈষম্য দোষ আছে। সে ভাল বলে আপনি তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, আর আমি ভাল না বলে আমাকে গোল্লায় ফেলছেন? আমার কি হবে? ভগবান তখন বলছেন, আমার কেন বৈষম্য দোষ হবে, সবাই আমার কাছে সমান। আমি সূর্যের আলো, সূর্যের আলোতে কেউ ভাল কাজ করছে, আবার এই সূর্যের আলোতে কেউ মন্দ কাজও করছে কিন্তু সূর্য সবাইকে সমান ভাবে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। সূর্যের মধ্যে যেমন কোন বৈষম্য দোষ থাকতে পারে না, তেমনি ভগবানও কোন পক্ষপাত করেন না। পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।১১।।

*(যিনি যে প্রকারে (মোক্ষ, জ্ঞান, কাম্য বস্তু, অথবা আর্তি-নিবারণের জন্য) আমার উপাসনা করেন, আমি (সর্বফলদাতা পরমেশ্বর) তাঁকে সেই ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি, অর্থাৎ সকামকে তাঁর কাম্যফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি। হে পার্থ, বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মনিষ্ঠ মানুষরা সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন। যাঁরা যে প্রকারে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁরা সেই সকল প্রকারে সর্বাত্মক, সর্বাবস্থ আমারই মোক্ষমার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ আমিই ইন্দ্রাদি সর্বদেবরূপধারী।)*

এই শ্লোকের বিশেষ একটা দাম আছে, কারণ গভীরে গেলে এর অনেক অর্থ বেরিয়ে আসে। ভগবান বলছেন, আমি সেই অনন্ত, আমি কামধেনু, আমি সেই কল্পতরু। আমি কাউকে নিজে থেকে কিছু দিই না, যে যা চায় সে সেটা পায়। আমি নিজে থেকে কাউকে কিছু করে দিই না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর কল্পতরু, কল্পতরুর মূলে গিয়ে কি তুমি লাউ কুমড়ো চাইবে? ঈশ্বরজ্ঞানের তুলনায় কামিনী-কাঞ্চন হল লাউ কুমড়ো।

বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*, আমার কাছে যে যেমনটি চায়, আমি তাকে তেমনটি দিয়ে দিই। এর উপসংহার খুব মারাত্মক হয়। আমার বর্তমানে যে দুরবস্থা চলছে এটা কি তাহলে ভগবান দিয়েছেন? অবশ্যই ভগবান দিয়েছেন। কেন দিলেন ভগবান? রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে বর্দ্ধমানের টিকিট চাইলে কাউন্টার থেকে বর্দ্ধমানের টিকিটই দেওয়া হবে, আর আসানসোলের টিকিট চাইলে আসানসোলের টিকিটই দেওয়া হবে। কারণ তিনি কল্পতরু। আপনি বর্দ্ধমানের টিকিট চাইলেন, এবার ট্রেনে চেপে চললেন। কিন্তু ভুলেই গেলেন যে, আপনি বর্দ্ধমানের টিকিট চেয়েছিলেন। বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে ট্রেন চলছে। এবার টিটি এসে আপনার টিকিট চাইল, টিকিট দেখেই টিটি আপনাকে ধরবে। আপনি বলছেন, আমাকে তো আসানসোল যেতে হবে। টিটি কিন্তু আপনাকে আর ছাড়বে না। আপনি কখন, কোন এক সময় কোন কিছু চেয়েছেন, যেটার ফল আজকে আপনাকে পেতে হচ্ছে।

কেন ফল পেতে হচ্ছে? কারণ জীবনের সব কিছুই হল প্যাকেজ ডীল। বিয়ে থা একটা প্যাকেজ ডীল, সন্তান হওয়া একটা প্যাকেজ ডীল, চাকরি একটা প্যাকেজ ডীল, সন্ন্যাস একটা প্যাকেজ ডীল। একজন মজা করে লিখলেন, এই লকডাউনে বাড়ির লোকদের খুশী রাখার জন্য আমি রান্নায় এই এই আইটেম বানালাম। যে যে আইটেমের কথা উনি বললেন, সেই নামগুলি আমি শুনেছি, কিন্তু চেখে দেখার সুযোগ কখন হয়নি। রামকৃষ্ণ মিশনে আমার চল্লিশ বছর হল, বেলুড় মঠে আমাদের রুটিন খাওয়া ঝোল চচ্চড়ি। সারা বছর ওই এক আইটেম চলে, চচ্চড়িতে কি শাক দেওয়া হয়েছে দেখে বোঝার উপায় নেই এখন কোন সিজন চলছে। তারপর আজ বৃষ্টি পড়ছে, আজ খিচুরি আর ইলিশ মাছ হলে বেশ জমবে। ছোটবেলা বাড়িতে এই রকম আবদার করলে পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন প্রশ্নই নেই। এখানে ব্রেকফাস্ট মুরি আর মুরি, আর দুপুরে চচ্চড়ি, আর বিশেষ দিন হলে খিচুরি। এখানে মজা করে বলা হয়, এই তিনটকে যদি আপনি ভালবেসে ফেলতে পারেন, মুরি, চচ্চড়ি আর খিচুরি, বুঝে নিন আপনি এখন ঠিক ঠিক রামাকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। এটা প্যাকেজ ডীল, আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, এটা নিয়েই থাকতে হবে। কোন একটা সময় ভগবানের কাছে কিছু একটা চেয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ আপনাকে আজকে এটা ভুগতে হচ্ছে।

তার সাথে বলছেন, *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*, মানুষ আমার দেওয়া পথের বাইরে এই জগতে কিছু করতে পারে না। যে ভাল করছে, সেই পথটাও আমার দেওয়া; যে মন্দ করছে সেটাও আমার দেওয়া পথ। এই শ্লোকের অর্থটা স্পষ্ট, অল্প কথা দিয়েই বলে দেওয়া যায়, প্রথম হল আমার কাছে যে যা চায় তাকে আমি সেটাই দিই, আর দ্বিতীয় হল, যে যেই পথে চলছে, সেই পথ আমারই দেওয়া। জিনিসটা ঠিক তা নয়, এর অর্থ অনেক গভীরে যায়। কথায় কথায় আমরা বলি, সব ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছা পরে হয়, আমার নিজের চেষ্টা আগে হয়। আগে আমাকে চেষ্টা করতে হবে, প্রভু পরে ওটাই আমাকে দেবেন। এই নীতি কাদের জন্য? যাদের 'আমি' বোধ আছে, আমিত্ব বোধ যাদের আছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। যার আমিত্ব বোধ নেই, তার আমিই কোথায় আর ঈশ্বরই বা কোথায়। তার পুরুষকার নেই, ঈশ্বর ছাড়া তার কিছু নেই, সেইজন্য এই প্রশ্ন ওঠে না। আমিত্ব বোধ যদি একটুও থাকে, সুতোতে একটু যদি আঁশ থাকে ছুঁচের মধ্য দিয়ে সুতোকে প্রবেশ করানো যাবে না, এই আঁশ হল আমিত্ব বোধ। আমি বোধ যদি একটু থাকে, তাহলে জানবেন, পুরুষকার আগে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরে। আমি যেমনটি চাইব, তেমনটি পাব। চেষ্টা আমাকে সেটার জন্যই করতে হবে, যেটা আমি চাইছি। ভগবান কি কি দেন?

*তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, যারা ফল চায় আমি তাদের ফল দিই। কেউ যদি চাকরি চায়, আমি তাকে চাকরি দিই, কিন্তু সেটার জন্য যোগ্য হতে হবে। একটা চার বছরের বাচ্চা ছেলে যদি বলে, মা আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও, তাই বলে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে না, উপযুক্ত হতে হবে। ওই চেষ্টা করে যখন উপযুক্ত হয়ে গেল, তখন ভগবান ফল দিয়ে বলছেন, যাঁরা শাস্ত্রোক্ত কর্ম করে, কিন্তু ফল চায় না, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যাচ্ছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছিল *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি*, তাঁকে আমি জ্ঞান দিই। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান না।

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। প্রথমটা হল, আমি কাজ করছি ফল চাইছি, ভগবান আমাকে ফল দেবেন। তার জন্য আমাকে কিন্তু কাজ করতে হবে, কাজ না করলে ঈশ্বর কক্ষণ আমাকে ফল দেবেন না। এবার আমি কাজ করছি, কাজ করে আমি বলছি, হে ঠাকুর, আমি যে এই শাস্ত্রবিধির কাজ করলাম, এর ফল আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করে দিলাম। আমার দেহ, মন ও বাণী দিয়ে যা কিছু করলাম, এর সব ফল আপনার চরণে সমর্পিত করলাম। আমার শুধু চাই শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি; ভগবান তখন জ্ঞান দেন, ভক্তি দেন। কি জ্ঞান দেন? ঈশ্বরই কর্তা এই জ্ঞান, ঈশ্বরই আছেন এই জ্ঞান, ঈশ্বর অনন্ত এই জ্ঞান দেন; এটা কিন্তু মুক্তি না।

সাধনা এরপর থেকে শুরু হয়। যারা শাস্ত্রবিধিতে কাজ করছে না, বর্তমান কালের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে নানা রকম অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছে, এখানে এদের আলোচনাতেই আনা হচ্ছে না। এরা আলোচনার বাইরে। শাস্ত্রবিধিতেই কাজ করছে, ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটের মধ্যেই চলছে, কিন্তু ফল চাইছে, ভগবান তাকে ফল অবশ্যই দেবেন। তার মানে, যজ্ঞ করছেন পূজা করছেন, শাস্ত্র আবৃত্তি করছেন, সবই করছেন, কিন্তু ফল চাইছেন না, ভিতরে তাঁর ভাব হল, হে প্রভু, তোমার ভালবাসাটুকু শুধু চাই, তোমাকে বুঝতে চাই, তোমাকে জানতে চাই, তোমাকে পেতে চাই। ভগবান তখন তাঁকে জ্ঞান দেন। এই বোধটা করিয়ে দেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। আমি আপনিও মনে করছি ঈশ্বর সত্য, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, ঈশ্বর কি আমার আপনার জন্য সত্য? সারাদিন মিথ্যা কথা বলছি, অপরকে ঠাকাচ্ছি, অপরের ক্ষতি চাইছি, ঈশ্বর সত্য জানলে এগুলো কি করা যায়? দুদিন আগে একটা খবরে দেখলাম, বিহারে পয়ষট্টি বছরের এক মহিলা নাকি আঠারো মাসে পাঁচটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। এটা কি কখন সম্ভব। বাচ্চা হলে সরকার থেকে কি একটা অনুদান পায়, তাই লোকেরা জাল করে তার নামে সরকার থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। কত gross levelএ এই চুরি হচ্ছে ভেবে দেখুন। আমাদের একটা নিরাপত্তা আছে বলে আমরা এভাবে মিথ্যা বলে টাকা আদায় করি না। দরকার পড়ে না বলে আমরা চুরি করি না। চুরি করা সুযোগ নেই বলে চুরি করি না। ভিতরে কিন্তু সেই ভাব থেকে যায়। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন ঈশ্বরই আছেন, তিনি কি কখন ডান দিক বাম দিক করবেন?

যে জানে আমার ঘরে একটা বিষধর সাপ ঢুকেছে, সে কি ওই ঘরে ঢুকতে পারবে? সংসারে যত দুষ্কর্ম, এগুলো হল সব সাপ, সংসারের ঘরে এই সাপগুলো ঝুলছে, জানার পর এখানে কি কেউ থাকতে চাইবে? ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল পাতকুয়া, আর আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সব হল কালসর্প। কিন্তু আমরা কত আনন্দে, কত খুশী হয়ে নিজের লোকদের বুকে জড়িয়ে ধরছি। ঈশ্বরই আছেন, এই জ্ঞান যার হয়ে গেছে, সে কখন কি কারুর সাথে জড়াতে চাইবে? কোন প্রশ্নই নেই। এসব কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগে, কিন্তু এটাই একেবারে রুঢ় বাস্তব। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখছেন, এই কথাগুলো আপনি জানেন, বিশ্বাস করেন, তা সত্ত্বেও আপনি ডান দিক বাম দিক করছেন, এটা কি কখন সম্ভব! এই বোধ কখন আসে?

শাস্ত্রবিধিতে কাজ করতে করতে মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে সে কোন ফলের আকাঙ্খা করছে না। ফলের কামনা করলে আপনার মন অশুদ্ধ হয়ে গেল। আপনি শাস্ত্র পালনও করছেন, আর তার সাথে ফলও চাইছেন। এই ধরণের ফলাকাঙ্ক্ষীদের দিয়েই সংসার চলে, এদেরকেই আমরা বলি ধার্মিক পুরুষ। যারা আচারি, যারা ধর্ম পথে ভাল কাজ করেন, ঈশ্বরের পূজা অর্চনাও করেন, কিন্তু ফল চান।

কিন্তু সাধক যিনি, তিনি কাজ করে যান, কিন্তু ফল চান না। ভগবান এই সাধকদের জ্ঞান দিয়ে দেন। এনারাই হলেন মুমুক্ষু, এনারাই সাধক। আর যাঁরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী, সমস্ত ত্যাগ করে মুক্তি চাইছেন, যিনি বলছেন ঈশ্বর বৈ আমার আর কিছু লাগবে না, আমার কোন কর্ম লাগবে না। ভগবান তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেন, এটাই বিজ্ঞান। এটাকেই পরে সপ্তম অধ্যায়ে আরও বিস্তারে বলবেন, যেখানে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থি আর জ্ঞানীদের কথা আসবে। সেখানে এটাই আবার বলবেন, যারা আর্ত, তাদের আমি দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিই। কিন্তু আমরা যে প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি, কই আমাদের তো দুঃখ-কষ্ট দূর হচ্ছে না। এখানে সেই পাঁচ বছরের বাচ্চার কথা মনে করতে হবে, যে বলছে, মা আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও। মা বিয়ে দেবেন না। আমরা এত কিছু করে রেখেছি যে, ভগবান কিছুই করছেন না।

এর পরের লাইনে আরও পরিষ্কার হবে। *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ সর্বশঃ*, এই জগতে যারাই আছে, সবাই ঈশ্বরের মার্গকেই অনুসরণ করছে, যে ভাল কাজ করে সেও, আর যে ভুল কাজ করছে সেও। হিন্দু ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মের সাথে এটাই একটা বড় তফাৎ। অন্যান্য ধর্মে এটা ভুল, এটা ঠিক, এইভাবে পরিষ্কার একটা বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। এটা ঈশ্বর আর এটা ডেভিল, পরিষ্কার লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বরই আছেন, এখানে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মে যে শয়তানের কথা বলা হয়ে, হিন্দুদের কাছে সেটা নেই। ভাল আর মন্দের যে দ্বৈত ভাব, ঈশ্বরের মধ্যে তা একেবারেই নেই। আমাদের কাছে এক ঈশ্বরই আছেন। সেই ঈশ্বরের ভাল নেই, মন্দ নেই; সেই ঈশ্বরের পূণ্য নেই, পাপ নেই; সেই ঈশ্বরের ধর্ম নেই, অধর্ম নেই। ফলে আমাদের সব পথ ঈশ্বরের দিকে যায়। আজকের খবরে আছে, দুই ভাই আছে, ওদের ভ্রমণ জিনিসটা খুব পছন্দের। ওরা একটা প্ল্যান তৈরী করেছে, দিল্লী থেকে লণ্ডন বাসে করে নিয়ে যাবে। কুড়ি জনের সিট থাকবে, টিকিটের মূল্য কত লক্ষ টাকা, আমার ঠিক জানা নেই। আমি এদের রুটটা দেখছিলাম, এখান থেকে কোথায় বার্মা, কোথায় চায়না হয়ে উজবেকিস্থান, প্যারিস হয়ে লণ্ডন নিয়ে যাবে। ফ্লাইটে গেলে রাস্থাটা অন্য রকম হবে। কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়ার অনেকগুলো রাস্থা আছে। রোডেও অনেক রাস্থা, ট্রেনে গেলেও অনেক রাস্থা। আর যদি পূব দিকে চলে যায়, বার্মা হয়ে ঘুরে ঘুরে সারা বিশ্ব চক্কর দিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছাবে। সমস্ত পথ ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে।

একজন যে অলস ব্যক্তি, সেও ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে। ভগবান তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'বাবা, তোমার কি আলস্য খুব ভাল লাগে'? 'হ্যাঁ খুবই ভাল লাগে'। 'খুব ভাল কথা, তোমার কি এই অলসতার মধ্যে হিংস্র ভাবও আছে'? 'হ্যাঁ, তা একটু আছে'। 'তাহলে এই নাও, তুমি এবার অজগর সাপ হয়ে থাক'। থাকল কয়েক জন্ম অজগর সাপ হয়ে। ও বাবা তাতেও স্বভাবটা বদলাল না, ঠিক আছে, পাথর হয়ে পড়ে থাক। এবার সে লক্ষ লক্ষ কোটি বছর একটা পাথর হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর কোন এক সময় কোন মহাত্মার নজরে আসবে, মহাত্মা পাথর দেখে বুঝতে পারবেন এর মধ্যে কোন জীবাত্মা আছে। তিনি কৃপা করবেন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আবার এগোতে থাকবে। কেউ কেউ আছে, মেয়েদের দেখলেই তাদের চোখ ঝলসে যায়। খুব ভাল, এবার মেয়েদের পিছনে দৌড়াতে থাক। একবার এর পিছনে, আর-একবার ওর পিছনে দৌড়াবে। এরপর প্রথমে বাবা-মা মারবে, তারপর পাড়ার লোকেরা মারবে, তারপর পুলিশের মার খাবে। এরপর একটা সময় বলবে, অনেক হয়েছে, আমার আর লাগবে না। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের চেতনাটা ফিরে আসে, তখন বলে আমি আর পথভ্রষ্ট হব না।

এই কথা গুলো খুবই নেগেটিভ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পজিটিভ দিক হল, মানুষ চাইছে শাস্ত্রকে অনুসরণ করে জীবন চালাতে। শাস্ত্রকে যখন অনুসরণ করে, তখনও মানুষ ভোগ চাইতে পারে, দুঃখ-কষ্টের নিবারণ চাইতে পারে, জ্ঞান চাইতে পারে, মুক্তি চাইতে পারে। এগুলো সমস্ত ভগবানেরই দেওয়া। এমন কোন কিছু নেই, যেটা ভগবান নিজেই সেই পথটা করে দেন।

যখন বলছেন, *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*, তখন এই কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিন্দু ধর্মে পাপ বলে কিছু হয় না। অন্যান্য ধর্মে পাপের অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা। কিন্তু এখানে আমরা হিন্দুরা যেটাই করি সেটাই ঈশ্বরের আদেশের মধ্যে পড়বে; ঈশ্বরের আদেশের বাইরে কোন কিছুই হয় না। কারণ ঈশ্বরের বাইরে তো কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব মানেই ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরের বাইরে কখনই কেউ যেতে পারে না। যে খুনী, যে লম্পট, যে জোচ্চর, যে প্রতারক, সবাই ঈশ্বরের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। তফাৎ হল, এরা যে পথ নিয়েছে, এটা অনেক লম্বা পথ, লম্বা পথ নেওয়ার জন্য একটু মার তো খেতেই হবে। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে যতক্ষণ রোগের কসুর না হয় ততক্ষণ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। পাহাড়ে যখন

আমরা উঠি, চলতে চলতে যদি উপরের দিকে যাই তখনও সামনের দিকে যাচ্ছি, যখন নীচের দিকে নামতে থাকি তখনও সামনের দিকে এগোতে থাকি। আমরাও সবাই ঈশ্বরের দিকেই এগোচ্ছি। একজন যে চিররুগ্ন, সব সময় রোগে ভুগছে, সেও ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে; যে সুস্থ, সেও এগোচ্ছে; যে এখনও শিশু আর যে এখন বৃদ্ধ, দুজনেই ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে। একটা অল্প বয়সী ছেলে জানতে চাইল, আমার জীবনে এই সময় কি আদর্শ হওয়া উচিৎ? তুমি এখন স্কুলে পড়াশোনা করছ, পড়াশোনা করাটাই তোমার এখন জীবনের আদর্শ। *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ,* অধ্যয়ন করাটাই তোমার এখন তপস্যা, এখানে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। কারণ অধ্যয়ন করার যে পথ, এই পথটা ভগবানই দিয়েছেন। জপধ্যান করা, এই পথটাও ভগবানই দিয়েছেন। বাড়ির লোকেদের দেখাশোনা করা, এই পথটাও ভগবানরই দেওয়া। ভগবানই পথ দিয়ে রেখেছেন, কিভাবে তুমি একটার পর একটা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। তবে কারুর পথ লম্বা, কারুর পথ ছোট। জোর করে কেউ যদি পথ ছোট করতে যায়, তাহলে তাকে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

যে কথাগুলো এতক্ষণ আলোচনা হল, এগুলো যদি সত্য হয়, সমস্ত বিশ্ব যদি বাসুদেবের স্বরূপ হয়, তাহলে তো ঈশ্বর ছাড়া কিছু হতে পারে না, কোন পথ নেই যে বলা যাবে এটা ঈশ্বরের পথ নয়। তাহলে মানুষ সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের পথে চলছে না কেন? হে কৃষ্ণ, কোথাও তুমি একটা গোলমাল করছ, লোকেদের ভিতর কোথাও এই চেতনাটা missing। কেন এই রকম? তুমি যখন সৃষ্টি করেছ, আর এই সৃষ্টিটা যদি তুমিই হয়ে থাক, মানুষ তাহলে তোমাকেই কেন ভজনা না করে অন্য কিছুর ভজনা করছে? ভগবান বলছেন, এটা কখনই সম্ভব হবে না, কারণ সংসার মানেই লোভ মোহ। সংসারে কাম ক্রোধ থাকবেই, লোভ মোহ থাকবেই, এই সংসারে যে আসবে, তাকেও এগুলোকে নিয়ে থাকতে হবে। এই সংসারে মানুষ যা কিছু করে সব লোভে পড়ে করে, কামনার অধীনে করবে। তাহলে সংসার কেন? আমি যদি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত হতাম, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। জন্ম হওয়া মানেই আমার অবিদ্যা, কিছু বাসনা থেকে গেছে। আর যদি একেবারে শুদ্ধ থাকতাম, ছুঁই ছুঁই অবস্থায় থাকতাম, তাহলে তো আমি হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে তপস্যা করতাম। অনেক গোলমাল আছে, অনেক দুর্বলতা আছে বলেই প্রথম জন্ম হল, আর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়ে এলাম। এখানে গোলমাল আছে বলেই তো আমি আছি। কোন গোলমাল যদি না থাকত আমার জন্মই হত না। তবে এটা ঠিক যে, সদ্‌গুণ আছে বলে সংসারে গিয়ে পড়িনি। দুর্বলতা আছে বলেই এই সংসারে আসা। দুর্বলতা আছে বলে মানুষ কি করবে?

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।।১২।।

*(তবে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফল কামনা করে অনেকে ইহলোকে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করেন; কিন্তু মুক্তির জন্য সাক্ষাৎভাবে আমার শরণাগত হয় না। কারণ, মনুষ্যলোকে কাম্য কর্মের ফল শীঘ্র লাভ হয়।)*

এই সংসারে যখন আছে, তখন এখানে তার কর্মের ফল চাই। কর্মের ফল যখন চাই, তখন একবার এটা চাইবে, একবার ওটা চাইবে। আগেকার দিনে ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবতারা ছিলেন, ইদানিং এই বাবাজী সেই বাবাজীরা আছেন। মানুষও তাই দেবতাদের ছেড়ে এখন এই বাবাজী, সেই বাবাজীর কাছে যাচ্ছে, আর বলছে ওই বাবাজীর কাছে গেলে সিদ্ধি হবেই হবে। ভগবান পরে বলবেন, বড় দুঃখের কথা, তারা মনে করে ওখানে গেলে আমি সব পেয়ে যাব, পায় না যে তা না, পায় ঠিকই। কারণ, *ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে,* এই যে মনুষ্যলোক, এখানে মানুষ সিদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। কারণ এখানে কর্মের অধিকার আছে; স্বর্গে দেবতাদের কর্মের অধিকার নেই। দেবলোক আদি হল ভোগের জায়গা। যে কর্মটা আগে করা হয়েছে, সেই কর্মের ভোগটা স্বর্গে গিয়ে পাবে। মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি, এখানে সঙ্গে সঙ্গে ফল পায়। ফলে, কেউ অমুক দেবতার পূজা করল,

কেউ তমুক দেবতার পূজা করল, এর ফল সে কিন্তু পাবে। আর মানুষ তার স্বভাববশতঃ সব সময় ছটফট করছে, এটা চাই, সেটা চাই, আর এক্ষুণি চাই। ফলে মানুষ ভগবানকে ছেড়ে বাকি সব কিছুতে লেগে আছে।

প্রাইভেট অফিসে যে বসের আণ্ডারে কাজ করতে হচ্ছে, আমি জানি লোকটা একটা বদমাইশ লোক। কিন্তু আমাকে হাতজোড় করে দু-বেলা তার সামনে দাঁড়াতে হয়, কারণ সে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে আমার পেট ভরাবে। আর সত্যিই সে দেয়। অন্য দিকে ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান, তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালে তিনি দেবেন ঠিকই, কিন্তু কবে দেবেন, কতটা দেবেন আমরা জানি না বলে আমরা ভগবানের কাছে যাই না। সেইজন্য ঈশ্বরের পথে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু এই সংসারে ফল চটপট পাওয়া যায়। আমি যদি ঠাকুরকে বলি, হে ঠাকুর আমার চাল দরকার, ভাত হলে খেতে পাব। ভগবান অবশ্যই দেবেন, কিন্তু কবে দেবেন ঠিক নেই। তার থেকে কম সময়ে ধানের বীজ পুতে আমি চাল পেয়ে যাব। তার থেকে আরও কম সময়ে দুটো টাকা আয় করে চাল কিনে আমি খেয়ে নিতে পারব। কারণ *ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে*, মন্যুষলোকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। *সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা*, কর্ম থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়।

দস্তভস্কি খুব নামকরা রাশিয়ান লেখক। কি একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য আঠারো-উনিশ বয়সে রাজা মনে করল দস্তভস্কি বিপ্লবীদের সাথে জড়িয়ে আছে। তখন তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল। রাশিয়ায় তখন ফাঁসি মানে গুলি করেই মেরে দেওয়া হত। দস্তভস্কিকে দেওয়ালে দাঁড় করানো হয়েছে, এবার ফায়ারিং অর্ডার দিতে যাচ্ছে। ওয়ান, টু, থ্রী বলা শুরু করেছে, ওয়ান বলে দেওয়া হয়ে গেছে, ততক্ষণে রাজার এক ঘোড় সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলছে, ভুল হয়ে গেছে, ওর কোন দোষ নেই, ওকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। দস্তভস্কি প্রস্তুত, শুধু বন্দুকের বুলেট এসে ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। দস্তভস্কি তখন বমি করে দিয়েছে। সেখান থেকে পরে তিনি একজন বিরাট লেখক হয়ে গেলেন। দস্তভস্কির লেখাগুলো খুব গভীর ও উচ্চমানের।

উনি এক জায়গায় খুব মজা করে বলছেন, একজন মাতাল বলছে, একটা লোক এক অফিসারের কাছে সাহায্য চাইতে গেছে, সাহায্য না পেয়ে চলে এসেছে। তখন আমি অফিসারকে বললাম, ‘দেখ ভগবান তাকে ফল দিল না বলেই তো তোমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে, তুমিও যদি তাকে ফিরিয়ে দাও, বেচারা কোথায় আর যাবে’। ব্যঙ্গ করে লিখছেন। দস্তভস্কি অত্যন্ত উচ্চমানের লেখক। যিনি কোন সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, জীবন পরে অন্য রকম হয়ে যায়।

*ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে*, মনুষ্যলোকে কর্ম থেকে যে ফল জন্ম নেয়, সেই ফল খুব শীঘ্র পাওয়া যায়। মানুষ সেইজন্য আমার কাছে আসতে চায় না। কারণ আমার কাছে ফল পেতে দেরী হবে। শুধু দেরী হবে না, ভগবান আদৌ দেবেন কিনা জানা নেই। কারণ বেশি ভক্তি যদি থাকে, ভগবান তখন চাইবেন না যে তাঁর ভক্ত বিনাশের পথে যাক। এরপর বলছেন, কেন এই রকম হয়, কারণ একমাত্র মন্যুষ্যলোকে অনেক তফাৎ আছে, যেখানে বিভিন্ন রকমের ফল পাওয়া যায় –

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারামব্যয়ম্।।১৩।।

*([তাঁরা আমারই কর্মাত্মক মার্গের অনুবর্তন করেন; কারণ] সত্ত্বাদিগুণ ও শমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সৃষ্টি করেছি। আমি মায়িক ব্যবহারে চতুবর্ণের সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে পরমার্থদৃষ্টিতে অব্যয় অকর্তা ও অসংসারী বলে জানবে।)*

এই যে চতুর্বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, বর্ণের এই বিভাজন আমিই করেছি। কিভাবে করা হয়েছে? গুণ আর কর্ম বিভাগ অনুসারে, জন্ম দিয়ে এই বিভাজন করা হয়নি। *তস্য কর্তারমপি মাং*, এর কর্তা অবশ্যই আমি, কিন্তু জানবে আমি সব সময় অকর্তা, অর্থাৎ আমি অনাসক্ত।

আমরা দুটো খুব প্রচলিত শব্দ শুনে থাকি, সাম্য ও স্বাধীনতা। আমাদের সংবিধানেও, সমতা ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কিন্তু সমতা ও স্বাধীনতা কখনই এক সঙ্গে হয় না, এটা একটা ভুল ধারণা। যেখানে স্বাধীনতা আছে সেখানে সাম্য থাকবে না, যেখানে সাম্য থাকবে সেখানে স্বাধীনতা থাকবে না। কম্যুনিস্টরা সাম্যের কথা বলে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। আমেরিকাতে স্বাধীনতা আছে, অনেক বাঁদরামও আছে, ফলে সাম্য নেই। সাম্য আর স্বাধীনতা দুটো এক সঙ্গে চলে না। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা বেছে নিয়েছি স্বাধীনতাকে। আপনি যদি স্বাধীনতাকে নেন, আপনাকে তাহলে সাম্য ছাড়তে হবে। সমতাকে যদি বেছে নেন তাহলে স্বাধীনতাকে ছাড়তে হবে। কিছু কিছু ধর্ম আছে, বইয়ে বাঁধা; ফলে ওখানে সবাই সমান। শুনতে দারুণ লাগে, কিন্তু বুঝতে হবে ওখানে স্বাধীনতা নেই।

হিন্দু সমাজ অনেক আগেই মেনে নিল বৈষম্যই জীবনের সত্য, সবাই সমান থাকে না, সবার জন্ম সমান হয় না, সবাই সমান ভাবে মরে না। এগুলোকে নিয়ে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই, একটু বুদ্ধি থাকলেই বুঝতে পারবেন। সমতা বলে কোন কিছু হয় না। হিন্দু সমাজ একটা adjustment নিয়ে এলেন, equality তো হবে না, inequality যেন আমেরিকার মত না হয়ে যায়। একজন লক্ষ কোটিপতি আর আরেকজন যার কিছু নেই, এই ধরণের জিনিস যেন না হয়। ওনারা একটা বাঁধন দিয়ে দিলেন। হিন্দুদের বর্ণপ্রথাকে নিয়ে এত নিন্দা করা হয়, কিন্তু পুরো বিশ্বে একমতার হিন্দুদের system এত দিন টিকে ছিল। এখানে জাতিপ্রথাকে নিয়ে বলছেন না। জাতি মানে যার যার জীবিকা। আজকে দেশে যে এত বেকারত্ব, তারপর করোনার জন্য কত সমস্যা হয়েছে। আগে যে জাতিপ্রথা ছিল, তখন ওরা কাউকে না খেয়ে মরতে দিত না। যিনি ওই জাতির প্রধান মাথা, তিনি সবারই জন্য কিছু না কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন। তবে এখন আর সম্ভব না, ওই দিন চলে গেছে, ওই অধ্যায় শেষ।

ব্যাসদেব এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চারটে জাতি করে দিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। গীতা ব্যাসদেবের রচনা, তিনি সেখানে লিখছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং*। বেদের পুরুষসূক্তমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা আছে, কিন্তু অনেকে বলেন, বেদে যে চারটে বর্ণের কথা বলা হয়েছে, এটা বেদের অন্যান্য জায়গায় কোথাও নেই, সেইজন্য মনে হয় পরে পরে কেউ ওই মন্ত্রটা ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, গুণ আর কর্ম দিয়ে আমি এই চারটে বর্ণ সৃষ্টি করেছি, এখানে জন্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে কি হিন্দুরা এটা মেনেছিল যে, ব্রাহ্মণ জন্ম থেকে হয় না, কর্ম থেকে হয়? হিন্দুরা চিরদিন এটা মেনে এসেছে। ইদানিং কালে বামপন্থী লিবারালরা দেশটাকে টুকরো করে দেওয়ার জন্য, সব কিছুকে খারাপ দেখিয়ে দেন। যারা নির্বাচিত সরকার, তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। তাদের ইচ্ছা মত না করলেই বলবে, এরা চোর, এরা মিথ্যাবাদী। এরাই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুরা এই দোষ করেছিল, সেই দোষ করেছিল। হিন্দুরা একটা দোষ করেছিল, যেটা সব জায়গায় হয়, অধিকার নেওয়া। ব্রাহ্মণরা অধিকার নিতে শুরু করল। স্বামীজী বার বার এই কথা বলছেন, অধিকার নেওয়াটা বন্ধ কর। অধিকার নেওয়াটা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই যে বর্ণ, এর মত সুবন্দোবস্ত system হয় না, এই যে বর্ণাশ্রম প্রথা, এর মত বিজ্ঞানসম্মত system হয় না। কিন্তু মানুষ সুযোগ আর অধিকার নেবেই। অধিকার যদি না নেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বে কোন সামাজিক ব্যবস্থা আছে যেটাকে ভাল বলা যাবে?

এখানে *গুণকর্মবিভাগশঃ* বলছেন, গুণকর্মবিভাগ মানে মানুষ যেখানে সত্ত্ব প্রধান হয়, সাত্ত্বিক গুণ যাঁর বেশি, তাঁকে বলছেন ব্রাহ্মণ। সত্ত্ব প্রধান হলে তাঁর জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা আসবে, আর যাঁদেরই জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁদের মধ্যে রজোগুণ বেশি থাকে, অন্য দিকে সত্ত্বগুণটা একটু কমে যায়, তাঁদের মধ্যে শৌর্য বীর্যটা বেশি দেখা যায়। এনারা হলেন ক্ষত্রিয়। যে মানুষের মধ্যে তেজ আছে, কিন্তু জ্ঞানের স্পৃহাটা কমে গেছে, এনারা হলেন ক্ষত্রিয়। যাঁদের আবার রজোগুণটা একটু কমে গিয়ে তমোগুণটা বেড়ে গেল, এনারা হলেন বৈশ্য। বৈশ্যদের রজো আর তমোগুণ মিশে থাকে, যার মধ্যে রজোগুণটা একটু বেশি থাকে। আর চতুর্থ হল তমোগুণটাই প্রধান, রজোগুণ কমে গেছে, এনাদের বলছেন শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে তমোগুণটা বেশি থাকে, রজোগুণ একটু কম আর সত্ত্বগুণ আরও কম থাকে। এইভাবে এই চারটেকে ওনারা একটা system করে দিলেন।

আমরা যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটে নাম সরিয়ে দিই, এবং অন্য যে কোন নাম নিয়ে আসা হয়, দেখা যাবে এই বৈশিষ্ট্যটা থাকবেই। কোথাও সত্ত্বগুণের আধিক্য, কোথাও রজোগুণের আধিক বেশি, সত্ত্বগুণ একটু কম; আবার কারুর মধ্যে রজোগুণ বেশি কিন্তু তার মধ্যে তমোগুণ একটু ঢুকে গেছে। আবার কেউ আছেন, যাঁদের তমোগুণটা বেশি। সমাজে যত মানুষ আছে, সংসারে যত মানুষ আছে, এদের সবাইকে এই চারটে শ্রেণীতেই রাখা যায়। কিন্তু এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো, ভগবান নিজে করেছেন। এই গুণের উপর আলোচনা আবার সপ্তম অধ্যায়ে আসবে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ যে প্রকৃতি, সেটা হল আত্মা, পরা প্রকৃতি। আর অপরা প্রকৃতি হল এই জগৎ। জগৎ মানেই ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ ও তমের খেলা। আমাদের সবার মধ্যে যে সত্ত্ব, রজো ও তমের খেলা চলছে, এটা ভগবান নিজেই হয়ে আছেন, এটা ভগবানেরই দেওয়া। আমি যদি ঠিক করি, আমি জপধ্যান বেশি করে করব, জ্ঞান চর্চা বেশি করে করব, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলাম।

এই যে চারটে বর্ণ তিনটে গুণের মধ্যে বেঁধে যে কাজ করছে, ভগবান বলছেন, এটা আমারই দেওয়া। এটাকেই যখন ধর্ম রূপে করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফল পায়, আগের শ্লোকে যেটা বলা হল। ফলে মানুষ ফলটা তাড়াতাড়ি পেতে চায়। ঠাকুর বলছেন, এ যুগে ডি গুপ্তের ফিভার মিকশ্চার, এখন আর পাচন চলে না। মানুষ তাড়াতাড়ি ফল চায়। ভগবান বলছেন, এতে কোন দোষ নেই। এই যে মানুষ নিজের মত কর্ম করছে, বর্ণাশ্রমকে আশ্রয় করে লোকেরা কর্ম করছে, আর সেখান থেকে ফল ভোগ করছে, কোনটাই দোষের মধ্যে পড়ে না। কারণ এগুলো আমারই দেওয়া। এদের মধ্যে কিছু কিছু আছেন, যাঁরা ডিউটি রূপে এই কর্মগুলি করেন, অন্য কিছু ফল চান না। আবার কিছু আছেন, যাঁরা সব কিছু ছেড়ে আমার দিকে আসেন। সবটা আমারই দেওয়া। এর আগে বলছিলেন, ভগবান আপনার তো বৈষম্য দোষ আছে; এবার আসবে, আপনিই যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র করে থাকেন, তাহলে এদের মধ্যে যত গোলমাল হচ্ছে, তার দোষ তো আপনার উপর আসবে। ভগবান বলছেন, না, আমার কাছে কোন কিছুই আসবে না, কারণ আমি যা কিছু করি, কোনটাতেই আমি লিপ্ত হই না, আমি সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

তেরো নম্বর শ্লোকের এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, ভগবান এই চারটে বর্ণকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভিতরে যে নানা রকমের গুণ থাকে, সেই গুণানুসারেই মানুষ নিজের নিজের কর্ম করে। কোন বাড়িতে বাবা-মায়ের হয়ত চারটে সন্তান, ওই চারটে সন্তানের প্রবণতা দেখে বলে দেওয়া যায় ওরা বড় হয়ে কে কোন দিকে যাবে। সবার এক ধরণের প্রবণতা থাকে না, এক একজনের এক এক রকম প্রবণতা থাকে। আমাদের ঋষিরা তখনকার দিনে মানুষ বিভিন্ন ধরণের যে কাজ করতেন, যে পেশায় নিযুক্ত থাকতেন, সেই পেশা বা কাজ অনুসারে চারটে বর্ণ করে দিলেন। আমরা অনেক সময় ভুল মনে করি যে, এই জাতিপ্রথা সিস্টেমটা যেন পাথরে বাঁধা। দেশে যদি সম্পদ কম থাকে, সমাজে যদি অভাব থাকে, তখন সেখানে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে চায়। যেমন করোনার জন্য মানুষের আয় কমে গেছে। আমরা এখন কেউ বাজে খরচ করছি না, আমরা অর্থ বাঁচাতে চাইছি।

ঠিক তেমনি সমাজে যখন অভাব থাকে তখন নিজের জ্ঞাতি, আত্মীয়দের বাঁচানোর চেষ্টা করে, সেই থেকেই guild আসে। এইভাবে জাতিটা হয়ে গেল বাঁধা, তবে একেবারেই যে পাল্টাতো তা না, পাল্টাতো। পরে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণ নিয়ে এলেন, এটা কিন্তু গতিশীল ছিল। সেই সময়কার কোন মহাপুরুষ হয়ত কোন নীচু বর্ণের লোককে বলে দিলেন, যা, তোরা আজ থেকে ব্রাহ্মণ। স্বামীজীর বর্ণনাতে আমরা পাই, কিভাবে শঙ্করাচার্য কেরলে যারা মাছ ধরে তাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করে উপরে তুলে আনলেন।

তেরো নম্বর শ্লোকের মূল বক্তব্য হল, এর আগের আগের জন্মে তুমি যেমন যেমন কর্ম করেছ, যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সেই সঞ্চয়ের পুটলি নিয়েই তুমি এবার জন্মেছ। এটাকে তুমি তোমার নিজের যে প্রবৃত্তি সেই রূপে নিতে পার, বা বলতে পার ঈশ্বরই তোমাকে এই প্রবণতা দিয়েছেন। ঠাকুরও অনেক জায়গায় বলছেন, মা ওকে অতটুকু কেন দিলি। এটা তাঁর নিজের ভাব। যিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি বলবেন, এটা ঈশ্বর দিয়েছেন। আর যিনি সব জায়গায় নিজের ক্ষমতা দেখেন, তিনি বলবেন, এটা আমার জন্য হল। অনেকে শুনে থাকবেন, আজকাল carrier consultant হয়, ইয়ং ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলে তারা বলে দেয় তোমার জন্য কোন ক্যারিয়ারটা ভাল। ভগবান এটাই এখানে বলছেন, তোমার মনের যে ভাব, এটা তুমি নিজে নিয়ে এসেছ, সেই অনুসারে এই চতুর্বর্ণ এসেছে। আপনি বলতে পারেন, এটা তো জন্মের সাথে বাঁধা। এগুলো আমরা আগে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছি। আমাদের আজকে মনে প্রশ্ন ওঠে, জাতি জন্ম থেকে কেন হয়? এগুলোকে নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। একটা স্থির সামাজিক ব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে, এর উপর অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু কারুর কাছে কোন সঠিক উত্তর নেই। আমি আপনি যেটাই আনব, দুদিন পরে দেখা যাবে সেখানেও অনেক সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। যে করেই হোক, হিন্দুরা এটাই নিয়েছিলেন।

স্বামীজী বলছেন, ভারতের যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, এর সময় ফুরিয়ে এসেছে, এর দুর্গন্ধ সমাজে এখন ছড়িয়ে পড়েছে, এই বর্ণপ্রথাকে ভাঙা দরকার। সত্যিই তাই হল, ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে গেল, স্বাধীন ভারতে সংরক্ষণ ছাড়া আর কোথাও বর্ণপ্রথার স্থান নেই। বিবাহ আদিতে কিছু ব্যবহার করে, তাও যাদের পয়সা ও ক্ষমতা আছে, তারা আবার এগুলোকে গ্রাহ্য করে না। তার সাথে সাথে টেকনলজি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির জোয়ার এসেছে, তাতে trade guild ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। আগে আমরা এর কিছু আলোচনা করেছিলাম।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪।।

*(অতএব আমার অহংকার এবং কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কোন কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না। এ-রূপে যিনি আমাকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন এবং কর্তৃত্বরহিত ও কর্মফলে স্পৃহাশূন্য বলে জানেন, তিনি কর্ম দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না; কর্ম তাঁর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। কর্ম যে আমার বন্ধনের কারণ হয় না তা বলাই বাহুল্য।)*

ভগবান চতুর্বর্ণ করলেন, এই চতুর্বর্ণ করার ফলে সমাজে যে দোষ হয়েছে, যে দোষের কারণে মানুষের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে, এই দোষটা তাহলে ভগবানের উপর যাওয়ার কথা। সাধারণ ভাবে কর্মের যিনি কর্তা, কর্মের দোষ কর্তার উপর বর্তায়। বর্ণাশ্রম জনিত যত রকমের দোষ হতে পারে, যেমন বলা হচ্ছে শূদ্রের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কার জন্য এই অত্যাচার হচ্ছে, ভগবানের জন্য, কারণ তিনিই এই বর্ণ বিভাজন করেছেন। দোষ কার? ভগবানের। কিন্তু ভগবান বলছেন, না, আমার উপর দোষ পড়বে না। কারণ *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*। গীতা মোক্ষশাস্ত্র এই কথা অনেকবার বলেছি, আরও অনেকবার বলব। আপনি কি যোগী হতে চান? এখানে ভগবান

দেখাবেন, আপনি কিভাবে যোগী হবেন। কিছু কিছু যোগী আছেন, টিভি চ্যানেলে, সোস্যাল মিডিয়াতে এসে কত লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে যাচ্ছে। সেই রকম যোগী তো এখানে আপনি হতে পারবেন না, এখানে বলা হচ্ছে কিভাবে ভিতর থেকে যোগী হওয়া যায়। অনেক সময় বাইরের লোকেরা সাধুদের রেগে গিয়ে বলে, 'বাইরে গেরুয়া না, নিজের ভিতরটা গেরুয়া করুন'। যিনি ভিতর থেকে যোগী হতে চান, তাদের জন্য এই শ্লোকে ভগবান বলছেন।

বাচ্চা ছেলে যেমন বাবাকে নকল করে বাবার মত হতে চায়, সাধকরাও তেমনি সিদ্ধ পুরুষকে নকল করেন। ভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের কি গুণ? আমি কর্মতেও জড়িয়ে পড়ি না আর কর্মফলেও আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই আমি কোন কর্মবন্ধনে পড়ি না। একটু পরেই মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আর এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জেতাবেন। দেখে তো মনে হবে, শ্রীকৃষ্ণের কর্মফলে স্পৃহা আছে, তিনি চাইছেন অর্জুন এই যুদ্ধে জয়লাভ করুক, তারপর সেই দিয়ে ধর্ম সংস্থাপন হবে। কিন্তু না, ভগবানের কর্মফলে কোন স্পৃহা নেই, আর কোন কর্মে আমি জড়িয়ে নেই। ভগবান হলেন পাঁকাল মাছের মত, গায়ে কিছু লাগে না; ভগবান হলেন পদ্মপাতার মত, যে পাতা জলে সিক্ত হয়ে যায় না, জল গড়িয়ে পড়ে যায়। পদ্মপাতায় জল দিলে যতক্ষণ জল ততক্ষণ জল, পাতা হাওয়ায় একটু নড়চড়া করলে জল আর নেই, out of sight out of mind, চোখের পলক পড়তে না পড়তে পুরোটাই বেরিয়ে গেল। এটা কোন নেগেটিভ দৃষ্টিতে বলছেন না, পুরো পজিটিভ দৃষ্টিতে। যখন কাজ করছেন তখন পুরোদমে সেই কাজের মধ্যে ঢুকে পুরো কাজটা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু তখনও তাঁর কর্মফলে কোন স্পৃহা থাকে না, সাথে সাথে কর্মের প্রতিও কোন আসক্তি নেই। তার সাথে বলছেন, যে আমার এই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে; আপনিও যদি বুঝে নেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা করেছেন, সেখানে কর্মের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, কর্মফলের প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নেই; আপনি যোগী হয়ে যাবেন, আপনিও কোন কর্মবন্ধনে পড়বেন না।

স্বামীজী বিদেশে থাকার সময় সব দেখে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, মনে করছেন সব ফেলে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করবেন। কোন কিছুতে স্পৃহা নেই। তখনকার দিনে জাতিভেদ ভাবটা খুব প্রবল ছিল, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও এই ভাব অনেকের বেশি ছিল। নরেন রাখাল এরা সব কায়স্থ আর ঠাকুর হলেন একজন আচারী ব্রাহ্মণ। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের কিছু ব্রাহ্মণ বলছেন, তুমি এই দুটো কায়েতের ছেলের উপর এত মন দিয়েছ কেন? ঠাকুর বলছেন, সে কিগো, আমি যে ওদের সাক্ষাৎ নারায়াণ দেখি। বলেই ঠাকুর তাঁদের বলছেন, এই দেখ আমি ওদের উপর থেকে মন তুলে নিচ্ছি। বলতে বলতেই তিনি সমাধিতে চলে গেলেন, আর ওনার চুল, দাড়ি, লোম সব শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেল। নরেন, রাখাল, লাটু, এদেরকে ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানেও তাঁর কোন স্পৃহা নেই। কর্মেও কোন স্পৃহা নেই, আর কর্মফলেও কোন স্পৃহা নেই।

যারা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে কাজের আশায় বসে আছে এদের মধ্যে কিছু আছে যাদের বলতে দেখা যায়, আমার টাকা পয়সা কে কি দেবে তাতে কোন আগ্রহ নেই, আমার job satisfaction হলেই হল। এইটাই ভগবান এখানে বলছেন, এই যারা job satisfaction বলছে তারা কিন্তু মহা বন্ধনে পড়ে আছে। আর যারা job satisfaction চাইছে না, তারা কি বলছে? কাজ যাই করি না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই আমার package টা কেমন হবে? মানে আমাকে কত মাইনে দিতে যাচ্ছে। একজন বলছে I don't care for perks, I want job satisfaction, আর-একজন বলছে, যে কাজই আমাকে করতে হোক না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই, আমার কত মাইনে হবে সেটাই আমার লক্ষ্য। দুজনেই কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মহা বন্ধনে পড়ে গেল। যে পয়সার প্রতি আসক্ত সে যেমনটি বন্ধনে পড়ে আছে, ঠিক সেই একই বন্ধনে পড়ে আছে যে কর্মের প্রতি আসক্ত। কিন্তু ভগবান বলছেন –আমার কাজের প্রতিও

আসক্তি নেই আর কাজ যদি কখনও করি তাহলেও সেই কাজের ফলের প্রতিও আমি আসক্তি শূন্য, করতে হবে তাই করলাম।

ভারতে আগেকার দিনে রান্নাঘরে চিমনির সিস্টেম ছিল না, এখনও নেই; বিদেশে ছিল। আগেকার দিনে কাঠের উনুনে রান্না হত, উনুনে কাঠ ধরালেই ধুয়ো হয়ে পুরো ঘরটাকে ঢেকে দিয়ে কালো করে দিত। কিন্তু খাঁটি কর্পূর যদি পোড়ান হয়, অগ্নির শিখা ছাড়া কিছু থাকে না, ধুয়া তাতে একটুও থাকে না, পোড়ার পর কর্পূরের কোন ছাই অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ কর্পূরের হাল্কা একটু ধুয়ো হয়, কিন্তু তাতেও সব কিছু পরিষ্কার থাকে। এনারা যে কর্ম করেন, কর্মফলটা ভিতরে নিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেন, ফলের কোন অবশিষ্ট থাকে না। অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে, এনারা যে কর্ম করছেন, এই কর্মের ফল কোথায় যায়? কর্ম শেষ হয়ে গেলে, কর্মের ফলটাও সেখানেই শেষ হয়ে যায়। আবার এই রকমও অনেক সময় দেখা যায়, যেমন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে একজনকে একটা ফলে দিয়ে বলছেন, এই ফলটা তোমার, এর ফলটাও তোমার। এগুলো তাঁরা করেন, একেবারে যে করেন না, তা না। আবার অনেক সময় জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। স্বামী সারদানন্দজী যেমন লীলাপ্রসঙ্গে বলছেন, ঠাকুর ভারতের কুলকুণ্ডলীনিকে জাগিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কোথাও কোন স্পৃহা নেই।

বলছেন, *ইতি মাং যোহভিজানাতি*, যিনি এই জিনিসটাকে ভাল ভাবে বোঝেন, তিনিও সব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। সাধারণ মানুষের কর্মের প্রতি প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকে, আর কর্মফলের প্রতিও তার প্রচণ্ড স্পৃহা থাকে। ম্যানেজমেন্টে মাসলো একজন বড় ম্যানেজমেন্ট গুরু ছিলেন। তিনি ম্যানেজমেন্টের একটা পিরামিড বানিয়েছেন। মানুষ জীবনে কি চায়? প্রথমে টাকা-পয়সা চায়, নিরাপত্তা চায়, করতে করতে পিরামিডের সবচেয়ে উপরে রাখছেন self actualisation। আমরা এসব অনেক আগে থেকেই জানি, তফাৎ হল এরা নূতন নূতন শব্দ নিয়ে আসে, নূতন করে প্যাকেজিং করে। পটেটো চিপসের যে প্যাকেট হয়, তাতে শুধু বাতাস আর বাতাস, ভিতরে কিছু নেই। এমনিতে আলু ভেজে দিলে বাচ্চারা খেতে চাইবে না, এখানেই প্যাকেজিংএর মহিমা। আমেরিকানসরা এই ব্যাপারে মাস্টার, প্যাকেজিং আমেরিকানসদের কাছে শিখতে হয়, সব প্যাকেজিং করে দিয়েছে। Self actualisationএ এসে বলে, ওর সব কিছু হয়ে গেছে, টাকা-পয়সা হয়ে গেছে, নামযশ হয়ে গেছে, এবার চায় সে সম্মান। এরপর তাকে যদি দুটো পয়সাও দেওয়া হয়, নিয়ে নেবে। কিন্তু সম্মানটা চাইবে। বৃদ্ধ পুরুষরা সম্মান চান, কারণ তার জীবনের বাকি সব কিছু হয়ে গেছে। বলছেন, এটাই কর্মফলের স্পৃহা। আর যে কোন কাজ করে, সব সময় বলছে, এই কর্মের ফলটা যেন ভাল হয়। কর্মে আসক্তি আর কর্মফলে স্পৃহা, এই দুটো জিনিস থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। ভগবানের কিন্তু এই দুটোর কোনটাই থাকে না, কারণ তিনি জ্ঞানী। যিনি এই জিনিসটাকে জেনে গেছেন, তিনিও জ্ঞানী।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুকুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।।১৫।।

*('আমি অকর্তা, অভোক্তা ও কর্মফলে নিঃস্পৃহ' –এই ভাবেআমাকে জেনে জনকাদি পূর্বতন মুমুক্ষরাও নিষ্কাম কর্ম করেছিলেন। যেহেতু প্রাচীনগণ পূর্বকালে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন, অতএব তুমিও নিষ্কাম কর্ম কর, কর্মত্যাগ করো না।)*

অর্জুনকে তাঁর আগেকার কথা বলছেন। এর আগে আগে মুমুক্ষু যাঁরা ছিলেন, এনারাও এভাবেই কর্ম করেছিলেন, যেভাবে ভগবান কর্ম করেছিলেন। তাহলে তিনটে ধাপ হয়ে যাচ্ছে, এক হল ভগবান নিজে বা আমরা বলতে পারি সিদ্ধ পুরুষ। দ্বিতীয় হল, আগেকার যাঁরা মুমুক্ষু ছিলেন

এবং পরে সিদ্ধ হয়েছেন। আর তৃতীয় হল, ইদানিং কালের যাঁরা মুমুক্ষ। অর্জুনকে বলছেন, তোমার যদি মোক্ষ লাভের ইচ্ছা হয়, তুমি যদি একজন মহাপুরুষ হতে চাও, তুমি যদি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? *কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং*, আগের আগের মুমুক্ষুরা যেভাবে কর্ম করেছেন, তোমাকেও সেইভাবে কর্ম করতে হবে। এই আধুনিক কালে তুমি নিজের মত কিছু নূতন পথ বার করতে যেও না, আগেকার ঋষিরা, মুমুক্ষুরা যেভাবে কাজ করেছেন তোমাকেও সেভাবেই কাজ করতে হবে।

হিন্দুদের ধর্ম হল, মহাপুরুষরা যে পথে চলেছেন, আমাদেরও ঠিক সেই পথে চলা। আমাদের এত শাস্ত্র আছে, বেদ আছে, উপনিষদ আছে, পুরাণ আছে, মহাভারত আছে, কিন্তু এত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কে করবে, আমাদের বোঝাবে কে? আপনি বলবেন, 'কেন শঙ্করাচার্যের ভাষ্য তো আছে'। পড়ে কেউ বুঝতে পারে? নিজে পড়ে কেউ বুঝতে পারে না। তাহলে কে বোঝাবেন? এই শাস্ত্র বোঝান মহাপুরুষদের জীবন। যাঁকে আমরা মহাপুরুষ মনে করি, তাঁর জীবন হল living commentary of scriptures। এই living commentary of scriptures যদি না থাকে শাস্ত্র কখনই বোঝা যাবে না। স্বামীজীও বলছেন, আর রামকৃষ্ণ মিশনের রুল বুকেও আছে, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবন, সেই জীবনের মাধ্যমে দেখতে হবে। ভাগবতের রাসলীলা বোঝা যাবে না, যতক্ষণ না আমরা ঠাকুরের মধুর ভাব না পড়ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ভাষ্য রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর জীবনটাই হল গীতা, উপনিষদ, মহাভারত, পূরাণ, সমস্ত শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য। হিন্দুরা এটা প্রথম দিন থেকে জানে, শাস্ত্র যাই বলে থাকুক, গীতা মে লিখা হ্যায়, এর কোন দাম নেই।

একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, কেউ সরকারি অফিসে গেলে ওরা তাকে কথায় কথায় আইন শুনিয়ে দেবে। পুলিশ, উকিল, যার কাছেই যাবে আইনের কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি শোনায় অফিসাররা। সরকারি অফিসে অফিসারের কাছে কোন কাজের কথা বলতে গেলে দেখিয়ে দেবে, এই আইনে এই কাজ করা যাবে না। আর সাধুদের কাছে যদি যান, ওনারা ফরর ফরর করে সংস্কৃতে দুটো শাস্ত্রের কথা বলে আমাদের একটা কিছু প্রতিপাদন করে দেবেন। তাহলে উপায় কি? উপায় মহাপুরুষদের জীবন। হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা হিন্দুদের নিন্দা করে বলে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। কিন্তু জানে না যে, হিন্দু ধর্মই ধর্ম। কারণ হিন্দুদের ধর্ম চিরন্তন সত্যের উপর আধারিত। কিন্তু আমরা হিন্দু ধর্মের সব সত্য নিতে পারব না, আমার নেওয়ার দরকারও নেই। ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে সুন্দর বলছেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একটা দানা খেয়ে তার পেট ভরে গেছে, আরেকটা দানা মুখে করে এবার সে বাড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, পরের বার এসে পুরো পাহাড়টা নিয়ে যাব। এটা আমাদের জন্য নয়।

আমাকে দেখতে হবে, আমি মহাপুরুষদের মধ্যে কাকে ভালবাসি। শ্রীকৃষ্ণ আছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু আছেন, শ্রীরামচন্দ্র আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, আমাকে নিজে দেখতে হবে এনাদের মধ্যে আমার মনের মত কে। এবার তাঁর জীবনের ছাঁচে আমাকে ঢালতে হবে। ওনাদের জীবনে কখন বেতালা পা পড়ে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, কোন কিছুতে তাঁর বেতালা পা পড়বে না। ওনারা কক্ষণ কাউকে বলবেন না, আমি যেটা বলছি তুমি শোন, আমি যেটা করি সেটা কক্ষণ করবে না। এনারা বলবেন, আমি ষোল আনা করেছি, তুমি এক আনা কর। এই বুকের পাটা যদি থাকে তাহলে, উপনিষদের ঋষির মত বলতে পারবেন, *বেদাহমতং পুরুষং মহান্তম্*, আমি এটা দেখেছি, তুমি এসো তুমিও দেখতে পারবে। এই যে জোশ, আমি দেখেছি, তুমিও দেখবে, এটাই আসল ধর্ম। আমাদের বাইবেলে আছে, আমাদের বেদে আছে, আমাদের কোরাণে আছে; আছে তো আছে, নিকুচি করেছে, আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমি একজনকে নিয়ে এসো, ওইটাকে পালন করে কে মহাপুরুষ হয়েছেন?

অনেক আগেকার কথা। একজন মহারাজ একটা ইয়ুথ কনফারেন্সে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। আর-একজন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কিসের উপর লেকচার দেবেন মহারাজ'? উনি বললেন, 'স্বামীজী হলেন যুবকদের আদর্শ'। 'খুব ভাল কথা, আচ্ছা মহারাজ যদি কোন যুবক আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোটিপতি হতে চাই, আজ একশ বছরে কেউ কি আছেন যিনি স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে কোটিপতি হয়েছেন? আপনি কি উত্তর দেবেন'? বক্তা মহারাজ ওই মহারাজের উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। কারণ আমরা এ-রকম কাউকে জানি না, যিনি গর্ব করে বলতে পারবেন, স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে আমি একজন ব্যবসায়ী হয়ে কোটিপতি হয়েছি। অথচ এটা খুব সহজে হওয়া যায়। গুজরাতের একজন সফল ব্যবসায়ীকে আমরা জানি, যিনি স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে বিরাট ধনী ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। লোকেরা যদিও এটা করে না, কিন্তু খুব সহজে হতে পারে। কারণ স্বামীজীর আদর্শে যত বেশি ঢুকতে যাবে, ওরা ত্যাগ বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

মানুষ জীবন্ত আদর্শ দেখতে চায়। ঠাকুরের কথামৃত পড়ে মনে দাগ কাটতে পারে, কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি একটু দেখতে চাই কথামৃত পড়ে আপনাদের এখানে কি ফল হয়েছে? এই রামকৃষ্ণরূপী যে বৃক্ষ, এর ফল কি? এই আদর্শ পালন করে আপনার কি হয়েছে? ঠিক তেমনি শাস্ত্রকে যিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, শাস্ত্রকে আধার করে জীবন চালিয়েছেন, তার ফল কি? শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তার ফল, শ্রীকৃষ্ণ তার ফল, চৈতন্য মহাপ্রভু তার ফল, শঙ্করাচার্য তার ফল। এবার আপনি ঠিক করুন, আপনি কাকে নেবেন। আপনাকেও পরে এই আদর্শ হতে হবে।

অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি এই জিনিসটা ভাল করে বোঝ। বুঝে নিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য কর, তোমাকে যোগী হতে হবে। আগে আগে মুমুক্ষুরা যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা সবাই দুই প্রকার কাজ করেছিলেন। প্রথমে আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয়, যখন অনেকটা উন্নত হয়ে গেছেন, কিংবা যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, তখন তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করতেন। লোকসংগ্রহ মানে, চারজনকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে পিছিয়ে থাকা মানুষরাও এই পথে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে। এরপর বলছেন, যদি তুমি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে তিনটে জিনিস বুঝতে হবে।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।।১৬।।

*(কর্ম কি এবং অকর্ম (কর্মের অভাব) কি —এই বিষয়ে পণ্ডিতরাও ভ্রান্ত হন। অতএব যেটা জানলে সংসাররূপ অশুভ থেকে মুক্ত হবে, সেই কর্ম ও অকর্ম তোমাকে বলব।)*

কর্ম কি, অকর্ম কি, কবি অর্থাৎ মহাপুরুষরাও বুঝতে পারেন না, মোহিত হয়ে যান। *তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি*, আমি তোমাকে সেই কর্মরহস্য বলব, যেটাকে জেনে তুমিও একজন মহাপুরুষ হয়ে যাবে। *যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ*, মুক্তি কি? অশুভ থেকে মুক্তি। অশুভ কি? সবটাই, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, সবটাই অশুভ। শেষ অবস্থায় গিয়ে মানুষ যখন মুক্তির দিকে যায়, সেখানে ধর্মও বন্ধন, পূণ্যও বন্ধন। খ্রীশ্চানরা এগুলো শুনলে ঘাবড়ে যায়, কি সব বলছে! পরের শ্লোকে ভগবান খুব মজার কথা বলছেন —

কর্মণো হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।১৭।।

*(শাস্ত্রবিহিত কর্মের, নিষিদ্ধ কর্মের ও অকর্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, অকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।)*

আগের শ্লোকে ভগবান বললেন, অর্জুন তোমাকে আমি তিনটে জিনিস বলব, কর্ম কি, বিকর্ম কি এবং অকর্ম কি। তোমাকে বলার দুটো কারণ, একটা কারণ হল, কর্মের গতি কেউ বুঝতে পারে না, মানুষ বুঝতে পারে না কর্ম জিনিসটা কি। আর যদি তুমি একবার বুঝে নিতে পার, আর সেই রকম আচরণ যদি তুমি কর, তাহলে তুমি যোগী হয়ে যাবে, অশুভ থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। পর পর সাত আটটা শ্লোকে ভগবান যা বলবেন, সেটার একটা ছোট্ট ভূমিকা যদি দিয়ে দেওয়া হয়, এই শ্লোকগুলিতে ভগবান কি বলতে চাইছেন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রত্যেক ধর্মে কর্ম বিভিন্ন ধরণের হয়, হিন্দুদেরও রয়েছে, তার সাথে কিছু টেকনিক্যাল শব্দও রয়েছে। হিন্দু ধর্মেও চার-পাঁচ ধরণের কর্মের কথা বলা হয়। প্রথমটাকে বলে নিত্যকর্ম, যে কর্ম আমাদের রোজ করতে হবে। যেমন জপ, ধ্যান, পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এগুলো সব নিত্যকর্ম; রোজ করতে হয়। দ্বিতীয় হল নৈমিত্তিক কর্ম, যখন দিন দেখে, সময় দেখে আর ঋতু দেখে কিছু পূজা পার্বণ করা হয়। যেমন শরৎকাল আসছে, দূর্গাপূজা হবে, এটা হয়ে গেল নৈমিত্তিক কর্ম। ছেলের উপনয়ন করাতে হবে, ষোড়শ সংস্কার করতে হবে, এগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ধর্মজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাঁরা গৃহস্থ ধর্মে আছেন, তাঁদের আর-একটা কর্ম থাকে, যাকে কাম্য কর্ম বলা হয়। কামনা ও বাসনা নিয়ে যখন কিছু কর্ম করা হয়, এটা কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ে। আমার টাকা পয়সা চাই, এটা চাই, সেটা চাই। কাম্য কর্ম হল তৃতীয়। চতুর্থ হল প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, তীর্থাদিতে যাওয়া, একাদশী করা, ব্রত পালন করা, এগুলো সব প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। জান্তা অজান্তায় যে পাপকর্ম হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত কর্মের দ্বারা সেগুলোর শুদ্ধি হয়ে যায়। পঞ্চম একটা আছে, এটা কর্ম না, এটাকে বলে নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্ম করতে নেই। মানুষ যে গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে নিয়ে চলে, সেই শাস্ত্র বলে দেয় কোন কোন কর্ম নিষিদ্ধ কর্ম।

বিভিন্ন শাস্ত্রে কর্ম, বিকর্ম, অকর্মের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকমের হয়। এখানে বিকর্ম বলতে নিষিদ্ধ কর্মকে বলতে চাইছেন। আচার্য বিকর্মকে বলছেন শাস্ত্রবর্জিত, *বিকর্মণঃ শাস্ত্রপ্রতিসিদ্ধস্য*, প্রতিসিদ্ধ শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই কর্মকে বলছেন বিকর্ম। কর্ম হল, যে কর্ম তোমার করা দরকার। অকর্ম হল, আত্মজ্ঞানের দর্শনটা বুঝে নেওয়া। আত্মজ্ঞানের দর্শনকে যদি বুঝে নেওয়া যায়, তখন বোঝা যায় পুরো জিনিসটা কি। কর্ম করছে, অথচ ওটা কর্ম না, এটা কখন হয়?

যে কোন কাজের আগে থাকে স্পৃহা। স্পৃহা থেকে কামনা বাড়তে শুরু হয়, সে কামনা বৃদ্ধি হলে মানুষ তখন কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়। একটা পাগল রোজ সকালবেলা একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। রাস্থার ধারে যত মাটির চায়ের ভাড় পড়ে আছে, সেগুলোকে সে লাঠি দিয়ে ভাঙতে থাকে। সারা দিন ভাঙার পর বিকাল হলে বলে, 'উঃ আর পারি না'। তোমাকে কে বলেছে চায়ের ভাড় ভাঙতে? পাগল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা লাঠি নিয়ে রাস্থার পাশে, নর্দমার পাশে যত মাটির ভাড়, হাড়ি পড়ে আছে, সেগুলো ভেঙে বেড়াচ্ছে। আমরা যদি বিচার করে দেখি, আমরা বেশির ভাগ সময় রাস্থার ভাড় ভেঙে বেড়াচ্ছি, আর মনে করছি কত কি করছি। রাস্থায় পড়ে থাকা মাটির চায়ের ভাড় ভাঙা ছাড়া আমরা আর কিছু করি না।

কিন্তু তার একটু উপর যেটা করছি, সেখানে থাকে স্পৃহা। মনে একটা হাল্কা ইচ্ছা জাগল, সেই ইচ্ছা কামনাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তারপর সেই কামনা কর্মে রূপান্তরিত হয়। যখন কাজ করতে শুরু করি, তখন সেই কর্মে আমরা পুরোদমে ডুবে যাই। যে কোন কাজ যখন করব, তখন সেই কাজ ভাল মন্দ ফল দেবেই। জপ করছি, সেও ফল দেবে, কারুর ক্ষতি করছি, সেও ফল দেবে, কাউকে গালাগাল দিচ্ছি, তাও ফল দেবে। আর সেই ফল, তা ভাল ফলই হোক আর মন্দ ফলই হোক, আমাকে বাঁধবেই। উচ্চ পর্যায়ে ধর্মটাও বন্ধন, আমি শুভ কাজ করছি, সেটাও আমাকে

বাঁধবে। এখানে আমরা সাধারণ লোকের কথা বলছি না, এখানে খুব উচ্চমানের কথা বলা হচ্ছে – যোগী কিভাবে হয়, কর্মযোগী কিভাবে হওয়া যায়।

তাহলে আমরা এই কর্মবন্ধন থেকে বাঁচব কি করে? পুরো গীতার আলোচনা এটাকে কেন্দ্র করেই চলে। সংসার হল কর্মবন্ধন, মোক্ষ হল সংসার থেকে, অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সংসার থেকে বেরিয়ে আসা মানেই, এই কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা। আগের একটা শ্লোকে বলা হয়েছিল, *কর্মবন্ধং প্রহাষ্যসি*, তোমার কর্মবন্ধন কেটে যাবে। কর্মবন্ধন আমরা কাটব কি করে? যোগী কি করে হব? আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ কিভাবে হব? এই জগতের একজন বন্দনীয়, স্মরণীয় পুরুষ আমি কি করে হব? ভগবান তখন বলছেন, অর্জুন তুমি শোন, জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি যে পথ দিয়ে চলেছেন, তুমিও সেই পথকে অনুসরণ কর। কয়েকটা শ্লোক আগে যেমন ভগবান বললেন, *কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্*, আগেকার ঋষিরা যেভাবে সব কিছু করেছেন, তোমাকেও সেই ভাবে সব কিছু করতে হবে। প্রথম কথা হল, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, দ্বিতীয় কথা হল, আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে চাইছি, আমি যোগী হতে চাইছি।

ভগবান এখানে বলছেন, যদি তুমি যোগী হতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে কর্মরহস্য বুঝতে হবে। কর্মরহস্য তোমাকে এইজন্য বুঝতে হবে, প্রত্যেক কর্মের পিছনে কামনা আছে, স্পৃহা আছে। কামনা ও স্পৃহা আছে বলে, কর্ম যখন ফল দেবে, সেই ফল ভাল হবে, মন্দ হবে; তুমি যাই কর, এই ভাল ও মন্দ ফল তোমাকে বাঁধবে। দেববাণীতে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, তুমি একজন ভাল মানুষ, সেইজন্য তুমি গর্ব করো না, তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে করাচ্ছে বলেই তুমি আজ একজন ভাল মানুষ। প্রবৃত্তি কিভাবে আমাকে দিয়ে করায়? আমি অনেকদিন ধরে কিছু করছি, করতে করতে ওটাই আমার প্রবৃত্তি হয়ে গেছে, এরপর আমি মন্দ কাজ করতেই পারব না, এটাই বন্ধন। আর যে মন্দ কাজ করছে, মন্দ কাজ করে করে সে এমন হয়ে গেছে যে, ভাল কাজে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। যদি তুমি ভাল হও, এতে তোমার গর্ব করার কিছু নেই। যদি আমি কাউকে দেখি যে সে একটা মন্দ লোক, সেইজন্য তার নিন্দা করার কোন কিছু নেই, কারণ সে তার নিজের সংস্কারে আবদ্ধ। তার যে সংস্কার, এটা ঠিক যে সেটা তার নিজের চেষ্টা দিয়েই তৈরী হয়েছে, কিন্তু বাঁধা। আমি এখন এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, শুভ ও অশুভ দুটো থেকেই মুক্তি। আর শেষ যে মুক্তি, সংসার থেকে, জন্মমৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি, তার জন্য ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য সবটাই অশুভ। উপায় হল, আগেকার যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁদের পথে চল। একই কথা কয়েকবার করে বলতে হচ্ছে, তা নাহলে ধারণা হবে না।

তাঁরা কিভাবে কাজ করেছিলেন? এখানে মুক্ত পুরুষদের কথা বলছেন, মুমুক্ষুদের কথা বলছেন, যাঁরা মুক্তির চেষ্টায় লেগে আছেন। বলছেন আগেকার দিনের মুমুক্ষুরা নিরন্তর কাজ করতেন। তাঁরা দুটি কারণে নিরন্তর কাজ করতেন। প্রথমতঃ তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করতেন। বেশির ভাগ লোকেদের মধ্যে কিছু আছে যারা কোন কাজ করে না, আর যারা কাজ করে তারা আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করে না। আত্মশুদ্ধি এমন কিছু কঠিন না। খুব কম করে সাত দিন আর তা নাহলে তিন দিনও এই জিনিসটা করুন। আপনার বাড়িতে যিনি আপনার ইষ্ট, যদি ইষ্ট না থাকে, ঘরে ঠাকুর বা স্বামীজীর একটা ছবি লাগিয়ে নিন। তারপর বলুন, গীতার কথা শুনে আমি একটা পরীক্ষা করছি, আমি এখন থেকে যত কাজ করব, সব কাজ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে করব। রান্না করব, ঠাকুরের উদ্দেশ্য, রান্নার পর আগে ঠাকুরকে অর্পণ করব, তারপর আমরা সবাই খেতে বসব। যারা মদ খায় তারা কি করবে? ঠাকুর মা স্বামীজী তো মদ খেতেন না। ঠাকুরের কাছে অনেকে আসতেন যাদের মদের নেশ ছিল, তাদের ঠাকুর বলতেন, যেটাই খাবে মা কালীকে নিবেদন করে খাবে, আর অতটাই খাবে যাতে পা যেন না টলে। সেইভাবে আপনিও বলুন, হে প্রভু, তুমি তো জগৎস্রষ্টা, তোমার চরণে আমি নিবেদন করে এইটুকু খাচ্ছি। আপনি তামাক খান, সিগারেট খান, ড্রাগস খান,

ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করে গ্রহণ করুন। যা কিছু করছেন, ঠাকুরকে অর্পণ করে করুন, তিন দিন করে দেখুন। যার উপর রেগে আছেন, তাকে গালাগাল দিয়ে যে আনন্দ হয়, তার থেকেই এটা করে বেশি আনন্দ পাবেন। কারণ এটা মুক্তির আনন্দ। কাউকে গালাগাল দিয়ে কেন আনন্দ হয়? এখানে সেই মুক্তির আনন্দ। তার উপর রাগে ভিতরটা যে হাঁসফাস করছে, গালাগালি দিয়ে যেমনি রাগটা বেরিয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল। ভিতরে খুব বেদনা, হঠাৎ যদি চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, তারপর খুব ভাল লাগে। কেন? ওই বেদনা থেকে মুক্তির আনন্দের জন্য ভাল লাগে।

গীতায় পরে আসবে, কর্মকে কিভাবে যজ্ঞে পরিণত করতে হয়। ভগবান বলছেন, আগেকার মুমুক্ষুরা আত্মশুদ্ধির জন্য নিরন্তর এটাই করতেন। এখান থেকে আত্মোন্নতির খুব উপরের স্তরে চলে যাওয়ার পর এনারা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করতেন। এই দুটোর বাইরে যদি কোন কাজ করা হয়, সেটাই কর্মবন্ধনের কারণ হয়ে যাবে। যে কোন কাজ যদি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে করা না হয়ে থাকে, কিংবা লোকসংগ্রহের জন্য যদি না করা হয়, তাহলে জানবেন এই কর্মটাই আপনার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নিরন্তর যদি না লেগে থাকা হয়, আমি যে কাজ করছি, এটা আমি আত্মশুদ্ধির জন্য করছি আর তা নাহলে অপরের মঙ্গলের জন্য করছি, এই দুটোকে সামনে রেখে যদি কাজ না করা হয়, সেটাই হয়ে যাবে বন্ধন। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করার পর, এই মঠ ও মিশনের জন্য ঠিক এই আদর্শই দিলেন, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*। যে কোন কাজ যখন করা হবে, তখন এই দুটোকেই বা এর যে কোন একটাকে সামনে রাখতে হবে, হয় *আত্মনোমোক্ষার্থং*, নয় *জগদ্ধিতায়*; সিদ্ধির অন্য কোন পথ নেই।

আমাদের হাজার বছর আগে যেতে হবে না, ঠাকুর সময়ে যাঁরা ছিলেন, স্বামীজীর সময় তাঁরাও এভাবেই কাজ করেছেন। ভগবান বলছেন, যদি এভাবে কাজ না করা হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রথমের দিকে মনে হতে পারে, জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা বিরাট উপরে উঠে যাচ্ছি, আর ঠিকই হয়ত উঠছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। যার জন্য, পরের জন্মের কথা ছেড়ে দিন, এই জন্মেই বয়স হয়ে গেলে দেখবেন, প্রচুর কষ্ট পাচ্ছেন। এই রহস্য; কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি, যাঁরা পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে সমাজে যাঁদের আমরা প্রতিষ্ঠিত মনে করি, তাঁরাও বুঝতে পারেন না।

কথামৃতে ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, বিদ্যাসাগরের ভিতরে সোনা চাপা আছে, খবর নাই। সত্ত্বগুণী যাঁরা, তাঁরা এই রকমই হয়। স্পৃহা সব সময় হয় মন থেকে, মন যখন কোন জিনিস করে, সে সব সময় ইন্দ্রিয়কে দিয়ে করায়; তার মানে যে কোন কাজে, ঈশ্বরের ধ্যান যখন করছি, ঈশ্বরের জপ যখন করছি, তখন কে কাজ করছে? ইন্দ্রিয় আর মন। আর ইন্দ্রিয় এবং মনের পিছনে যে আসল সত্তা আত্মা, আত্মা কক্ষণ কোন জিনিসে কাজ করেন না। যদি আমি যোগী হতে চাই, তাহলে আগে আমাকে বুঝতে হবে জগৎটা হল বস্তু বা পদার্থ। এই বস্তুর উপর আমরা কাজ করি আমাদের অঙ্গগুলি দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে। আর সেই খবরটা আগে আমাদের কাছে আসে আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মন। তার মানে, আমরা যে কাজই করছি, সব কাজের আসল কর্তা হল মন, আত্মা নন। যখনই যেখানে যে কাজই হয়, ভাল কাজ হোক, মন্দ কাজ হোক, তার আসল কর্তা হল মন। আত্মা, যিনি আসল কর্তা, তিনি কোন কাজে জড়ান না। এই জিনিসটাকে আগে খুব ভাল করে বুঝে নিতে হয়।

কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর একটা কাহিনী দিয়ে বলছেন। কাহিনীটা হল, ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, সেখানে গোপীরাও আছেন, তাঁরাও যমুনা পার হবেন। কিন্তু কোন মাঝি নেই। গোপীরা ব্যাসদেবকে বলছেন, কিছু উপায় করুন। ব্যাসদেব বলছেন, উপায় তো পরে হবে, কিন্তু এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে, তোমাদের কাছে কি আছে খেতে দাও। গোপীরা তাঁদের কাছে

যত ননী, ক্ষীর ছিল সব ব্যাসদেবকে খেতে দিলেন। ব্যাসদেব সব খাওয়ার পর বলছেন, 'হে যুমনে, আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি, তাহলে তুমি আমাকে পথ দিয়ে দাও'। বলতেই, যমুনা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল, মাঝখান দিয়ে সবাই যমুনা পার হয়ে গেলেন। গোপীরা ভাবছেন, এই মাত্র ইনি এত কিছু খেলেন, কিন্তু কেন বললেন, 'আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি'? প্রথম প্রথম কথামৃত যাঁরা পড়বেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না, ঠাকুর এই কাহিনীর মাধ্যমে এখানে কি বলতে চাইছেন। যিনি সাধক, তিনি আহারকে মনে করেন, ভিতরে যে জঠরাগ্নি রয়েছে, সেখানে তিনি আহুতি দিচ্ছেন। ব্যাসদেবের মত জ্ঞানীরা জানেন তাঁরা শুদ্ধ আত্মা, তাঁরা এখানে দেখছেন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থের উপর কাজ করছে, ইন্দ্রিয়ার্থ হল এই জগৎ, বস্তু। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল, *ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ*, ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর দৌড়াচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এটাকে বিস্তারে আলোচনা করেছিলাম, যিনি এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্পর্ককে জানেন, আত্মা কখন এদের ব্যাপারে জড়ান না।

এবার আপনি কর্মরহস্যটা বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেখানে বলা হয়েছিল, যাঁরা এটাকে জানেন *তস্য প্রজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ*। গীতাতে মানুষ যখন এই জিনিসগুলো শোনেন, আত্মা কোন কাজ করেন না, এখানে এসে তাঁরা জিনিসটাকে ধারণা করতে না পেরে নানা রকম প্রশ্নে সংশায়চ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং জীবনটা তাঁদের এলেমেলো হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বরে একজন ছিল, যে অনেক অসৎ কাজ করে বেড়াত। ঠাকুর যখন তাঁকে বলছেন, লোকটি বলছেন, সবটাই মিথ্যা, আমার এগুলোও মিথ্যা। মিথ্যা বলতে, আমার আত্মা তো এগুলোতে জড়াচ্ছে না। তাঁর উত্তর শুনে ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। এটাকে নিয়ে একটা নোংরা শব্দ আছে, বাইরে অনেকে বলে পাঞ্জাবী বেদান্ত। উত্তর ভারতে অনেক পাঞ্জাবী সাধু, ওরা ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করে। ওদের কাছে সব কিছুতেই জগৎ মিথ্যা। কোন সাধু কোন মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, সেটাকেও বলে মিথ্যা। কেন মিথ্যা? ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়। এভাবে বেদান্ত হয় না, তুমি ভাবের ঘরে চুরি করছ, তোমার সততা নেই। যদি তোমার দম থাকে তাহলে তুমি বল, নারীসঙ্গের ব্যাপারে আমার এখনও দুর্বলতা আছে। কিন্তু এটা বলা কখনই ঠিক না যে, আমি তো এসব কিছু করছি না, আমি তো শুদ্ধ আত্মা। খিদে পাওয়ার সময় তো তোমার এটা মনে হচ্ছে না যে, খিদে আমার পাচ্ছে। খুব সূক্ষ্ম মন না হলে এই জিনিসটাকে ধরা যায় না।

আমরা যখন বলি কাজ না করা, কাজ না করা তো সবাই জানে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা। কিন্তু বলছেন, কাজ না করা মানে তা নয়। কাজ না করা মানে হয়, আত্মা কোন কাজ করেন না, এই জিনিসটাকে বুঝে নেওয়া। এই আলোচনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, আজকের এই আলোচনাটা যিনি ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারবেন, তাহলে জানবেন, তিনি কর্মের রহস্যটা অনেকটাই বুঝে নিয়েছেন। তাহলে অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, তখন বলতে চাইছেন, আমি কাজ করব না, কিন্তু এটাও কাজ। কারণ মন ওখানে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, আমি কাজ করব না, এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও একটা কাজ। আমরা প্রথমে স্পৃহার কথা বলেছিলাম, স্পৃহা, কামনা, সব মন দিয়েই হচ্ছে। ঠিক তেমনি, মন যখন বলছে আমি কাজ করব না, আমি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকব, এটাও কিন্তু কাজ। আমার 'পরম' উপন্যাসে একজন মুচি ঠিক এই কথা বলছে, আমার যদি অনেক টাকা হয়ে যায়, তারপর আমাকে যদি আর কাজ না করতে হয়, সেটাও তো একটা কাজ। কাজ না করাটাও কাজ। আমি বলছি, এখন আমি চুপচাপ বসে থাকতে চাই, কোন কাজ করব না। চুপচাপ বসে থাকাটাও একটা কাজ। যিনি জ্ঞানী, একমাত্র তিনিই কাজ করেন না। কেন কাজ করেন না, তিনি জানেন তিনি আত্মা; তিনি নিজেকে আত্মার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে রেখেছেন, তিনি আত্মার সাথে এক। কোন আত্মার সঙ্গে? যে আত্মা কক্ষণ কাজ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে এত বড় যুদ্ধ করছেন, করাচ্ছেন, তিনিও কোন কাজ করছেন না, কারণ তিনি জানেন তিনি আত্মা। অন্য দিকে অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, অর্জুন তখন কিন্তু কাজ করছেন। কারণ অর্জুন মন দিয়ে প্রভাবিত, মন চলছে বলে কাজ করছেন। এটাই আশ্চর্যের যে, অর্জুন যখন বলছেন, আমি যুদ্ধ করব না, তখন এটাও কাজ। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাচ্ছেন, যুদ্ধে সারথির কাজ সামলাচ্ছেন, মানে যুদ্ধে সরাসরি লিপ্ত, অথচ তিনি কিন্তু কোন কাজ করছেন না। এখানে tricky কোন কিছু নেই, এটা অত্যন্ত সহজ জিনিস, যিনি জানেন আমি শুদ্ধ আত্মা, তিনি কোন কাজ করেন না। যাঁদের জ্ঞান হয়েছে, তাঁরা জানেন, তাঁরা কক্ষণ কোন কাজ করেন না। যাঁরা ওই অবস্থায় পৌঁছাননি, তাঁরা বুঝতে না পেরে এলেমেলো করে বসেন।

এটাকে বুঝতে হলে শুধু আমাদের মনে করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ আছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করাচ্ছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে উপদেশ দিচ্ছেন। আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাচ্ছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এক অপরকে দেখবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ আত্মা, তিনি কোন কাজ করছেন না, ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, তিনি পূর্ণ আত্মা, তিনি কোন কাজ করছেন না। তাহলে কাজ কে করছে? তাঁর ইন্দ্রিয় কাজ করছে, তাঁর মন কাজ করছে, তিনি কোন কাজ করছেন না, তিনি এগুলো থেকে আলাদা। স্বামীজী বিদেশে গিয়ে কত কাজ করলেন, আসলে এগুলো কোনটাই কর্ম না, কারণ সেখানে স্বামীজীর ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে, আসল যে তিনি, তিনি কখনই কোন কাজ করছেন না। এটাই হল কর্মরহস্য, এটাকে যিনি বুঝে নিলেন তিনি যোগী হয়ে গেলেন। সত্যিকারের যে অকর্ম, যেখানে কাজ করা হচ্ছে না, সেখানে দুটো জিনিস থাকে না, একটা হল কোন ধরণের স্পৃহা বা কামনা সেখানে থাকবে না। এটা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হলে এই জিনিস কখনই হবে না।

ইদানিং ছেলে মেয়ে উভয় উভয়কে দিনরাত বলে যাচ্ছে, জানো, আমি তোমাকে কেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসি। ভালবাসা মানেই তো তোমার স্বার্থ আছে। ভালাবাসা মানেই সেখানে স্বার্থ আছে, নিঃস্বার্থ কি করে হবে? কিন্তু বলার সময় এই কথা বলবে, জানো, তোমার আমার প্রেম পুরো অন্য রকমের, পুরো আলাদা। প্রেম আবার আলাদা হয় নাকি, সব প্রেম সেই একই প্রেম। তার শরীর, মনের সেখানে কিছু একটা ভাল লেগে গেছে, জোঁকের মত এবার এঁটে গেছে। এরপর এই জোঁক আর ওই জোঁক দুজন দুজনকে শুষবে। যেখানেই মন সেখানেই স্বার্থ থাকবে, আর মনের বাইরে কিছু হয় না। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বা আত্মজ্ঞানে ছুঁই ছুঁই অবস্থা, তিনিই একমাত্র স্পৃহা শূন্য হন। আর যাঁরা সাধক, প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি যা করছেন আত্মশুদ্ধির জন্য করছেন, তখন সেটাকে আমরা আর স্পৃহা বলতে পারি না, কারণ তিনি বলে দিয়েছেন, আমি আত্মশুদ্ধির জন্য করছি। ঠাকুর যেমন বলছেহ, মিছরি মিষ্টির মধ্যে না, তেমনি ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা ইচ্ছার মধ্যে না। কারণ মানুষ তখন নিজের আসল অবস্থায়, নিজের স্বরূপে যেতে চাইছে, এটা স্পৃহার মধ্যে পড়ে না। যদি বলেন, না এটা স্পৃহা, তাহলে এই স্পৃহাটা হল আত্মজ্ঞানের প্রতি যাওয়া। ওনারা কিন্তু এখানে আত্মজ্ঞানের স্পৃহাকে স্পৃহার মধ্যে নিচ্ছেন না।

স্পৃহা হয় যেখানে মানুষ জাগতিক ক্ষেত্রে বড় হতে চায়, জাগতিক জিনিসকে পেতে চায়। সেইজন্য কোথাও যদি একটু 'আমি' লেগে যায়, ঋষিরা ওটা করতে পারেন না। এটা খুব সুন্দর দেখা যায়, ঠাকুর ইচ্ছে হল, তিনি তাঁর পূর্বজদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবেন, গঙ্গায় নেমে জল দেবেন কিন্তু দেখছেন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সব জল গড়িয়ে পড়ছে, এটাকেই বলে গলিতহস্ত। ঋষিরা সবাই এই রকমই হন, কোথাও যদি আমিত্ব লাগায়, ওটা আর তাঁরা করতে পারেন না। এখন মুমুক্ষুরা যে কাজ করেন, আত্মশুদ্ধির জন্য, আর লোকসংগ্রহের জন্য, এটাই কাজ, এর বাইরে কোন কাজ হয় না। যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি জানেন তিনি আত্মা, আত্মা কোন কাজ করে না, তিনিও মনে

করেন আমি কোন কাজ করছি না, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপর কাজ করছে; যেমন জামা ছিঁড়ে গেলে আমরা বলি না যে আমি ছিঁড়ে গেছি, আমার জামা ছিঁড়ে গেছে। এই হল সতের ও আঠারো শ্লোকের মূল বক্তব্য। এখান থেকে আমরা মূল শ্লোকের আলোচনায় যাব।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।১৮।।

*(যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্ব কর্মের কর্তা। এটাই কর্ম ও অকর্মের বোদ্ধব্য রহস্য। এই জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয়।)*

কর্মের মধ্যে যিনি অকর্ম দেখেন আর অকর্মের মধ্যে যিনি কর্ম দেখেন, তিনিই হলেন বুদ্ধিমান মানুষ। আগের শ্লোকের আলোচনায় ব্যাসদেবের গল্প বলা হল, মাখন, ক্ষীর খেয়ে বলছেন আমি কিছু খাইনি। কেন এভাবে বলছেন? কারণ তিনি নিজেকে শুদ্ধ আত্মার সাথে অভেদ দেখছেন, সেই ব্যাসদেবের পেটের খিদে পেয়েছে, কিন্তু ওই পেট ব্যাসদেব নন, আমরা কিন্তু জানি পেট আমার। রাজযোগের সমাধিপাদে চার নম্বর সূত্রে বলছেন, *বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, আবার তার আগের সূত্রে বলছেন, *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*; সমস্ত বৃত্তি যখন শান্ত হয়ে যায়, নিরোধ হয়ে যায়, তখন যিনি দ্রষ্টা, তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। বাকি সময় তিনি মনের বৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে থাকেন। আমার যখন খিদে পাচ্ছে, তখন আমার ক্ষুধা আর আমি এক; আমি যখন রেগে যাচ্ছি, তখন আমি ও আমার রাগ এক। ঠাকুর কোন দিন বৃত্তির সঙ্গে এক হবেন না, শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তির সঙ্গে কোন দিন এক হবেন না, কিন্তু জগৎ চলে বৃত্তিকে দিয়ে। ঠাকুর সব সময় জানেন, তিনি কক্ষণ রেগে যাবেন না, যদিও বা রেগে যান, সেটা লোকশিক্ষার জন্য, ওই রাগে নিজের আমিত্ব জড়িয়ে নেই। গীতাতে পরে বলবেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, আত্মজ্ঞানীর বুদ্ধি ওখানে লিপ্ত হয় না, আমাদের বুদ্ধি ওখানে লিপ্ত হয়েই আছে, আমাদের অনাসক্ত কক্ষণ হয় না।

একজন হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, আমরা বলছি ব্যাটা কোন কাজ করে না। কিন্তু এখানে তার অঙ্গগুলি কাজ করছে না, ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে না ঠিকই, কিন্তু মন কাজ করে যাচ্ছে। মন বলছে, আমি কাজ করব না। মা বাচ্চাকে এবিসিডি শেখাতে চাইছেন, বাচ্চা সাফ্ সাফ্ বলে দিল, আমি শিখব না। সে শিখছে না ঠিকই, কিন্তু কাজ করছে। কি কাজ করছে? Will powerটা owned powerএ চলে গেছে। Will power দিয়ে মানুষ কাজ করে আর owned power দিয়ে মানুষ কাজ প্রত্যাখ্যান করে, দুটোতেই মানুষের মন কাজ করছে। আমরা যখন কাজ করছি না, তখন আমার owned power লেগে আছে, তার মানে ওটাও কাজ।

এবার মনে করুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে বসে সারথির কাজ করছেন আর অর্জুনকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর অন্য দিকে সবাই যুদ্ধ করে চলেছে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন, ঠাকুর বাকিদের বলছেন –দ্যাখো এরা সবাই যুদ্ধ করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কি বলবেন? ঠাকুর বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ যত যাই করুন না কেন, তাঁর মনটা সেই আত্মাতেই পড়ে আছে, আত্মা কোন কাজ করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক যে বাস্তবিক সত্তা সে কিন্তু কোন কাজ করছে না। তাঁর দেহ ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়ের সাথে তাঁর কোন সংযোগ নেই। এর বিপরীতে শ্রীকৃষ্ণ যদি দক্ষিণেশ্বরে দাঁড়িয়ে দেখেন তিনিও দেখবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কাজ করছেন না, তাঁর দেহ ইন্দ্রিয়ই কাজ করছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মন আত্মাতে সংলগ্ন হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাস্তবিক স্বরূপ সেই আত্মাতে তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে হাজরা কোন কাজ করছে না, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় চুপচাপ বসে জপ করছেন। ঠাকুর হাজরাকে বলছেন –ঢ্যাম্না শালা, বাড়িতে মা কান্নাকাটি করছে,

টাকা-পয়সা নেই, দেনা শোধের চেষ্টা নেই। ঠাকুর এগুলোকে বলছেন ধাপ্পাবাজী। হাজরা জপ ধ্যান করছে কিন্তু ঠাকুর নিন্দা করছেন। কেন নিন্দা করছেন ঠাকুর? হাজরা এখানে নিষ্কর্মা হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, কিন্তু মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে; কার থেকে কত টাকা ধার করব, কিভাবে দেনা শোধ করবে; এই সব চিন্তা ঘুরছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মনটাকে আত্মাতে স্থির করা। কিন্তু আত্মাতে স্থির করতে পারছে না অথচ হাত পা গুটিয়ে চুপ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। বাইরে থেকে দেখে সবার মনে হচ্ছে সে নিষ্ক্রিয় কিন্তু ভিতরে মন চরকির মত ঘুরছে, মানে মন সক্রিয়। কিন্তু আমি যদি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তখন আমার হাত পা যদি চলতেও থাকে তাতেও আমি কোন কর্মে যুক্ত হচ্ছি না, আমি স্থির আছি। কিরকম হয় ব্যাপারটা –বাতাসে আমার গায়ের চাদরটা নড়ছে, কিন্তু আমি কি নড়ছি? আমার চাদর নড়ছে আমি নড়ছি না, আমি স্থির আছি। ঠিক এই রকম আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মাটা স্থির আছে। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, যিনি জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর এই পার্থক্যটা নিরূপণ করে নিয়েছেন, *স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু*, তিনিই মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। সেই হচ্ছে *যুক্তঃ*, তিনিই যোগে প্রতিষ্ঠিত, সেই হচ্ছে *কৃৎস্নকর্মকৃৎ*, তিনিই সব কর্মের কর্তা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন, তাঁর আর কর্তব্য কর্ম বলে কিছু থাকে না, সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যদি বলতেন – চল অর্জুন তোমাকে জগৎটা দেখিয়ে নিয়ে আসি, কে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তখন তিনি অর্জুনকে দেখাচ্ছেন – দ্যাখো দ্যাখো অর্জুন ঐ যে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন, উনি একজন জ্ঞানি, উনি কিন্তু যুদ্ধ করছেন না, ওনার দেহ ইন্দ্রিয় যুদ্ধ করছে। চিকাগোতে নিয়ে এসেছেন অর্জুনকে –ঐ দ্যাখো স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন, এই আর-একজন জ্ঞানী পুরুষ, উনি কিন্তু এখানে কোন লেকচার দিচ্ছেন না, ওনার দেহ, বাগেন্দ্রিয় লেকচার দিচ্ছে। অর্জুনকে নিয়ে আমাদের মত কয়েকজনকে দেখিয়ে বলছেন –এই যে এরা ধ্যান করছে এরা কিন্তু সবাই অজ্ঞানী, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে কিন্তু মনে মনে কাজ করে যাচ্ছে আর ভোগ করে যাচ্ছে, এদের দেহ ইন্দ্রিয় সব স্থির কিন্তু মনটা চঞ্চল, আত্মাতে স্থিত নয়। দেহ ইন্দ্রিয়কে ঠিক ঠিক গোটান তখনই হবে যখন তোমার মন আত্মাতে গিয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাবে।

আমি এটা ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না, এটাও কর্ম, কারণ মন থেকে বলা হচ্ছে আমি ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই ভাব তাঁর হচ্ছে না, এগুলো নিজে থেকেই খসে পড়ে গেছে, আলাদা করে কিছুই ফেলতে হচ্ছে না। অর্জুন বলছিল যে আমি যুদ্ধ করব না, আমি ভিক্ষুক হয়ে যাব, যুদ্ধ না করে কাজ করব না ভেবেছিল অর্জুন, সেটা আর হল না, কারণ ভিক্ষা করাটাও তো কাজ। আমরা যখন কাজ করব বলছি, তখন শরীর ইন্দ্রিয় কাজ করছে, মনও বলছে কাজ করছি। ত্যাগের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হয়। আমি যখন মুখে বললাম আমি কাজ করব না, তখন শরীর ইন্দ্রিয় হয়তো কাজ করছেন না, কিন্তু মনে মনে কাজ চলছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শরীর ও মনকে আলাদা করে দেখা হয় না। শরীর দিয়ে হয়তো কোন পাপ করছি না, কিন্তু মনে মনে কোন পাপ চিন্তা করলাম তখন সেটা পাপযুক্ত কর্মের মধ্যেই গণ্য হবে। মনে মনে যদি ভেবে থাকি আমি ওর ঐ জিনিসটা চুরি করব, আমি যদি চুরি না করেও থাকি তবুও তখন আমার কিন্তু চুরি করা হয়ে গেল। উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শরীর দিয়ে চুরি করলে যে পাপ হত, মনে মনে চিন্তা করে নেওয়ার পর সেই একই পাপ হল। ঠাকুর বলছেন, গৃহস্থের মনে ত্যাগ, বাইরে যা করার করুক। কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে ত্যাগ আর বাইরে ত্যাগ দুটোই থাকতে হবে। কিন্তু যদি শাস্ত্রাদি পড়ে, সাধুসঙ্গ করার পর সংসারে এমন কিছু কাজ সামাজিক বা পারিবারিক কারণে আমাকে করতে হয় যেগুলো সাধুসঙ্গ করা বা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার আগে কিছুই মনে হত না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছিঃ এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মনের ত্যাগের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে

যাওয়া। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হবে এগুলো এবার না করলেই বাঁচি কিন্তু সামাজিক কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে।

আচার্য এখানে একটা লম্বা আলোচনা করছেন, এটাকে মানুষ তো জানে, বলছেন, না এটা মানুষ জানে না। এই জিনিসটা মানুষ জানে না বলেই জগতে এত অশান্তি, এত কষ্ট। এই ধরণের যাঁরা যুক্ত পুরুষ হন, যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলছি, তাঁদের স্বভাব কি রকম?

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯।।

*(যাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা কাম ও (তৎকারণে) সংকল্পরহিত এবং যাঁর শুভাশুভ কর্ম (কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্মদর্শনরূপ) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানিগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলে থাকেন।)*

যে কোন কাজের শুরু করাকে বলা হয় *সমারম্ভাঃ*। যে কোন কাজ শুরু করার আগে এই ধরণের যুক্ত পুরুষের মধ্যে কোন কামসংকল্প থাকে না। আমরা আগে স্পৃহার কথা বললাম, ভগবানের কোন স্পৃহা নেই। বেলুড় মঠে একদিন কিছু ভাল আইটেমের রান্না হয়েছে। সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রান্না কেমন হয়েছে'? বললেন, 'ভাল হয়েছে'। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, 'ঠিক আছে আবার হবে'। তখন একজন সেবক বললেন, 'আপনার মনে যখন ইচ্ছা জেগেছে তখন অবশ্যই হবে'। সেবকের কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমার কোন ইচ্ছা নেই'। মহাপুরুষদের কখন কোন ইচ্ছা হয় না। এরপর ভেবে দেখতে হয়, স্বামীজী কি ধরণের ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি ধরণের ছিলেন, কোথাও কোন কিছুর ইচ্ছা এনাদের মধ্যে থাকে না। ওনারা যেটা করেন, তা হল, একটু একে খুশী করে দিলেন, একটু তাকে খুশী করে দিলেন, তার জন্য যেটুকু করার করে দেন, তার বেশি কিছু না। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের সাথে এত লীলা করলেন, এগুলো কিছু না, গোপীদের একটু খুশী করে দিলেন। সাধারণ লোক হলে বলবে, আমি ছাড়ব না, পায়ে দড়ি বেঁধে আমার কাছে ধরে রাখব। গোপীরাও তাই করলেন, কৃষ্ণের পায়ে দড়ি বাঁধার চেষ্টা করছেন, মাঝখান থেকে কৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

*কামসংকল্পবর্জিতাঃ*, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন কামসংকল্প নেই, আমাকে আপনাকে খুশী করার জন্য করছেন, আমাদের উপর কৃপা করার জন্য করছেন। সামনের লোকেরা যখন শোনে তখন তাদের এই কথাগুলো খুব খারাপ লাগে, কিন্তু সে বুঝতেও চায় না, সে জালে না ফাঁসিয়ে ছাড়বে না। আর ওই জ্ঞানী পুরুষ এমন যে, তিনি জালে ফাঁসবেন না, সেখান থেকে যত অশান্তি। তখন আঙুর ফল টক বলে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে তার নামে গালাগাল দেবে। সেইজন্য আমরা দেখি, ঠাকুরের নামে লোকেরা গালাগাল দেয়, স্বামীজীর নামে গালাগাল দেয়, ধর্মের নামে গালাগাল দেয়। বুঝতে পারে না বলেই গালাগাল দেয়।

*জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং*, এনাদের সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোন জ্ঞান? যেটা আগে বলা হল, *কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ*, কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখা আর *অকর্মণি চ কর্ম যঃ*, অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখা। ইন্দ্রিয় যে কর্মগুলি করছে, তাতে আত্মা অকর্ম। আর ইন্দ্রিয়গুলি যখন কাজ করে না, তখনও তার মন সক্রিয়, এই জ্ঞান যাঁর আছে তাঁর সমস্ত কর্ম এই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মিভূত হয়ে যায়। তার মানে বলতে চাইছেন, বেড়াল বলে মাছ খাব না কাশী যাব, এই ধরণের ত্যাগ যখন আমরা অবলম্বন করি, এটাকে ত্যাগ বলা যাবে না, এটা কর্ম, এই জিনিসটাকেই এখানে বোঝাতে চাইছেন। যোগী হওয়ার আগে তাঁকে কাজের এই রহস্য বুঝতে হবে। কর্মের এই রহস্য

বুঝে নিলেই সে যোগী। কিন্তু যখন বলছে, আমি সব ছেড়ে যোগী হব, সে কিন্তু তখন যোগী হচ্ছে না, কারণ সে যখন বলছে আমি সব ছাড়ব, এই ছাড়াটাও কাজ।

এখানে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন, কোন কারণে আমাদের মত লোকেরাও কাজ ছাড়তে চাইলে ছাড়তে পারেন না। সন্ন্যাসীরা আশ্রমে আছেন, তাঁদেরও আশ্রমের কাজ করতে হয়। আচার্য এই ব্যাপারে বলছেন, *স কৃতশ্চিত নিমিত্তাৎ কর্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি*, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি হয়ে যায়, যেখানে মানুষ কাজ ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। একজনের মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছে, কিন্তু বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন, সে ছাড়া তাঁর দেখাশোনা করার কেউ নেই, একটা দায়ীত্ব আছে। সংসারে অনেকেরই দায়ীত্ব থাকে, সেইজন্য কাজ ছাড়তে পারে না। আচার্য তাঁদের জন্য বলছেন, *সতি কর্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া*, এনারা সেই ধরণের মানুষ, যাঁদের কর্মফলে কোন আসক্তি থাকে না। আর *স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ*, নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। *লোকসংগ্রহার্থং*, লোকসংগ্রহের জন্য এনারা কাজ করেন। দুটো লোককে ভাল করার জন্য, কয়েকজনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উপদেশ দেওয়ার জন্য কাজ করেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করেন না। আসলে কিন্তু তাঁদের কাজ করার কোন দরকার নেই।

স্বামীজী বার বার ঠাকুরকে গিয়ে বলছেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীকে ভর্ৎসনা করছেন, লোকসংগ্রহের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য তোকে মায়ের কাজ করে যেতে হবে। স্বামীজী এখন ফেঁসে গেছেন। স্বামীজীর কাজে কোন ইচ্ছে নেই, উনি আত্মজ্ঞানে ডুবে থাকতে চাইছেন, আমরা ডুবে থাকতে চাই আলস্যে। আমরা যখন বলি, আমি কাজ করতে চাই না, কারণ আমি আলস্যে পড়ে গেছি, আর স্বামীজী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু স্বামীজীকে ওই অবস্থায় ঠাকুর থাকতে দিচ্ছেন না, টেনে তাঁকে কাজে নামাচ্ছেন। বলছেন, যদি কোন কারণে কাজ করাটা আবশ্যিক হয়, কাজ তাঁকে করতেই হবে, তখন তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করেন, স্বপ্রয়োজনাভাব, নিজের কোন প্রয়োজন নেই। আমেরিকাতে স্বামীজী চার বছর কাজ করে করে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে দিচ্ছেন, সেখান ওনার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই ধরণের মহাপুরুষরা ভগবানের সঙ্গে এক। এই অবস্থা যখন হয়ে যায়, তখন কুড়ি নম্বর শ্লোকে বলছেন –

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসংঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০।।

*(যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন, যিনি আপনাতেই নিত্যতৃপ্ত ও নিরাবলম্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে চেষ্টাশূন্য, তিনি সর্বতোভাবে (বিহিত) কর্মে প্রবৃত্ত হলে কিছু করেন না – অর্থাৎ তাঁর কর্মফলে কিছুমাত্র আসক্তি নেই।)*

অকর্মের মধ্যে কর্ম আর কর্মের মধ্যে অকর্ম, এটা কখন হয়? বলছেন, *ত্যক্ত্ব কর্মফলাসংঙ্গং*, কর্মের ফলের জন্য কোন আসক্তি থাকে না। ঠাকুর স্বামীজীকে দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন ঠাকুরের ভাব প্রচার করার জন্য। স্বামীজী চাইছেন, কোন রকমে এটাকে ফেলে দিয়ে বাঁচতে পারি। গ্রীক পুরাণে হারকিউলাসের কাহিনীতে আছে, হারকিউলাস কিভাবে কিভাবে এ্যটলাসের কাছে গেছে। জগতের বোঝা এ্যটলাসের ঘাড়ে চাপানো আছে, এ্যটলাস কোন রকমে ওটাকে ছাড়তে চাইছে। আমাদের কাছেও ঠিক সেই রকম, জগতের বোঝাটা আমরা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই বোঝাকে কিভাবে হাল্কা করতে হবে? বলছেন, *ত্যক্ত্বা কর্মফলাসংঙ্গং*, আমার কোন আগ্রহ নেই, আমার ঘাড়ে পড়েছে, কোন রকমে আমাকে এটা করে দিতে হবে।

*নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ*, নিজের মধ্যেই খুশী। এই তৃপ্তি হল জ্ঞানের তৃপ্তি, এ পুরো অন্য জিনিস। তার সাথে *নিরাশ্রয়ঃ*, কোন কিছুর উপর তিনি আশ্রিত নন। আমরা যে কাজ করি, ওই কাজ

একটা আশ্রয় নিয়ে নেয়, ফলটা হল আশ্রয়। যেমন মানুষ যে চাকরি করে, চাকরি করে যে টাকা পায়, এই টাকাটা হল চাকরির আশ্রয়। *কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি*, আমার নামযশ হবে, মরার পর স্বর্গে যাব, এই ধরণের কোন ইচ্ছাই তাঁর থাকে না। এমন কি কাজ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবও হয়, তখন লোকসংগ্রহের জন্য বা লোকেদের মনে নিন্দার ভাব আসতে পারে, এটার জন্য কাজ করেন, কিন্তু কাজের প্রতি তাঁর কোন প্রবৃত্তি নেই। মূল কথা হল, মহাপুরুষরাও কাজ করেন, অর্জুন তুমিও কাজ কর, সবাইকেই কাজ করতে হবে। কিন্তু প্রথমে কর্মফলের প্রতি স্পৃহাটা ছাড়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে কাজকে ছাড়তে হয়। কিন্তু কোন কারণ কাজ করা যদি ছাড়া সম্ভব না হয়, তখন এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে যে, আমি লোকের মঙ্গলের জন্য, ভালর জন্য এই কাজটা করছি।

যিনি একেবারে কোন কাজই করেন না, ঠিক ঠিক জ্ঞানীরা; আগেকার দিনে এই ধরণের অনেক জ্ঞানী ছিলেন, যেমন তোতাপুরীর মত জ্ঞানীরা ছিলেন, এবার তাঁদের কথা বলছেন –

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।

*(যিনি নিষ্কাম ও সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুত্যাগী এবং যাঁর অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, তিনি জ্ঞান দ্বারা কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে শরীরধারণ উপযোগী কর্ম মাত্র করেন; কিন্তু তাতে পাপপূণ্যভাগী হন না। এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীই মুক্ত হন।)*

*নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা*, নিরাশী শব্দের অর্থ, যাদের সমস্ত আশা চলে গেছে, অর্থাৎ তারা কোন কিছুর সাথে কোন আশা রাখে না। আশা থাকে না বলে, নিরাশীদের কোন হতাশা হয় না। *যতচিত্তাত্মা*, চিত্তকে যিনি সব কিছু থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, এনারা হলেন *চিত্তাত্মা*। এখানে যে আত্মা বলছেন, এই আত্মা শরীর অর্থে বলা হচ্ছে। আত্মা মানে হয় চেতনা, আমার চেতনা যেখানে সেখানেই আমার আত্মা, চেতনা যদি শরীরকে জড়িয়ে থাকে, তখন আত্মার একটা অর্থ হয়ে যায় শরীর। বলছেন, নিজেকে পুরো গুটিয়ে এনেছে, ফলে সমস্ত ভোগ সামগ্রী সে ত্যাগ করে দেয়। তখন *শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্*, শুধু শরীর নির্বাহ করার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই রাখেন, ভোগের প্রতি কোন স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদেরও জীবন অত্যন্ত সহজ সরল জীবন। সুস্থ ভাবে শরীরকে চালানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তাঁরা নেবেন, তার বাইরে না। নানান রকমের যে ভোগের উপকরণ থাকতে হবে, এসব কিছু নেই। শরীরকে ঠিক ঠিক ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা করা দরকার, সেটাই করেন। যখন এই রকম হয়ে যান, তখন তাঁর *কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্*, তখন কোন ধরণের পাপ তার গায়ে লাগে না।

এটা তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে, যাঁরা অনেক উচ্চাবস্থায় চলে গেছেন। অন্যরা অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু সমাজে থাকার জন্য এগুলোই অনেক সমস্যা তৈরী করে। সমাজে থাকলে দু-চারজন লোক আসবে, আর তাদের চোখে যদি পড়ে যায়, তখন অনেক সমস্যা হয়। আমি এসব গ্রাহ্য করি না, এই ভাবটাকে যদি আনতে হয়, তাহলে আগে তাকে অনেক বড় হতে হবে। টাটা, বিড়লার মত বড় বড় ধনীরা কি খাচ্ছেন, কি পড়ছেন তাতে কারুর কিছু এসে যায় না, তাঁকে নিয়ে আপনি কি ভাবছেন, তাই নিয়ে তাঁরা কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, সমাজে থাকার জন্য তাদের দরকার পড়ে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, গৃহস্থের ভিতরে ত্যাগ রাখতে হয়, সন্ন্যাসীর বহিঃত্যাগ, ভিতর থেকেও ত্যাগ। সংসারে যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন, তাঁদের ভিতরে ত্যাগ করতে হয়। সমাজে থাকতে গেলে ভাল ভাল সামগ্রী রাখতে হবে। চারজন লোক আসছে, তার জন্য ভাল চেয়ার তাকে রাখতে হবে। চা দিয়ে আপ্যায়ন করার জন্য তাকে ভাল কাপ-ডিশ রাখতে হবে। কিন্তু গৃহস্থ যদি বলে, হাজার টাকার দামী কাপের সেটে হাজার টাকা দামের চা না আনলে আমি চা খাবই না, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে সে এই পথের পথিক নয়।

অতিথির জন্য আমি সব থেকে ভাল ব্যবস্থা করব, কিন্তু আমার নিজের জন্য কিছু লাগবে না। এই ভাবটাকে develop করতে হবে। সন্ন্যাসীদের অনেক সময় প্রশ্ন করে, আমরা তো সংসারে আছি। সংসারে আছেন তো কি হয়েছে, সমস্যা কোথায়। এর পরের শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য –

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২।।

*(যিনি যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা পীড়িত হলেও অবিষণ্ণচিত্ত, মাৎসর্যহীন (নির্বৈর) ও লাভালাভে হর্ষবিষাদরহিত, তিনি শরীরধারণের উপযোগী কর্ম করলেও সেই কর্মে বদ্ধ হন না।)*

যদিও এই শ্লোকটা সন্ন্যাসীদের জন্য, তবে এই ভাবগুলো শুনে রাখতে হয়। *যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো*, যখন যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট। সন্ন্যাস হওয়ার পর তিন দিন ভিক্ষা করতে হয়, ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় তাতেই খুশী। *দ্বন্দ্বাতীতো*, সুখদুঃখের পারে, *বিমৎসরঃ*, কারুর প্রতি কোন ক্ষোভ নেই, রাগ নেই। *সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ*, সাফল্য, অসাফল্য, যা হল সবটাই তাঁর কাছে সমান। *কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে*, ফলে তাঁর কোন বন্ধন হয় না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।

*(আসক্তিশূন্য, ধর্মাধর্ম ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির বন্ধন থেকে বিমুক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞার্থ কর্ম অনুষ্ঠিত হলেও তার সমগ্র কর্ম বিনষ্ট হয় অর্থাৎ ফলপ্রসব করে না।)*

*গতসঙ্গস্য মুক্তস্য*, সমস্ত সঙ্গ বা আসক্তি থেকে মুক্ত। কোন কিছুর প্রতি, কোন ব্যক্তির প্রতি, বাবা, মা, বন্ধুর কারুর প্রতি আসক্তি নেই। *জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ*, পাগল ছাড়া এটা সম্ভব হয় না, কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা এটা পারেন। একমাত্র যদি তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তবেই তিনি সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। *যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে*, এই ধরণের মানুষ যখন যজ্ঞ রূপে সমস্ত কর্ম করেন, তখন সেই কর্মের যে ফল হয়, সব ফল কর্মের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

কর্মের ফল কর্মের সাথে নাশ হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করছেন, *গতসঙ্গস্য মুক্তস্য*, কোন ধরণের আসক্তি নেই, সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; *জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ*, আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি, আমার উদ্দেশ্য ঠাকুরকে পাওয়া, আমার মন শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত; এই ভাব সব সময় ধরে রাখতে হয়। আর *যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম*, যা কিছু কর্ম করা হচ্ছে, সবটাই যজ্ঞ রূপে করছে। এরপর সাত আটটা শ্লোকে বিস্তারে বলবেন, কিভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাও যজ্ঞ রূপে করতে হয়। তখন তার কর্মের যে ফল কর্মের সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। কর্ম আর কর্মের ফল আলাদা তার হয় না। কর্পূর পোড়ানর মত, কর্পূর পোড়ালে ধুয়ো হয় না, তার ছাইও হয় না। ধীরে ধীরে তার সমস্ত দায়ীত্ব শেষ হয়ে যায়। কর্মবন্ধন শেষ হয়ে যায় বলে তার আর দায়ীত্ব বলে কিছু থাকে না। যদি কোন কারণে দায়ীত্ব থাকে, যদি কারুর মধ্যে দায়ীত্ব বোধ থেকে থাকে, তখন তাকে এটাই করতে হবে, ঠিক আছে এই দায়ীত্ব আমার উপরে এসে গেছে, লোকে যাতে আমার উপর না হাসে, লোকে যাতে আমার নিন্দা না করতে পারে, লোকের কাছে একটা বাজে দৃষ্টান্ত যাতে না হয়ে যায়, সেইজন্য আমি করছি, কিন্তু এটাও আমি যজ্ঞ রূপে করছি।

যোগী যদি হতে চান, অর্থাৎ কর্মযোগী হতে যদি চান, তাহলে সবার আগে নিষিদ্ধ কর্ম করাটা বন্ধ করতে হবে। তারপর philosophy of karma বুঝতে হবে, তার মানে এটা বুঝতে হবে, আমি সেই আত্মা, আত্মা কোন কাজে লিপ্ত হন না, কাজ ইন্দ্রিয় বস্তুর উপরে করে। শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান, রথ চালানো ইন্দ্রিয়ের কাজ, এটা শ্রীকৃষ্ণের কাজ না। যতক্ষণ এই বোধ না হয় যে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, ততক্ষন তাকে সব কাজ যজ্ঞ রূপে করতে হবে, ঠাকুরের পূজা রূপে কাজ করতে হবে, নিজের শুদ্ধির জন্য কাজ করতে হয়। আর যদি মনে করেন, জ্ঞানীরা তো কাজ করতেন না, আমিও কাজ করব না, এই না করাটাও একটা কাজ। যতক্ষণ তোমার জ্ঞান না হয়ে যায়, ততক্ষণ তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে সব কাজ যজ্ঞ রূপে করতে হবে। আসক্ত হওয়া চলবে না। যে কোন কাজ নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য বা লোকের মঙ্গলের জন্য করতে হবে, এটাই রামকৃষ্ণের মিশনে মোটো, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*।

আমরা এতক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে দেখলাম যাঁরা কর্ম করেন, তাঁরা কিভাবে অনাসক্ত থাকেন। অনাসক্ত হয়ে কর্ম না করলে, কিভাবে ওই কর্মই তাঁর বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এর উপর আমরা বিস্তারে আলোচনা করলাম। আমরা থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা অনেক করেছি, কিন্তু জীবনে এই জিনিসগুলোকে কিভাবে করা যায়, সেটাই এবার চব্বিশ থেকে তেত্রিশ শ্লোকে বলতে যাচ্ছেন। ঠাকুর স্বামীজী আসার পর থেকে কিছু কিছু শব্দ খুব প্রচলিত হয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা হল মুক্তি, সবারই মুক্তি চাই; তার সাথে সবারই মুখে এখন অদ্বৈত বেদান্ত। অদ্বৈত বেদান্তের নীচে কেউ কথাই বলবেন না। এভাবে শুধু ধর্ম কেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও কিছু হয় না। ইউটিউবে কোন মহাত্মা বা কোন বড় বাবাজীর একটা লেকচার শুনে খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু তারপরই এক গুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। মনে প্রশ্ন ওঠা মানেই, এখনও সে এর জন্য প্রস্তুত হয়নি। আমেরিকার এক জায়গায় স্বামীজী লেকচার দিচ্ছিলেন, একজন শ্রোতা উঠে স্বামীজীকে বলছেন, 'আমি আপনার এই মতের সাথে একমত হতে পারছি না'। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, 'তাহলে এই কথাগুলো তোমার জন্য নয়'। হিন্দুরা অনেক দিন ধরে এটা জানে যে, ঋষিরা জানতেন সব জিনিস সবার জন্য নয়। ঠাকুর বলছেন, যার পেটে যেটা সয়। আবার অন্য ভাবেও বলছেন, প্রথমে উড়ন্ত পাখি তীর দিয়ে মারতে গেলে পারবে না, তাই আগে কলাগাছ বিঁধতে হয়। সবাইকেই ধাপে ধাপে এগোতে হয়। গীতা এই জিনিসটা বরাবর মাথায় রেখেছে।

যাঁরা ইউটিউবে আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদেরকে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, যেটা আপনি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছেন, ওটাই আপনার সাধনা। তার থেকেও বেশি, আপনার গুরু আপনাকে যেটা বলে দিয়েছেন, সাধনা একমাত্র সেটারই হবে। কোথায় কে অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কোথায় আবার কে বিবেকচূড়ামণি নিয়ে বলছে, সেখানে দৌড়ে গেলাম, আবার কোথায় কে মাণ্ডুক্যকারিকা নিয়ে বলছে, সেখানেও গিয়ে হাজির হলাম, এভাবে কোন কিছুই হবে না। এগুলো শোনার জন্য, আপনার জ্ঞানরাশি বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু ওটা আপনার সাধনা নয়। গীতা পদে পদে, যখনই কিছু আলোচনা করতে যাচ্ছেন, মায়ের মত আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। গীতা আগাগোড়া বলবে দুটি পথ –প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। আমরা প্রথম থেকে যখনই সুযোগ আসছে তখনই বলছি, নিবৃত্তি সবার জন্য নয়, অষ্টাবক্র গীতা সবার জন্য নয়, প্রথমে নীচে থেকে শুরু করতে হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বললেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসংঙ্গিনাম্*, কারুর বুদ্ধি বিচলিত করতে নেই। বুদ্ধি বিচলিত করে দিলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে।

গীতা এখানে বলবেন, তোমার জীবন কিভাবে ধন্য করবে, কিভাবে কৃতার্থ করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, সমস্ত কাজকে, যত ধরণের কাজ আছে সব কিছুকে যজ্ঞ রূপে দেখবে। পরের দশটি শ্লোকে ভগবান দেখাচ্ছেন, জীবনের সব কিছু, যে কোন কর্ম কিভাবে যজ্ঞ হয়ে যায়। শুরু করছেন একটা আদর্শকে দিয়ে। যিনি সন্ন্যাসী, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মবেত্তা, তাঁরা জিনিসটাকে কিভাবে দেখেন? এই জগতে যত ক্রিয়া হচ্ছে, সেটাকে তিনি কিভাবে দেখেন? বেদে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী*

*ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই স্খলিত পদে হেঁটে চলা বৃদ্ধ।

ঠাকুরের সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছাগ বলি হত। ঠাকুর একদিন দেখছেন, যে ছাগকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটাও সচ্চিদানন্দ; যার উপরে রেখে বলি দেওয়া হবে, সেই বলিকাঠ, সেটাও সচ্চিদানন্দ; যেটা দিয়ে বলি দেওয়া হবে, সেই খড়্গও সচ্চিদানন্দ; যে বলি দেবে সেও সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর আলাদা করে ছাগ দেখছেন, খড়্গও দেখছেন, যূপকাঠ দেখছেন, কিন্তু সবটাই চৈতন্য দেখছেন, আমাদের ভাষায় ব্রহ্ম। যিনি বলি দিতে যাচ্ছেন, তিনি ব্রহ্ম, ছাগটাও ব্রহ্ম, খড়্গটাও ব্রহ্ম। বলির পর ছাগলের মুণ্ডু আর ধর যখন আলাদা হয়ে যাবে, তখন কি হবে? মুণ্ডুটাও ব্রহ্ম, ধরটাও ব্রহ্ম। ঠাকুর এটা সাক্ষাৎ দেখছেন। একবার দেখছেন, তা না। এটাই মানবজীবনের শেষ উপলব্ধি, এই উপলব্ধির পর মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায় এবং মুক্ত হয়ে যায়।

আমরা দেখছি, ছাগ আলাদা, খড়্গ আলাদা, বলি যে দিচ্ছে সে আলাদা। তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই দৃশ্য দেখছিলেন, একবার দেখেননি, তিনি ওটাতেই, ওই জ্ঞানেই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। আমাদের মত অন্য অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও ঘটনাটা দেখছে, কিন্তু সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখছে। এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেদান্তে এটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বেদান্ত বলেন, যখনই কোন ক্রিয়া হয়, যে কোন ক্রিয়া, ক্রিয়া হলেই তিনটে জিনিস এসে যায় – কারকের বিভক্তি, ক্রিয়া ও ফল। আসলে থাকে কর্তা, কিন্তু এই যে কর্তা, যাকে প্রথমা বলা হয়, এর বিস্তার হয়ে যায়। বিস্তার হয়ে সাত কি আটটা কারকের বিভক্তি হয়ে যায়, সংস্কৃতে বলা হয় কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, প্রথমা, দ্বিতীয়, তৃতীয়া ইত্যাদি। এটাকে বলে কারক, বেদান্তে কারক ঘুরে ঘুরে আসবে। যেখানেই ক্রিয়া হবে সেখানে কারক থাকবেই, ক্রিয়া থাকবেই আর কর্মের একটা ফল থাকবেই, ভাল ফল, মন্দ ফল যাই হোক। আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের জন্য এই সংসারে কারক আর তার যে আটখানা বিভক্তি, এটা পুরো আলাদা। ওদিকে আট আর এদিকে যোগ হয় ক্রিয়া আর ফল, মোট দশটি জিনিস, আমাদের কাছে সব সময় আলাদা ভাবে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর কাছে এগুলো সব এক হয়ে যায়। জ্ঞান আর অজ্ঞানের এটাই তফাৎ, অদ্বৈত জ্ঞান আর দ্বৈত জ্ঞানে এটাই তফাৎ। দ্বৈত জ্ঞান যেখানে দশ দেখছে, অদ্বৈত জ্ঞান সেখানে এক দেখে।

যেমন, আমি ভাত খাচ্ছি। আমি হয়ে গেলাম প্রথমা, ভাত হয়ে গেল দ্বিতীয়া, হাত দিয়ে খাচ্ছি, এসে গেল তৃতীয়া। থালা থেকে খাচ্ছি, আরেকটা বিভক্তি বেড়ে গেল। আর খাওয়াটা একটা ক্রিয়া, খাওয়ার পর পেট ভরল, এটা হয়ে গেল ফল। সবটাই আলাদা। এই যে কারকের বিস্তার আর তার সাথে ক্রিয়া ও ফল, দশ হয়ে গেল, এটাই সংসার। সংসার মানেই, কারক-ক্রিয়া-ফল, সবটাই আলাদা হয়ে যায়। যেমন একটা বৃক্ষের অনেক ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, তেমনি সংসারে আর কিছু নেই, সেই এক এই দশটি হয়ে আমাদের সামনে আসে। ভগবান, যিনি অবতার, যিনি জ্ঞানী, সাধনা করে করে যাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন, যাঁরা জন্ম থেকে জ্ঞানী, তাঁরা এই বিস্তার দেখেন না, এমনি মনে মনে চিন্তা করে কিছু দেখছেন না, তাঁরা সাক্ষাৎ দেখেন। আমরা যেমন বলি, আমি নিজের চোখে তোমাকে বদমাইশি করতে দেখেছি। এনারা পরিষ্কার ওই ভাবে দেখেন, সব এক, চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। এখন এই যে ছাগকে বলি দেওয়া হচ্ছে, মা কালীর কাছে অর্পণ করা হচ্ছে, সেখানে ঠাকুর দেখছেন, যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, সবটাই সচ্চিদানন্দ।

এবার ঠাকুরের মত কেউ যদি যজ্ঞ করতে চান? আমরা সবাই এত বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করছি, গীতা উপনিষদ পাঠ করছি, এত ঠাকুরের কথা বলছি, কিন্তু আমাদের সবারই জীবনের প্রতি আসক্তি রয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া জীবনের প্রতি আসক্তি সবারই থাকে। এর সাথে, পরের জন্মে

তোমাকেই যেন পাই, এই ভাবটা থাকবেই থাকবে। এর থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। এক ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া, যিনি বহুকে এক দেখে নিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া বাকি সবারই মনে কোথাও না কোথাও এই ভাবটা থাকবেই থাকবে। অনেক পরিচিতরা এসে সাধুদের বলেন, আশীর্বাদ করুন পরের জন্মে আমি যে সন্ন্যাসী হয়ে জন্মাই। তার মানে পরের জন্মটা থেকেই যাচ্ছে।

বেদ হল মায়ের মত, বেদ জানেন, মানুষ সব সময় নিজের ভাল চায় আর তার যারা প্রিয়জন, তাদের ভাল চায়। মানুষ এর বাইরে যেতে পারে না। সেইজন্য ঋষিরা বিধান দিলেন, তুমি যজ্ঞ কর। যজ্ঞ করে তোমার যে ক্ষুদ্র আমি, এই ছোট্ট আমিকে বৃহতের সাথে এক করার চেষ্টা কর। ঠাকুরের পূজা করার সময়, আমরা ঠাকুরের পায়ে ফুল অর্পণ করলাম। ফুল অর্পণ করে আমরা কি করছি? নিজেকে ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি, এছাড়া তো আর কিছু হচ্ছে না। যারা ঠাকুরের পূজা করছে, হয়ত কদাচিৎ কখন তাদের মনে আসে, হে ঠাকুর আমার এটা যেন ভাল হয়; কিন্তু যাঁরা নিয়মিত পূজা করেন, যদি তাঁদের মধ্যে ভক্তি থাকে, হয়ত একটা মন্ত্রোচ্চারণ করার মাধ্যমে একটা ভাবে এসে বলেন, হে ঠাকুর তুমিই আমার সব, এই বলে ঠাকুরের চরণে পুষ্প অর্পণ করছেন। আমরা এটাকে পূজা বলছি। কিন্তু আসলে কি এটা? আমার যে ক্ষুদ্র আমি, তাঁর পাদপদ্মে ফুল দিয়ে, আর ফুল অর্পণের ক্রিয়া করে, ফুলটা একটা বস্তু আর অর্পণ করাটা একটা ক্রিয়া, এইভাবে তিনি বৃহৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বৃহৎ, এই বৃহতের সাথে নিজেকে জুড়ে দিচ্ছেন। উপনিষদেও বলছেন, *যোগৈ ভূমাঃ তৎ সুখম্*, মানুষ যখন নিজেকে বৃহৎ মনে করে তখনই সে সুখী হয়, কারণ সেখানে নিজের বিস্তার হয়। কাউকে কটূ কথা বললে, তার স্পেসটা ছোট হয়ে যায়, কষ্ট হয়।

যখন আমরা পূজা করছি, ঠাকুর যিনি অনন্ত, যাঁর ভাব অনন্ত, সেই অনন্তের সাথে কোন না কোন ভাবে আমরা জুড়ে যাচ্ছি। কোন মন্ত্রী বা বড় কোন লোকের সাথে যদি কারুর পরিচয় থাকে, সে গর্ব করে বলবে, আরে ওনার সাথে আমার পরিচিতি আছে। বংশের কেউ যদি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা কোন বড় কিছু হয়, তখন গর্ব করে বলে, জানো আমাদেরই বংশের একজন ওখানে আছে। পাড়া বা গ্রামের কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে, সেই পাড়া বা গ্রামের কোন লোকের সাথে সেই সন্ন্যাসীর দেখা হলে খুব গর্ব ও আনন্দ সহকারে বলে, আমি আপনাকে জানি, আপনি আমাদের গ্রামে থাকতেন। কারণ সে নিজেকে সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। আমরা যখন পূজা করছি, তখনও আমরা সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। সমুদ্র দেখে আমাদের আনন্দ হয় কেন? কারণ সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালেই আমাদের মন কোথাও গিয়ে সেই বৃহতের সাথে জুড়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, খোলামেলা জায়গায় থাকলে মন ভাল থাকে, ধ্যানও ভাল হয়। সারাদিন একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকলে ধ্যান হবে না। দিনে কিছু সময় ছাদে গিয়ে পায়চারি করলে মন খুলে যাবে। মুক্ত আকাশের নীচে কিছুক্ষণ সময় কাটান। হিমালয়ে গিয়ে কোন নির্জন খোলামেলা জায়গায় থাকলে প্রাণ এমনিই খুলে যাবে। সাধনা মানেই, নিজের ক্ষুদ্রতাকে বৃহতের কাছে খুলে দেওয়া।

বেদ মায়ের মত, বেদ এই জিনিসটাকে জানেন, তিনি একটু শুধু টোপ খাইয়ে দিচ্ছেন, এই যজ্ঞ করলে তোমার এই লাভ হবে, অমুক যজ্ঞ করলে অমুক হবে। সব সময় শুধু যে টোপ দিচ্ছেন তা না, বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্য বিখ্যাত স্তুতিগুলিও আছে। শুধু ফুল অর্পণ না, ফল অর্পণ না, মিষ্টি অর্পণ না, যখন স্তুতি করছেন, যে কোন স্তুতি, সেখানে শব্দ দিয়ে নিজেকে সেই বৃহতের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। গীতার আলোচনার শুরুতে আমরা যে স্তুতি করে, বলছি *কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরুম্*, শব্দ দিয়ে নিজেকে আমরা জুড়ে দিচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। আমরা কি ভগবানের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় প্রার্থনা করি? একেবারেই তা নয়, প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা নিজেকে জুড়ে দিচ্ছি সেই বৃহতের সঙ্গে। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা যে ঠাকুরের সামনে খণ্ডন ভব বন্ধন করছি, সেই সময় আমাদের মন একটা অনাবিল আনন্দের মধ্যে, গভীর শান্তির মধ্যে ডুবে যায়। কারণ, সেই সময়ও আমরা বৃহতের সাথে জুড়ে যাচ্ছি। বেদ অন্য ভাবে বৃহতের সাথে আমাদের জুড়ে দিচ্ছেন। বেদ এটাকে বলছেন যজ্ঞ;

বেদী বানাও, অগ্নি স্থাপন কর, সেই অগ্নিতে আহুত দাও, আহুতি দেওয়ার জন্য আবার অনেক উপকরণ দরকার, বেদের সময় এই জিনিসগুলোর খুব প্রচল ছিল, এখন অনেক কমে গেছে, তবে যজ্ঞাদি কমে গেলেও এটাই এখন অন্য রূপে করা হয়।

অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তার মানে সেখানে একটা ক্রিয়া হয়ে গেল। ক্রিয়া হয়ে গেল মানে, কারকের বিস্তার হবে, তার সাথে ক্রিয়ার একটা ফল হবে। ফল মানে, মৃত্যুর পর যেন ভাল জন্ম পাই বা মৃত্যুর পর যেন স্বর্গে যেতে পারি বা ইহজগতে আমার যেন এটা হয়, সেটা হয়। যজ্ঞ একটা পূজার কার্য, তাতেই কত বিস্তার হয়ে গেল –আটটি কারক, ক্রিয়া এবং ফল। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যেমন ঠাকুরের কথা বর্ণনা করা হল, তিনি দেখছেন ছাগ, খড়্গ, বলিকাঠ সবই সচ্চিদানন্দ, এই ধরণের আত্মজ্ঞানী যদি যজ্ঞ করেন, তখন তিনি কি দেখবেন? চব্বিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন –

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।২৪।।

*(কারণ, ব্রহ্মবিৎ হবনীয় দ্রব্যের অর্পণকে, ঘৃতকে, হোমাগ্নিকে, আহুতিদানের কর্তাকে এবং হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্তব্য ফলও ব্রহ্ম।)*

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মবেত্তা, তিনি যখন যজ্ঞ করেন, এটা ঠিক যে ব্রহ্মজ্ঞানী কখন যজ্ঞ করবেন না, কিন্তু এখানে আদর্শ রূপে বলা হচ্ছে, ঠাকুরের যেমন গলিতহস্থ হয়ে যাচ্ছে, পূর্বজদের তর্পণ করতে যাচ্ছেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাঁর জল গলে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী যদি যজ্ঞ করেন, তখন তিনি কি দেখবেন? তিনি দেখবেন যে জিনিস দিয়ে যজ্ঞ করা হচ্ছে সেটা ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে আহুতি দেওয়া হবে, সেটা ব্রহ্ম; যিনি যজ্ঞ করছেন (কর্তা), তিনি ব্রহ্ম; যে অগ্নি স্থাপনা করা হয়েছে, সেই অগ্নি ব্রহ্ম; আর এই যে হবন ক্রিয়া, এই ক্রিয়াটাও ব্রহ্ম এবং এই ক্রিয়ার যে ফল হবে সেটাও ব্রহ্ম, সবটাই ব্রহ্ম।

*ব্রহ্মকর্মসমাধিনা,* যে ব্যক্তির সমস্ত কর্ম মনের ভিতরে এই অর্থে বসে গেছে যে, ব্রহ্মই আছেন; তিনি যে সমস্ত কর্ম করেন, তাঁর কাছে সবটাই ব্রহ্ম। একটা ক্রিয়ার যত রকমের অঙ্গ হতে পারে, কারক রূপী যত অঙ্গ থাকতে পারে, তার সাথে ক্রিয়া এবং তার সঙ্গে ক্রিয়ার ফল, সব এক হয়ে যায়। এটাই আবার ধ্যানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। আমরা একটা জিনিসকে যখন জানছি, যেমন এই কলম আছে, আমি এই কলমকে জানছি, তখন আমি আলাদা, চশমা দিয়ে দেখছি এটাও একটা কারক, কলম হল দ্বিতীয়া, সংস্কৃতে বলে কর্ম আর দেখাটা হল ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে, এই তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। সেই যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যিনি অনন্ত, সেখানে কার উপর কে ক্রিয়া করবে, যেটা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। ক্রিয়া কি করে হবে, অনন্ত কিনা। ক্রিয়া করার জন্য একটা জায়গা দরকার, তারপর কর্তা ও কর্ম, সংস্কৃতে প্রথমা ও দ্বিতীয়া, এই দুটোকে আলাদা হতে হবে। ফলে এক হয়ে যায়। ঠাকুরও কথামৃতে অনেক জায়গায় বলছেন, ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান এক। এক হওয়া মানে, যিনি ধ্যান করছেন, যাঁর ধ্যান করছেন আর ধ্যান রূপ ক্রিয়া, তিনটেই এক হয়ে যায়। আমরা যাঁরা এই লেকচার ফোনে বা কম্প্যুটারে দেখছি, আমাদের সামনে একটা স্ক্রীন আছে, দৃশ্য গুলি সরে সরে যাচ্ছে।

এই জগতকে যখন দেখছি, দেখার সময় চোখের উপরে যদি একটা ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওই ঠুলি দিয়ে যে দৃশ্য দেখব সেটা সম্পূর্ণ একটা দৃশ্যের অংশ দেখব, আমরা টুকরো টুকরো দৃশ্য দেখি। কিন্তু ঠুলিটা যদি খুলে দেওয়া হয়, তখন কোন মুভমেন্ট নেই, কিছু নেই, একটা সলিড। চোখের উপর একটা পাইপ লাগিয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে একটা পাহাড় দেখছি, আর আস্তে আস্তে মাথাটা ঘোরাচ্ছি, দৃশ্যগুলো তখন পাল্টাতে থাকে। চোখের উপর থেকে পাইপটা সরিয়ে দিলে

সব এক দেখাবে, আলাদা কিছু দেখাবে না, কোন মুভমেন্ট নেই, কোন ক্রিয়া নেই, কোন কর্তা নেই, কোন কর্ম নেই, মানে দ্বিতীয়া নেই।

ব্রহ্মজ্ঞানীকে নিয়ে বলতে গিয়ে এই যে বলছেন, কর্তা নেই, কর্ম নেই। কর্তা আর কর্ম না থাকলে সেখানে ক্রিয়া কি করে হবে! তাই বলছেন, আত্মজ্ঞানে সমস্ত ক্রিয়ার অভাব হয়ে যায়। কেন অভাব হয়ে যায়? কারণ সব মিলে এক হয়ে যায়, আসলে যেহেতু আমিটাও থাকে না, সেইজন্য এক বলাটাও ঠিক হবে না, ঠিক ঠিক হল এক দুয়ের পারে। অদ্বৈত মানেই তাই, অদ্বৈত মানে এক দুয়ের পারে, কি আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। এক যদি বলি, তাহলে তো মুখে বলে দেওয়া হল, বৌদ্ধদের মত শূন্য যদি বলি, সেখানেও মুখে বলে দেওয়া হল। মুসলমানদের মত যদি বলি এক, সেই আল্লা, মুখে বলে দিলেন। অদ্বৈত তা নয়, অদ্বৈত এক দুয়ের পার। কেন? সেখানে কর্তা নেই, ক্রিয়া নেই, কর্ম নেই, তাই ফলও নেই, এক আসবে কোথা থেকে। তাহলে কি এক আছে? তাও নেই, কি আছে মুখে বলা যাবে না। ওটাকে হয় আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে, নয়তো ধারণা করতে হবে। একটা ধারণা হয়ে গেলে অনেকটা শান্তি। বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদের ভাব এটাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সেন্টারে খাওয়ার সময় এই মন্ত্রোচ্চারণ করে অন্ন গ্রহণ করা হয়। মিশনের সিনিয়র মহারাজরা সবাইকে আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি, এটাকে যজ্ঞ রূপে নিতে বলে দিয়েছেন। খাওয়ার সময় এই জন্যই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের এই চব্বিশ নম্বর শ্লোক পাঠ করা হয়, নিজেকে মনে করাবার জন্য, যিনি খাচ্ছেন তিনিও ব্রহ্ম, যেটা খাওয়া হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, খাওয়ার যে ক্রিয়া এটাও ব্রহ্ম, ক্রিয়ার যে ফল পেট ভরে যাওয়া, এটাও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্মজ্ঞানীদের কথা বলার পর এবার আমাদের মত লোকেদের জন্য বলছেন। তোমার সবাই তোমাদের জীবন ধন্য কর। কিভাবে করবে? জীবনে যত ক্রিয়া আছে সব ক্রিয়াকে যজ্ঞ রূপে কর।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫।।

*(অন্য যোগিগণ দেবতাপূজারূপে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর কেউ কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সোপাধিক জীবাত্মাকে নিরুপাধিক পরমাত্মারূপে দর্শন করেন।)*

বিভিন্ন রকমের যজ্ঞের কথা বলছেন, সব মিলিয়ে প্রায় বারো রকম যজ্ঞের কথা বলছেন। এই যে ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য বললেন *ব্রহ্মার্পণং*, এটাই যাঁরা জ্ঞানী নন তাঁরা কিভাবে করেন? পঁচিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন পূজা রূপে যেটাই করছেন, ওটা যজ্ঞ। আমরা পঞ্চ যজ্ঞের কথা অনেকবার অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মযজ্ঞের পর হল দেবযজ্ঞ। কিন্তু তখনকার দিনের ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এই যজ্ঞ করতেন, শূদ্রের অধিকার ছিল না। এখন কোন শূদ্র নেই, এখন হয় সবাই ব্রাহ্মণ, নয়তো সবাই শূদ্র। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সবাই ব্রাহ্মণ। মনু বলে গিয়েছিলেন, শুদ্ধ আচরণ করলে শূদ্ররাও ব্রাহ্মণ। এখন ভারতবর্ষের সবারই আচরণ শুদ্ধ হয়ে গেছে। চুরি-চামারি সবাই করে, এগুলো কোন কিছু না। আমরা এখন নূতন জাতি, এখন নূতন ক্ষমতা পেয়েছি, একটু কেউ চুরি করে, একটু বদমাইশি করে, ওগুলোর দিকে অত তাকাতে নেই। হিন্দুরা একটা বিশুদ্ধ জাতি, এখানে সবাই ব্রাহ্মণ। এখন যজ্ঞ হয় না, কিন্তু পূজা হয়, একই জিনিস।

*দৈবমেবপরে যজ্ঞং*, অন্যরা যখন করে, তখন তাঁরা যজ্ঞ দিয়ে দেবতাদের পূজা করেন। তাঁদের জীবনটা পুরো যজ্ঞে সমর্পিত। আগেকার ঋষিদের তাকালে আমরা দেখতে পাই, সারাটা সময় তাঁরা যজ্ঞ করে যাচ্ছেন। মহাভারতে বর্ণনা আছে, নৈমিষ্যারণ্যে একটা যজ্ঞ হচ্ছে, বারো বছর ধরে নাকি সেই যজ্ঞ চলছে। শৌণক ঋষি সেই যজ্ঞ দেখতে গেছেন। তাঁকে ঋষিরা সবাই মিলে ঘিরে

ধরে অনুরোধ করে বলছেন, সন্ধ্যেবেলা আমাদের একটু অবসর হয়, সেই সময় যদি আপনি পুরাণের কাহিনীগুলি আমাদের বলেন। শৌনক ঋষিও পুরাণ-কাহিনী বলছেন। জীবনটাই একটা পুরো যজ্ঞ, দেবতাদের জন্য যজ্ঞ করছেন। আর বলছেন, *ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি*, অনেকে আবার যজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞের পূজা করছেন। এখানে কোন দেবতার পূজা করছেন, সেই যজ্ঞেরই পূজা করছেন।

এটাকে আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তিনি বলছেন, যজ্ঞের একটা অর্থ হয় আত্মা। সংস্কৃতে এই এক সমস্যা, একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়, বিভিন্ন ভাষ্যকাররাও এটাকে বিভিন্ন ভবে ব্যাখ্যা করেন। আচার্য এখানে বলছেন, যজ্ঞের একটা অর্থ হয় আত্মা, আত্মা দুই প্রকার – শুদ্ধ আত্মা এবং উপাধিসহিত আত্মা। উপাধি সহিত আত্মা মানে, যেমন আমি, আমি অমুক ব্যক্তি, আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু উপাধি লাগানো আছে। কি রকম উপাধি? আমি এই দেহ মনের সঙ্গে যুক্ত, আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি আচার্য রূপে ক্লাশ নিচ্ছি, এই উপাধিগুলো লেগে গেছে। উপাধি লেগে যাওয়ার জন্য এটাকে আমরা অশুদ্ধ আত্মা বলি না, আমরা বলি সোপাধিক, উপাধি সহিত। বলছেন, যখন এনারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করছেন বা যে যোগীরা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করছেন, তখন তাঁরা কি করছেন? সোপাধিক আত্মাকে নিরুপাধিক আত্মাতে আহুতি দিচ্ছেন।

আগেকার দিনে দেওয়ালীর সময় আর দোলের সময় সব পুরনো আবর্জনা জড়ো করে পোড়ান হত। সব নোংরা আবর্জনাকে পুড়িয়ে দাও। সোপাধিক আত্মা, দেহ মনের সঙ্গে আত্মা জড়িয়ে আছে, ওর এই জড়ানোটা, এটাই অশুদ্ধ ভাব, এটাকে আহুতি দিয়ে দাও। কোথায়? নিরুপাধিক আত্মাতে, যাতে ও বুঝে নিতে পারে, আমি আসলে শুদ্ধ আত্মা। সোপাধিক আত্মা জগতের সাথে, এটার সাথে, সেটার সাথে জড়িয়ে আছে, সব আহুতি দিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও আগুন, এই অশুদ্ধিকে পুড়িয়ে দাও। এই যজ্ঞ সন্ন্যাসীরা করেন, বা যে কোন লোক যিনি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোচ্ছেন তাঁরা এটাই করেন, *ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং* , ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে, কোন ব্রহ্ম? নিরুপাধিক ব্রহ্ম, সেই অগ্নিতে সোপাধিক ব্রহ্মকে আহুতি দিয়ে দেন, যাতে সব উপাধি পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। তার সাথে বলছেন, আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের উপলব্ধিটাই এই যজ্ঞের ফল। যজ্ঞটা হল যেটা সাধনা করা হচ্ছে, আত্মাই যে ব্রহ্ম, এই জ্ঞান যাতে আসে। এখান থেকে আরও সহজে নিয়ে যাচ্ছেন –

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬।।

*(অন্য কোন কোন যোগী কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযম-অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করেন। অপর কোন কোন যোগী শব্দাদি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন [শ্রোত্রাদি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয়গ্রহণকে হোম মনে করেন।])*

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি, ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনছি, আস্বাদ করছি; যোগীরা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে নেন। আমরা ব্রহ্মচর্যের কথা শুনেছি, ব্রহ্মচর্য মানে সব কিছুকে সংযম করে নেওয়া। সাধনা রূপে আমি হয়ত একটা বিশেষ কোন খাবার খাই না, তার মানে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে নিলাম। ইউপি বা উত্তরাঞ্চলে দেখা যায়, অনেকে তীর্থাদিতে গিয়ে কোন একটা বিশেষ ফল কোন দেবতার নামে অর্পণ করে দেন; হয়ত কেউ কলা অর্পণ করে দিলেন, শিবের মাথায় কলা অর্পণ করে দিয়ে বলে দিলাম, আমি আর কলা খাব না। এই যে সংযম, এই সংযম একটা অগ্নি; সংযমরূপী যে অগ্নি, এতে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়গুলি আছে, সেগুলিকে আহুতি দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের সহজ ভাষায়, যোগী নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে নেন বা নিয়ন্ত্রণ করে নেন। এটাকেই গীতা যজ্ঞের সাথে তুলনা করে বলছেন, এই যে সংযমরূপী অগ্নি, তাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে আহুতি দিয়ে দিচ্ছেন।

*শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি*। কোন কোন যোগীরা আবার কি করেন? ইন্দ্রিয় দিয়ে শাস্ত্র সম্মত ভাবে অল্প একটু যে গ্রহণ করছেন, সেটাকে এনারা মনে করেন, এই বিষয়গুলিকে আমি ইন্দ্রিয়ে আহুতি দিচ্ছি। কথামৃতে এক জায়গায় আছে, ঠাকুর খাচ্ছিলেন, তখন একজন জিজ্ঞেস করছেন, বাবা তুমি কি খাচ্ছ, নাকি আহুতি দিচ্ছ? খেতে বসে আমরা সবাই মনে করি আমরা খাচ্ছি, কিন্তু যিনি যোগী, তিনি মনে করছেন, এই যে আমার খাবার, এটাকে আমি জিহ্বার উপর আহুতি দিলাম। ইন্দ্রিয় একটা অগ্নি, এই অগ্নিতে বিষয়গুলিকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। আর ইন্দ্রিয়কে যখন সংযম করে নেওয়া হচ্ছে, তখন সংযমকে বলছেন অগ্নি। আমরা যদি একটা অগ্নিকুণ্ডের কল্পনা করি, যেখানে হোম হচ্ছে, এই আগুনটা হল সংযম, সেই অগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের আহুতি দেওয়া হল। আমি সিনেমার গান শুনব না, আমি পপুলার মিউজিক শুনব না, এটাই ইন্দ্রিয়ের সংযম, সংযম রূপী অগ্নিতে আমি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়ে দিলাম। তেমনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যেটা দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ভোগ হচ্ছে, এখানে ইন্দ্রিয় রূপী অগ্নিতে বিষয়কে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। গীতা আমাদের জন্য কত সহজ করে দিচ্ছে, আমি যে খাওয়া-দাওয়া করছি, এটাকেও যজ্ঞ রূপে পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়। যখনই কিছু খাচ্ছি, *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ* যেটা বলা হল, এটা ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য। আচার্য যদিও বলছেন, ঐ রূপে সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু শুদ্ধি তো হবেই। কিন্তু এই বোধ করা, আমি খাচ্ছি না, আমি আহুতি দিচ্ছি।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭।।

*(আত্মাতে সংযমরূপ বিবেক-বিজ্ঞান প্রদীপ্ত যে যোগাগ্নি তাতে অপর যোগিগণ সব ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণাদি দশ বায়ুর কার্য আহুতি দেন বা লয় করেন।)*

যত রকমের কর্ম আছে, আর শরীরের ভিতর যে প্রাণশক্তি রয়েছে, যে প্রাণশক্তি আমাদের সব রকম ক্রিয়াকে চালনা করে, ওখানে বললেন ইন্দ্রিয় সংযম, আর এখানে বলছেন আত্মসংযম, অর্থাৎ সমস্ত কর্মের সংযম করে নিচ্ছেন। যিনি যোগী, তিনি যত রকম কর্ম করেন, সেখানে তিনি নিজেকে আটকে দিলেন। কোন দিকে তাঁর বিস্তার নেই। বলছেন, *আত্মসংযমযোগাগ্নৌ*, ওখানে ছিল শুধু সংযম অগ্নি আর এখানে আত্মসংযম রূপ অগ্নি, এখানে সমস্ত কিছুকে সংযম করে নিচ্ছেন। কারা এই যজ্ঞ করেন? বলছেন, *জ্ঞানদীপিতে*, যাঁদের বিবেক বিজ্ঞান প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, যিনি বুঝে গেছেন আমাকে আত্মজ্ঞান পেতে হবে, যিনি জেনে গেছেন এই সংসারে আমার হারাবার কিছু নেই আর এই সংসার থেকে আমার পাওয়ারও কিছু নেই। এই বোধ যাঁর এসে গেছে, তিনি শুধু ইন্দ্রিয় সংযম করেন না, তিনি সব কিছুকে সংযম করে নেন। তাঁর শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় না, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সব কিছুকে সংযম করে নেন।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮।।

*(অন্য কেউ কেউ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপোরূপ যজ্ঞ এবং কেউ কেউ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি যোগরূপ যজ্ঞ করেন। অপর কোন কোন দৃঢ়ব্রত যত্নশীল যোগী বেদাভ্যাস (শাস্ত্রপাঠ) ও শাস্ত্রার্থনিশ্চয়স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন।)*

*সংশিতব্রতাঃ*, যাঁরা দৃঢ় ভাবে চেষ্টা করছেন। এখানে পর পর বলছেন, কিভাবে বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ হয়। প্রথমে দ্রব্যযজ্ঞের কথা বলছেন, আমরা যখন কোন জিনিস দিয়ে যে দান করছি, এটা হল দ্রব্যযজ্ঞ। শ্রীশ্রীমা গ্রাম্য ভাষায় খুব সুন্দর বলছেন, যার আছে মাপো, যার নেই জাপো। তোমার যদি অনেক টাকা-পয়সা থাকে তাহলে তুমি দান কর, তোমার টাকা পয়সা সেই রকম নেই,

তুমি জপ করে যাও। তীর্থে গেলে দান করতে হয়, কোন শুভক্ষণ হলে দান করতে হয়। প্রতি বছর দূর্গাপূজা আসে, দূর্গাপূজাতে আমরা কত টাকা নিজের উপর খরচ করি। নূতন জামা-কাপড়, নূতন ধরণের ডিজাইনের শাড়ী, পোশাকের জন্য কত টাকা খরচ করছি, কিন্তু আমাদের যে দান করতে হবে, সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না। কত রিলিফ ফাণ্ড আছে, প্রাইমিনিস্টার রিলিফ ফাণ্ড আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফ ফাণ্ড আছে। আচ্ছা না হয় ওখানে দান করলে কেউ আমার নাম জানতে পারবে না, আপনি পাড়াতেই দিন। যেখানে দশ হাজার টাকার জামা কাপড় কিনতে যাচ্ছেন, সেখানা টাকাটা একটু কম করে দিন, নয় হাজার টাকার মধ্যে বাজেট করে এক হাজার টাকা বাঁচিয়ে রাখুন। সেই টাকায় সস্তা শাড়ি কেনে লোকেদের উপহার দিন। কিন্তু কেউ করে না। টাকা-পয়সা থাকলে দ্রব্যযজ্ঞ সবাইকে করতে হয়। দ্রব্যযজ্ঞ করলেও আপনি শুদ্ধ হবেন। জীবনকে যদি ধন্য করতে চান, দ্রব্যযজ্ঞ করুন।

দ্রব্যযজ্ঞের পর আসছে তপোযজ্ঞ। বিভিন্ন ভাবে তপস্যা করা যায়, রাজযোগে অনেক রকম তপস্যার কথা বলা হয়েছে, প্রাণায়ম করা, প্রত্যাহার কর, নিজের ইন্দ্রিয়াদিকে সংযম করা। এগুলো অবশ্য তপস্বীরা করেন, সবাই পারবেন না। তবে যতটা পারা যায় করা ভাল। বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে ইয়ং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা বলেন, আমরা আজ জপযজ্ঞ করছি। বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীরা জপযজ্ঞে সারা রাত, বিশেষ করে শীতের সময় জপ করবেন। তবে বাই টার্ন করেন, একটা দল দু ঘন্টা করল, এরপর আরেকটা দল দু ঘন্টা করল, এইভাবে সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত জপযজ্ঞ চলতে থাকে। তার মধ্যে অনেকে টানা সারা রাত বসে থাকেন। কিন্তু এখানে তপোযজ্ঞ বলছেন, তপোযজ্ঞ হল সারা জীবন তপস্যা করে যাচ্ছেন।

*স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ*, সারাদিনে নির্দিষ্ট একটা সময় নিয়মিত রোজ শাস্ত্র পাঠ করা, এটাকে বলে *স্বাধ্যায়যজ্ঞ*। সকাল আটটা বাজল, এখন আমি গীতা পাঠ করব, বা চণ্ডী পাঠ করব, বা কথামৃত পাঠ করব বা যিনি যে শাস্ত্রকে অনুসরণ করে থাকেন সেই শাস্ত্র রোজ নিয়মিত পাঠ করছেন, এটা হল *স্বাধ্যায়যজ্ঞ*। দিনের পর দিন এই স্বাধ্যায়যজ্ঞ যদি করে যান, এতেও জীবন ধন্য হয়ে যায়। নিজের জীবন যদি ধন্য করতে চান, নিজেকে যদি কৃতার্থ করতে চান, কৃতকৃত্য যদি করতে চান, তাহলে স্বাধ্যায়যজ্ঞ করলেও হবে। তার সাথে বলছেন, *জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ*, শাস্ত্রের অর্থ অনুধাবন করা, ধারণা করা, আমরা যে গীতার ব্যাখ্যা শুনছি, এটা স্বাধ্যায়যজ্ঞ না, এটা জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে আমরা গীতার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছেন। এখন নিয়মিত যদি না হয়, একদিনই হল, মন্দের ভাল। *সংশিতব্রতাঃ*, যাঁরা এগুলো পারেন না, তখন তাঁরা বিভিন্ন ব্রত করছেন, যেমন বিহারের লোকেরা ছট করে, ছট একটা ব্রত, এটা পূজা না। কেউ একাদশী ব্রত করছেন, চান্দ্রায়ণ ব্রত করছেন, এই ধরণের নানা রকমের ব্রত করছেন, এদেরকে বলছেন *সংশিতব্রতা*।

এই আটাশ নম্বর শ্লোকটা সবারই মুখস্ত করে নেওয়া উচিৎ, নিজের জন্য তো বটেই অপরের জন্যও খুব দরকার। আমরা এটাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ রূপে খুব সহজ করে বলেছি ঠিকই। *সংশিতব্রতাঃ*, যাঁরা যত্নশীল। এটা আমাদের দেখতে হবে যে, এগুলো যেন নিয়মিত হয়। বা আরও সহজ ভাবে নিতে হলে পঞ্চ মহাযজ্ঞের যে কথা বলা হয়েছিল, সেটাও করা যেতে পারে। যজ্ঞ যদি না করা হয়, তাহলে আমাদের জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। জীবনকে যদি ধন্য করতে হয়, আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে যদি একটা মহৎ জীবনে রূপান্তরিত করতে চাই, আমরা যদি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে যেতে চাই, তাহলে যজ্ঞ করতে হবে।

লোকেরা কথায় কথায় বলে, কবে ঠাকুর কৃপা করবেন, কোন দিন করবেন না। কিছু কি করেছেন জীবনে? ঠাকুর হলেন বড় হাওয়াই জাহাজ, জাম্বো জেট প্লেন, এই প্লেন যে নামবে, তার জন্য দরকার একটা বড় রানওয়ে। বড় প্লেনকে যেখানে সেখানে নামানো যাবে না। জিটি রোডে কি

প্লেন নামানো যাবে? কত অটো, টোটো, রিক্সা, স্কুটার এই ভিড়ের মধ্যে প্লেন কি কর নামবে, প্রশ্নই নেই! প্লেন আসবে, মাথার উপর কয়েকটা চক্কড় মেরে বলবে, এখানে নামা যাবে না, ঘুরে চলে যাবে। ঠাকুর আসেন, কিন্তু আমাদের মনের রানওয়েটা দেখে আবার উড়ে ফেরত চলে যান। যেখানে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা থাকে, সৈন্যরা গিয়ে প্রথমে ওখানে একটা রানওয়ে তৈরী করে, যুদ্ধের প্লেনগুলো যাতে ওঠা-নামা করতে পারে। আত্মজ্ঞান বা ঠাকুর হলেন বড় জাম্বো প্লেন, যেখানে সেখানে নামতে পারেন না। নামার জন্য লম্বা রানওয়ে দরকার। আমার আপনার যে সঙ্কীর্ণ মন, এখানে বাচ্চাদের যে কাগজের প্লেন ছাড়া হয়, এটাই নামতে পারবে।

*যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ*, নিজেকে যে তৈরী করবেন, সেই চেষ্টা কোথায় করছেন? আপনাকে যতি হতে হবে, ব্রত উপোস করে করে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। দ্রব্যযজ্ঞ করতে হবে, তপযজ্ঞ করতে হবে, জ্ঞানযজ্ঞ করতে হবে, স্বাধ্যায়যজ্ঞ করতে হবে, এর মধ্যে যে কোন একটা করুন, কিছু একটা তো করুন। কিছু একটা করে আগে আপনার রানওয়েটা তৈরী করুন। ঠাকুর সব সময় আসছেন, কিন্তু তিনি নামার জায়গা পাচ্ছেন না, কয়েকটা চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এটা ঠিক যে, ঠাকুরের জ্ঞান যাঁর হয়ে যাবে, তিনি অনেকেরই উদ্ধার করতে পারবেন। ঠাকুর বাহাদুরী কাঠের কথা বলছেন, বাহাদুরী কাঠ না হলে কাউকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের সংযমের কথা বললেন, বা বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আহুতি রূপে দেওয়া হচ্ছে বা সমস্ত কিছুকে নিজের ভিতরে নিয়ন্ত্রণ করে নিচ্ছে বা এই আটাশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন, দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, তার সাথে স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, *যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ*, জীবনকে যিনি ধন্য করতে চাইছেন, তাহলে এগুলো করুন। এগুলো সব কটা একসাথে করার দরকার নেই, যে কোন একটাকে ঠিক করে সেটাই করতে থাকুন। আরও যজ্ঞ আছে, আগেকার দিনে যোগী অনেক ছিলেন, বিভিন্ন যোগী বিভিন্ন ভাবে যজ্ঞ করতেন, এটাই পরের শ্লোকে বলছেন –

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।২৯।।

*(অন্যান্য যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু (পূরক প্রাণায়াম) এবং প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দিয়ে (রেচকনামক প্রাণায়াম করে) প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি রোধপূর্বক কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন।)*

কোন কোন যোগী আবার প্রাণায়ামের সময় নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছেন, তখন সেই নিঃশ্বাসকেও তিনি আহুতি দিচ্ছেন, যজ্ঞ হয়ে গেল। বাইরে নিঃশ্বাসকে ফেলছেন, এটাও একটা যজ্ঞ। প্রাণ বায়ু হল যেটা বেরিয়ে যায়, যে বায়ু ভিতরে যায় সেটাকে অপান বায়ু বলে। প্রাণায়ামের তিনটে ধাপ পূরক, রেচক ও কুম্ভক – শ্বাস ছাড়া, শ্বাস ভিতরে নেওয়া আর বায়ুকে ভিতরে বা বাইরে ধরে রাখা। কেউ রেচক করে, কেউ পূরক করে আবার কেউ কুম্ভক করে। যোগীরা বিশেষ করে যাঁরা হঠযোগ করেন, তাঁরা এগুলোর অনুশীলন করেন। ভগবান বলছেন, যাঁরা প্রাণায়ামাদি করেন তাঁরাও এটাই করেন। নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, এটা একটা আহুতি; যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছেন সেটাও একটা আহুতি, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া দুটোকেই যদি বন্ধ করে দেন, সেটাও একটা আহুতি।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষঃ।।৩০।।

*(অন্য কোন কোন যোগী আহার-সংযমপূর্বক প্রাণবায়ুসমূহে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন অর্থাৎ যে যে প্রাণবায়ু জয় করেন, সেই সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু হোম করেন। এই সকল যজ্ঞের জ্ঞাতা ও কর্তা যজ্ঞ দ্বারা পাপমুক্ত হন।)*

আবারা অনেকে আছেন, যাঁরা এসব কিছু না করে শুধু নিজের আহার, খাওয়া-দাওয়াকে সংযমিত করেন, এই ধরণের যোগীদের বলা হয় *নিয়তাহারাঃ*; খাওয়া-দাওয়াটা খুব মেপে করেন। প্রাণশক্তি যেটা শরীরের ভিতরে কাজ করে, অনেক যোগী আছেন যাঁরা ওটাকেই হবন করেন। আমাদের শরীরে প্রাণশক্তি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে, বিশেষ করে পাঁচ ভাবে প্রাণশক্তি শরীরে কাজ করে, এবং সেই প্রাণশক্তির আলাদা আলাদা নাম, যেমন, প্রাণ, আপান, সমান, উদান এবং ব্যায়ান। এই যোগীরা এইভাবে হবন ক্রিয়া দ্বারা এক একটা প্রাণশক্তিকে জয় করে নেন। এই পাঁচটি প্রাণশক্তিকে জয় করে নেওয়ার ফলে তাঁদের শক্তিও সেই রকম হয়ে যায়। এই দুটো শ্লোকে যোগীদের কথা বলছেন।

*সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ*, এই ধরণের যোগীরা, যাঁরা এই সব যজ্ঞ করেন, তাঁরা সবাই যজ্ঞের মর্ম বোঝেন। সেইজন্য তাঁরা ক্রিয়া দ্বারা যা কিছু করেন, এই ধরণের যজ্ঞ করে তাঁদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি কি চান আপনার পাপের নাশ হয়ে যাক? আপনি হয়ত বলতে পারেন, আমি তো কোন পাপ করি না, পাপের আবার নাশ কি করে হবে। খুব ভাল, এই বোধ থাকাটাও ভাল। কিন্তু যদি মনে হয়, আপনার ভিতরে কিছু কল্মষ রয়েছে, আপনি কি সেটাকে নাশ করতে চান? তাহলে পর পর এতক্ষণ যত যজ্ঞের কথা বলা হলে, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা যজ্ঞকে ঠিক করে বলুন, আমি এই যজ্ঞ রোজ করবই করব। রোজ দান করুন, রোজ দান করে দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান; কর্ণ যেমন দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সকালে এসে ব্রাহ্মণ যা চাইবে আমি দান করে দেব, এটাই তো দ্রব্যযজ্ঞ; রোজ একটা শাস্ত্রকে পারায়ণ করে পাঠ করুন, এটাই হয়ে যাবে স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বা শাস্ত্রের অর্থ বুঝে সেই অর্থের উপর গভীর ভাবে চিন্তন করুন, নয়তো ধ্যান করুন, এটাই হয়ে যাবে জ্ঞানযজ্ঞ। একটা কোন যজ্ঞে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। যদি না প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে ওই বিশাল বড় বড় জাম্বো জেট প্লেন নামতে পারার মত লম্বা রানওয়ে তৈরী হবে না, যেখানে আত্মজ্ঞান রূপী প্লেন নামতে পারবে।

*যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ*, এই যজ্ঞ দিয়ে যাঁদের সমস্ত পাপ নাশ হয়ে গেছে এবং তাঁরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছেন। ঠাকুর প্রচলিত ভক্তিভাবে বলছেন, একবার দূর্গা নাম করেছি আমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছি। ভক্তির স্তুতির জন্য এসব কথা বলা হয়, কিন্তু ঠিক ঠিক শুদ্ধ পবিত্র হওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। একজন প্রশ্ন করলেন, আমি যদি শুদ্ধ আত্মা হই, আমি যদি সচ্চিদানন্দ হই, তাহলে আমার সাধন-ভজন করার কি দরকার? আপনি তাহলে নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবুন তো, আমি জানি আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু বহির্জগতের সাথে আমার আচরণ কি সেইভাবে হচ্ছে? দেখবেন, হচ্ছে না। এগুলো সব মুখের কথা, মুখের কথা দিয়ে আত্মজ্ঞান হয় না। একটা বড় বিল্ডিং দেখে আমরা ভুলে যাই, মাটির তলাতেও সে কত বিস্তৃত হয়ে আছে। আত্মজ্ঞান হল সেই রাজপ্রাসাদের বিল্ডিং, ওর পিছনে কত আত্মত্যাগ, কত তপস্যা, কত বলিদানের ইতিহাস হয়ে আছে আমাদের জানা নেই, আমরা শুধু উপরটা দেখে যাচ্ছি। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১।।

*(যথোক্ত যজ্ঞসমূহ সম্পাদনপূর্বক অন্তে বিহিত অমৃত নামক অন্ন যাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভোজন করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোকই নাই, সর্ব-লোকাতীত আত্মজ্ঞান লাভ তো দূরের কথা।)*

যজ্ঞ সম্পাদন করার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে, তাকে যজ্ঞশিষ্ট বলে আবার অমৃতও বলে, ইদানিং কালে এটাই হয়ে গেছে প্রসাদ, পূজার পর আমরা যেটা প্রসাদ রূপে গ্রহণ করি। আগে প্রসাদের এই ধারণা ছিল না, তখন ছিল যজ্ঞ এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট বা যজ্ঞশিষ্ট। এটাকেই আবার

যজ্ঞশেষ বলা হয়, যজ্ঞশেষ যা অমৃতও তাই। আপনি সাধনা রূপে যজ্ঞ করলেন, যে যে যজ্ঞের কথা বলা হল, সেই সাধনা বা যজ্ঞের যে ফল, এই ফলকে বলা হয় অমৃত। মানুষ যখন ওই অমৃতকে গ্রহণ করে আস্বাদ করে, তখনই সে ব্রহ্মকে লাভ করে। চিত্তশুদ্ধি না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যায় না। চিত্তশুদ্ধি করা মানে, নিজেকে বৃহতের সাথে জুড়ে দেওয়া। নিজেকে যদি কেউ বৃহতের সাথে জুড়তে চায়, সেইজন্য তার দরকার অমৃত সেবন করা। শাস্ত্রে বা পুরাণে বর্ণনা আছে, দেবতারা অমৃত লাভ করলেন, দেবতারা অমৃত পান করে অমর হয়ে গেলেন। স্বর্গের এই অমৃত বলে কিছু হয় না, যজ্ঞের যে অবশিষ্ট, এটাই অমৃত। এই অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ হয়। মহাভারতে কচ ও দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কাহিনী আছে, সেখানে অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য বলছেন, আমি দানবদের জন্য অমৃত পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজের মেয়ে দেবযানীকে বলছেন, দেখো, আমার কাছে একমাত্র আত্মজ্ঞানই আছে, আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আত্মজ্ঞানকেই বলছেন অমৃত, যেটা যজ্ঞ অবশিষ্ট। যে যজ্ঞ করে না তাদের কি হয়?

*নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম*, সে এই জীবনেই সুখ পায় না। আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন, জীবনে এত অশান্তি কেন? আমরা হলাম বাঁধন ছাড়া বাছুর, শুধু দৌড়ে বেড়াচ্ছি, এছাড়া কিছু নেই, কোন যজ্ঞ নেই, তার সাথে কোথাও কোন সংযম নেই। এতদিন আমরা বলে এসেছি, আমার সময় কোথায় যে কিছু করব, কিন্তু করোনার দৌলতে ভগবান যখন আমাদের অফুরন্ত সময় দিয়েছিলেন, আমরা তখন কি কিছু করেছিলাম? কিছুই করিনি, কারণ আগেও আমাদের কিছু ছিল না। আমাদের পুরো জীবনটা হয়ে আছে বহির্মুখী, ঘরবন্দী হয়ে তাই আমাদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। ইয়ং ছেলেমেয়েদের জন্য বহির্মুখী হওয়াটা ঠিক আছে, তারা নিজেদের অভিব্যক্ত করতে চায়, চাকরী করতে চায়, বাইরে যেতে চায়। কিন্তু যাদের পঞ্চাশ ষাট বছর হয়ে গেছে, খেলে হজম হয় না, আপনি কিসের জন্য দৌড়াতে চাইছেন? লকডাউনের জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করতে পারছিলেন না, মন খারাপ। আসলে আপনার সেই ট্রেনিং নেই, যে ট্রেনিং দিয়ে প্রথম জীবনেই নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়। ট্রেনিং নেই বলে শাস্ত্র পড়েননি, শাস্ত্রের অর্থকে নিয়ে চিন্তন করেননি, চিন্তন করার পর সেই অনুসারে যে জীবন চালানোর কথা, সেইভাবে জীবনকে চালাননি, কোন চেষ্টাও করেননি। আজকে যখন বিপদ এসে গেছে, তখন আপনি কান্নাকাটি করছেন।

ভগবান বলছেন, যে যজ্ঞ করে না, *নায়ং লোকহস্ত্যযজ্ঞস্য*, সে এই জীবনেই সুখ পায় না। যে এই জীবনেই সুখ পায় না, *কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তমঃ*, পরলোকে গিয়েও তার কিছু হয় না। আমরা ভাবি মৃত্যুর পর ঠাকুর আমাদের নিয়ে যাবেন, ভাল কোথাও রাখবে, এই আশাতেই থাকুন। ইংরাজীতে খুব সুন্দর বলা হয়, fool's paradise, মুর্খের স্বর্গ, ঠাকুর একটা মুর্খদের স্বর্গ তৈরী রেখেছেন, সেখানে সব মুর্খদের নিয়ে একসাথে রেখে দেবেন, নে তোরা খুব আনন্দ কর। যে যজ্ঞ করে না, পরলোকের কথা ছেড়ে দাও, এই জীবনেই সে কোন সুখ পায় না।

ব্যাধ প্রতিদিন জাল বিছিয়ে ফাঁদ পাতে, আর ওই ফাঁদে পড়ে টিয়া পাখিগুলো ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে যায়। এক সাধুবাবা সব দেখার পর টিয়া পাখিগুলির জন্য তাঁর করুণার উদ্রেক হয়েছে। তিনি টিয়া পাখিগুলিকে শিখিয়ে দিলেন, 'দেখ, শিকারী আসবে, জাল বিছাবে, ওর মধ্যে দানা ছড়াবে, দানার লোভে তোমরা ফেঁসে যেও না'। টিয়া পাখিরা শুনে নিজেদের খুব ধন্য মনে করতে লাগল, আমাদের আগের বন্ধুরা ভুল করে ফেঁসে গিয়েছিল, আমরা আর ফাঁসব না। সবাই সাধুবাবার কথা খুব ভাল করে মুখস্ত করে নিয়েছে। পরের দিন যথারীতি ব্যাধ এসেছে। পাখিগুলি একসাথে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, 'শিকারী আসবে'। ব্যাধ শুনে ভয় পেয়ে গেছে, পাখিরা সব জেনে গেল। ব্যাধ জাল বিছিয় দিতে গেল, পাখিরাও একসুরে বলতে লাগল, 'জাল ছড়াবে'। ব্যাধ খুব ঘাবড়ে গেছে, 'পাখিগুলি সব জেনে গেল কি করে'? তারপর বলল, 'দানা ছড়াবে'। ব্যাধও দানা ছড়াতে লাগল। পাখিরা তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'লোভে পড়ে ফেঁসো না'। বলেই, সব পাখি ঝাঁকে

ঝাঁকে দানা খেতে জালের মধ্যে নেমে গেল। পরে সাধুবাবা এসে দেখছেন সব টিয়া পাখিগুলি ব্যাধের জালে ফেঁসে আছে, আর জোরে জোরে বলে যাচ্ছে, 'শিকারী আসবে, জাল বিছাবে, দানা ছড়াবে, লোভে পড়ে ফেঁসো না'। শাস্ত্র পড়ে, শাস্ত্র শুনে আমাদেরও টিয়া পাখির মত অবস্থা।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২।।

*(বেদমুখে এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই সকলকে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত বলে জানবে। ''আত্মা নিষ্ক্রিয়; আমি সেই উদাসীন আত্মা, এসব ব্যাপারে আমার নয়'' —এরূপ আত্মজ্ঞান হলে শুভাশুভরূপ সংসার থেকে মুক্ত হবে। আত্মজ্ঞ পুরুষ নৈষ্কর্ম-সিদ্ধ।)*

বারো ধরণের যজ্ঞের কথা বলে ভগবান এবার বলছেন, এই যে এত ধরণের যজ্ঞ, *ব্রহ্মণো মুখে*, অর্থাৎ বেদে এই ধরণের অনেক রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যেমন অগ্নিতে যে যজ্ঞের আহুতি দেওয়া হয়, যেটাকে দৈবযজ্ঞ বলা হল, সেটাতো আছেই, তাছাড়াও অনেক ধরণের যজ্ঞের কথা বলা আছে। কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞ, *কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে*, তিন ভাবে করা হয়, কায়িক, মানসিক ও বাচিক; শরীর দিয়ে করা হয়, মন দিয়ে করা হয় আর বাক্ দিয়ে করা হয়। আত্মা দিয়ে কোন যজ্ঞ হয় না, অর্জুন তুমি এই জিনিসটাকে ভাল করে বোঝ। সব যজ্ঞ ক্রিয়া দ্বারা হয়, ক্রিয়া থাকলে সেখানে কারক থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর তার একটা ফলও থাকবে। আত্মা এগুলোর পারে। যত যজ্ঞের কথা বলা হয়, এবং এর বাইরে আরও যত যজ্ঞ বেদে বলা হয়েছে, আত্মা এগুলোর পারে। আত্মজ্ঞান আসে একমাত্র জ্ঞান দিয়ে। তাহলে এত যজ্ঞের কথা কেন বলা হল? এগুলো হল শুদ্ধির জন্য, শুদ্ধি যদি না হয় মানুষ ঈশ্বর লাভের পথে, আত্মজ্ঞানের পথে এগোতে পারবে না। যজ্ঞের বর্ণনা করা গীতার উদ্দেশ্য না, এটা বেদের কাজ। কিন্তু মাঝে মাঝে এগুলোকেও আনতে হয়। তাহলে যজ্ঞ করা কেন? এর উত্তর তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলে এখানে বিষয়টাকে শেষ করছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩।।

*(হে পরন্তপ, সংসার-ফলারম্ভক দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞোপসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়।)*

গীতা আবার নিজের স্বরূপে, গীতার যেটা মূল, সেখানে এসে গেলেন। শ্রীশ্রীমা যেমন বলছেন, যার আছে মাপো, যার নেই জাপো, এখানেও তাই বলছেন। *শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ*, সাধনার দ্বারা যে যজ্ঞগুলি সিদ্ধ হয়, সেগুলো দ্রব্যযজ্ঞ থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। আপনার অনেক আছে আপনি দান করুন, ঠিক আছে; কিন্তু মন দিয়ে যে যজ্ঞগুলি হয়, উদ্দেশ্য হল সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। জ্ঞানযজ্ঞ হল শাস্ত্রের অর্থটা বোঝা, কারণ শাস্ত্রের অর্থটা যদি বুঝে নেওয়া হয়, তাহলে সাধনা করা অনেক সুগম হয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি। কি সিদ্ধি হয়? জপ করতে করতে মনের শুদ্ধি হয়, সেই শুদ্ধ মন দিয়ে তখন ধ্যান হয়। সেই ধ্যান থেকে ঠাকুরের স্বরূপ জ্ঞান হয়, স্বরূপ জ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ মুক্তি হয় না, সিদ্ধি হয় না। ঠাকুরও বলছেন, কলকাতার ওই মেয়েরা লক্ষ লক্ষ জপ করে, কিন্তু কই কারুর তো কিছু হয় না। এখানে এটাই বলছেন, দ্রব্যযজ্ঞ বা আরও যে যজ্ঞ আছে, সবার থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযজ্ঞ কি? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শাস্ত্রের অর্থটা বোঝা, বুঝে ধারণা করা এবং ধারণা করে অর্থকে মনন করা।

তার সাথে বলছেন, *সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে*, যত যজ্ঞ রয়েছে, যত জপ রয়েছে, যত ধ্যানের চেষ্টা রয়েছে, সব কিছু পরিপূর্ণ হয়ে যায় জ্ঞানে এসে। কোন জ্ঞানে? ব্রহ্মজ্ঞানে,

২৪ নং শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে মূল জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে বলা হয়েছিল – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্,* যে অবস্থায় গিয়ে দেখে সব কিছুই ব্রহ্ম –আমি কথা বলছি, আমি ব্রহ্ম, আমার কথা গুলো ব্রহ্ম, এই মাইক্রোফোনটা ব্রহ্ম, মাইক্রোফোনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যারা শুনছেন তাঁরাও ব্রহ্ম, এই যে কর্ম করা হচ্ছে এটাও ব্রহ্ম, এই পুরো কর্মের যে ফল হবে শ্রোতা আর বক্তার উভয়ের, সেটাও ব্রহ্ম। এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম যজ্ঞ। যিনি জ্ঞানযজ্ঞ করে যাচ্ছেন, তাঁর এই যজ্ঞ সব কিছুর উপরে চলে যায়, সমস্ত কিছুকে তিনি জয় করে নেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ক মুনির খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, আগেকার দিনে একটা খেলা হত, সেখানে যে সত্যযুগের ঘুঁটি পেয়ে যে, সে সব কিছু পেয়ে যেত এবং খেলা জিতে নিত। জ্ঞানযজ্ঞ করলে এই যে বিভিন্ন রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়, এগুলোর কোনটাই আর করতে হয় না। শাস্ত্রের অর্থ যদি কেউ ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারে, তাহলে যত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, বেদে যত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সব কটার ফল স্বাভাবিক ভাবেই সে পেয়ে যাবে।

অর্জুনের মনে হতে পারে যে, ভগবান তো সেই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে খুব জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু এই জ্ঞান পাওয়া যাবে কি করে? তাই ভগবান বলছেন –

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।

*(যে বিধি দ্বারা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বলছি, অবগত হও। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন।)*

এই শ্লোক থেকে আমরা আলোচনা করব আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়, এবং আত্মজ্ঞান হলে কি হয়। আগে আগে আলোচনা হয়েছিল, আগেকার দিনে মঠ, আশ্রমাদি কম ছিল, সেইজন্য যাঁরা সন্ন্যাসী হতেন, তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। বলা হয় যে, শরীর চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে নিতেন, সেখানেও তাঁরা কোন সঞ্চয় করতেন না। ঠাকুরও কথামৃতে বলছেন, পঞ্ছি অউর দরবেশ সঞ্চয় করে না, সন্ন্যাসী সঞ্চয় করবে না। এই শরীর নির্বাহ সবাইকেই করতে হবে, একজন গৃহস্থকেও করতে হবে, একজন সন্ন্যাসীকেও করতে হবে। যিনি ঠিক ঠিক হিন্দু, যিনি ঠিক ঠিক শাস্ত্র বোঝেন, এই সংসারে তাঁর কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা থাকবে না। টাকা-পয়সার প্রতি স্পৃহা থাকবে না, জীবনের প্রতি স্পৃহা থাকবে না। জীবনের প্রতি স্পৃহা যদি না থাকে তাহলে কি মরে যেতে চাইছি? কখনই না, মৃত্যুর প্রতিও কোন স্পৃহা থাকবে না। যিনি জ্ঞানী, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে জীবন যেমন, মৃত্যুও তেমন। আর আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে জীবনও যা, মৃত্যুও তাই।

তাহলে সাধারণ মানুষ যারা তারা কেন কাজ করেন? আসলে প্রত্যেকটি কাজের একটিই উদ্দেশ্য, তা যে কোন কাজই হোক না কেন –জ্ঞান অর্জন। বাচ্চারা খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে একটা সময় তার আর ওই খেলনা নিয়ে খেলতে ভাল লাগে না, নূতন একটা খেলনা দেখলে পুরনো খেলনাটা ফেলে নূতন খেলনার দিকে চলে যাবে। আমরা মনে করি বাচ্চাদের মন চঞ্চল, তাই নূতন নূতন খেলনা চায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরাও একজনের সাথে থাকতে পারে না, কিছু দিন পর পরই সঙ্গী বদলাতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে এদের মন চঞ্চল, কিন্তু এর আর-একটা দিক আছে, সেই দিকটা হল, সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য একটাই, জ্ঞান লাভ। আমরা মনে করি, আমরা কাজ করছি অর্থ উপার্জনের জন্য, উপার্জনের জন্য বলছি, আসলে আমরা সঞ্চয় করি। আমরা যে ভালবাসি, সেখানে বলি আমার যে ইমোশান ডানদিক বামদিক যাচ্ছে, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। কিন্তু না, সেখানেও উদ্দেশ্য হল জ্ঞান লাভ। এই সংসারে জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের শরীরটাকে রাখতে হয়। শরীরটা ঠিক রাখার জন্য মন ঠিক রাখতে হয়। শরীর আর মন ঠিক রাখার জন্য কিছু

কিছু জিনিস দরকার হয়। কিন্তু সেখানেও উদ্দেশ্য হল জ্ঞান লাভ। এই জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারলে, আমাদের জীবনে অনেক শান্তি আসবে। যে কোন কাজ করার উদ্দেশ্য একটাই জ্ঞান লাভ।

বাচ্চার কাছে একটা নূতন খেলনা এসেছে, সে দেখতে চাইছে জিনিসটা কিভাবে হয়। যেমনি ভাল করে খেলনার কারুকুরি বুঝে গেল তখন ওই খেলনাই তার কাছে একঘেঁয়ে লাগবে। যে কোন কর্মের উদ্দেশ্যই হল জ্ঞান লাভ। আর যিনি জ্ঞানী হয়ে যান, আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে যায়, তিনি সমস্ত কর্মকে জয় করে নেন। আচার্য এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে একটা উদাহরণ নিয়ে আসছেন – রৈক্ব নামে একজন ঋষি ছিলেন, ওখানকার রাজা একদিন শুনছেন পাখিগুলো '*অথ রৈক্ব*', '*অথ রৈক্ব*' বলতে বলতে উড়ে যাচ্ছে। পাখিরা বলতে চাইছে, যত পূণ্য হচ্ছে সব পূণ্য রৈক্ব মুনির কাছে যাচ্ছে। বিভিন্ন কর্মের যে ফল হয়, সেই ফল থেকে মানুষ অনেক কিছু করে। আমরাও প্রায়ই মনে করি, জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম। স্বামীজীও যখন বলছেন, কাজ করে যা, খেটে খেটে মরে যা, সেখানে স্বামীজী আত্মশুদ্ধির জন্য কাজ করতে বলছেন। সেখানেও কাজটা উদ্দেশ্য না, সেবাটা উদ্দেশ্য, সেবাকার্যের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধিটা উদ্দেশ্য।

সেবা কেন? জ্ঞান লাভ করার জন্য। জ্ঞান অর্জন যদি না হয়, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তাহলে এগুলো সব বেকার। কারণ যে কোন ধর্ম যখন চলে, যে কোন জীবন যখন চলে, তখন সেই ধর্ম বা জীবন একটা সত্যের উপর আধারিত থাকে। সংসারী মানুষ যারা, যাদের কাছে ভোগ হল কুকুর বেড়ালের মত আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। এটাই বেশির ভাগ মানুষের জীবনধারা। তারাই এভাবে বলে, আমি কাজ করতে করতে মরে যেতে চাই। কাজটা উদ্দেশ্য না, আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন, সত্য হল আত্মা, যেখানে দুই নেই, যেটা এক দুইয়ের পারে। কিন্তু যে কোন কর্মে কারকের বিস্তার থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর তার ফল থাকবে, আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি। কর্ম মানে বহু এসে যাচ্ছে, যেটা কখন জীবন-দর্শনের জন্য ঠিক হতে পারে না। সেইজন্য কর্ম কখন জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাহলে কর্ম করাটা বন্ধ করে দেওয়াটাই ঠিক? একেবারেই না। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম, বিভিন্ন রকম যে কর্ম করি, প্রত্যেকটা কর্ম যেন এক একটা যজ্ঞ। এই যজ্ঞ থেকে মন শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধি থেকে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান লাভটাই উদ্দেশ্য। যিনি জ্ঞানী হয়ে যান, তাঁর ভিতরে সমস্ত কর্ম সমাহিত হয়ে যায়। তাঁকে আর কাজ করতে হয় না, কাজের যা যা ফল সেটা তিনি এমনিই পেয়ে যান, তাঁর আর কোন কিছু লাগে না।

ওই জ্ঞানটা কি, যেটাকে লাভ করলে মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে যায়? ওই জ্ঞানটা কি, যেটাকে লাভ করলে মানুষ সব কর্মকে জয় করে নেয়, কর্মের আর কোন স্পৃহা থাকে না, আর কাজ করার কোন দরকার হয় না? আমরা আগে বলেছিলাম, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যাবতীয় যত ভাব, সব সূত্রাকারে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পুরোপুরি কর্মযোগের উপর বললেন। চতুর্থ অধ্যায়ে সন্ন্যাসের দিক থেকে কর্ম কিভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিকে যাচ্ছে, সেটাকে দেখাচ্ছেন। আর পঞ্চম অধ্যায়ে পুরোপুরি সন্ন্যাসে ঢুকে যাবেন। এখান থেকে গীতা এবার কর্মযোগ থেকে কর্মত্যাগের দিকে এগোতে শুরু করছেন। বলছেন, *সর্বং কর্মাখিলং*, অখিল কর্ম অর্থাৎ যত কর্ম আছে সব জ্ঞানে *পরিসমাপ্যতে*, জ্ঞানে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয়ে যায়।

সেই জ্ঞানটা কি? সেই জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যাবে? গীতার মূল উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। যদিও অনেক চিন্তকরা, যাঁরা গীতাকে নিয়ে লিখেছেন, অনেকে তাঁরা মনে করেন গীতার উদ্দেশ্য কর্মযোগ; কিন্তু তা না। গীতার উদ্দেশ্য হল, হয় তুমি জ্ঞান পথ অবলম্বন করে; আমি সেই আত্মা, এই জ্ঞান লাভ কর। আর তা নাহলে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়ে আছেন, এই জ্ঞান লাভ করে, ভক্তিভাব অবলম্বন করে সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর। চৌত্রিশ নম্বর থেকে এবার জ্ঞানকর্মসন্ন্যাস, কিভাবে কর্মকে জ্ঞানে পরিসমাপন করতে হবে, কিভাবে সেই জ্ঞান হবে, এবার পর পর বলতে থাকবেন।

চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, সবাই কি জ্ঞান লাভ করতে পারে, আমি কি ধর্ম লাভ করতে পারি? প্রায়ই আমরা এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করে থাকি, আমাদের মন বসে না, ধ্যান হয় না, জপ হয় না কেন, ইত্যাদি। তাদের জন্য এই শ্লোক। *তদ্বিদ্ধি*, ওটাকে জানো, তোমাকে আগে ওটার ব্যাপারে জানতে হবে। প্রথমে তত্ত্বতঃ জানতে হবে, তারপর উপলব্ধি করতে হবে। তত্ত্বতঃ জানতে হলে আগে গুরু বা আচার্যের সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর। তারপর হাতজোড় করে প্রশ্ন কর, আর গুরুর সেবা কর। এই তিনটে কাজ তোমাকে আগে করতে হবে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা। পরিপ্রশ্ন, যে প্রশ্নগুলি অনেক দিন ধরে আমার ভিতর তোলপাড় করছে।

বেলুড় মঠের একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, খুব বড় পণ্ডিত। ওনাকে কেউ প্রশ্ন করলে উনি বলতেন, 'এগুলো হল technicalities of religion, এটা জেনে তোমার কি হবে, তোমার কি সমস্যা বল'। ধরুন কেউ যদি প্রশ্ন করে, \মহারাজ ঈশ্বর আছেন কি'? এগুলোই হল technicalities of religion, এগুলো জেনে কি হবে? আপনার কি সমস্যা বলুন। স্বামীজী যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয় আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? ওখানে technicalities কিছু ছিল না। আপনি যদি আমাকে এই প্রশ্ন করেন তখন technicalities ব্যাপার এসে যাবে, meaningless questions।

'মহারাজ পঞ্চদশীটা একটু আলোচনা করবেন'? পঞ্চদশী জেনে আপনার কি হবে? আপনার কি সমস্যা সেটা বলুন। 'মহারাজ একটু বিবেকচূড়ামণী যদি আলোচনা করেন'? বিবেকচূড়ামণী, পঞ্চদশী এগুলো আপনি খুলে কোন দিন দেখেছেন? দেখেননি। এগুলো হচ্ছে মুর্খোত্তমদের প্রশ্ন। আগেকার দিনে দোলের সময় কাশীতে একটা প্রতিযোগিতা হত, তাতে মুর্খোত্তম উপাধি দেওয়া হত।

*পরিপ্রশ্ন*, relevant question, এখানে আচার্য বলছেন, *দীর্ঘনমস্কারঃ তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চ অবিদ্যা*, হে গুরু বন্ধন জিনিসটা কি, মোক্ষ জিনিসটা কি, বিদ্যা কি, অবিদ্যা কি, এই ধরণের যে প্রশ্নগুলো এটাই পরিপ্রশ্ন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের ছেলেরাই গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যেত, বাচ্চা বয়স থেকে তারা এই শব্দগুলো বাড়িতে শুনে আসছে, তারাও গুরুর কাছে সেই প্রশ্ন করছে।

*সেবয়া*, গুরুর শুশ্রুষা করা। উপনিষদে, মহাভারতে সত্যকামের গল্প আছে। সত্যকাম গুরুর কাছে এসেছেন, তাঁর বিধবা মা পাঠিয়েছেন। গুরু সত্যকামকে কয়েকটা মূল কথা বলে দিয়ে কিছু গরু দিয়ে বলে দিলেন, এই কটা গরু নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, যখন হাজারটা গরু হয়ে যাবে তখন তুমি আমার কাছে ফেরত আসবে। আরুণীর গল্প আছে, আগেকার দিনে গুরুদের চাষবাশ করার জন্য সামান্য জমি থাকত। একদিন রাত্রিবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, গুরু আরুণিকে বললেন, 'তুমি এখন ক্ষেতে যাও, দেখ আল ভেঙে ক্ষেতে জল ঢুকে ফসল নষ্ট না হয়ে যায়'। আরুণি গিয়ে দেখছে, আল এমন ভাবে ভেঙে গেছে যে, কোন ভাবে জল ঢোকাটাকে আটকানো যাবে না। আরুণি আলের ভাঙা অংশে শুয়ে পড়ল যাতে গুরুর ক্ষেত রক্ষা হয়। সে সারা রাত আশ্রমে ফেরেনি। সকালে গুরু খবর পেলেন, ক্ষেত থেকে আরুণি ফেরেনি। গুরু বাকি শিষ্যদের নিয়ে ক্ষেতে গেলেন। আরুণি ততক্ষণে ঠাণ্ডায় বেহুঁশ হয়ে সেই আলে শুয়ে আছে। গুরু আরুণি আরুণি করে ডাকতে শুরু করলেন। গুরুর আওয়াজ একটু কানে আসতেই কোন রকমে সে আল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল উদ্দালক। গুরু তাকে এমন আশীর্বাদ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান হয়ে গেল।

সত্যকামকে আশীর্বাদও করতে হল না, সত্যকাম নিজে থেকেই সব জ্ঞান পেয়ে গেলেন। তাঁকে ষাঁড়, অগ্নি, পাখি এনারা ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে দিলেন। গুরু সত্যকামকে দেখে বলছেন, 'তুমি

কাকে গুরু করেছ, তোমার চেহারা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঝকঝক করছে'? সত্যকাম খুব বিনীত ভাবে বলছেন, আমি তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না'। সত্যকাম, উদ্দালক এনাদের সবার কি করে জ্ঞান হল? যখন কাজ করা হয়, বিশেষ করে সেবা আদি যখন করা হয়, তখন মনের ময়লাগুলি পুড়ে যায়। আমাদের মনের ভিতরে এত আবর্জনা জমে আছে, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না।

বেলুড় মঠে আমরা যখন জয়েন করতে আসি, তখন আমাদের বেশির ভাগেরই বয়স কুড়ি একুশ হবে, ওই বয়সে ধর্ম আমরা কি আর বুঝব। মহারাজদের জানতাম, মহারাজদের ভালবাসতাম, নিজেদের কেমন স্বাধীন স্বাধীন মনে হত, আনন্দে মহারাজদের সাথে থেকে গেলাম। ধর্ম-টর্ম কিছুই বুঝতাম না, মহারাজরা যা বলতেন অবাক হয়ে শুনতাম। প্রশ্ন কোন দিন করতাম না, কিছু বুঝতামই না, প্রশ্ন কি করব! এতটা বুদ্ধি ছিল যে, প্রশ্ন করতে নেই। কেবল শুনে যেতাম। তখন আরোগ্য ভবন হয়ে গিয়েছিল, যেখানে মঠের খুব প্রবীণ সাধুরা থাকেন। ওনারা বলতেন, 'যে সাধুরা জীবনে প্রচুর কাজ করেছেন, শেষ বয়সে ওনারা অনেক শান্ত হয়ে যান। যাঁরা কাজ করেননি, তাঁরা অশান্ত থাকেন'। তখন আমরা এগুলো বুঝতাম না। পরে বয়সের সাথে সাথে জীবনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, শাস্ত্র পাঠ করেছি, এখন সব কিছু পরিষ্কার, যা শুনেছিলাম এখন সব ঠিক মনে হয়।

দেওঘরে তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, বিদ্যাপীঠে সপ্তাহে তিরিশটা করে ক্লাশ নিতে হত, তার সাথে মঠের দুনিয়ার কাজ। সিনিয়র স্টুডেন্টসদের হস্টেলের ওয়ার্ডেন ছিলাম; স্কুলের পরীক্ষার সিস্টেম, যেটা ওখানকার খুব জটিল ব্যাপার ছিল, সেটা আমাকে পুরোটাই দেখতে হত; ছেলেদের মর্ণিং স্টাডি পুরোটা দেখতাম; তার সাথে কয়লা, সিমেন্ট মঠে সব নিয়ে আনার ব্যাপার আমাকেই দেখতে হত; কোন মহারাজ সেন্টারে আসবেন দেওঘর থেকে যশিডি স্টেশনে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করা, সি অফ্ করা, এই করে করে সব আবর্জনাগুলো পুড়েছে। আমি এখন আতঙ্কিত হয়ে যাই এই চিন্তা করে যে, তখন যদি কাজ না করতাম কি দুরবস্থাটাই না এখন হত। সেবা করলে আবর্জনা গুলি পুড়ে যায়।

আপনি বলবেন, 'গুরু তো আমার কাছে নেই, কি করে আমি গুরু সেবা করব'? সেই ঈশ্বর বহুরূপে আপনার পরিবারে, আপনার সমাজে ছড়িয়ে আছেন, তাদের সেবা করুন। মন্ত্র দীক্ষা পেয়ে গেছেন, করোনার দৌলতে ঘরে বসে এখন শাস্ত্রের কথা শুনতে পারছেন। এটাই তো সময় সমাজের জন্য কিছু করার। শ্রীশ্রীমা বার বার বলছেন, বাবা কাজ করতে হয়। স্বামীজীর সেবামূলক কাজ নিয়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে একটা সময় খুব অশান্তি লেগেছিল। কারণ কথামৃত পড়ে সবাই মনে করতেন, আগে ঈশ্বর দর্শন, কাজ পরে। শ্রীশ্রীমা সেখানে খুব কড়া ভাবে বলে দিলেন, নরেন যা বলছে সেটাই ঠিক।

যাদেরই মধ্যে হতাশার ভাব দেখা যাবে, বুঝতে হবে সে কাজ করেনি। কিন্তু প্রচুর কাজ করেছে, তা সত্ত্বেও ভিতরে হতাশার ভাব রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে মনে তার অদম্য কামনা-বাসনা। আগে বলা হল, কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, কাজ যদি তাকে উপরের দিকে না নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার কাজে কোন গোলমাল আছে। গুরুর সান্নিধ্য যদি পাওয়া যায়, গুরুর যদি সেবা করা হয়, তাহলে মনের আবর্জনা গুলি পুড়ে যায়। আপনি বলতে পারেন, গুরুর সেবা করতে রাজী আছি, সমাজসেবা আমার দ্বারা হবে না। রামকৃষ্ণ ভাবধারায় ব্যক্তি গুরু হন না, এখানে সঙ্ঘই গুরু। সেই সঙ্ঘের সাধুরা সমাজের সেবা করছেন, আপনি কেন করবেন না? আপনার গুরু যাঁর সেবা করছেন, আপনি কেন তাঁর সেবা করবেন না? আপনি যাঁরই শিষ্য হয়ে থাকুন, স্বামী ভূতেশানন্দজী বলুন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলুন, স্বামী গহনানন্দজী বলুন, সবাই কাজ করেছেন।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এক সময় উত্তরকাশীতে দু বছর তপস্যা করলেন। তপস্যা থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আসার পর তাঁকে চেরাপুঞ্জী পাঠিয়ে দেওয়া হল। চেরাপুঞ্জীতে তখন কিছু নেই, একটা শেড আছে, সেখানে মাস্টাররাও আছেন, ছাত্ররাও আছে, উনি একটু আলাদা থাকতেন। একান্তে জপধ্যান করার কোন সুযোগ নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই। মহারাজ শিলংএ গিয়ে সপ্তাহে একদিন ক্লাশ নিতেন, সেখানে যা প্রণামী বা দক্ষিণা পেতেন, সেটা দিয়ে ছেলেদের থাকা-খাওয়া চালাতেন। আর চেরাপুঞ্জী থেকে শিলং পুরো রাস্থাটা হেঁটে যেতেন। আজকে আমরা রাজকোটে ঠাকুরের কত সুন্দর মন্দির দেখছি। এই মন্দির তৈরী করতে গিয়ে মহারাজ একটা একটা করে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এই মন্দির দাঁড় করিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে লোকেদের অনেক মঙ্গল হবে। আপনার গুরুই যদি এত কাজ করতে পারলেন, আপনি কেন করবেন না? উনি তো বিশেষ কোন ব্যক্তির সেবা করতেন না, করতেন শুধু সমাজের সেবা। সমাজের সেবা, বিশেষ করে অপরের সেবা করলে মনের আবর্জনাগুলি চলে যায়। আমরা আসলে প্রচণ্ড অলস, কাজ করতে চাই না। কাজ না করতে চাওয়ার জন্য আমরা কিছু না কিছু একটা বাহানা তৈরী করে নিই। কিছুই যদি না পারেন, পাড়ার চারটে দুস্থ বাচ্চাকে এনে দুধ বিস্কুট খেতে দিন আর তার সাথে এক ঘন্টা বাড়িতে বসিয়ে পড়িয়ে দিন। আপনি অ আ ক খ তো জানেন, সেটাই ওদের শিখিয়ে দিন। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে শুরু হবে। এই শাস্ত্রগুলি তখন বেশি ভাল বুঝবেন। দিনে দু ঘন্টা করে অপরের যদি এই জ্ঞানে সেবা করেন, আমার যিনি গুরু তিনিও সেবা করেছেন, তাই আমি সমাজের সেবা করছি। এতে আপনার ব্যক্তিত্ব খুলবে, জপধ্যান বেশি ভাল হবে। সেবা করলে মানুষ inclusive হয়, হৃদয় খোলে, হৃদয় খুললে তবেই জপধ্যান ভাল হয়।

তখনকার দিনে গুরুর আশ্রমে গিয়ে অধ্যয়ন করতে হত, এখানে তাই গুরুর সেবার কথা বলছেন। তার সাথে বলছেন, আপনার সেবা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তিনি তখন আপনাকে উপদেশ দেবেন। আগেকার দিনে শিষ্যরা গুরুর কাছে থাকত, সারাদিন নানা রকম ফাইফরমাস খাটছে, নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ থাকত, তারই মাঝে মাঝে গুরু একটা দুটো তত্ত্ব কথা বলে দিলেন, তাতেই শিষ্যদের জ্ঞানের দরজাটা খুলে যেত। বৃষ্টির সময় বাইরে যদি একটা বালতি রেখে দেওয়া হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই বালতিটা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলে ভরে যাবে। তারপর যত বৃষ্টি পড়বে, সব জলটাই বাইরে উপচে পড়বে। পাত্রতা আমাদের এত কম যে, জ্ঞান বর্ষণ হলেও আমাদের কোন লাভ হবে না। এই পাত্রতা বাড়ানোর একটা খুব ভাল উপায় হল – গুরুসেবা। যাঁর কাছ থেকে এই পার্থিব জগতের কিছু পাব না, যেখানে কোন প্রত্যাশা নেই, কিছু পাওয়ার আশা নেই সেখানে সেবা করতে হয়। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে সেবা করি, মনে কোথাও একটা প্রত্যাশা আছে, সে বলবে থ্যাঙ্ক ইউ, সে বলবে, আহা তুমি আমাকে কত ভালবাস, এগুলো শোনার জন্য আমরা কাজ করি। যেখান থেকে কোন কিছু পাওয়ার সম্ভবনা নেই, কিছু প্রত্যাশা নেই, সেখানে কাজ করুন। এর ফলস্বরূপ আপনার মধ্যে পাত্রতা বাড়বে।

লিও টলস্টয় এগুলোকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী রচনা করেছিলেন। টলস্টয় কম বয়সে বিরাট বড় জমিদার ছিলেন, বিরাট এ্যস্টেটের মালিক, আর অনেক সার্ফ, মানে কাজের লোক ছিল। কত মেয়ের সঙ্গে যে তিনি জড়িয়ে ছিলেন তার ঠিক নেই। তার সাথে ছিল জুয়ার নেশা। জুয়া খেলে খেলে উনি সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেন। পৈতৃক সম্পত্তি পুরোপুরি নাশ হয়ে গেল। কোন এমন দুর্গুণ নেই যে, যেটা ওনার মধ্যে ছিল না। রাজপ্রাসাদের মত অত বিশাল বাড়িটা বিক্রী হয়ে গেল, চোখের সামনে একজন এসে কিনে নিলেন, ঘরছাড়া হতে হল। তখন ওনার বয়স মাত্র কুড়ি কি একুশ হবে, এই বয়সেই অত বিশাল সম্পত্তি শেষ করে দিলেন। তারপর তাঁর খুব অনুতাপ হতে শুরু হল, এ আমি কি করলাম। এরপরেই টলস্টয়ের জীবনে পরিবর্তন এসে গেল। তারপর তিনি সার্ফদের জন্য, সার্ফ হল বণ্ডেড লেবারের মত, স্কুল চালাতে শুরু করলেন। তাদের বেশির ভাগ

বাচ্চাই হল তাঁর নিজেরই বাচ্চা। টলস্টয়ের যতগুলো বই, ওয়ার এণ্ড পিস্, আন্না কেরিনা, ওনার ভিতরে যে জ্বালা জমে ছিল, যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি এই বইগুলোর মধ্যে তিনি ঢেলে দিয়েছেন। টলস্টয়কে বলা হয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপনাস্যিক। আর পরের দিকে তিনি একজন সেন্ট হয়ে গেলেন। খ্রীশ্চান মূল্যবোধগুলি তাঁর মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে গেল। কিভাবে ঢুকল? তিনি সেবা করতে শুরু করলেন, বিভিন্ন স্তরে সেবা করতে লাগলেন। আর সত্যিই, তাঁর জীবনে এক বিন্দু স্বার্থপরতা ছিল না। তখনকার দিনে তিনি বিশ্বের একজন আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠলেন। স্বামীজীর রাজযোগ তিনি পড়েছিলেন। রাজযোগ পড়ে টলস্টয় মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বলছেন, 'দেখো এই লোকটির চিন্তা-ভাবনা সব কেমন আমার মত'।

এই পরিবর্তনটা তখনই আসে, যখন ধর্ম বিভিন্ন ভাবে আমাদের মধ্যে ঢুকে যায়। *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং*, তখন তোমাকে গুরু উপদেশ দিতে শুরু করবেন। কারণ এই যে সেবা করতে শুরু করলেন, সেখান থেকে পাত্রতা এসে গেল, গুরু বুঝে গেলেন একে উপদেশ দিলে এখন ধারণা করতে পারবে।

গুরু কেমন হবেন? *জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*, যিনি গুরু হবেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞানী হবেন, তার মানে শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর থাকতে হবে। জ্ঞানী অনেকেই হন, আমরা বই পড়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি। বলছেন, যদি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে তত্ত্বদর্শি হতে হবে। তত্ত্বদর্শি মানে, যাঁর নিজের আত্মজ্ঞান হয়েছে, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। ঠিক ঠিক মুক্তি, এক অবতার যখন আসেন তিনি অনেককে মুক্তি দেন, আর অবতারের যাঁরা অন্তরঙ্গ সঙ্গী তাঁরা মুক্তি দেন। ঠাকুর বলে গেছেন, আর-একবার আসতে হবে। এসে চলে গেছেন কিনা আমরা জানি না। বলছেন, তারপরে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। ফেসবুকে প্রায়ই অনেকে লেখেন, গুরু কোথায় পাবো? ভাই তোমার এখনও পাত্রতা হয়নি, এখন আমাদের মত লোকদের দিয়েই তোমাকে চালাতে হবে।

উপনিষদ অবতার মানেন না, ওনারা বলেন তত্ত্বদর্শি। এখন আমরা তত্ত্বদর্শি কিভাবে বিচার করব? বিচার করতে গেলে আবার লোম বাছতে গিয়ে কম্বল চলে যাবে, অমুক ভাল না, তমুক ভাল না, করতে গিয়ে কপালে গুরুই জুটবে না। ওদিক দিয়ে না গিয়ে বরং দেখুন যাঁকে আপনার ভাল লাগে, যাঁকে আপনার পছন্দ হয় তাঁকেই গুরু রূপে বরণ করুন; আর তার সাথে যাঁর আপনার প্রতি কোন স্বার্থ নেই, যিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত নন আর যাঁর জীবন শাস্ত্রকে আধার করে চলছে, উনিই আপনার গুরু, তত্ত্বদর্শি কিনা বিচার করার দরকার নেই। কিন্তু গীতা এভাবে আপোষ করবেন না, গীতা যখন বলবেন, তখন উচ্চতম আদর্শ দেবেন – *জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*, গুরু যিনি হবেন তাঁকে জ্ঞানী হতে হবে, তার সাথে তত্ত্বদর্শি হতে হবে। মুণ্ডকোপনিষদেরও একই ভাব, সেখানেও বলছেন, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, এখানে তৎ বলছেন, সেই নিত্যপদ, যেটা তত্ত্ব, সেটাকে জানার জন্য তুমি একজন শ্রোত্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠম্, যিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না, এই রকম একজন গুরুর কাছে যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানী মানে নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করে একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়েছে, এই জ্ঞান না, শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতে হবে। আর সেই জ্ঞান পরম্পরাগত হতে হবে। পরম্পরাগত মানে, আপনি যে আদর্শ বা মতের অনুগামী, আপনি রামানুজের হন, শঙ্করাচার্যের হন বা মাধ্বাচার্যের হন, সেই পরম্পরার গুরুর কাছেই জ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে যেতে হবে। হঠাৎ করে একজন বলল, আমার ঠাকুরদাও গীতার একটা অনুবাদ করেছিলেন, ওই জ্ঞানটা চলবে না। একমাত্র আচার্য রূপে যাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর কাছেই যেতে হবে। বেদান্তের মতে আচার্যের একটা পরিভাষা আছে, যিনি গীতা, উপনিষদ, অন্তত দশটি উপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং যে মতকে লোকেরা মানে, তবেই তাঁকে আচার্য বলা যাবে। এমনি কেউ গীতার উপর

একটা বই লিখে দিল, বা অনুবাদ করে দিল, তাতে আচার্য হয় না। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *জ্ঞানবন্তঃ অপি কেচিদ্ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলা অপরে ন অতো বিশিনষ্টি*, জ্ঞানবান অনেকেই হন, তবে জ্ঞান যেমনটি ঠিক ঠিক তেমনটি খুব কম লোকই জানে। যিনি *সম্যগ্‌দর্শিনঃ*, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তিনিই আপনাকে জ্ঞান দিতে পারবেন। যে যতটুকু জানে সে ততটুকুই জ্ঞান দিতে পারবে। বলছেন, যদি তিনি এই জ্ঞান দিয়ে দেন, এই জ্ঞান যদি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে?

যজ্‌জ্ঞাত্বা পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫।।

*(হে পাণ্ডব, আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ করলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না; কারণ একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত ভূতসমূহকে স্বীয় আত্মাতে (প্রত্যগাত্মাতে) এবং আমাতে (পরমেশ্বরে, পরব্রহ্মে) দেখতে পাবে।)*

হে অর্জুন, এই জ্ঞান যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমার মধ্যে আর কোন দিন কোন আসবে না। এই যে তোমার মধ্যে মোহ এসেছে, আমি যুদ্ধ করলে আমার আপনজনরা মারা যাবে, এটা আমি সহ্য করতে পারছি না, এতে তোমার ধর্মের হানি হবে; এগুলো হল মোহ। এই যে তোমার ভিতরে তমোগুণ, এই জ্ঞান হয়ে গেলে, এই তমোগুণ আর তোমার ভিতরে আসবে না, তখন তোমার সব মোহের নাশ হয়ে যাবে। তুমি তখন স্পষ্টতঃ জিনিসটা যেমন ঠিক তেমনটা জেনে যাবে। একবার যদি আপনি বুঝে যান, এই জীবনটাই শেষ নয়, এটুকু বুঝতে পারলে বিরাট বড় কৃতিত্ব অর্জন করে নিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছু একটা আছে, মৃত্যুর পরে আমি কোন না কোন ভাবে থাকব, এই বোধটা যদি কারুর এসে যায়, সে বিরাট কিছু হয়ে গেল, এখন সে আর সাধারণ কেউ নয়। আর একজন জ্ঞানীর মত যদি আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে সে একজন সাধুপুরুষ। তার হয়ত আত্মজ্ঞান না হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এসে গেছে।

একটা হরিণ খুব বেগে দৌড়াতে পারে, চিতাবাঘও খুব বেগে ছুটতে পারে, সেখানে একটা ছোট্ট পাখি প্রথমবার ডানায় ভর করে উড়তে শুরু করল, কিন্তু একটু গিয়েই পড়ে গেল, সেই পাখির উপর হরিণ হাসতে পারে, কিন্তু পাখিটার গুণগত পরিবর্তন হয়ে গেছে, কারণ সে মাটিকে ছেড়ে দিয়েছে। এরপরে সে সুপারসনিক জেট বা ভারতের যে নূতন মিসাইল সিক্স ম্যাক, ধ্বণির গতির ছয় গুণ বেশি গতিতে যাচ্ছে, তাই না, এসকেপ ভেলসিটি রকেট বানিয়ে দেবে, কারণ সে মাটিকে ছেড়ে দিয়েছে। সেও মাটি ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন নূতন উড়ছে এবং পড়বেও, গতি থাকবে না, যারা মাটিতে আছে তারা তাকে দেখে হাসবে। বলবে, কেন মাটি ছাড়ার চেষ্টা করতে গেলে বাপু। কিন্তু তারা জানে না, তার জাতটাই আলাদা হয়ে গেছে। কারণ তার মধ্যে অসীম শক্তি জাগ্রত হওয়ার সম্ভবনা এসে গেছে। সেই দরজাটা খুলে গেছে, যেখান দিয়ে সে অসীম শক্তিকে প্রাপ্ত করে নিতে পারবে। সেই জ্ঞানটা কি?

এখানে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *কিং চ ভূতানি অশেষেণ*, সমস্ত যত ভূত, যত প্রাণী আছে, কি রকম, *ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্যন্তানি*, সেই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ঘাসের একটা ছোট্ট টুকরো পর্যন্ত যা কিছু আছে *দ্রক্ষ্যসি আত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানি ইমানি ভূতানি ইতি*, সাক্ষাৎ তুমি দেখবে সব তোমার হৃদয়ে বাস করে, তুমি সাক্ষাৎ দেখবে, তোমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। আমি বলতে পারব না, যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় শঙ্করাচার্যের এই কথা কতটা স্পর্শ করেছে। মন শান্ত করে, একান্তে বসে যদি একটু গভীরে গিয়ে এই কথাগুলো চিন্তা করেন, আপনার শরীর মনে ইলেক্ট্রিক শক্ লাগবে। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের থেকে শুরু করে, ইদানিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে যত নামকরা ক্রিমিনাল আছে, সন্ত্রাসবাদী আছে, যত ধর্ষণকারী আছে, সবাই আপনার হৃদয়ে বাস করে। যত সাপ আছে, বিছে আছে, সিংহ

আছে, বাঘ আছে, সব এই হৃদয়ে বাস করে। শুধু বাস করে না, এখান থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। জগতে যত দুষ্ট লোক সবাই আপনার থেকেই বেরিয়েছে। যত ভাল মানুষ আছেন, সবাই আপনার থেকেই বেরিয়েছে। সেইজন্যই তো ভগবান কাউকে পছন্দ করেন না, আবার কাউকে অপছন্দও করেন না, সবটাই তাঁর কিনা। শুধু এই কথাই আচার্য বলে থামছেন না, তার সাথে বলছেন, *অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চ ইমানি ইতি*, ভগবান বাসুদেব, যিনি পরমেশ্বর, তাঁর ভিতরেও এরা বাস করছে। আচার্য শেষ করছেন এই বলে, *ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসি ইত্যর্থঃ*, সব উপনিষদে যে বলছেন, ক্ষেত্রজ্ঞ, তোমার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী, যিনি আত্মা আর বাসুদেব কৃষ্ণ, দুটো এক। আপনি কৃষ্ণ নন, যখন *অহং ব্রহ্মাস্মি* বলা হয়, তখন প্রত্যগাত্মাকে নিয়ে বলা হয়। বলতে চাইছেন, আপনি আসল যেটা, তাঁর ভিতরে সমস্ত কিছু, *ভূতানি অশেষেণ*, যত যা কিছু আছে, জীব, জন্তু, জঙ্গম, স্থাবর, অস্থাবর সব আপনার ওই আসল যেটা তার মধ্যে বাস করছে। যাকে আমরা ভালবাসি, সেও আমার ভিতরে; যাকে সহ্য করতে পারি না, সেও আমার ভিতরে বাস করছে। আর সব সেই ভগবানের হৃদয়েই বাস করে। আমার যে প্রত্যগাত্মা, শুদ্ধ আত্মা, যিনি অন্তর্যামী আর শ্রীকৃষ্ণ এক। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার এই বিষয়টা আসবে।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬।।

*(যদি তুমি সকল পাপী থেকে অধিক পাপিষ্ঠ হও, তথাপি এই জ্ঞানের পোত দ্বারা সমুদয় ধর্মাধর্মরূপ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবে, ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ মাহাত্ম্য।)*

*অপি চেদসি পাপেভ্যঃ*, এই বিষয়টা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। তুমি যদি এমনই পাপী হয়ে থাক যে, তোমার মত পাপ কেউ আগে করেনি, তুমি যাই করে থাক, যে পাপই করে থাক, নৌকা যেমন মানুষকে সমুদ্রের পারে নিয়ে চলে যায়, এই জ্ঞান তোমাকে সমস্ত কিছুর পারে নিয়ে চলে যাবে। এই জ্ঞান হয়ে গেলে তোমার কাছে পাপ আর পাপ থাকবে না, পূণ্য পূণ্য থাকবে না। আচার্য বলছেন, *ধর্মঃ অপি ইহ মুমুক্ষোঃ পাপম্ উচ্যতে*, মুমুক্ষ যাঁরা, যাঁরা আত্মজ্ঞানের দিকে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই শ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের জন্য ধর্মটাও পাপ। এর আগে আমরা এই বিষয়ের উপর বিরাট আলোচনা করেছিলাম, পবিত্র স্থানে যদি কোন জিনিস পড়ে থাকে, ওটা পবিত্র স্থানকে অশুদ্ধ করে, ওখান থেকে ওটাকে তুলে নেওয়া হয়।

রাজযোগে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন। মন হল দাঁড়িপাল্লার মত, দাঁড়িপাল্লা বিচার করে না এটা সোনা না লোহা, সে খালি জানে ওজন। আপনার মনে পাপ চিন্তন আছে, না ঈশ্বর চিন্তন আছে, মন কোন তফাৎ করে না। তফাৎ হল, পাপ চিন্তন হয় তমোগুণ রজোগুণ থেকে, সমাধি হয় না। ঈশ্বর চিন্তন সত্ত্বগুণ থেকে হয়, সমাধি হয়। কিন্তু যেখানে আত্মার জ্ঞান হবে সেখানে ঈশ্বর চিন্তনটাও বাধক। ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধির যে বর্ণনা আছে, সেখানে এই একই জিনিস পাই। পাপ হল একটা subjective জিনিস, সমাজ ঠিক করে দিচ্ছে, এটাকে পাপ বলে। যেমন মানুষ খুন, যুদ্ধের সময় সৈন্যরা মানুষ খুন করছে তখন সেই সৈন্যদের কোন পাপ হয় না। এগুলো কিছু না, আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ বলে কিছু হয় না। কিন্তু পূণ্য বলেও কিছু হয় না, আত্মজ্ঞান পাপপূণ্যের পারে। এটা কি করে সম্ভব যে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? হ্যাঁ সম্ভব।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।

*(হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেই রকম ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি সমস্ত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিদগ্ধ হলে কোন কর্মই ফল প্রসব করতে পারে না।)*

খবরে দেখাচ্ছিল, ক্যালিফোর্ণিয়ার জঙ্গলে আগুন লেগেছে, জঙ্গলের সব গাছকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোথা থেকে আগুন লাগল? একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি কেউ ঠুকে দিয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যদি কাঠ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়, আর তাতে একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি মেরে দিলে সব ছাই হয়ে যাবে। যখন দাবানল লাগে, তখন দাবানলের আগুন সব কিছুকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি*, আগুন যদি একবার জ্বলে ওঠে, সেই আগুন সব কিছুকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। ঠাকুর বলছেন ওর মধ্যে কলাগাচ ফেলে দিলে সেটাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ঠিক সেই ভাবে জ্ঞানরূপী অগ্নি সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ঠাকুর বলছেন, একটা ঘর, হাজার বছরের অন্ধকার, ওখানে একটা আলো জ্বেলে দিলে অন্ধকার কি একটু একটু করে যাবে? না, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার চলে যাবে। আত্মজ্ঞানেও ঠিক তাই হয়। আত্মজ্ঞান কি? যাবতীয় যা কিছু আছে, সব আমার হৃদয়ে অবস্থিত। নেতারা ভাষণ দেওয়ার সময় বলে, ভাইয়ো ঔর বহিনো, তারপর দেখে নিজের স্ত্রীও সেখানে আছে, তাকে তো আর বোন বলা যাবে না, তখন আবার বলে মুন্নি কি ম্যামি কো ছোড়কর, কেম মুন্নির মাকে কি বোন বলা যাবে না। আমেরিকাতে স্বামীজী যখন বলছেন, Sisters and brothers of America, তখন সবাই স্বামীজীর জন্য ভাই আর বোন, এটাই তফাৎ। গীতার কথা শুনে আমি বলছি, সবাই আমার হৃদয়, কিন্তু ওই লোকটা একটা বদমাইশ, ওকে বাদ দিয়ে বলছি, ও আমার ভিতরে নেই। এভাবে হয় না। জ্ঞান, সেই একত্বের জ্ঞান যত পাপপূণ্য আছে সব কিছুকে উড়িয়ে দেয়, কারণ সমদৃষ্টি এসে যায়।

আরেকটা ব্যাপারে এনারা বলেন, যে কর্ম দিয়ে এই শরীরের জন্ম হয়েছে, জ্ঞান লাভ হলে সেই কর্মগুলি থাকে, বাকি সব কিছুকে পুড়িয়ে দেয়। এনারা কর্মের উপর অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে একটা হল, যিনি জ্ঞানী তিনি কিছু কর্ম দিয়ে তাঁর এই জন্ম পেয়েছেন। পূর্ব পূর্ব সংস্কার, পূর্ব পূর্ব কর্মগুলি জ্ঞানের পরেও কাজ করতে থাকে। কর্মবাদ একটা মডেল, এই মডেলে কিছু জিনিসকে ব্যাখ্যা করা হয়, এটাও সেই রকম একটা ব্যাখ্যা। তবে ঠাকুর বলছেন, লোহার তরবারকে যদি পরশমণি দিয়ে স্পর্শ করিয়ে দেওয়া হয়, ওই তরবার সোনা হয়ে যাবে, ওই তরবার দিয়ে আর হিংসা করা যাবে না। আবার বলছেন, একটা দড়িকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর দড়ির আকারটা থেকে যায়, কিন্তু সেই দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ হয় না। ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন, তিনি যে কর্মগুলি জ্ঞান লাভের পর করছেন, তাতে তিনি জানেন আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সঞ্চিত কর্মগুলি আছে, সেই কর্ম এখন আমার চলছে, শরীর পড়ে গেলেই শেষ। তিনি যদি আত্মহত্যাও করে নেন, তাতেও ওনার কোন পাপ লাগবে না। কিন্তু উনি এখন নির্বিকার হয়ে গেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করার সময় এটার উপর আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে শুভ-অশুভ, পাপ-পূণ্য এই জিনিসগুলো আর কোন প্রভাব ফেলে না, ভাল এলেও ঠিক আছে, মন্দ এলেও ঠিক আছে। আত্মজ্ঞানী এগুলোর দিকে আর তাকান না। ভগবান এবার জ্ঞানের স্তুতি করে বলছেন –

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।

*(ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞান-নাশক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। এর তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছু নাই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে মুমুক্ষু স্বীয় আত্মাতে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।)*

আগুন যেমন সব কিছুকে পবিত্র করে দেয়, ঠিক তেমনি জ্ঞান সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে দেয়। জগতে মানুষকে এবং মানুষের মনকে পবিত্র করার জন্য জ্ঞানের মত আর কিছু হয় না। তৎ *স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ*, যোগসংসিদ্ধ কে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *তৎ জ্ঞানং স্বয়ম্ এব যোগসিংসিদ্ধো যোগেন কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতাম্ আপন্নো মুমুক্ষুঃ*, বহিরঙ্গ দিয়ে

যখন কাজ হয় তখন হয় কর্মযোগ, আর অন্তরঙ্গ কর্ম হয় মনের ভিতরে; আচার্য বলছেন, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ বা একটা বা দুটোকে দিয়েই যখন করা হয়, তখনই সংসিদ্ধ হয়। সংসিদ্ধ হয়ে যাওয়া মানে, *সংস্কৃতো যোগ্যতাম্ আপন্নো*, আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতাটা সে পেয়ে যায়, এনারা হলেন মুমুক্ষু। যাঁরা ভাবছেন আমি ঠাকুরের ভক্ত, ভক্ত আপনি ঠিকই। কিন্তু আপনি কি মুমুক্ষ? মুমুক্ষু হওয়ার জন্য অনেক দিন ধরে কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ করতে হয়, জপ করাটাও কর্মযোগ। কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ করে সংস্কৃত হয়ে গেছেন, শুদ্ধ হয়ে গেছেন, যোগ্যতা পেয়ে গেছেন, এবার ইনি মুমুক্ষু। তখন তাঁদের কি হয়?

*কালেনাত্মনি বিন্দতি*, নিজের ভিতরেই আত্মার জ্ঞান লাভ করেন। আত্মার জ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন বাইরে কোথাও হয় না, আত্মার ভিতরেই আত্মার জ্ঞান হয়। *কালেনাত্মনি বিন্দতি*, এটা একদিনে হয় না, দিনের পর দিন কর্মযোগ, ধ্যানযোগের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে, তারপর সময় হলে আপনিই জ্ঞান হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, যদি কেউ জপধ্যান করতে থাকে, ঠাকুরের প্রতি যদি সমর্পিত থাকে, মৃত্যুর সময় ঠাকুর তাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের পরম্পরা বিদ্যাতে বলা হয় *কালেনাত্মনি বিন্দতি*। আপনাকে আগে দেখতে হবে আপনি যোগসংসিদ্ধ কিনা, মন সুসংস্কৃত হয়েছে কিনা; যদি হয়ে থাকে তখন স্বয়ং, নিজে থেকেই নিজের ভিতরে *কালেনাত্মনি বিন্দতি*। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁদের এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে হবে। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপী জাহাজে উঠে পড়েছেন, পাড়ে আপনি যাবেনই। কিন্তু আমরা কি ঠিক ঠিক জাহাজে উঠেছি? জাহাজে ওঠার জন্য শুধু এটা বিচার করতে হবে, আমি যোগসিংসদ্ধ কিনা, অন্তঃকরণ আমার সংস্কৃত হয়ে গেছে কি? আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

গুরুকে পাওয়ার কথা বলে দিলেন, তুমি গুরুকে পেয়ে গেছ, জ্ঞান কি করে পাবে সেটাও বলে দিয়েছেন। এবার বলছেন উপায় কি?

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯।।

*(গুরুবাক্যে ও বেদান্তোপদেশে বিশ্বাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে জন্মান্তরগ্রহণ বা লোকান্তরগমন না করেই শাশ্বতী শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।)*

স্বামীজী বার বার বলছেন, শ্রদ্ধাবান হও বীর্যবান হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে। শ্রদ্ধাবান হলে তুমি জ্ঞান লাভ করবে। তার সাথে *তৎপরঃ*, লেগে থাকতে হবে, সেই চেষ্টায় তোমাকে তৎপর থাকতে হবে। *সংযতেন্দ্রিয়ঃ*, শ্রদ্ধা আছে, লেগেও থাকছ, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সংযম নেই, তাহলেও তোমার জ্ঞান লাভ হবে না, ইন্দ্রিয়ের সংযম দরকার। এভাবে শ্রদ্ধাবান হয়ে ইন্দ্রিয় সংযম করে লেগে থাকলে তুমি জ্ঞান লাভ করবেই করবে আর জ্ঞান লাভ করে *পরাং শান্তিম্*, পরম শান্তি লাভ করবে। আচার্য এখানে বলছেন, *শ্রদ্ধালুত্বে অপি ভবতি কশ্চিদ্ মন্দপ্রস্থানঃ*, শ্রদ্ধাবান অনেকেই হয়, ঠাকুরের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু খাটবে না, অলস, তমোগুণী, এদের দ্বারা হবে না, তৎপর হতে হবে। *গুরুপাসনাদৌ অভিযুক্তঃ*, গুরুর সেবাতে, গুরুর উপাসনাতে তোমাকে লেগে থাকতে হবে।

মূল কথা, খাটতে হবে; ঠাকুর বলছেন, আগেকার ঋষিরা কত খাটতেন, সেই সকালবেলা কুটির থেকে বেরিয়ে সারাদিন ধ্যান করতেন, সন্ধ্যেবেলা ফিরে একটু ফলমূল খেতেন। আমরা একদিন একাদশী করলে, কয়েকদিন উপোস করলে আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়, অথচ ঋষিরা দিনের পর দিন এই ভাবেই জীবন যাপন করতেন। অভ্যাস করে করে শরীর সাধন ভজনের জন্য তৈরী হয়ে গেছে।

তার সাথে বলছেন, *মন্দপ্রস্থানঃ*, আমাদের প্রধান শত্রু কামিনী-কাঞ্চন নয়, আমাদের মূল শত্রু মন্দপ্রস্থান, আলস্য। আর দীর্ঘসূত্রতা, আজকের দিনটা থাক কাল থেকে করা যাবে। এখন দূর্গাপূজা চলছে, পূজা কেটে যাক তারপর নামব। কত পূজা চলে গেল, নামাই আর হয় না। বলছেন, শ্রদ্ধাবান আছে, তৎপরও আছে, কিন্তু *অজিতেন্দ্রিয়*, এখানে এসেই সবাই আটকে যায়। মানুষ প্রথম কোন কাজ করতে যখন শুরু করে, তখন ওই কাজের প্রতি আগে তার শ্রদ্ধাটা আসে। কাজ করতে শুরু করল, তারপর সে কাজে কর্মে খুব তৎপর হয়ে গেল। কিন্তু দেখা যায় কখন যে অজিতেন্দ্রিয় হয়ে গেল, বোঝাই যায় না। হৃদয়রামের সবই ছিল, ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস, সেবাতে তৎপর, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পরে তাই তাঁর সব কিছু এলেমেলো হয়ে গেল। এই তিনটে জিনিস যদি থাকে, শ্রদ্ধা আছে, তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান তার হবেই হবে।

আচার্য খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, *প্রণিপাতাদিঃ তু বাহ্যঃ, প্রণিপাত*, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, এগুলো সব বাহ্য আচরণ। *অনৈকান্তিকঃ অপি ভবতি মায়াবিতাদিসম্ভবাদ্*, কপট প্রকৃতির যারা, যারা চালাকি করে, প্রণামাদি তারাও করতে পারে। অফিসের কর্মচারীরা নিজের বসকে পছন্দ করে না, কিন্তু রোজ সকালে এক গাল হাসি দিয়ে বলবে, 'গুড মর্ণিং স্যার'। এরা কপট, আচার্য মায়াবী বলছেন। তুমি গুরুকে ঠকিয়ে দিতে পার, আচার্যকেও বাহ্য আচরণ দিয়ে বোকা বানিয়ে দিতে পার, কিন্তু শ্রদ্ধা এমন একটা জিনিস, যেটাকে ঠকানো যায় না, শ্রদ্ধা পুরোপুরি ভিতরের ব্যাপার। আগে তাই বলা হল, প্রণিপাত করে আগে তাঁকে খুশী কর। তিনি খুশী হয়ে গেলেন, আর তুমিও মন্ত্র পেয়ে গেলে। এবার শ্রদ্ধা, যেটা তোমার নিজের, সেটাকে নিয়ে এসো। আগেও আমরা বলেছি, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পূণ্য যদি থাকে, তবেই শাস্ত্রের কথা শুনতে ইচ্ছে জাগবে, তা নাহলে শুনতে ইচ্ছা করবে না। যদি তোমার শুনতে ইচ্ছে করে, তাহলে বুঝতে হবে তুমি অনেক এগিয়ে গেছ। যদি কোন আচার্য পেয়ে যাও, যিনি তোমাকে শাস্ত্রের কথা শোনাচ্ছেন, তাহলে তুমি সত্যিই একজন ভাগ্যবান। এরপর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলে, তাঁর কথাগুলো গ্রহণ করতে পারলে, তুমি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে। এরপর উনি যে কথাগুলো বলবেন, সেই কথার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে যায়, যদি মনে হয় এগুলো সব সত্য, তাহলে তো you are great। তারপর যদি তুমি খাটতে শুরু করে দাও, তাহলে তোমার আর বেশি দেরী নেই। আর তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সব সংযমে আছে, তখন ভগবান বলছেন, *অচিরেণাধিগচ্ছতি*, তোমার তো হয়ে গেল, সব মুঠোয়। সাধুর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেই যে সবাই তাঁর কাছে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইবে, তা কখন দেখা যায় না। ঠাকুর বলছেন, লোকেরা সাধু সঙ্গ করে গাঁজা খাওয়ার জন্য। আমাদের এখানে বেশির ভাগ ভক্তরা সাধু সঙ্গ করে বলার জন্য, মহারাজ একটু প্রসাদ রেখে দেবেন, মহারাজ আমি বেড়াতে যাচ্ছি অমুক সেন্টারে একটা চিঠি লিখে দেবেন, মহারাজ নরেন্দ্রপুরে ছেলেটাকে ভর্তি করিয়ে দেবেন। এগুলো সাধুদের কাজ না, সাধু সঙ্গের উদ্দেশ্য অন্য কিছু, নিজের জাগতিক সুবিধা আদায় করার জন্য না।

পর পর ধাপ সাজানো আছে, প্রথমে সাধুসঙ্গের ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ তাঁর কথায় বা শাস্ত্র বাক্যে পুরো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তৃতীয় ধাপ সেই কথা অনুসারে তৎপর হয়ে চেষ্টা, চতুর্থ ধাপ ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয় সংযম অনেক পরে আসে, প্রথমের দিকে ইন্দ্রিয়ের সংযমের অতটা দরকার পড়ে না। কারণ প্রথমের দিকে ওই কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে হয়, শুনতে শুনতে প্রস্তুতি নিতে হয়, সেখান থেকে আসে ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয় সংযমে যখন এসে গেল, তখন আসলে শেষ ধাপে এসে গেছে। এই চারটে ধাপ যদি হয়ে তাহলে জ্ঞান লাভে তাকে কে আর আটকাবে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০।।

*(অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, (জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানবিষয়ে) সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং ঐহিক সুখও নাই।)*

এই আত্মজ্ঞানকে নিয়ে, ধর্মকে নিয়ে যে সংশয় করে, যেমন আজকেই একজন বললেন এটা হিন্দুত্ব হতে পারে, হিন্দু ধর্ম না। আরে ভাই হিন্দুত্ব আর হিন্দু ধর্ম আলাদা কিছু নাকি, যা খুশী মনে হবে বলে দেবে। একটু পড়াশোনা জানে, শব্দের একটা ভাণ্ডার বানিয়ে নেয়, সেখান থেকে শব্দ নিয়ে যা খুশী একটা বলে দেয়; রাজযোগে একে বিকল্প বলে। *অজ্ঞঃ*, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যার কোন ধারণা নেই, যে জানে কিন্তু সে মানে না, এরাই অজ্ঞ। *অশ্রদ্ধঃ*, যে আত্মজ্ঞান জানে, কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা নেই। *সংশয়াত্মনঃ*, গুরু বাক্যে ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করে না। প্রথম হল আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে যদি কোন ধারণা না থাকে, দ্বিতীয়, শ্রদ্ধা যদি না থাকে আর তৃতীয় সংশয়াত্মা, আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে যদি সংশয় কর; এই তিনটে যদি হয় তাহলে কি হবে?

*নায়ং লোকহস্তি  ন পরো*, এই জীবনেই সে সুখ পাবে না, পরের জন্মে তো আরও সুখ পাবে না। ধর্মে যাদের বিশ্বাস নেই, সংশয়াত্মাদের পরের জন্ম ছেড়ে দিন, এই জন্মেই তারা সুখ পায় না। টাকা-পয়সা হলেই কি সুখ হয়? হয় না। যাঁদের ধর্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, তাঁরাই সুখ পান। আমরা মনে করি, টাকা, বাড়ি, গাড়ি হলে, ভাল স্ত্রী হলে, ভাল এক স্বামী হলে আমরা সুখী হব। কিন্তু সুখ নাগালের বাইরেই থাকে, কারণ সমস্ত সুখ ভিতর থেকে আসে। ভিতরটা চলে আত্মজ্ঞান থেকে, আত্মজ্ঞান যদি নাও হয়ে থাকে, কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবেই সুখ হয়, তা নাহলে হয় না।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১।।

*(স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন দ্বারা যাঁর সংশয় ছিন্ন এবং ধর্মাধর্মত্যাগ হয়েছে, সেই আত্মবান্ অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে দৃষ্ট কর্মরাশি আবদ্ধ করতে পারে না, অর্থাৎ তাঁর কর্ম নিষ্কাম হওয়াতে অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্র কোন প্রকার ফল উৎপন্ন করে না।)*

যিনি পরমার্থ জ্ঞানরূপী যোগ জেনে গেলেন, যখন জেনে গেলেন আত্মার ব্যাপারটা কি, তখন তিনি পূণ্য ও পাপ রূপ যত কর্ম আছে, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দেন। খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। আমাদের স্তরে আসবে, কর্মের প্রতি স্পৃহা নেই, কর্ম ফলের প্রতিও স্পৃহা নেই। এই স্তরে যখন যায় তখন বলে *যোগসংন্যস্তকর্মাণং*, যিনি বুঝে গেছেন আত্মা কি, পরমার্থ তত্ত্ব কি, ঈশ্বর কি। তখন কি হয়? আমার আরও চাই, এটা চাই, সেটা চাই, না পেলে লুটেপুটে খাব, এই ভাবটা চলে যায়। এনাদের বলছেন *যোগসংন্যস্তকর্ম*। এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানকর্ম সন্ন্যাস যোগ, এই যোগের উদ্দেশ্য হল *যোগসংন্যস্তকর্ম*। তাঁর বিশ্বাস হয়ে গেছে, এগুলো সব সত্য। আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করলাম, শরীর ধারণের জন্য কিছু করতে হয় আর সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ।

*আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়*, যিনি এটা খুব ভাল করে বুঝে গেছেন, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, যে রূপেই ঈশ্বরকে নিন, সন্তান রূপে দেখুন বা এমনকি সেবক রূপে নিন, হে প্রভু আমি তোমার সেবক; কিংবা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে নিন, আমার ভিতরে যিনি অন্তর্যামী আর ঈশ্বর এক, যিনি ঈশ্বর তিনিই আমার ভিতরে আছেন, কোন না কোন ভাবে বুঝে গেছেন আপনি ঈশ্বরের সাথে এক, এই সংশয় যাঁর মিটে গেছে, অর্থাৎ এই জীবনটাই শেষ এটা তাঁর কাছে আর সত্য বলে থাকছে না। এই ধরণের মানুষকে বলছেন, *জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্*, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সব সংশয়ের নাশ হয়ে গেছে। এই দুটো শব্দ –*যোগসংন্যস্তকর্মা*, যিনি বুঝে গেছেন যে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, সেইজন্য এটা সেটার পিছনে দৌড়ানটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা হল প্রথম; আর মনের সংশয় নাশ, এনাদের *আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়*, এনারা যে কাজ করেন সেই কাজ তাঁর ভিতর কোন সংস্কারের ছাপ ফেলে না, ভবিষ্যতে যে কর্মের ফল দেবে, এটা আর হবে না। অনেকে প্রশ্ন করেন,

তিনি যে কর্ম করলেন, সেই কর্মের যে ফল হবে সেটার কি হবে? তিনি যে কর্ম করেন, সেই কর্মের ফল কর্মের সঙ্গে নাশ হয়ে যায়। কর্পূর পোড়ালে যেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক তেমনি কর্মগুলিরও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বলছেন, কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে করতে অন্তঃকরণ, মনের যত অশুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে, আর সেখান থেকে আত্মার জ্ঞানের ব্যাপারে সব সংশয় দূরীভূত হয়ে গেছে। সেইজন্য অর্জুনকে বলছেন –

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২।।

*(অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত বুদ্ধিস্থিত, আত্মবিষয়ক এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করে ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।)*

ঈশ্বরকে না জানাটাই অবিবেক। অবিবেকর জন্য কি হয়, ভিতরে সংশয় আসে, ভিতরে মোহ আসে। ভগবান বলছেন, তোমার ভিতরে যে শোক আর মোহ আছে, এই শোক আর মোহ কেন এসেছে এটাকে ভাল করে বোঝ। তোমার আত্মজ্ঞান নেই, তাই তোমার মধ্যে সংশয় আছে, ঈশ্বরের সত্তায় তোমার বিশ্বাস নেই, সেইজন্য তোমার মধ্যে সংশয় আছে। আর এই সংসারে থাকলে শোক মোহ আসবেই। ঠাকুরের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী স্তবে বলছেন, *সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং*, ঠাকুর এই যুগে অবতার রূপে এসে মানবজাতির মধ্যে যে সংশয়রূপী রাক্ষস আছে, সেই রাক্ষসকে নাশ করে দিয়েছেন। ভগবান বলছেন, এই আত্মজ্ঞন হল সেই খড়্গ, যে খড়্গ দিয়ে সংশয়কে নাশ করা হয়। হে অর্জুন, তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু সংশয়, এই শত্রুকে নাশ কর।

আমাদের ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস নেই, আত্মজ্ঞানে বিশ্বাস নেই, যদি বিশ্বাস আসে, তখন জগতের পিছনে যে আমরা দৌড়াচ্ছি, এটা বন্ধ হয়ে যাবে, তমোগুণ নাশ হয়ে যাবে, অতৎপর অর্থাৎ লেগে থাকতে পারে না, এটা নাশ হয়ে যাবে; আর ইন্দ্রিয়ের উপর সংযম নেই, এই দুর্বলতা কেটে যাবে। ফলে শোক আর মোহ এই দুটো নাশ হয়ে যাবে। আচার্য বলছেন, *ছিত্ত্বা এনং সংশয়ং স্ববিনাষহেতুভূতং যোগং সম্যগ্‌দর্শনোপায়কর্মানুষ্ঠানম্ আতিষ্ঠ*, এই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় কর; অর্জুন তুমি ওঠো। তুমি যে মোহে পড়ে আছ, এই মোহকে ছেড়ে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াও আর যে যোগের কথা বলা হল, সেই যোগকে পাওয়ার চেষ্টা কর। এই যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তুমি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবে। এর ফলে তোমার মনের ভিতর যত সংশয় আছে নাশ হয়ে যাবে, আর ফলে তোমার মধ্যে যে শোক আর মোহ এসেছে, এগুলো সব নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন, *উত্তিষ্ট ইদানিং যুদ্ধায়*, এই যুদ্ধের জন্য তুমি ওঠো। এখানেই চতুর্থ অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাসযোগ, যেখানে ত্যাগের উপর খুব জোর দিচ্ছেন আর সেখান থেকে দেখাবেন জীবনমুক্তিটা কি।

সংক্ষেপে চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল, নিজেকে পশুস্তর থেকে উপরে আনার জন্য প্রথমে তাকে যজ্ঞভাব নিয়ে সব কাজ করতে হবে। কি যজ্ঞ করবে? তুমি কিছু করতে পারছ না, ঠিক আছে গরীবকে কিছু দান কর। এর থেকে আর-একটু উপরে হলে আরও বড় যজ্ঞ করতে পার, এরও উপরে উঠলে তুমি প্রাণায়ামাদি কর, আরও উপরে উঠলে শাস্ত্রাদি পাঠ কর, এইভাবে পর পর বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ তখনই হবে যখন তুমি মনে করবে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশিও চৈতন্য, সর্বত্র তিনি সেই চৈতন্যকেই দেখছেন, চারিদিকেই ফুল ছুড়ছেন। এই অধ্যায়ে এটাই বলা হল, দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যত যজ্ঞই করা হোক না কেন, সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ। খাওয়ার সময়েও তিনি তখন দেখেন যেটা খাচ্ছি সেটাও ব্রহ্ম, থালাটাও ব্রহ্ম, আমার জঠরাগ্নিও ব্রহ্ম, আমার হাত, মুখ, জিহ্বা সব ব্রহ্ম, যিনি পরিবেশন করছেন তিনিও ব্রহ্ম, খাওয়াটাও ব্রহ্ম, খাওয়ার যে ফল পেট ভরা, তৃপ্ত হওয়া, এটাও ব্রহ্ম। এই কারণে খাওয়ার সময় হাসিঠাট্টা করা উচিৎ নয়, কারণ *ব্রহ্মার্পণং* করে যখনই কিছু খাওয়া হয় তখন সেটা আর শুধু খাওয়া থাকছে না,

যজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। হাসিঠাট্টা জাগতিক জিনিষ, পূজা করার সময় যেমন হাসিঠাট্টা করাটা অশোভনীয়, ঠিক তেমনি খাওয়ার সময়েও যে কোন ধরণের মজা করা, ঠাট্টা ইয়ার্কি করা খুবই নিন্দনীয়। যদি তুমি এই ভাব নিয়ে সব কাজ কর তাহলে তোমার জ্ঞান উদয় হবে। এটাই হল শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ।

এটা যদি না করতে পার তাহলে ধাপে ধাপে নিজেকে উন্নীত কর, সেটাও যদি না পার তাহলে দ্রব্যযজ্ঞ কর। তোমাকে কোন যজ্ঞই করতে বারণ করা হচ্ছে না, সব যজ্ঞই তুমি করতে পার। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞের মাহাত্ম্যকে মাথায় রেখে তাতেই তোমাকে বেশি জোর দিতে হবে। এখন জ্ঞানযজ্ঞ করতে গিয়ে যদি দ্রব্যযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞানযজ্ঞও করছ না আর দ্রব্যযজ্ঞ এবং তার মাঝখানে যত যজ্ঞের কথা বলা হল কোন যজ্ঞই করছ না তাহলে তোমার অবস্থার কোন পরিবর্তনই হবে না, যে পশুস্তরে তমোগুণে পড়েছিলে, সেই তমোতেই পড়ে থাকবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, তামসিক লোকের বাড়ি থেকে যদি কেউ চুরি করে তখন তাকে ধরবে, ধরে প্রথমে তার সব জিনিসপত্রগুলো কেড়ে নেবে, তারপর খুব করে মারধোর করে পুলিশে দেবে, আর বলবে – জানেনা কার বাড়িতে চুরি করতে এসেছ! এরাই হল ঠিক ঠিক আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ।

মূল কথা যজ্ঞের উপরে আধারিত করে যদি তোমার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পার তাহলে তুমি পশুস্তরে, যেটা তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন –*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যজ্ঞার্থে যখন তুমি কর্ম করবে তবেই তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। যজ্ঞ তুমি কিভাবে করবে? তোমার অত বুদ্ধি নেই, ঠিক আছে তুমি দানধ্যান কর। এই কথাটাই আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে, শ্রীশ্রীমা বলছেন – যার আছে সে মাপো যার নেই সে জপো। তোমার কিছু নেই তুমি খুব করে জপ করে যাও তাতেই তোমার মঙ্গল হবে, আর তোমার প্রচুর অর্থ আছে, প্রাচুর্য আছে তাহলে তুমি দান করতে থাক।

তৃতীয় অধ্যায় আর চতুর্থ অধ্যায় হল কর্মকে নিয়ে। তুমি যদি পারমার্থিক সত্যকে ঠিক ঠিক জেনে থাক, তাহলে তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না, তুমি সব কিছু থেকে মুক্ত। কিন্তু তার লক্ষণ কি? যদি তুমি কারুর গলা কেটে দাও তাহলে তোমার মনে কোন পাপ বোধ হবে না, উল্টে যদি তোমার গলা কেউ কেটে দেয় তাতে তোমারও কোন বোধই হবে না যে তোমার গলা কাটছে। তোমার কি এই অবস্থা হয়েছে? না হয়নি, হাতে একটু ছুঁচ ফুটলেই চিৎকার করে উঠি। তাহলে তুমি কর্ম করতে থাক। কিভাবে কর্ম করবে? এমন ভাবে কাজ করবে যাতে কর্মফলে তোমার কোন স্পৃহা না থাকে। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, কর্তব্য রূপে যেটুকু কর্ম তোমার কাছে এসেছে, ততটুকুই কাজ করবে তার বেশি অতিরিক্ত কোন কাজে নিজেকে জড়াবে না। যদি কর্মফল ত্যাগ করতে পারছ না তাহলে তখন তুমি সব কাজ যজ্ঞ রূপে কর। আমি পড়ছি এটাও যজ্ঞ, আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি যজ্ঞ, খাওয়া, কথা বলা, চিন্তা করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা সবটাই যজ্ঞ। এই ধরণের নানা রকমের যজ্ঞের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই যজ্ঞ রূপে তুমি যদি কর্ম না করতে পার তাহলে তোমার আর কোন গতি নেই। এই রকম যজ্ঞ করার পর যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনা উদয় হয় তাহলে তোমাকে গুরুর কাছে যেতে হবে। গুরু কি রকম হবে? তিনি শ্রোত্রিয়, তত্ত্ববিৎ, কোন কামনার দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি শিষ্যকে উপদেশ দেননা। যারা বলছে আমি কাজ করছি না তারাও কিন্তু কাজ করছে। কারণ কাজ থেকে যে নিজেকে টেনে আনছে সেটাও কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসযোগের সার সংক্ষেপ। এরপর আমরা সন্ন্যাসযোগে প্রবেশ করব।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।**

পঞ্চমোধ্যায়ঃ

# সন্ন্যাসযোগ

পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য, এই অধ্যায়ের নামই সন্ন্যাসযোগ। কিন্তু আমরা এর আলোচনার মধ্যে যত ঢুকবো, তত দেখতে পাবো কিভাবে এই অধ্যায় আমাদের সবারই নিত্য অনুশীলনের বিষয়। এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটি বাক্য আমাদের রোজ অভ্যাস করা দরকার। পঞ্চমোধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া খুব দরকার।

অজান্তাতেই এই অধ্যায় আমার খুব প্রিয়। কি করে, কেন এই অধ্যায় আমার প্রিয় হল আমার জানা নেই। আমরা মনে আছে, প্রথম যখন রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি তখন স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের কাছে আমি গীতার পাঠ নেওয়া শুরু করি। গীতা মুখস্ত করার যখন কথা হল, তখন আমি প্রথমে এই পঞ্চম অধ্যায় দিয়েই মুখস্ত করতে শুরু করেছিলাম। পঞ্চম অধ্যায়ের সাথে আমার একটা বিশেষ যোগ। তখন অতটা বুঝতাম না, এটা বুঝেছিলাম যে এই অধ্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য, তাই আমি ঠিক করলাম, এই অধ্যায়টাই আগে মুখস্ত করব। পরে পরে বুঝলাম, গীতা যে উচ্চতম আদর্শের কথা বলছেন, অধ্যাত্মের যে শেষ কথা আত্মজ্ঞান, এই পুরো বিষয়টাই এই অধ্যায়ে ছেয়ে আছে। এরই একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা পেয়েছি দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে যেটা বলা হয়েছে, সেই জিনিসটাই এখানে আরও বিস্তারে বলা হয়েছে। সন্ন্যাসযোগ এই নাম শুনলে সবাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবেন, এই অধ্যায় শুধু সন্ন্যাসীদেরই জন্য; কিন্তু না, সবারই জন্য পঞ্চম অধ্যায় খুবই প্রয়োজনীয়। কেন প্রয়োজনীয়, এটা বোঝার জন্য খুব সাধারণ একটা জিনিসকে বুঝে নিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পপুলার জিনিসটা কি? মানুষ কিভাবে পপুলার হয়? মানুষ কেন পপুলার হয়? V.S.Naipaulএর নাম অনেকেই শুনে থাকবেন, খুব নামকরা সাহিত্যিক, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। একটা ইন্টারভিউতে সাহিত্য নিয়ে বলতে গিয়ে উনি বলেছিলেন, যে কোন উপন্যাস দেশ কালের যত কাছে থাকবে, মানুষ তত সেই উপন্যাসকে গ্রহণ করে। আমি এই কথাটা আজ থেকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে শুনেছিলাম। তখন শুনে মনে হয়েছিল, আমার মত লোক তো কোন দিন লেখক হতেই পারবে না। কারণ এত কাছে আমরা কি করে যাব। কিন্তু কোথাও মনে হচ্ছিল, এই কথার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যেটা বাদ চলে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা ধরতে পারছি না। যে কোন একজন নেতা বা সমাজসেবী, বা কোন শিক্ষক, বা একজন লেখক নিজের সময় খুব প্রসিদ্ধ থাকেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, সেই সময় কলকাতার সবাই তাঁর নাম জানতেন, কিন্তু ঠাকুরকে কে আর জানত। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কাগজে ঠাকুরের নামে কিছু লেখা ছাপালেন বলে সেই সময়কার কিছু লোক ঠাকুরের নাম জানলেন। যীশু খ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধকে তাঁদের সময় কেউ জানতেন না। কিন্তু তৎকালীন যে রাজা ছিলেন, তাঁকে সবাই জানতেন। বর্তমান কালে প্রধানমন্ত্রীর নাম গোটা দেশ জানে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম সারা রাজ্যের লোকেরা জানে। কিন্তু বর্তমান কালের যিনি বড় চিন্তক বা একজন মহাত্মা, তাঁর নাম আর কজন জানে! কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁরা চিন্তক, যিনি অবতার, যিনি মানুষকে ধর্ম শেখাচ্ছেন, সময়ের সাথে সাথে তাঁদের নাম ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। এটা একটা রহস্য।

আবার একজন মহাত্মা আর একজন অবতার, মহাত্মার নাম নিজের সময় খুব ছড়িয়ে যায়, কিন্তু একজন অবতারের নাম ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। এটা কেন হয়? তেমনি কিছু রচনা, কিছু শিল্পকর্ম আছে যেগুলো নিজের সময় কোন দাম পায় না। যেমন ভ্যান গগ্, ভ্যান গগ্ যত দিন বেঁচে ছিলেন তাঁর শিল্পকর্মের কেউ দাম দেয়নি। এমনকি একজনকে তিনি ফ্রীতে একটা ছবি

উপহার দিয়েছেন, সেও সেই ছবি পেয়ে নিজের মুরগীখানায় ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন ভ্যান গগের একটা ছবির কি দাম, আমরা কল্পনাই করতে পারব না। নিজের সময় মানুষ স্বীকৃতি পায় না, এটা সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে হয় না, বড় কোন মহাপুরুষ বা মহাত্মাদের ক্ষেত্রেই এটা হয়।

এটাকেই মাথায় রেখে অনেকে বলতে থাকেন, আজ তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না, পরে একদিন ঠিক বুঝবে। সাধারণরাই এই ধরণের কথা বলে, এগুলোর কোন দাম নেই। মহাপুরুষরা নিজের মত নীরবে চুপচাপ কাজ করে যান, জগৎ তাঁকে জানে না, আর তিনি চানও না যে জগৎ তাঁকে জানুক। সেটা গুরুত্ব নয়, প্রত্যেক মায়েরাই এই রকম হন। বেশির ভাগ মায়েরা চুপচাপই কাজ করেন, সব মাকে কি সবাই জেনে যায়, জানতে পারে না। কারণ যাঁরা সত্যিকারের মহৎ, ধর্ম জগতেই হন আর সাহিত্যের জগতেই হন কিংবা ছবি আঁকা, গান-বাজনার জগতের কেউ হন, যত তাঁরা সময় থেকে এগিয়ে, নিজের কাল থেকে এগিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রসিদ্ধি তত বেশি হয়।

সময়ের আগে যেটা চলে সেটা আরও মজার। যিনি নিজের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁর নাম হবে না। তিনি চলে যাবার বেশ কিছু দিন পর থেকে তাঁর নাম হতে শুরু হয়ে যায়। গণিতের জগতে এই ধরণের ঘটনা প্রচুর দেখা যায়, কেউ একটা থিয়োরী দিয়েছে, তখন কেউ মানতে চাইল না, কেউ বুঝতেই পারল না। তারপর দেখা গেল ওটাই পরে গণিতের জগতে একটা বিরাট অবদান রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। কোন জিনিস যদি নিজের সময় থেকে এগিয়ে থাকে, সেটাকে বোঝার ক্ষমতা বেশি লোকের থাকে না।

আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি দেওয়ার পর সেই সময় একটা জোক বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থার এডিংটন এ্যাস্ট্রনমিক্যাল ফিজিক্সের লোক ছিলেন, আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি যখন ফিজিক্সের কেউ মানতে চাইছিল না, তখন উনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের সময় ছবি তুলে দেখালেন যে, আইনস্টাইনই ঠিক। এটাকে নিয়ে একটা জোক আছে, অনেক বলে যে এটা সত্য ঘটনা হতে পারে না, কিন্তু আইডিয়াটা খুব সুন্দর। এডিংটন সূর্যগ্রহণের সময়ের ছবিগুলি দিয়ে দেখাচ্ছেন, আকাশে তারাগুলি যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তার মানে তারা থেকে দিনের বেলায় যে আলো আসে, সূর্য সেই আলো নিজের দিকে টেনে নেয়, আর এটাই আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তে বলা হয়। ফলে রাত্রে তারাগুলিকে এক জায়গায় দেখা যায়, দিনের বেলায় অন্য জায়গায় দেখায়। সূর্যগ্রহণের ছবি তুলে এডিংটন দেখালেন, আইনস্টাইন যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। এডিংটন এই কথা বলার পর খুব হৈ হৈ পড়ে গেল, কারণ নিজের সময়ে এডিংটন এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফিজিক্সের জগতে একজন নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। আইনস্টাইনের থিয়োরী বেরিয়েছে ১৯০৪ সালে, এডিংটন এটা বললেন ১৯১৬ সালে, তার মানে বারো বছর হয়ে গেছে।

এডিংটনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছেন, 'আমরা জানি বিশ্বে মাত্র তিনজন আছেন, যাঁরা থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি বোঝেন'। এডিংটন সাংবাদিকদের এই কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এতক্ষণ চুপ করে আছেন দেখে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আরও বেশি আছে কি'? তখন এডিংটন বলছেন, 'না, আমি ভাবছি তৃতীয়জন কে'? তার মানে এডিংটন বলতে চাইছেন, আইনস্টাইন বোঝেন আর এডিংটন বোঝেন, তৃতীয় এই রকম কেউ নেই যে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত বুঝবে। লোকেদের মত যে, এটা বানানো গল্প, এডিংটন এ-রকম কথা বলতে পারেন না। কিন্তু এখানে আইডিয়াটা দেখতে হবে, আইনস্টাইন নিজের সময় এত বেশি এগিয়ে যে, তাঁকে বোঝার ক্ষমতা সেই সময় কারুর নেই। অথচ আজকের দিনে গ্রাজুয়েশান লেভেলে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি রবার্ট পেনরোজ আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিকে আধার করে নোবেল প্রাইজ পেলেন। এটাই একটা রহস্য, আইনস্টাইনের সময় কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বুঝতে পারল না, আজকে এত লোক বুঝতে পারছে।

টাইম ম্যাগাজিনে গত হাজার বছরে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকায় আইনস্টাইনের নাম দু নম্বরে, আমেরিকা রুজভেল্টের নাম সব কিছুর আগে রাখে বলে, ওই নামটা এক নম্বরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন হলেন আসল, পুরো জগৎকে পাল্টে দিলেন। যখন কোন আইডিয়া বা ভাব নিজের সময় থেকে এগিয়ে থাকে, ওটাকে সেই সময় ধরা বা বোঝা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু বিবর্তনের জন্য আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি, আমরা আরও মহৎ থেকে মহত্তর হচ্ছি। ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদে এক একটা প্রজাতির যে evolve হয়, তার কথা বলছেন। আমরা এটা মানি যে, প্রত্যেকটা জীব, আমি আপনি সবাই ওই অর্থে এগিয়ে যাচ্ছি, তার মানে আজকে যে আমাদের সমষ্টি জ্ঞান, চার হাজার বছর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের থেকে অনেক বেশি। চার পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাসদেব, বাল্মীকির মত মহাপুরুষরা ছিলেন, ঋষিরা ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজে জ্ঞানের প্রবাহ তখন অনেক কম ছিল, আমরা আজকে তার থেকে অনেক এগিয়ে আছি। এখানে কোন একজনকে দিয়ে বিচার করা যাবে না।

বাল্মীকি ছিলেন বিরাট কবি। বাল্মীকির কবি প্রতিভার কাছাকাছি কালিদাস হয়ত একটু যেতে পারেন, অন্য আর কেউ যেতে পারেননি। কিন্তু বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের কীর্তির যে সমঝদার হবে, সমাজে তার সংখ্যা সেই সময় অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু যেমন যেমন সমাজ এগিয়ে চলে, তত বেশি সংখ্যায় মানুষ ওনাদের সৃষ্টিকে ধরতে পারছে। যেমন যেমন সমাজ এগোতে থাকে মানুষের বুদ্ধিও তত বিকাশিত হয় এবং তত এর প্রকাশ পায়। আর সেই সময় যিনি খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন, তিনি দেশ আর কালের মধ্যে এমনটাই বাঁধা ছিলেন যে, সবাই যেমনি এগিয়ে গেল উনি আর ওনার কীর্তি পিছিয়ে পড়ে থেকে গেল। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেশে যে নেতারা খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন, আজকে তাঁদের কেউ নামও শোনেনি। অথচ একটা সময় সাধারণ জ্ঞানে তাঁদের নাম আমাদের মুখস্ত করতে হত। ক্লাশ ফোর ফাইভে আমাদের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নাম মুখস্ত রাখতে হত। এখন রাজ্যের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, আর মুখ্যমন্ত্রী এত ঘন ঘন পাল্টায় যে নাম মুখস্ত রাখা খুব মুশকিল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের জন্য জানতে হয়। এখন তো কেউ নামই শোনেনি, কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ খোঁজও রাখে না।

সক্রেটিস নিজের সময় খুব বিখ্যাত ছিলেন, যীশু খ্রীষ্টের নাম তখন কেউ শোনেনি। খ্রীশ্চান জগতে আজকে যীশু খ্রীষ্টের নাম সবাই জানে, ঘরে ঘরে তিনি পূজিত হচ্ছেন। অন্য দিকে সক্রেটিস আজকে কয়েকটা বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। যেমন যেমন সময় এগোচ্ছে লোকেরা তত যীশু খ্রীষ্টকে তারিফ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। যার জন্য আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, একে তো তাঁরা খবর পাননি, দ্বিতীয় তাঁকে বোঝার মত ক্ষমতা ছিল না। আমরা তাঁদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে।

সময় থেকে এগিয়ে থাকা মানে, জিনিসটা সত্যের খুব কাছাকছি। কিছু কিছু জিনিস হয় যেটা দেশ কালের খুব কাছাকাছি থাকে, যেটা নইপাল বলছেন। যেটা আসল সত্য, জিনিসটা যদি সেই আসল সত্যের কাছে হয়, জিনিসটাকে মনে হবে দেশ ও কাল থেকে যেন এগিয়ে আছে। কারণ এই বিশ্ব, এই সৃষ্টি হল জটিল, জটিল থেকে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সত্যের দিকে। সৃষ্টি যখন হয়েছিল, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, তখন জিনিসটা সহজ থেকে জটিল হয়ে গেল। সেখান থেকে সে আবার ধীরে ধীরে সহজের দিকে এগোচ্ছে। জিনিসটা যত সহজ হয়, তত সেটা সময় থেকে এগিয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সময়ে যে কথাগুলো বলছিলেন, সেগুলো আধ্যাত্মিক জগতের কয়েকটা খুব সহজ ও সত্য কথা ছিল। তখনকার লোকেদের যীশুর সেই কথাগুলো নেওয়ার ক্ষমতা

ছিল না, কারণ তাদের মন জটিল। স্বামীজী যখন বলছেন, আমি চিন্তন জগতের জন্য পনেরশ বছরের খোরাক দিয়ে গেলাম, তখন এর এটাই অর্থ হয় যে, স্বামীজী যে কথাগুলো বলে গেছেন তার অনেক কথাই আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের পরে যাঁরা আসবেন, তাঁদের বুদ্ধি, বোঝার ক্ষমতা এত বেশি থাকবে যে, তাঁরা স্বামীজীর কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন। তত দিনে আবার নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা কোন মহাপুরুষ এসে যাবেন।

এই কথাগুলো বলা এই জন্য যে, উপনিষদ হল হিন্দুদের ঠিক ঠিক গ্রন্থ। আমরা বেদ বেদ বলি ঠিকই, বেদ হল হিন্দু ধর্মের উৎস, উপনিষদ আবার সেই বেদের অঙ্গ। সেইজন্য আমরা বলি বেদ সবচেয়ে বড় ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মগ্রন্থ হল উপনিষদ। উপনিষদ নিজের সময় থেকে এত বেশি এগিয়ে, তার মানে উপনিষদের ঋষিরা তাঁদের সময় থেকে এত বেশি এগিয়ে যে, আজ সাত থেকে আট হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনও সমাজে উপনিষদকে ছড়িয়ে যেতে পারেনি, এমনকি বড় বড় বোদ্ধারা, চিন্তকরাও উপনিষদকে বোধগম্য করতে পারছেন না। কারণ উপনিষদ হল বিশুদ্ধ বেদান্ত।

যে কোন জ্ঞান যদি জীবনে না নামানো যেতে পারে, যদি practical না হয়ে থাকে, ওই জ্ঞানের কোন দাম নেই। যে কোন মানুষ একটা থিয়োরী দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যদি ওই থিয়োরীর কোন পরীক্ষা করা না যায়, দ্বিতীয় ওই থিয়োরীকে যদি কোন কাজে লাগানো না যায়, তবে ওই থিয়োরীর কোন দাম নেই। যে জ্ঞানকে কাজেই না লাগানো যায়, ওই জ্ঞান নিয়ে আমি কি করব। যে গরু বাছুর দেবে না, দুধ দেবে না, সেই গরু আমার কোন কাজে লাগবে? উপনিষদ সেই সত্যগুলিকে বলছেন, ফলে নিজের দেশ কাল থেকে এত বেশি এগিয়ে যে, ওটাকে দৈনিন্দিন জীবনে নামানো যায়; ঋষিদের যে শিষ্যরা ছিলেন, তাঁদেরও এই জিনিসটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। ঈশোপনিষদে ঋষি বলছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর আর কিসের শোক, কিসের মোহ। এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

মুসলমানরা মনে করে আমার ধর্ম সত্য, এটাকে বিশ্বাস করে তারা যে কোন জিনিস করার জন্য প্রস্তুত। জুহুদিদের ব্যাপারটা আরও মজার, ওরা বলে We are the chosen people of God। শুধু এই বিশ্বাস, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর গত দু হাজার বছরে ওদের উপর এত অত্যাচার হয়েছে, হিটলারের সময় কত কি হয়েছে, কিন্তু জুহুদিদের চিরদিন এই বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের আমরা বিশেষ। শুধু এই বিশ্বাসকে ধরে আজকে ইজরায়েল কোন জায়গায় চলে গেছে। ওই ছোট্ট একটা দেশকে চারিদিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্ররা ঘিরে রেখেছে, কিন্তু একা সব কটা দেশকে আটকে রেখেছে। নিজের ধর্মগ্রন্থের শুধু একটি বাক্যকে বিশ্বাস, আমরা হলাম ঈশ্বরের বিশেষ, We are the chosen people of God।

এটাকে মাথায় রেখে এবার আমাদের কথা একটু ভাবুন। আপনার আমার যে ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ, উপনিষদের একটিই কথা, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। এই কথার উপর আমার আপনার বিশ্বাস আছে? শুধু ধাপ্পাবাজী আমাদের। কারণ এই একটি বাক্য, **'তুমি সেই ব্রহ্ম, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক'**, এই একটি বাক্যে যদি কারুর বিশ্বাস হয়ে যায়, রাতারাতি তার জীবনটাই আমূল পাল্টে যাবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা আমাদের সবার বাড়িতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা থাকে, কিন্তু একটা খণ্ডও পুরোটা কেউ পড়ে দেখেননি। না পড়ারই কথা, অত ধৈর্য কোথায় আমাদের, আর অত উচ্চ ধারণা করার ক্ষমতাও নেই। তবে আমাদের মঙ্গলের জন্য একটা কাজ আমরা করতে পারি, স্বামীজীর বাণী ও রচনার প্রত্যেকটি খণ্ডের প্রত্যকেটি পাতার প্রথম ও শেষ শব্দটা শুধু পড়বেন, তাতেই মনে হবে জীবনে কিছু একটা করলাম, জীবনকে ধন্য মনে করবেন। স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা একটি কথাই বলছে, তুমি সেই ব্রহ্ম। স্বামীজী যখন বলছেন, শক্তিমান

হও, বীর্যবান হও, তিনি আসলে কি বলতে চাইছেন? ঐ সত্যটাকে জানার জন্য তোমাকে আগে শক্তিমান হতে হবে, বীর্যবান হতে হবে। স্বামীজী যখন বলছেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভাল, তার মানে আগে তোমার শরীর গঠন কর, পেশী মজবুত কর, তমোগুণকে কাটিয়ে নিজেকে রজোগুণে নিয়ে এসো, যাতে তোমার সেই প্রস্তুতিটা হয়। তবে গিয়ে গীতা তুমি অনেক ভাল বুঝতে পারবে।

স্বামীজী যখন বলছেন, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, তখন তিনি কি বলতে চাইছেন? আসলে বলতে চাইছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম। স্বামীজী তাঁর লেকচারে বার বার বলছেন, বেদান্ত শুধু কোন তত্ত্ব না, এটা কার্যকরী, জীবনে নামানোর জন্য। শঙ্করাচার্য এত বড় ভাষ্যকার, তিনিও এত জোর দিয়ে বলেননি, যেটা স্বামীজী বলেছেন। শঙ্করাচার্যের চোদ্দশ বছর পর স্বামীজী এসেছেন, তত দিনে সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে, স্বামীজীও তাই এই শব্দটা আনতে পারলেন – **প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত**। নূতন কিছু কি স্বামীজী বলেছেন? একেবারেই না, প্রত্যেকটি উপনিষদ প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, একটু আগে আমরা ঈশোপনিষদের যে মন্ত্র বললাম, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি*, এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। পুরো গীতার সাতশটি শ্লোক প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। এই সাতশ শ্লোকের মধ্যে আবার এই পঞ্চম অধ্যায় হল একেবারে সরাসরি প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। সন্ন্যাসযোগ বা পঞ্চম অধ্যায় হল দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর লেকচারে পঞ্চম অধ্যায় থেকে প্রচুর শ্লোক উল্লেখ করতেন, তিনিও দেখাচ্ছেন পঞ্চম অধ্যায় কিভাবে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, living Vedant এবং এটাই তোমার আসল ধর্ম।

সাপের মাথায় মণি কিন্তু সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে, আমাদের ঠিক এই দুরবস্থা। ঘুরে ফিরে আমাদের সব চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু আমাদের শরীর, মনের টানাপোড়েন। দেহের চিন্তা, মনের টানাপোড়েনের চিন্তা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে চিন্তা, এর বাইরে আমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, এর বাইরে আমরা যেতেই পারছি না। তাহলে অন্ততঃ এটা বলুন, আমি পতিত হিন্দু। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনার ধর্ম কি? বলবেন আমি পতিত হিন্দু, গর্ব করে বলতে যাবেন না যে আমি হিন্দু। ধর্মের যে একটি মূল কথা, সেটাতেই এক বিন্দু বিশ্বাস নেই, কিসের হিন্দু আপনি? স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I do not consider a Hindu a Hindu, if he is not spiritual। ধর্মের কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি কিসের হিন্দু? প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের যে আদর্শ, সন্ন্যাস জীবন যেটা, এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

আমাদের ঋষিরা চারটে আশ্রম ঠিক করে দিলেন – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তুমি শিখবে বেদান্ত জিনিসটা কি, গার্হস্থে কর্মযোগের মাধ্যমে তুমি নিজেকে গড়ে তুলবে, বাণপ্রস্থে চিন্তন করে করে তোমার মনকে বেদান্তের ভাবে দৃঢ় করবে আর সন্ন্যাস আশ্রমে শুধু এই চেষ্টাই থাকবে যাতে চব্বিশ ঘন্টা বেদান্তের অনুশীলন করতে পার এবং ওই জ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে এই জীবনেই যেন মুক্ত হয়ে যেতে পার। হিন্দুরা মৃত্যুর পর মুক্তির কথা কখনই বলে না, হিন্দুরা বলে *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, এখানে এই শরীরে তোমাকে মুক্তি পেতে হবে। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোক শুধু এই কথা বলছে – প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

ইদানিং সবাই বলে আমি অদ্বৈত বেদান্ত জানতে চাই। কোন ছোটবেলা থেকে আমরা বেদান্তের কথা শুনে শুনে বড় হয়েছি, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে বেদান্তকে নামাতে গিয়ে আমরা কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাই। হিন্দুদের আজ এই দুরবস্থার মূল কারণ এটাই, এত বড় যে একটা আধ্যাত্মিক সত্য, যে সত্য বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে নেই; সেই সত্যকে আমরা জীবনে নামাতে পারছি না। এই বিদ্যা আমরা পরম্পরায় পেয়েছি। আমাদের ঋষিরা তখনকার সমাজে কত হাজার বছর এগিয়ে ছিলেন কল্পনা করা যায় না। ব্যাসদেব পুরো সেই জিনিসটাকে গুছিয়ে গীতায় রাখলেন,

this is practical Vedant। তার মধ্যে আবার এই পঞ্চম অধ্যায়ে practical Vedantaকে পুরো ঠেসে রেখে দিলেন। প্রথম একটা কি দুটো শ্লোক প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে আছে, কিন্তু পরের প্রত্যেকটি শ্লোক জীবনের সর্ব অবস্থায়, প্রতিটি দিন, প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগানোর জন্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তকে একভাবে এনেছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে পুরো ঢেলে রেখে দিচ্ছেন, এখানে কোন ঢাকাঢাকি চাপাচাপির কিছু নেই –এই হল তোমার জীবনের আদর্শ। পঞ্চম অধ্যায় হল হিন্দুদের জীবনের আদর্শ। পঞ্চম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে এটাই তোমার জন্য শেষ কথা, এটাই তোমাকে সারা জীবন কঠোর ভাবে অনুশীলন করে যেতে হবে। দিনে তুমি এর কথা ভাববে, রাত্রে তুমি এটাকে নিয়ে ভাববে, এটাকে নিয়ে তুমি চিন্তন কর, চিন্তন আর অনুশীলন করে এটার সঙ্গে তুমি এক হয়ে যাও। এটাই হবে তোমার ধর্ম জীবন। যদি এটা না করতে পারো, সারা জীবন তোমাকে কাঁদতে হবে। এখনও তো কাঁদছ, করোনা নিয়ে কাঁদছ, ঘরবন্দী হয়ে কাঁদছ, রোগ-শোকে কাঁদছ, অজানা ভয়-ভীতিতে কাঁদছ। কেন তোমাদের জীবনে এত কান্না, কারণ যে আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের পূর্বজরা দিয়ে গেছেন, সেই সত্য থেকে তোমরা এত বেশি পিছিয়ে আছ যে, তোমরা কিছুই ধরতে পারছ না। তোমাদের পূর্বজরা কত তপস্যা, কত সংগ্রাম করে এই সত্যগুলিকে ধরলেন, ধরে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে গেলেন যাতে আমরাও এই সত্যকে ধরতে পারি। কিন্তু আমরা ধরব না।

*অহং ব্রহ্মাস্মি* এই সত্যকে দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে নামানো যেতে পারে? এই ভাবনাটা দেশ ও কাল থেকে অনেক অনেক বেশি এগিয়ে। ব্যাসদেব জীবনের এই আদর্শকে গীতাতে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, শঙ্করাচার্য এর উপর ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন, স্বামীজী লেকচারের মাধ্যমে এটাকে আরও যুগোপযুগি করে আমাদের সামনে রেখে দিলেন। স্বামীজীকে এক জায়গায় একজন বলছেন, স্বামীজী আপনি যে বিদেশে ওদের বেদান্তের কথা বলছেন ওরা বেদান্তের কি বুঝবে! স্বামীজী বলছেন, ওরা আরও ভাল বুঝবে। কারণ ওদের শক্তি আছে, ভারতে শক্তি কোথায়, তমোগুণী সব। ঠাকুর বলছেন, ও দেশে লোকেরা গরু কিনতে গেলে গরুর লেজে হাত দেয়, গরু যদি শুয়ে পড়ে ওই গরু তারা কেনে না। আমরা হলাম ওই রকম, লেজে হাত দিলেই শুয়ে পড়া গরু। তিড়িং বিড়িং করে লাফানোর জন্য শক্তি দরকার, সেই শক্তিটাও আমাদের নেই।

আমরা সন্ন্যাস বলতে কি মনে করি? সন্ন্যাস মানে মাথা কামিয়ে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ানো, সন্ন্যাস মানে লোকেদের উপদেশ দেওয়া, সন্ন্যাস মানে নিরামিষ খাওয়া। আর যারা কোন কিছু পারে না, কোথায় কিছু সুযোগ পায় না, তারা সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তার সাথে মনে করা, সন্ন্যাসীরা হল সমাজের প্যারাসাইটস আর এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে আর-একটা বড় বিশেষণ হল, সন্ন্যাসী মানেই ঢপবাজ। অথচ অবাক লাগে যে, হিন্দু জীবনধারাই হল সন্ন্যাসের জীবনধারা। গীতার পঞ্চম অধ্যায় দেখিয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাস মানে কি। যখন বলছেন *অহং ব্রহ্মাস্মি*, তার মানে তুমি সত্যিকারের জেনে গেলে যে তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। এখানে কল্পনার কিছু নেই, সত্যিকারের যখন তুমি জেনে গেলে তুমিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁর ভিতরে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, সমস্ত শক্তি রয়েছে আর যাঁর ভিতর থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। বাঘ, সিংহ, সাপ, বিছে বেরিয়েছে; সেই একই জায়গা থেকে গান্ধীজী, নাথুরাম, যীশু, ল্যাজারাস সবাই বেরিয়েছে, জগতের সমস্ত শুভ জিনিস, সমস্ত অশুভ জিনিস তোমার ভিতর থেকেই বেরিয়েছে; কারণ তুমি ছাড়া তো এখানে আর কেউ নেই; এই জ্ঞান যাঁর হয়ে যাবে, তখন তাঁর মধ্যে কিসের অপূর্ণতা থাকবে, কিসের জন্য সে কাজ করবে; কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ কিছুই তাঁর থাকবে না। এই অবস্থাকেই বলে সন্ন্যাস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই অবস্থাকেই বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞ। যদিও এটা জীবনের আদর্শ, যে কোন মানুষ এই পথে যেতে পারে, কিন্তু সবাই পারে না; মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সন্ন্যাসের পথে আসেন।

এটাই দুর্ভাগ্য যে, যারা এখনও প্রস্তুত নয়, যারা এখনও শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়নি, যাদের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে বললেন, *য আস্তে মনসা স্মরণ*, মনে মনে ভোগ করতে চাইছে, কিন্তু বাইরে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ঢপবাজি করে যাচ্ছে, এদের সংখ্যাই সমাজে বেশি। বাইরে নিজেকে কেন গুটিয়ে রেখেছে? কারণ তারা জানে যে সন্ন্যাসের একটা বিরাট সম্মান আছে, সন্ন্যাসের ভাব দেখাতে পারলে আমিও সম্মান পাব। যার বিদ্যা আছে সে সম্মান পায়, বিদেশের ডিগ্রি যার আছে সে সম্মান পায়, ঠিক তেমনি বেদান্তের শেষ অবস্থায় যিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর অবশ্যই একটা সম্মান থাকবে। আর যেখানে আসল আছে, সেখানে নকল থাকবে। কিছু দিন আগে জানা গেল, দু হাজার টাকার নোটের নকল বেশি হচ্ছে, কারণ দু হাজার টাকার দাম অনেক বেশি। নকল যদি করতেই হয়, একশ টাকার নকল কেন করতে যাব, দু হাজার টাকার নোটই নকল করব। নকল যদি করতেই হয় সন্ন্যাসের নকলই করব, তাই ঢপ সন্ন্যাসী কিছু থাকবেই। ঢপ সন্ন্যাসী কিছু থাকার জন্য সন্ন্যাসীকুলের দুর্নাম হয়ে গেছে যে, সন্ন্যাসী মানেই ঢপ। কিন্তু যত দুর্নামই হোক, এটাই জীবনের আদর্শ। গীতা বলছেন, এটাই তোমার জীবনের আদর্শ, এটাই তোমার জন্য স্বাভাবিক।

কিন্তু তুমি যদি না পার, তাহলে এর থেকে এক ধাপ নীচে যেটা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন জ্ঞান করার চেষ্টা কর। কিভাবে করবে? এর জন্য বলছেন নিষ্কাম কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগে তোমার উপর যে দায়ীত্ব এসে গেছে, নিঃস্বার্থ ভাবে আমার এটা কর্তব্য তাই আমি করে দিলাম। যেভাবে রোজ সকালে উঠে আমরা দাঁত ব্রাশ করি, স্নান করি, জানি এটা আমার কর্তব্য, এটাই আমাকে করতে হবে, এই ভাব নিয়ে যখন সব কাজ করা হয়, সেটাই তখন নিষ্কাম কর্মযোগ হয়ে যায়। মায়েরা বাড়িতে কত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, সকালে উঠে বিছানা তুলছেন, চাদর, বালিশ সব সাজিয়ে রেখে ঝাঁটা দিয়ে বিছানা পরিষ্কার করছেন, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার আয়োজন করেন, এখানে কোন চাহিদা নেই, কোন প্রত্যাশা নেই। ঠিক তেমনি সমস্ত কর্ম এই মানসিকতাকে নিয়ে করতে হবে, আমার এটা কর্তব্য তাই করছি। আমি চাকরি করছি, চাকরি করে দুটো টাকা পাচ্ছি, এই টাকায় আমার ঘর সংসার চলছে, আমার দেহ চলছে, সবচেয়ে বড় হল আমার জীবনের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যকে এটা দিয়ে পূরণ করতে পারছি।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমার এক ছাত্র ছিল, খুব ইন্টেলিজেন্ট, জিআরই পরীক্ষায় চব্বিশ নম্বরে চব্বিশ পেয়েছিল। ভারত যবে থেকে স্বাধীন হয়েছে, তারপর থেকে সে হল দ্বিতীয় ভারতীয় যে চব্বিশ নম্বরে চব্বিশ পেয়েছে। দিল্লী গেলে ছেলেটি পুরো সময় আমার সঙ্গে থাকত। সেই সময় উপমন্যু চ্যাটার্জী আইএএস হয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টর পদে ছিলেন, অন্য দিকে তিনি আবার একজন খুব নামকরা ইংরাজী সাহিত্যের লেখক। কাজে কর্মে তাঁর সাথে আমাকে দেখা করতে যেতে হত, এমনিতেও ওনার সাথে আমার কলেজ লাইফ থেকেই পরিচয়, কলেজে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম, ভাল বন্ধু।

একবার এই ছেলেটিকে নিয়ে আমি উপমন্যু চ্যাটার্জীর সাথে দেখা করতে গেছি। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান, ওনার সাথে দেখা করে বেরিয়ে এসে আমাকে বলছে, 'আমি যত আইএএস অফিসার দেখেছি উনি হলেন সব থেকে ব্যালেন্সড লোক। কিন্তু এই ভদ্রলোক এখানে বসে কি করছেন, এটা ওনার জন্য নয়'। আমি ওকে বললাম, 'তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো, পরিচয় তো হয়েই গেছে'। আবার আমার সাথে উপমন্যু চ্যাটার্জীর চেম্বারে গেল। ঢুকে বলছে, 'Sir you do not belong here, আপনার জন্য এটা না, আপনি এখানে কেন আছেন'? উপমন্যু চ্যাটার্জী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পেটের জন্য'। আমি তখন বাইরে ছিলাম, ছেলেটি শুনে অবাক হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলল'? বললেন, 'পেটের জন্য'। আমি বললাম, 'এটাই ঠিক উত্তর'।

উপমন্যু চ্যাটার্জী আমাকে বলেছিলেন, লেখাটা আমার সাধনা। আমাদের জীবনে কি কিছু আছে যে বলতে পারব, এই জিনিসটা আমার সাধনা? কিছুই নেই। উপমন্যু চ্যাটার্জী জানেন তিনি আসলে লেখক, কিন্তু তাঁকে তো পেটটা চালাতে হবে। ভারতে এখন আর আগেকার দিন নেই যে ব্রাহ্মণরা পেট চালাবার জন্য এখানে সেখানে গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন, ভিক্ষা না পেলে নিজেও অভুক্ত থাকবেন, নিজের সন্তানকেও অভুক্ত রাখবেন, সাথে তাঁর স্ত্রীও অভুক্ত থাকবেন। এখন একটা চাকরি চাই। আইএএস হয়েছেন, যতটুকু কাজ ততটুকু করে দেন, ফাঁকা সময়, ছুটিতে নিজের লেখার সাধনা করে যান। আজকে তাঁকে ভারতে ইংরাজী সাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে গণ্য করা হয়। এই হচ্ছে জীবনে একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে চলা। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি বা যে ইয়ং ছেলেরা চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? কিছুই জানে না, কোথায় দৌড়াচ্ছে, কোথায় থামছে, কিছুই জানে না। কুকুরের লেজে যদি কেউ স্পিরিট বা পেট্রল লাগিয়ে দেয়, দেওয়ার ফলে ওর লেজে ঠাণ্ডা লাগে তাতে ভয়ের চোটে কুকুরটা দৌড়াতে থাকে, ভাবে কি হয়ে গেল রে ভাই। কুকুরটা দৌড়াতেই থাকে, হাওয়া লাগার জন্য আরও ঠাণ্ডা বেশি লাগে, ভয়ে আরও জোরে দৌড়াতে থাকে। কেউ জানে না, কোথায় দৌড়ে পালাতে চাইছে। পুরো মানবজাতি আজ এভাবে দৌড়াচ্ছে।

হনুমানজীর লেজে এখন আগুন লেগে আছে। হনুমানজী এখন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন, লঙ্কা পুড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরাও আমাদের চারিদিকে যে লঙ্কা রয়েছে পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই, উদ্দেশ্য নেই। যে মুহূর্তে জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে নেবে, যে কোন আদর্শ, এই আদর্শই একদিন তাকে *অহং ব্রহ্মাস্মি*র দিকে নিয়ে যাবে। তখন এটা বুঝতে পারবে, আমি যে কাজই করছি, চাকরি করি বা ব্যবসা করি, এটা আমি করছি আমার ঘর সংসার চালানোর জন্য। গীতা এটাই বলছেন, তোমার উদ্দেশ্য হল *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই জ্ঞানের সঙ্গে এক হওয়া। যতক্ষণ এর সাথে এক হতে না পারছ, ততক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাও, অর্থাৎ অন্য কোন ধরণের স্বার্থ তার মধ্যে থাকবে না। আমি এই কাজ করছি, কাজ করে যে কটা টাকা পাব তাই দিয়ে আমার ঘর সংসার চালাবো, আমি এটার দায়ীত্ব নিয়েছি, তাই এর দায়ীত্ব পালন করছি। আপনার সন্তান হয়েছে, ভগবান আপনাকে একটা উপহার দিলেন। কেন নিজেকে তার সাথে জুড়ে দিচ্ছেন? জুড়বেন না, কষ্ট পাবেন। এই ভাবেই আমরা পাঁচজনের সাথে জুড়ে যাই, আর সেখান থেকে কষ্ট নিতেই থাকি।

হিন্দু জীবনে এটা কখনই আদর্শ না, হিন্দু জীবনে কখন এর অনুমতি দেয় না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত শুধু এই দুটো জিনিস –একটা হল সন্ন্যাস, এটা হল আদর্শ; দ্বিতীয় হল, যারা সমস্ত ত্যাগ পারবেন না, তাদের জন্য কর্মফল ত্যাগ। কর্মফল ত্যাগ মানে ফলের প্রতি আসক্তি না থাকা। প্রথম হল কর্মত্যাগ, মানে সন্ন্যাসী, প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা; দ্বিতীয় এটা যদি না পারো তাহলে কর্মফল ত্যাগ। সমগ্র গীতাতে এই দুটো জিনিসই বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। আর এর ফল কি হয়, এটাই আমরা গীতাতে দেখে যাচ্ছি।

পঞ্চম অধ্যায় পড়ার সময় মনে হবে, কি সুন্দর সুন্দর আদর্শ, কিন্তু জীবনে লাগানো যাবে না। ঠাকুর যদি না আসতেন, স্বামীজী না আসতেন, শ্রীশ্রীমা যদি না আসতেন, নিজের জীবনে এনারা যদি না দেখাতেন, তাহলে আমাদের এটাই মনে হত যে, গীতার এই কথাগুলো সত্যিই খুব সুন্দর সুন্দর কথা, কিন্তু আজকালকার দিনে এসব কথা চলে না। কিন্তু পুরো বিপরীত, গীতা, বেদান্ত আজকের দিনেই চলবে, কারণ সমাজ এখন অনেক এগিয়ে এসেছে। পাঁচ হাজার বছর আগে এই কথা যত লোক বুঝতে পারতেন, আজকের দিনে তার থেকে অনেক বেশি লোকের বোঝার ক্ষমতা হয়ে গেছে। এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে খুব সংক্ষেপে এই দুটি কথা জেনে রাখা দরকার – সন্ন্যাস নেবে তাঁরাই, যাঁদের এই বোধটা এসে গেছে আর সেখান থেকে আত্মজ্ঞানও হয়ে গেছে যে, আত্মাই একমাত্র সত্য; কিন্তু যাঁদের এই বোধ হয়নি, আমাদের মত লোক যাঁরা, তাঁরা কাজ করবেন, কাজ করার সময় ফলের প্রতি তাঁর অনাসক্তি থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকাতে আচার্য শুরু করতে গিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় থেকে অনেকগুলো শ্লোক উল্লেখ করছেন, যেমন *কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ, স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্, শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি,* এই শ্লোকগুলিতে বোঝাচ্ছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কোন কর্ম থাকে না। যেটা আমরা সন্ন্যাসের আদর্শের কথাতে বললাম, এটাই ঠিক ঠিক হিন্দুদের আদর্শ। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ হল সন্ন্যাস। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ হল বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হিন্দুদের একমাত্র আদর্শ তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। যত দিন এই অবস্থায় আপনি না যেতে পারছেন, তত দিন আপনি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করুন, ঈশ্বরের সেবক মনে করুন, বা অন্য যাই মনে করুন, কিন্তু এই সত্যটাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে। অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁরা এর শিক্ষাই দেন। অবতার একটা শিক্ষাই দেন, তুমি সেই ব্রহ্ম।

কিন্তু তার সাথে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ*, ওঠো, যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। কিন্তু দুটো পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না? তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে মিলছে না তো। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরে যে প্রশ্ন জেগেছিল, চতুর্থ অধ্যায়ের পর অর্জুনের মনে সেই একই প্রশ্ন জেগেছে। আপনি যে এগুলো বলছেন, একটু বলুন তো এই দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল? তার মানে অর্জুন জানতে চাইছেন, সন্ন্যাস ভাল, নাকি কাজ করা ভাল? এটাকে আচার্য এখানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন।

আগে আচার্য যেটা বলেছিলেন সেখানে অন্যান্য দর্শনকে আটকানোর জন্য তাঁকে বলতে হয়েছিল। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ঠিকই, কিন্তু আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিতে দেখি যে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন আত্মজ্ঞানী, বা এই ধরণের আরও যাঁরা ছিলেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী ছিলেন, যিনি একত্ব দেখে নিয়েছেন তাঁদের আর কিসের কর্তব্য! সামনে দেখলেন কেউ কষ্টে আছে, তার কষ্টটা দূর করে দিলেন, এই যা। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান জনকাদির কথা বললেন, তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করেছেন। যেমন স্বামীজী, তাঁর আত্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন আর দেশের কি করে ভাল হয়, সেটার ব্যবস্থা করলেন। এনারা হলেন আচার্য, অবতার আচার্যের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিক্ষা দেন। অবতার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, আচার্য সেটারই প্রচার প্রসার করেন।

প্রথমের দিকে আমরা আচার্যের যে কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আচার্য সেখানে বলছেন, উত্তম শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রসার হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে সেই উত্তম শিষ্য পেয়েছিলেন। আচার্য যাঁরা, অবতারের সঙ্গে যাঁরা আসেন, তাঁদের ভিতর একটা শক্তি থাকে, ফলে অবতারের কথাগুলোকে তিনি যুগোপযুগী করে এবং সামাজিক অবস্থাটাকে মাথায় রেখে, অবতারের শিক্ষাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যান। অবতার ও অবতারের সঙ্গী যাঁরা, এই শ্রেনীটাকে ছেড়ে রাখতে হয়। এনাদের বাইরে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ পাই, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত যাঁরা ছিলেন, বা যাঁরা আরও উচ্চতর, তাঁরা দেখেন, ঈশ্বর বৈ কিছু নেই, আমার আর কিছু লাগবে না, আর কারুর প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই, এনারা সবাই খুব উন্নতমানের মহাত্মা। ওনারা নিজের জন্যও কিছু চেষ্টা করেন না, অপরের জন্যও বেশি কিছু করতে যান না। যেটা চোখে পড়ে গেল, সেটা করে দিয়ে বেরিয়ে যান। এনাদের বাইরে বাকি যাঁরা আছেন, তাঁদের সবাইকে কর্ম করতে হয়, খাটতে হয়।

কিন্তু গুরু বা আচার্যকে দেখে অনেক সময় তাঁর শিষ্যরাও কাজ করা ছেড়ে দেন। অনেকে এসে আমাদের বলেন, আমি সন্ন্যাস নিতে চাই। সন্ন্যাস কেন নিতে চাইছে? হয় গ্ল্যামার আছে বলে, নয়তো তার জীবনে অনেক হতাশা আছে বলে। বেশির ভাগ লোক সন্ন্যাস নিতে চায় এই দুটো কারণে। কিন্তু যার জীবনের সব কিছু ভাল চলছে, সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছে, আমি

আমার আন্তরিক উত্থান চাই, আমি ভিতর থেকে বড় হতে চাই; এই ধরণের যাঁরা সন্ন্যাস জীবন বেছে নিতে চাইছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। গীতা এখানে এটাই বলছেন, যাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি, তারাও সন্ন্যাস নিতে পারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের জন্য এটা মঙ্গলদায়ক না, এদের জন্য এখন কাজ করাটাই মঙ্গল। আচার্য তাঁর ভূমিকাতে এটাকে নিয়েই বলছেন, আর এখান থেকেই অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয় এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।

*(অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন – হে কৃষ্ণ, আপনি শাস্ত্রীয় কর্মের ত্যাগ আবার শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। এই দুটোর মধ্যে যেটা প্রকৃতপক্ষে মোক্ষদায়ক সেটা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন।)*

হে কৃষ্ণ, আপনি কখন কর্মসন্ন্যাসের প্রশংসা করছেন, আবার কখন কর্মযোগের প্রশংসা করছেন, যেমন আচার্য কিছু শ্লোক উল্লেখ করছেন, একবার বলছেন *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ*, সন্ন্যাসের কথা বললেন, আবার সেখান থেকে বলছেন *ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ*, অর্জুন তুমি ওঠো, যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। *যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং*, এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশি ভাল, *তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্*, সেটা নিশ্চিত করে আমাকে বলুন। হে প্রভু, আপনার কথা শুনে আমার ভিতরটা পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আমাকে সুনিশ্চিত করে বলে দিন তো আমাকে কি করতে হবে। এই ধরণের সংশয় সবারই হয়। অনেক সময় যাঁরা জ্ঞানীগুণী, তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা অনেক কিছু কথা যখন বললে, যে কথাগুলো শুনে আমাদের সব কিছু গুলিয়ে যায়। বেলুড় মঠে স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে।

একজন বয়স্ক মানুষ এসে একদিন স্বামীজীকে বলছেন, 'স্বামীজী আমি ধর্মকর্ম সেরকম কিছু করি না, তবে আমি রোজ গঙ্গাস্নান করি, আর মনে করি গঙ্গাস্নান আদি করলেই আমার সব হবে'। স্বামীজী বললেন, 'গঙ্গাস্নান করে কিছু হয় না, ওই দিয়ে ধর্মটর্ম হয় না, সাধনা করুন'। কিছুক্ষণ পরে এমনই কপাল যে, একজন যুবক এসে স্বামীজীকে বলছে, 'আমি এই গঙ্গাস্নান আদি এসব মানি না, ওতে কিছু হয় না, এগুলো বেকার'। স্বামীজী সেই যুবককে বলছেন, 'না না, গঙ্গাস্নান অবশ্যই করা উচিত, রোজ গঙ্গাস্নান করবে, এতেই সব ধর্মকর্ম হবে'। ওখানে একজন ছিল, যুবকটি চলে যাওয়ার পর সে বলছে, 'স্বামীজী আপনি দুজনকে পুরো বিপরীত কথা বললেন, আপনি একটু ঠিক করে বলুন তো কোনটা ঠিক'? স্বামীজী হেসে বলছেন, 'আমি আচার্য, যার যেটা দরকার তাকে আমি তার মত বলি। তোমার কি দরকার বল'।

ঘটনাটা প্রথম যখন একজন মহারাজের কাছে শুনেছিলাম তখন আমার এত সুন্দর লেগেছিল যে কি বলব। এই হলেন আচার্য। আচার্য পুরো চিত্রটা নেন, পুরো চিত্রটাই তাঁর কাছে থাকার জন্য একে এক রকম বলবেন, এক রকম ভালবাসবেন; আর তাকে আর-এক রকম বলবেন, আর-এক রকম ভালবাসবেন। কোন আচার্য সবার প্রতি সমান হবেন না। এমনকি দ্রোণাচার্য, যিনি ধনুর্বেদের আচার্য, তাঁর কাছেও সব শিষ্য সমান ছিল না, আচার্য কখন সব শিষ্যকে সমান ভাবে শিক্ষা দেন না, দিতেই পারেন না। যার যেমন দরকার আচার্য তাকে তেমনটা দেন। যার যেখানে ছিদ্র আছে, যেখানে দুর্বলতা আছে, আচার্য সেটাকে ঠিক করে এগিয়ে দেন। আচার্যের অন্তর্দৃষ্টি এত গভীর যে, শিষ্য দুটো কথা বললেই বুঝে যান এর কি লাগবে।

আচার্য এখানে বলছেন, *প্রশস্যতরং চ অনুষ্ঠেয়ম্*, যেটা শ্রেষ্ঠ মানুষ সেটাই করতে চায়। বাজারে গেলে প্রথমেই দোকানদারকে বলি, ভাল থেকে দেবেন। কারণ খারাপ জিনিস কেউ নিতে চায় না। বাড়িতে যখন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ওঠে, তখন বলে, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতে

হবে। সব কিছুতেই আমরা ভালটা খুঁজি। জীবনের আদর্শ যখন আসে, সেখানেও আমরা ভালটাই বাছতে চাই, অর্জুনও তাই বলছেন। অর্জুনকে আগে বললেন, তুমি যুদ্ধ কর, তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসের কথা বলতে শুরু করে দিলেন, সেখান থেকে আবার বলছেন, তুমি ওঠো, উঠে যুদ্ধ কর। কারণ একই মানুষ এক সঙ্গে দুটো জিনিস করতে পারে না। একই সঙ্গে কর্মযোগও করব আবার কর্মসন্ন্যাসও করব, তা হয় না। একই সঙ্গে হাসব আবার কাঁদব, দুটো জিনিস একসাথে হয় না। ঠিক তেমনি কর্মে সন্ন্যাস আর কর্ম করব, দুটো এক সঙ্গে হতে পারে না। তাহলে আপনি বলুন আমার জন্য কোনটা ঠিক। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ নিয়ে অর্জুনের মনে একটা সংশয় এসেছে। এই সংশয়ের নিরসন করার জন্য ভগবান এবার অর্জুনকে বলতে শুরু করলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে।।২।।

*(উত্তরে ভগবান বললেন – কর্মের ত্যাগ ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয়ই মুক্তিমার্গ; কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানহীন কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ।)*

ভগবান বলছেন, কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ অনেক ভাল। এই কথা কিন্তু ভগবান যারা জ্ঞানী তাদের সম্বন্ধে বলছেন না, যারা অজ্ঞানী, যাদের এখনও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হয়নি, তাদের জন্য এই কথা বলছেন। তবে দুটোই আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। সমস্ত কর্মের ত্যাগ যেমন নিঃশ্রেয়সের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি কর্মও নিয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা যে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, বাবা-মা, আত্মীয় পরিজনদের ত্যাগ করেছেন, এটাও তঁদের আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। আর যারা সংসারে থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন, তাঁকেও এই গৃহস্থ ধর্ম নিঃশ্রেয়সের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে, কি করতে হবে, সেটাই এবার আমরা এখানে আলোচনা করব। আচার্য বলছেন, *জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ*, জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দুটোই ভাল, কর্মত্যাগ আর কর্ম দুটোই ভাল। তবে যারা অজ্ঞানী তাদের জন্য কর্মযোগ সব সময়ই ভাল। কর্ম করলে কি হয়, কর্ম করলে মনের আবর্জনাগুলি পুড়ে যায়।

এক সময় আমাকে দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল পদের দায়ীত্ব সামলাতে হত। তখন আমার বয়স চৌত্রিশ পয়ত্রিশ। আমি কিছু দিন ধরে চাইছিলাম সব কাজ ছেড়ে উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করব। একজন সিনিয়র মহারাজ, এখন গত হয়েছেন, খুব জ্ঞানীগুণী ছিলেন, তিনি আমার কথা জানতে পেরে বললেন, 'যোগশাস্ত্রে যে সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ কথাগুলো বলা হয়েছে, একবার ভেবে দেখ তো সত্য কথা বলা, কাউকে হিংসা না করা, চুরি না করা, উপহার না নেওয়া, এগুলোর অনুশীলন হিমালয়ের গুহায় বসে হবে, নাকি সমাজের মাঝখানে থেকে অনুশীলন হবে? কাজকর্ম যদি নাই কর, পাঁচজনের মধ্যে যদি নাই থাক তাহলে এগুলোর অনুশীলন কোথায় করবে? যে বোবা, তার সত্য কি আর মিথ্যা কি, অন্ধের দিবা কি আর রাত কি'।

আমরা আসলে বুঝতে পারি না, মানতে চাই না যে, আমাদের পুরো মাথাটা আবর্জনায় ভরা। ধাপায় যেমন কলকাতার সমস্ত আবর্জনা পড়ে, আমাদের মাথাটা হল সমস্ত আবর্জনার ধাপা। এই মেন্টাল ডাস্টবিন যদি পরিষ্কার না হয়, কি করে এখানে ফুল ফুটবে! আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফুল ফোটানর জন্য আগে এই আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের মনের ভিতর আগাছা হয়ে আছে, একদিকে আগাছা উপড়ে ফেলছি, অন্য দিকে আগাছার বীজ পড়ছে, আবার আগাছা জন্মাচ্ছে। উপায় হল আগাছাকে পুড়িয়ে দাও, একেবারে বীজ সমেত পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পোড়ানটা হয় – মানুষ যখন কাজ করে, মানুষ যখন অবিশ্রান্ত ভাবে হাড়ভাঙা খাটে। আপনারা দেখবেন বাড়িতে ছেলের বউ আছে, সে শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না, আবার শাশুড়ি পুত্রবধূকে

সহ্য করতে পারে না। এই যে সহ্য হয় না, একটা উপায় বার করতে হবে, যেটা দিয়ে এক অপরকে সহ্য করবে, এটাই মনের আবর্জনাকে পোড়ায়। সত্য কথা বললে অশান্তি লাগবে, মিথ্যা কথা বললে বিবেক দংশন হয়, ফলে ধীরে ধীরে নিজের চরিত্রের পরিবর্তন হয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে এক ছাত্রকে জানতাম, পরে ছেলেটি নিজের কর্মক্ষেত্রে বিরাট বড় হয়েছে। ওর সাথে একবার দেখা হওয়ার পর ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে আমি দুষ্টুমি করতে, মিথ্যা কথা বলতে কোন দিন ধরতে পারলাম না'। ছেলেটি ছাত্র অবস্থায় ক্লাশে ফার্স্ট সেকেণ্ডের মধ্যে থাকত। খুব ভাল ছেলে, কক্ষণ দুষ্টুমি করত না, মিথ্যা কথা বলত না। ছেলেটি তখন আমাকে বলল, 'দেখুন মহারাজ, বদমাইশি করতে আমারও খুব ইচ্ছে করত, অন্যরা যা বদমাইশি করে তার থেকে আমি অনেক বেশি বদমাইশি করতে পারতাম, মিথ্যা কথা বলাতে এদের থেকে আমি অনেক পটু। কিন্তু পরে ভাবি, আপনি যখন জিজ্ঞেস করবেন, এটা কি তুমি করেছিলে? তখন আমি সত্যি কথা বলতে পারব না, আবার মিথ্যা কথা বললে বিবেকের দংশন হবে, আপনাকে ভালবাসি কিনা। এই দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার জন্য আমি বদমাইশি করতাম না'। একটা ক্লাশ টেনের ছেলের কি level of matuirity! ওর উত্তরটা শুনে আমি চমকে উঠেছি। আমি নিজেও কখন ভাবিনি যে সত্য এভাবেও অনুশীলন করা যায়।

সত্য বলতে যদি কারুর কষ্ট হয়, তাহলে তার সত্য থেকে দূরে থাকা দরকার। মিথ্যে বললে যদি বিবেক দংশন হয়, তাহলে উপায় কি? নিজে সৎ হয়ে যাওয়া। নিজে সৎ হয়ে গেলে আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। একদিনেই তো সৎ হয়ে যাওয়া যাবে না, লড়াই করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সত্য কলির তপস্যা। সত্য কথা শুধু বলা না, ও জিনিস পারা যায় না, সমাজে চলতে গিয়ে অনেক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যাবেন। আমার আপনার ভিতর হাজারটা দুর্বলতা রয়েছে, সেই দুর্বলতাকে যখন পূরণ করতে যাওয়া হবে, তখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সত্য বলতে পারব না, আবার মিথ্যে বললে মন এমন খুঁত খুঁত করবে যে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। উপায় হল, নিজের চরিত্রের পরিবর্তন। যদি কেউ সত্যকে ধরে ধীরে ধীরে সে সৎ হয়ে যায়। সৎ হলেই সে সাত্ত্বিক গুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সাত্ত্বিক গুণে প্রতিষ্ঠিত হলে আধ্যাত্মিক হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

সাধনা হবে কি করে, মনের আবর্জনা যেমন তেমনই; ভিতরে আবর্জনা নিয়ে কি সাধনা করা যায়! নর্মদার তীরেও এক দৃশ্য, হিমালয়ে গঙ্গোত্রিতেও সেই এক দৃশ্য, যেমন আবর্জনা তেমন আবর্জনা নিয়েই সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যেও একজন দুজন মহাপুরুষ আছেন, এনারাই হিন্দু ধর্মকে ধরে রেখেছেন কোন সন্দেহ নেই। আমি একটা সময় উত্তরকাশীতে ছিলাম। ওখানে অনেক কুঠিয়ায়, আখরায় শাস্ত্রপাঠ হয়। দেখতাম বেশ কিছু সাধু অনেক দূর থেকে পাঠ শুনতে আসতেন। একবার আমি একজন সাধুকে এমনি কৌতূহল বশতঃ বললাম, 'অধ্যয়ন আপকা বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়'। দেখেই বোঝা যায় পড়াশোনা করা না, কিন্তু শাস্ত্র পাঠ শুনতে সব জায়গায় যেতেন। আমার কথা শুনে তিনি খুব সুন্দর কথা বললেন, 'পঠন পাঠন মে রহেঙ্গে তো ভটকন্ সে বাচ জায়েঙ্গে'। পড়াশোনা আর শাস্ত্র আলোচনা নিয়ে যদি থাকা যায় মনের চাঞ্চল্য অবস্থা থেকে বেঁচে যাবে। এই যে আমরা গীতার আলোচনা করছি, যাঁরা আলোচনা শুনছেন, তাতে তাঁর উন্নতি না হতে পারে, এগিয়ে যেতে না পারেন, কিন্তু ওই যে মনের চাঞ্চল্য, কি করব, কি করা যায়, কি করব না, এটা থেকে তাঁরা বেঁচে যাচ্ছেন।

কিন্তু একা যদি একটা গুহায় বা ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকেন, কোন দিন আপনার গ্রোথ হবে না। নিজের উত্থানের জন্য সঙ্গ দরকার। একটা স্তরে চলে যাওয়ার পর বলা যেতে পারে, একলা চল রে। কিন্তু তার আগে সঙ্গ দরকার। একটা কাগজকে আগুনে ধরিয়ে মেঝেতে ফেলে দেওয়ার পর কাগজের টুকরোটা পুড়তে পুড়তে নিভে যাবে, দেখা যাবে কাগজ পুরোটা পোড়েনি, অল্প একটু

পোড়া বাকি থেকে গেছে। কাগজ, কাঠ, কয়লা পুরোটা পুড়বে না, একটু থেকে যাবে। এগুলোকে আগুনের মধ্যে দিলে পুরোটাই পুড়ে যাবে। কারণ একা যখন থাকে তখন একশ ভাগ পুড়বে না। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে দিলে পুরোটাই পুড়ে যাবে। আগুনও যখন নিজের কোম্পানির সাথে থাকে তখন দাউ দাউ করে জ্বলবে, আগুনের পুরো শক্তি বেরিয়ে আসবে। একা হয়ে গেলে আগুনেরও শক্তি কমে যায়। আগুন একা কাগজকে পুরোটা পোড়াতে পারে না।

তাহলে সন্ন্যাসী কে? আমরা এর আগে সন্ন্যাসের উপর লম্বা আলোচনা করলাম, সেখানে বলা হল, সন্ন্যাস হল প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের শেষ কথা। প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের জীবন্ত আদর্শ হল সন্ন্যাসী, সেইজন্য ভারতবর্ষ সন্ন্যাসীকে দেখলে মাথা নত করে। যে কোন সন্ন্যাসীকে যখন প্রণাম করা হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে প্রণাম করা হয় না, সেখানে অজান্তায় প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের আদর্শকে প্রণাম করা হয়। বড়দের প্রণাম করা, গুরুজনদের প্রণাম করতে বলা, সেটা আলাদা।

মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, ব্রাহ্মণরা জ্ঞানীদের বেশি সম্মান দেয়, প্রণাম করে; ক্ষত্রিয়রা যার ভিতর বেশি শক্তি ও ক্ষমতা আছে তাকে বেশি সম্মান দেয়; বৈশ্যরা তাদেরই সম্মান দেয় যাদের টাকা বেশি আর শূদ্ররা সম্মান দেয় যাদের বয়স বেশি। যদি দেখা যায়, শুধু বয়স বেশি হওয়ার জন্য কাউকে সম্মান দিচ্ছে, বুঝতে হবে সে শূদ্র। মনু ওখানে সন্ন্যাসীর কথা বলছেন না, আমরা এখানে অন্য ভাবে দেখালাম। সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, শঙ্করাচার্য মাত্র বত্রিশ বছর পৃথিবীতে ছিলেন, কিন্তু সেই সময় সারা ভারত তাঁকে নতমস্তকে সম্মান জানিয়েছে। স্বামীজী মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে চিকাগো ধর্মসভায় যে জ্ঞানের ফোয়ারা দেখালেন গোটা বিশ্ব তাঁর সামনে মাথা নত করে সম্মান দিল, এটা দেখাচ্ছে যে আত্মজ্ঞানে বয়স দেখা হয় না। এবার গীতা সেই সন্ন্যাসীর বর্ণনা করছেন। হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু অধ্যাত্ম, এর সবার যে মুকুট, যেটা মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি, সেই সন্ন্যাসীর বর্ণনা করে বলছেন –

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩।।

*(যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদি শূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলেই জানবে। কারণ হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন।)*

*নিত্যসন্ন্যাসী*, মানে পাক্কা সন্ন্যাসী। একশ ভাগ সন্ন্যাসী কে? বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত কে? তার আগে বলতে হয় সন্ন্যাসী দুই প্রকারের, এক যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, এনাদের বলা হয় বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় বিবিদীষা সন্ন্যাসী, যিনি আত্মজ্ঞান এখনো পাননি, কিন্তু ভিতরে একটা নিষ্ঠা তৈরী হয়ে গেছে, একটা স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং ঐ পথে উনি এখন চলতে শুরু করেছেন। আমরা এখনও বিবিদীষা, আমরা এই পথে চলতে শুরু করেছি। কিন্তু সম্মান দুজনকেই দেওয়া হয়। সম্মান কেন দেওয়া হয়? যিনি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন তিনিও ছাত্র আর যে ক্লাশ টুতে পড়ছে সেও ছাত্র। ছাত্রদের একটা সম্মান থাকে। রেলওয়েজ স্টুডেন্টসদের একটা কনসেশান দেয়, সে তফাৎ করে না যে, আপনি পিএইচডির স্টুডেন্ট নাকি আপনি ক্লাশ টুয়ের স্টুডেন্ট। আর ক্লাশে আপনি টপারে আছেন নাকি বটমে আছেন, রেলওয়েজ এই তফাৎ করে না। ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁদের এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি তাঁরাও গেরুয়া পরে আর যাঁরা ওই অবস্থায় চলে গেছেন তাঁরাও গেরুয়া পরেন। তবে তাঁরা গেরুয়া না পরতে পারেন; যেমন ঠাকুর গেরুয়া না পরলেও কিছু আসে যায় না। স্বামীজীও বিদেশে যখন ছিলেন, গেরুয়া পরতেন না। আবার ভারতে থাকার সময় সব সময় গেরুয়া পরতেন। নিত্যসন্ন্যাসীর আলোচনায় কাপড় নিয়ে আলোচনা হবে না, আলোচনা হবে মন নিয়ে।

*জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী*, তাহলে নিত্যসন্ন্যাসী কে? একশ ভাগ সন্ন্যাসী কে? *যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা তিনি পেতে চাইছেন আর এই জগতে কোন কিছু নেই যেটার প্রতি তাঁর দ্বেষ আছে। নিত্যসন্ন্যাসী কোন জিনিসকে পাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে থাকেন না; আর কোন জিনিসকে ছাড়ার জন্য তিনি উঠেপড়ে আছেন, তাও না – *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ*; যেটা আসছে আসুক, যেটা চলে যাচ্ছে, যাক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে ঠিক এই কথাগুলো বলা হয়েছিল। পুরো জগৎটা তোমার, পুরো জগৎটা তুমি নিজে হয়েছ, এরপর তুমি কাকে চাইবে, কাকে ছাড়বে! সব কিছু তো তুমিই হয়েছ, সব কিছুই তো তোমার; কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেমন নেই, তেমন কোন কিছু প্রতি দ্বেষ থাকার হেতু সেখান থেকে সরে আসারও কিছু নেই।

*নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে*, যে মানুষ এই অবস্থায় চলে গেছে তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না, কোন দ্বৈত ভাব থাকবে না। দ্বৈত না থাকাটা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হওয়া থেকেই চলছে। কোন ধরণের duality নেই, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, জীবন-মৃত্যু, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, শুচি-অশুচি কোন দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব ঠিক করে মন, কিন্তু যিনি নিত্যসন্ন্যাসী, তিনি মনের উর্ধ্বে চলে গেছেন, ফলে তাঁর ভিতর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভগবান অর্জুনকে বলছিলেন, অর্জুন তুমি নির্দ্বন্দ্বো হও। নির্দ্বন্দ্বো মানে সব রকম দ্বন্দ্বের পারে। নির্দ্বন্দ্বের একটা হল ভাল ও মন্দ, তিনি ভাল-মন্দ দেখেন না। দাঁড়িপাল্লা যেমন চাল আর ডালের তফাৎ করে না, সোন আর লোহার তফাৎ করে না, দাঁড়িপাল্লা নির্বিকার। আমার কাছে সোনার দাম আছে, দোকানদারের কাছে সোনার দাম আছে, দাঁড়িপাল্লার কাছে সোনাও যা লোহাও তাই। নিত্যসন্ন্যাসীর মন ঠিক এই রকম হয়ে যায়, নির্বিকার। ফলে কি হয়?

*সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে*, সমস্ত রকম বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান। এখানে বন্ধন মানে জীবন-মৃত্যুর বন্ধন, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। মুক্তি কিভাবে হয়? মানুষ যখন নির্দ্বন্দ্বো হয়ে যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। নির্দ্বন্দ্বো মানে ভাল মন্দের আর কোন তফাৎ থাকে না, জীবন-মৃত্যু তাঁর কাছে সমান। জীবন আমাদের কিছু পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়, কিন্তু মরে যদি যাই, তাতে হলোটা কি, হবে পরে হবে, একটু দেরী হবে। বেঁচে থাকলে একটু ভাল হত, কিন্তু তাই বলে মৃত্যু এসে গেলে যে একেবারে কেঁদে ভেঙে পড়বে, তা কখনই হবে না। এগুলো শুধু কান দিয়ে শুনলাম আর মুখে বলে গেলাম, এতে কিছু হবে না; অনুশীলন করতে হয়। সেইজন্য বলা হল পঞ্চম অধ্যায় হল প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রত্যেকটা জিনিস অনুশীলন সাপেক্ষ।

একজন অফিসে যাবে, খেতে বসেছে। খেতে খেতে মাকে মেজাজ দেখিয়ে বলছে, 'এটা কি রান্না হয়েছে, ডালে নুন নেই, তরকারীটা পুড়ে গেছে'। পিছন থেকে তার গিন্নী খুব গম্ভীর গলায় বলছে, 'মা আজ রান্না করেনি, আমি করেছি'। ভদ্রলোক বলছেন, 'খেতে খেতে ভালই লাগছে'। সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে গেল। মায়ের উপর জোর চালাচ্ছিল, গিন্নী বলতেই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গেছে। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি সুখ-দুঃখের পারে। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মহারাজ রান্নাটা কেমন হয়েছে? তিনি যেটা ঠিক সেটাই বলে দেবেন, বলবেন নুনটা কম হয়েছে। কিন্তু বলার মধ্যে অভিযোগের সুর নেই, একটু হয়ত নুন চেয়ে নেবেন। উচ্ছসিত প্রশংসাতেও তিনি যাবেন না। তিনি যে জড় বুদ্ধির তা না, তিনি যে জানছেন না তা না, তিনি যে পাষাণ হয়ে গেছেন তাও না। বরং অন্যদের থেকে তিনি অনেক বেশি সংবেদনশীল, তাঁর যে কোন বোধ-শোধ নেই তাও না; সব কিছুর বোধ আছে, ভাল-মন্দের বোধ আছে, শীত-উষ্ণের বোধ আছে, সুন্দর-অসুন্দরের বোধ আছে। বরং অন্যদের থেকে অনেক ভাল জানবেন, ভাল বুঝবেন; কারণ মন এখন তাঁর প্রবল অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলছেন, যে ভাল রান্না করতে পারে না, সে কক্ষণ ধর্ম জীবনে এগোতে

পারে না। অনুভূতি সম্পন্ন মানুষরাই এগুলো পারে, একটু ডান দিক বাম দিক হলেই ধরে নেবেন যে, জিনিসটা ঠিকমত হয়নি। কিন্তু তাঁদের কোন চাহিদা নেই, কোন নালিশ নেই।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।৪।।

*(অজ্ঞ লোকেরা সাংখ্য ও যোগকে পরস্পর বিরুদ্ধ ও ভিন্ন-ফল-বিশিষ্ট বলে থাকেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ তা বলেন না। কারণ উভয়ের ফল এক মোক্ষ। সেইজন্য একটি সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হলে উভয়ের ফল মোক্ষ লাভ হয়।)*

সাংখ্য মানে সাংখ্য দর্শনের কথা বলছেন না, সাংখ্য মানে সম্যক্ জ্ঞান, বর্তমান কালে আমরা যাকে জ্ঞানযোগ বলছি। আর যোগ বলতে বোঝাচ্ছেন যে কোন ধরণের চেষ্টাকে, এখানে ভক্তি করাটাও যোগ, কর্মটাও যোগ আর ধ্যান করাটাও যোগ, যোগ মানেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। সাংখ্য হল সন্ন্যাস আর যোগ হল কর্ম। বলছেন, যাদের বালবুদ্ধি তারাই বলে সাংখ্য আলাদা, যোগ আলাদা। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা কক্ষণ সাংখ্য আর কর্মকে আলাদা বলেন না।

*একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্,* একটাতে যদি কেউ অবস্থিত থাকেন, অন্যটার ফলও তিনি পেয়ে যান। পঞ্চম অধ্যায়ের এই চার নম্বর শ্লোকটা খুব interesting এই জন্য যে, বিশেষ করে এর দ্বিতীয় লাইনটা ব্যাখ্যা করা খুব মুশকিল, যদি না কারুর ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারাকে খুব ভাল ভাবে জানা থাকে। ঠাকুর স্বামীজীর যে জীবন, তাঁদের কথাগুলো খুব ভাল ভাবে জানা না থাকলে হিন্দু শাস্ত্রকে বোঝা অসম্ভব। স্বামীজী নিজে বলে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, এটাই ভাষ্য। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ যদি ভাল ভাবে পড়া থাকে তবেই হিন্দু শাস্ত্র বুঝতে পারবেন, তা নাহলে বুঝতে পারবেন না। হিন্দু শাস্ত্রের অনেক খিটিমিটি আছে, কারণ দেশ ও কাল থেকে হিন্দু শাস্ত্র এত এগিয়ে আর এত গভীর, মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না।

ইদানিং কালে একটা সম্প্রদায় হয়েছে, এরা দিনরাত ঠাকুর স্বামীজীর নিন্দা করে যাচ্ছে। আমি এদের কথা কিছুই জানতাম না। একজনের কাছ থেকে শুনে এদের একজনের কয়েকটা পয়েন্ট পড়ে আমার হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এত বোকা বোকা কথা, আর এই নিয়ে একটা সম্প্রদায় দাঁড়িয়েছে! এই যে বলা হয় শুধু খোল করতাল বাজালে বুদ্ধিটা ওই রকম হয়ে যায়, দেখছি সত্যিই তাই।

যাদের কোন বুদ্ধি নেই, কোন ধারণা নেই, এরা কোথা থেকে এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনের ব্যাখ্যা করবে! *একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্,* যিনি সন্ন্যাসে অবস্থিত তিনি কর্মযোগী হয়ে যান। এর ব্যাখ্যা করার উপায় নেই। স্বামীজীকে আমরা সাক্ষাৎ দেখছি। স্বামীজী ঠাকুরের কৃপায় সমাধিলাভ করেছিলেন, যিনি চেয়েছিলেন, সব সময় নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে। ঠাকুর যখন সমাধি থেকে তাঁকে নামিয়ে আনলেন, তিনি কর্মযোগী হয়ে গেলেন। কিভাবে স্বামীজী কাজ করলেন? যেভাবে কর্মযোগীদের কাজ করার কথা–নির্বিকার, নির্দ্বন্দ্বো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সাথে লীলা করছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। অর্জুনকে গীতার উপদেশ যখন দিচ্ছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। কুরুক্ষেত্রের ওই ঘোর যুদ্ধের মাঝখানে রথ পরিচালনা করছেন, তখনও তিনি কর্মযোগী। ঠিক ঠিক কর্মযোগী তাহলে কে হতে পারেন? যিনি সন্ন্যাসী। স্বামীজীও বলছেন, ভগবান বুদ্ধ হলেন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী, যীশু একজন শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। কেন বলছেন? ঠিক ঠিক কর্মযোগী যদি হতে হয়, ঠিক ঠিক কর্মযোগ যদি করতে হবে, ঈশ্বরজ্ঞান ছাড়া কর্মযোগ হয় না। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে কর্মযোগী হয়, সেইজন্য কর্মযোগীরা ঈশ্বরজ্ঞান পর্যন্ত পেতে পারেন, যদি ঠিক ঠিক তাঁরা কর্মযোগকে ধরে রাখতে সক্ষম হন।

হিন্দু শাস্ত্রে সাধ্য ও সাধনার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না, পথ আর লক্ষ্যে কোন তফাৎ নেই। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ যদি ঠিক ঠিক সেবা করতে পারে, যেমন ভগবান বুদ্ধ করলেন, তার মানে ঠিক ঠিক সেবা করলে তার ঈশ্বরদর্শন হবে, কারণ দুটোই এক। আমরা অবাক হয়ে দেখি, অনেক আগে পাশ্চাত্য দর্শনেও এই জিনিসটাকে তাঁরা করেছিলেন। জুল, তাঁর নামে জুল কনস্ট্যান্ট হয়েছে, তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, যেটা থেকে যেটার জন্ম, A থেকে যদি B বেরোয় তাহলে B থেকে A বেরোবে, inter connected যদি থাকে। সেখান থেকে তিনি বললেন, আমরা যদি হাতে হাত ঘষি, হাতের চেটো গরম হয়ে যাবে, এটা প্রমাণ করছে তাপ আর বেগ দুটো related। বেগ থেকে যদি তাপ হয়, তাহলে তাপ থেকে বেগ হবে। এখান থেকে নামকরা ইক্যুয়েশান দিলেন, ক্লাশ সেভেন এইটে পড়ানো হয়, W=JH। J হচ্ছে জুল কনস্ট্যান্ট, Work done = Heat into J। ফিজিক্সেও এটা চলে। দুটোর যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে দুটো কিন্তু আসলে এক। বেদান্তে এই কথা ঘুরে ঘুরে আসে। ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে যদি কর্মযোগী হয়, তাহলে যারা কর্মযোগী তারা ঈশ্বরজ্ঞানে যাবে। যাঁরা পাক্কা সন্ন্যাসী, তাঁরা যদি কর্মযোগী হন, তাহলে যাঁরা পাক্কা কর্মযোগী তাঁরা পাক্কা সন্ন্যাসী হবেন, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

গীতা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বার বার একটা কথা বলে যাচ্ছি, গীতার উদ্দেশ্য হল, এই যে আমরা মানবজীবন পেয়েছি, এই মানবজীবনকে কিভাবে ধন্য করা যাবে, মানবজীবনের যে উদ্দেশ্য সেটার পূর্তি কিভাবে হবে। কথামৃতের পাঠকরা বলবেন, ঠাকুর বলেছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ। ঠিকই বলছেন, কিন্তু সবাই তো সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বর লাভের দিকে যেতে পারে না। সন্ন্যাসীরা সব কিছু ছেড়ে এসেছেন, আবার অনেকে কখন নর্মদার তীরে, কখন হিমালয়ে কত তপস্যা করছেন, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হয়ে ওঠে না। ইচ্ছে থাকলেও সেই শক্তি নেই যে, এগিয়ে চলে যাবেন। পুরো জিনিসটার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু ধর্মের যে পরম্পরা, তাতে এনারা দুটো পথ করে দিলেন – এক হল ঈশ্বরের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ আর দুই হল কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের দিকে এগোনো।

কথামৃতেও এই জিনিসটা ঘুরে ঘুরে আসে। যেমন ঠাকুর বলছেন, বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত থাকবে; সে বাড়ির সমস্ত কাজ করে, মালিকের বাচ্চাকে এমন ভাবে আদর যত্ন করে যে মনে হয় তার নিজের সন্তান, কিন্তু সে জানে আমার যে আসল সন্তান সে দেশের বাড়িতে আছে। আমরা যদি একটু গভীর ভাবে নিজেদের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই ঘুরে ফিরে আমাদের মন সারাটা দিন, সারাটা মাস, সারাটা জীবন আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যে ঘুরতে থাকে, জীবনটাকে কোন ভাবে চালিয়ে নিতে হবে, এর বাইরে আমরা আর কিছু চিন্তা করতে পারি না। সত্যিই কি মানবজীবন শুধু এতটুকুর জন্য? এর থেকে যারা নিজের চেষ্টাতে ফিল্মস্টার হয়েছে অনেক ভাল, কারণ কিছু তো শক্তি দেখাচ্ছে। যদি কোন দিন বৈরাগ্য এসে যায়, এই ভিতরের শক্তি তাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। ফিল্মের জগতে, খেলার জগতে যাঁরা স্টার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কামনা-বাসনা অনেক বেশি থাকে ঠিকই, কিন্তু একটা শক্তির প্রকাশ ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন।

অন্য কিছু নাই হোক, সবারই এই চেষ্টা থাকা দরকার যে, জীবনে একটা শক্তির প্রকাশ হতে পারে। আমাদের বেদ উপনিষদের ঋষিরা এই জিনিসটা বুঝেছিলেন, সেইজন্য তাঁরা বলে দিলেন, সাংসারিক উপলব্ধি যদি নাও হয়, যে কাজটা করছ, যেখানে তুমি কাজ করছ সেখান থেকেই তুমি মহৎ হওয়ার চেষ্টা কর। ফলে ধর্মজীবনের পথ পরিষ্কার দুটি হয়ে যায়। এই দুটি পথের কথা আমরা গীতার আলোচনার প্রথমের দিকে অনেক বিস্তারে বলেছিলাম। আচার্য শঙ্করও বললেন বেদের দুটি ধর্ম, একটা হল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যেখানে সন্ন্যাসের কথা বলা হয় আর দ্বিতীয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যেখানে কর্ম রয়েছে।

নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের সমস্যা হল, যাঁরা সন্ন্যাসের জন্য উপযুক্ত নন তাঁরা যদি সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করেন, জীবনে তাঁদের অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। সন্ন্যাস হল ত্যাগের পথ, সমস্ত কিছুর ত্যাগ। ঠাকুর মর্কট বৈরাগ্যের কথা বলছেন। বাড়িত অভাব অশান্তি লেগে আছে। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল কাশী। কিছু দিন পর ওখান থেকে বাড়িতে চিঠি লিখছে, আমার একটি কর্ম হইয়াছে। মানুষ সমস্যার জ্বালায় সব সময় জ্বলে পুড়ে মরছে। সব সংসারে কিছু না কিছু একটা সমস্যা, স্ত্রী হয়ত উপপতি করেছে, ছেলেটা অবাধ্য, বখাটে হয়ে গেছে, স্বামী হয়ত অন্য কোথাও বাসা করে আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সমাধি বৈশ্যের বর্ণনা আছে, তার স্ত্রী আর ছেলে মিলে সব টাকা-পয়সা কেড়ে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। সমাধির আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তার মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। শাস্ত্র এই ধরণের ত্যাগকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। তবে ত্যাগ মানেই ত্যাগ, যে কোন কারণেই ত্যাগ করে থাকুক, অভাবেই করুক আর স্বভাবেই করুক। ত্যাগ নিজেই একটা সাংঘাতিক জিনিস। গীতা বলছেন, কর্মফল ত্যাগ যদি কর তাও ভাল, কর্মত্যাগ যদি কর তাও ভাল।

তবে সব কিছুকে গুছিয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে যদি নিয়ে আসা হয় তখন দেখা যাবে, স্বামী বিবেকানন্দের মত শ্রেষ্ঠতম পুরুষরা অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁরা নিত্যই প্রতিষ্ঠিত হন; এক ঘণ্টা কি দু ঘণ্টার জন্য বা এক মাস কি দু মাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত হন না। দ্বিতীয়, যাঁরা সব কিছু ভাল করে বুঝে নিয়ে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, ভাল করে বুঝে নিয়েছেন ঈশ্বর বলতে এই, ত্যাগ বলতে এই, সংসার আমার কেন চাই না, এই জিনিসগুলো ভাল ভাবে বুঝে নেওয়ার পর সব কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পিত করে দিয়েছেন, এটা হল এই জগতের শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ।

*যত শ্রদ্ধয়া করোতি বিদ্যায়া করোতি তত বীর্যতর ভবতি,* যে কোন কাজ যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয় এবং জেনে বুঝে নিয়ে করা হয়, তবেই সেই কাজ ফল দেয়। দীক্ষার সময় মন্ত্র দেওয়া হয়, সেই সময় বলে দেওয়া হয় মন্ত্রের অর্থ এই, ধ্যান এইভাবে করতে হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে করতে করতে মন্ত্রের প্রতি, জপধ্যানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবে। যদিও প্রথমের দিকে শ্রদ্ধা হয় না, প্রথমে ইমোশানস থাকে, কিন্তু ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা যখন জন্মায় তখন সেই শ্রদ্ধা থেকে আসে বীর্য। প্রথম হল বিদ্যা, জিনিসটাকে বোঝা, সেখান থেকে আসে শ্রদ্ধা, ঐ শ্রদ্ধা থেকে জন্মায় বীর্য বা শক্তি, ঐ জিনিসটাকে করার ক্ষমতা। তারপর ওখান থেকে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে। প্রায়ই ভক্তেরা এসে সাধুদের প্রশ্ন করেন, মহারাজ, জপের সময় ঠাকুরের দিকে মন বসে না। না বসারই তো কথা, কার বসে, সাধু সন্ন্যাসীদেরই বসে না। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন, দেখছেন একজন ভৈরব ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মন যদি ইষ্ট থেকে সরে আসে এই ত্রিশূল বুকের উপর দেব বিঁধে। প্রথমের দিকে ঠাকুরও পারছেন না। লেগে থাকতে, লেগে থাকতে, ভালবাসতে ভালবাসতে ভালবাসা জন্মায়। আগেকার দিনে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে জানত না, স্ত্রী স্বামীকে জানত না। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ভালবাসা জন্মে যেত, একজন আর-একজনের পরিপূরক হয়ে যেত। এখন সবাই পরস্পরকে জেনেশুনে, অনেক ঘোরাঘুরি সেরে তবে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, কিন্তু কদিনের মধ্যেই সেই বিয়ে ভেঙে যায়। জানাজানিটা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যাকে জানছে তার প্রতি শ্রদ্ধাটা আনতে পারছে না।

সবার উপরে হল সন্ন্যাসী, যিনি তত্ত্বগত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বটা বোঝেন, ত্যাগের ব্যাপারটাও তত্ত্বগত ভাবে বোঝেন, আর ওইটাকে পাওয়ার সত্যিকারের আগ্রহ আছে। তাঁর নীচে হলেন, যাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ত্যাগও করেছেন, কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। কোন একটা ইমোশানের তোড়ে এসে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। গীতা এনাদের খুব একটা সম্মান

দৃষ্টিতে দেখেন না। এটা হল সন্ন্যাসের দ্বিতীয় শ্রেনী। অন্য দিকে যারা কাজ কর্ম করছে, তারা হয় নিষ্কাম ভাবে করছে, নয়তো সব কিছু ঈশ্বরে অর্পণ করে কাজ করছে। এদেরকে গীতা যোগী বা কর্মযোগী বলছেন। যোগী মানেই তাই, হয় সে নিষ্কাম ভাবে সব কর্ম করছে, অর্থাৎ কর্মফলের প্রতি তার কোন আসক্তি নেই, ভালমন্দ যা কিছু করছেন সব ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করে দিচ্ছেন। তাঁর নীচে হলেন, যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তারও নীচে হল, যারা ফাঁকি মেরে যাচ্ছে। ফাঁকি মারা দুদিকেই হয়। সন্ন্যাসীদের বলা হচ্ছে সাংখ্যযোগী, বুদ্ধি তাঁর পরিষ্কার, তাঁর বুদ্ধি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে দু নম্বরে হলেন, তিনি কর্ম করছেন, কিন্তু কর্মফল ত্যাগ করে দিচ্ছেন, ফল ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে মন তাঁর চঞ্চল হয় না। তার ঠিক নীচে হল, যারা কর্মে আসক্ত, তিন নম্বরে হল যারা কর্মে ফাঁকিবাজ। সব মিলিয়ে পাঁচ শ্রেনীর লোক হয়। এই তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের মত ঈশ্বরকোটিদের আনা হচ্ছে না, এনারা জ্ঞানী, লোকশিক্ষার জন্য এনারা আসেন।

যাঁরা সাধক তাঁদের এই পাঁচটা শ্রেনীতে ফেলা যায়। প্রথম নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় ফাঁকিবাজ সন্ন্যাসী, এনারা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ত্যাগের ব্যাপারটা বোঝেন না, তৃতীয় যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগী, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করেন বা ঈশ্বরকে সব ফল অর্পণ করে কাজ করেন। চতুর্থ হল, যারা কর্মের প্রতি আসক্ত এবং কর্মফলের প্রতি আসক্ত। তারও নীচে পঞ্চম হল, ফলের প্রতি আসক্তি আছে, কিন্তু নিজে কোন কাজ করতে চায় না।

একজন কাঠুরিয়া ছিল। বনে কাঠ কাটতে গিয়ে সামান্য কয়েকটা কাঠ কেটেই শুয়ে থাকত। আর-একজন কাঠুরিয়া তাকে বলল, 'তুমি এভাবে সব সময় শুয়ে শুয়ে সময় নষ্ট করে যাচ্ছ, একটু কাজটাজ করলে তোমার কিছু টাকা তো হত'। তখন কাঠুরিয়াটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে, 'কাজ করলে কি হবে'? 'তোমার টাকা-পয়সা হবে'। 'তারপরে কি হবে'? 'টাকা-পয়সা হলে তুমি আরামসে শুয়ে থাকতে পারবে'। 'আমি তো তাই করছি'। এগুলো হল তমোগুণের শেষ কথা, একেবারে নিকৃষ্টতম। ঠাকুর এদেরকে বলছেন, কুমড়ো কাটা বরঠাকুর। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল মেয়েদের নাকি কুমড়ো কাটতে নেই। বরঠাকুর সারাদিন বৈঠকখানায় বসে বসে তামাক খায়, আর কুমরো কাটার সময় অন্দরমহল থেকে তার ডাক পড়ে, ভিতরে গিয়ে কুমরোটা কেটে দিয়ে আসে। অনেক বাড়িতে এই রকম অনেক আছে, যারা সবাই কুমরো কাটা বরঠাকুর। এদের উঠতে যে কত জন্ম লাগবে ভগবান জানেন। তমোগুণ কমে একটু রজোগুণ জাগলে তখন এরা একটু কাজ করবে। অন্য দিকে সন্ন্যাসী, যাঁরা না বুঝে সব কিছু ত্যাগ করেছেন, এই দুজনের মধ্যে আসলে খুব বেশি তফাৎ নেই। এরাও তমোগুণী, ওরাও তমোগুণী।

স্বামীজী সেইজন্য একটা মধ্যম পথ বার করলেন। যাঁরা সন্ন্যাসী হবেন, তাঁরা সবাই কাজ করবে, এই ধারণাটা ভারতবর্ষে বা অন্য কোথাও আগে ছিল না। বিদেশে তো সন্ন্যাসীর ধারণাই নেই, খ্রীশ্চান ফাদাররা ঠিক সন্ন্যাসী না, ওনারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত। আমাদের এখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যেমন হন, খ্রীশ্চান ফাদাররা এবং পোপও সন্ন্যাসী না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা কিছু ব্রত নেন, খ্রীশ্চান ফাদাররা এবং পোপ কিছু ব্রত নেন। সন্ন্যাসী কোন ব্রত নেন না, সন্ন্যাসী সব কিছুকে ত্যাগ করে দেন। দুটোর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাৎ, এগুলো না জানলেও চলে, তবে প্রসঙ্গ এসেছে বলে উল্লেখ করা হল। এই তামসিক ভাবাপন্ন লোক, সে সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহস্থই হোক, এদের থেকে উপরে কর্মে আসক্ত লোকেরা, এরা কাজ করছে ফলও চাইছে। এদের থেকে উপরে হলেন, একটা দায়ীত্ব বোধে কাজ করছে, আমার এটা দায়ীত্ব তাই কাজটা করে দিলাম, দায়ীত্ব শেষ হয়ে গেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। সেখান থেকে আসেন সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু বুঝে গেছেন। এই জিনিসটারই এখন আলোচনা চলছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করলেন, আপনি একদিকে আমাকে বলছেন সাংখ্যযোগী হতে, আবার অন্য দিকে বলছেন তুমি কাজ কর। পরিষ্কার করে বলুন তো আমাকে কি করতে হবে? ভগবান তখন বললেন, *জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, সেই ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না, কাউকে চানও না। এখান থেকে এবার বললেন সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগে কোন তফাৎ নেই। উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর লাভ হয়, উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, সেখানে এই দুটো পথে কোন তফাৎ নেই –

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫।।

*(জ্ঞানমার্গ অনুশীলনকারী সন্ন্যাসি যে মোক্ষপদ লাভ করেন, নিষ্কাম কর্মিও সে স্থান প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগের ফল একই মোক্ষ বলে উভয়কে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী, সম্যক্ জ্ঞানী।)*

সাংখ্যযোগ, তার মানে জ্ঞানযুক্ত সন্ন্যাস, আর কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম বা ঈশ্বরকে সব ফল অর্পণ করছি, এই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা, এই দুটো সমান। কেন দুটো সমান বলছেন? তাহলে তো সন্ন্যাসী আর আমরা সমান হয়ে গেলাম। সেভাবে সমান হয় না, অনেক তফাৎ থাকে। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য দুটোই সমান হয়ে যায়। যিনি সংসারে থেকে সব ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁরও মধ্যে আমিত্বের ভাব থাকে না, যিনি সন্ন্যাসী তিনিও আমিত্বকে ছেড়ে দেন। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই জ্ঞান যেটা আসবে, সেটা প্রভুর ইচ্ছার উপর আসবে। এই জ্ঞান কে পাবেন কেউ বলতে পারবে না। হয়ত দশ জন একসাথে সাধনা শুরু করেছেন, দশজনের মধ্যে কে এই জ্ঞান পাবেন, এটা কারুর জানা নেই, কেউ বলতে পারবে না। কারণ আত্মজ্ঞানে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। তাহলে তফাৎ কোথায় হয়? তফাৎ এটাই হয়, যিনি জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু বুঝে নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁর পতনের সম্ভবনা অনেক কমে যায়, হয়ত শতকরা এক ভাগ থাকে। কিন্তু যিনি কর্ম করছেন, সংসারে যিনি আছেন, ওনার পতনের সম্ভবনা প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। কারণ কোথায় কখন কিভাবে আসক্তি এসে তাঁকে জড়িয়ে নেবে ঠিক নেই। ঠাকুর এদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে।

তবে সংসারে থাকার অনেক সুবিধাও আছে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যায়, বাড়ির লোকেরা দেখাশোনা করতে পারছে, এ-ছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে। সন্ন্যাসী তো রিক্ত হস্তে খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে গেল, সন্ন্যাসীর কিছু নেই। বেলুড় মঠে কোন সন্ন্যাসীর যদি শরীর খারাপ করে, দরজা বন্ধ করে আমরা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকি, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আর শরীর যদি খুবই খারাপ হয়, সেবাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেবে। সবাই এটা নিতে পারে না। আমরা আবার অন্যটা নিতে পারি না, পাঁচ মিনিট পরে পরে এসে জিজ্ঞেস করবে এখন কেমন আছেন, জল লাগবে কিনা, খাওয়া লাগবে কিনা, চা খাবেন কিনা, আমরা বিরক্ত হয়ে যাই। সন্ন্যাসীরা স্বভাবে স্বাধীন। সংসারে যাঁরা আছেন, স্বভাবেই তাঁরা পরনির্ভর। সংসারীরা পরাধীন নয়, কিন্তু কারুর না কারুর উপর নির্ভর করে চলতে হয়। তার যদি নির্ভরতা নাই থাকে, তাহলে সে সংসারে থাকবেই বা কেন, সে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

ভগবান এখানে বলছেন, যাঁরা সাংখ্যযোগী, যিনি সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে সব ত্যাগ করে দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝেন, ত্যাগের মহিমা বোঝেন, এনারা স্বার্থহীনতার এমন অবস্থায় চলে যান, যেখানে তাঁর উপর ঈশ্বরের কৃপা যে কোন সময় হয়ে যেতে পারে। আর যিনি কর্মযোগী, যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি, এনারা সংসারেই ছিলেন, এনারাও এমন অবস্থায় চলে যান, যেখানে যে কোন অবস্থায় তাঁর উপর ঈশ্বরীয় কৃপা আসতে পারে। ঈশ্বর জ্ঞানের জন্য বা আত্মজ্ঞানের জন্য দুটো পথই সমান, এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বুঝতে হবে। আমরা এখানে জ্ঞানরহিত সন্ন্যাসীর কথা বলছি না। আর ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, ত্যাগ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, এদের কথাও

এখানে বলা হচ্ছে না, এরা হল তামসিক। কিন্তু যিনি জিনিসটাকে বোঝেন, অথচ কর্মযোগী; যেমন রাজা জনকাদিরা কর্মযোগী ছিলেন, তাঁরাও একই জায়গায় গিয়েছিলেন। যাঁরা এটা বোঝেন, তাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন। তাঁরা সংসারে থেকে সমস্ত কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠার সাথে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে করেন।

যেমন নবরাত্রির সময় অনেকে নবরাত্রি উদ্‌যাপন করেন। নবরাত্রির বিভিন্ন বিধি আছে, কেউ পুরোটা চণ্ডী পাঠ করেন, কেউ উপোস করেন, কেউ সামান্য একটু ফলাহার করে থাকেন; বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে নবরাত্রি উদ্‌যাপন করেন। গৃহস্থদের বিশেষ করে এগুলো করতে হয়, করলে দেহ মনের শুদ্ধি হয়। আমাদের যে মন সব সময় দেহের উপরে পড়ে আছে, এগুলো করলে শরীরের থেকে মনটা কিছু সময়ের জন্য সরে আসে। এগুলো করতে হয়, করলে সংসার থেকে মনটা একটু সরে আসে, সংসার থেকে মন সরে এলে শক্তি বাড়ে। শাস্ত্র পাঠ, পূজা অর্চনা, উপোস এগুলো সব গৃহস্থদেরই একটু একটু করতে হয়, করলে শরীরের থেকে মন একটু সরে আসে।

তাহলে অর্জুন কেন এমন জিজ্ঞেস করলেন দুটোর মধ্যে কোনটা ভাল? তখন বলা হল, না বুঝে কর্মসন্ন্যাস করার থেকে কর্মযোগ করা ভাল। এখানে কিন্তু সন্ন্যাসীর নিন্দা করা হচ্ছে না, যিনি ঈশ্বরের দিকে এগোবেন, এখানে তাঁকে সাবধান করা হচ্ছে। জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস নিলে তুমি তামসিক হয়ে যাবে, তার থেকে কাজ করলে তোমার ঢের উপকার হবে। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনে যখন কাজকর্মের ব্যবস্থা করলেন, তখনও সমস্যা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সেই সময় বললেন, স্বামীজী মহারাজ যে কাজের কথা বলছেন, এটা তিনি ঠিক করছেন। তখন কত ইয়ং ছেলেরা সন্ন্যাসী হতে আসছে, সন্ন্যাসী হওয়ার পর এরা সারাটা দিন কি করে সময় কাটাবে? কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়। দিনে সবাইকে কিছুক্ষণ কাজ অবশ্যই করতে হয়। তার সাথে দিনে কিছুক্ষণ শাস্ত্র পাঠ, অধ্যয়ন, জপধ্যান অবশ্যই করতে হয়, এতে মাথাটা ব্যালেন্সে থাকে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মের তোড়টা একটু কাটিয়ে আরও বেশি করে জপধ্যানের দিকে জোর দিতে হয়, যাতে তামসিকতা যেন গ্রাস না করতে পারে।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬।।

*(হে মহাবাহো, নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ছাড়া প্রথমেই কর্মসন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ হয়; কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মসন্ন্যাস করে অবিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।)*

কর্মযোগ যদি না করে থাক, বা কর্ম যদি না করে থাক, তাহলে পারমার্থিক সন্ন্যাস পাওয়া খুব মুশকিল। আমরা যখন রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি, তখন বয়স মাত্র কুড়ি বছর। সিনিয়র মহারাজরা আমাদের বলতেন, 'খুব খেটে যদি কাজ না কর, বুড়ো বয়সে খিটখিটে হয়ে যাবে'। কোন বৃদ্ধ যদি খিটখিটে স্বভাবের হয়, বুঝতে হবে তিনি জীবনে কোন কাজ করেননি। যিনি প্রচুর কাজ করেছেন, বয়স হতে হতে তাঁর মন শান্ত হয়ে যায়। ধর্ম ভাবে যদি কাজ করে থাকেন, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। যদি দেখেন বৃদ্ধাবস্থায় মন ঈশ্বরের দিকে যায়নি, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কর্তব্য ভাবে কর্ম করেননি, ধর্ম ভাবে কর্ম করেননি। খিটখিটে যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, কাজই করেননি, সারা জীবন ফাঁকি মেরে গেছেন।

আমাদের একজন মহারাজ প্রায়ই বলতেন, 'সন্ন্যাসী বৃদ্ধ হলে বোঝা যায়, তিনি নোঙর তুলে নৌকা চালিয়েছেন নাকি নোঙর ফেলে সারা জীবন নৌকা চালিয়েছেন'। একজন মাতাল সারা রাত নৌকা চালিয়েছে, সকাল হতে দেখে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কারণ নৌকার নোঙরটা ফেলা আছে। সারা জীবন সাধনা করে গেলেন, বয়স কালে এসে দেখছেন, কিছুই এগোল না, নোঙরটাই তোলা হয়নি। কাজ করলে নোঙর তোলা হয়, তখন বোঝা যায় কোথায় কি গোলমাল

আছে। পাঁচজনের সাথে মেলামেশা করতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে নিজের অহঙ্কারটা চাপা দিতে হয়, উপায় থাকে না। এক যুবতী মেয়ে সে যত সুন্দরী হোক, যত অহঙ্কারী হোক, সবাইকে অঙুলি হেলনে নাচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন সন্তান হয়, তখন সন্তানের সামনে তার মাথা নত হয়ে যায়। সেখানে তার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম হওয়াতে শুধু সন্তানের জন্ম হয় না, এক যুবতীর মাতৃত্বের জন্ম হয়। সন্ন্যাসের পর মাতৃত্ব হল শ্রেষ্ঠতম। কারণ মানুষের যত গুণ হতে পারে, সমস্ত গুণ একজন মায়ের মধ্যে থাকে। সাধু সন্ন্যাসীর যা যা গুণ থাকে, ঠিক ঠিক মা যিনি, সেই সব গুণ তিনি স্বাভাবিক ভাবে পান। সেইজন্য কাজ করতে হয়। যাঁরা আজ ঠাকুরমা, দিদিমা হয়ে গেছেন, তাঁদের মাথায় রাখতে হবে, একজন মা রূপে আপনি আপনার সন্তানের জন্য জীবনে কি কি করেছেন। ঠাকুরমা হয়ে আপনাকে সেটাই করতে হবে সবারই জন্য, তবেই আপনি ধর্ম জীবনে এগোতে পারবেন।

আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তো মুনি*, যা কিছু করা হচ্ছে সব ঈশ্বরকে সমর্পিত করে দিচ্ছে বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে, আমি কোন কিছুর অপেক্ষা রেখে কর্ম করছি না, আমার এটা কর্তব্য, তাই আমি করছি। এই ভাব নিয়ে যিনি সমস্ত কাজ করেন তিনিই মুনি। মুনি মানে যিনি ঈশ্বরের স্বরূপকে মনন করতে থাকেন, তখন তিনি পারমার্থিক সন্ন্যাস, যেটা পরমজ্ঞাননিষ্ঠা রূপ, সন্ন্যাস মানেই পরমজ্ঞাননিষ্ঠা, আত্মার যে স্বরূপ সেটাতে থিয়োরেটিক্যালি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যে আমরা ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করছি, শুরু করার সময় বলা হয়েছিল, বেদান্ত মানে আত্মাই যে সব কিছু, এটাকে জানা; তাঁদের জীবনকে বলা হয় বেদান্তিক প্র্যাক্টিস, কার্যকরী বেদান্ত। মহাপুরুষদের যে জীবনধারা, এটাই আমাদের জন্য সাধনা; তিনি যেটা অনায়াসে করেন, এটাই আমাদের সাধনা। গীতা আদি গ্রন্থে এই জিনিসটা রয়েছে, যখন এটা সাধনা রূপে করা হয়, তার মানে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিভাবে ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে জীবন-যাপন করলেন, স্বামীজী কিভাবে জীবন-যাপন করলেন, এই জিনিসগুলিকে চেষ্টা করে পালন করা, মানুষ তখন ধীরে ধীরে উপরে উঠে যায়।

পারমার্থিক সন্ন্যাস হল উদ্দেশ্য। যিনি সত্যিকারে সন্ন্যাসী তিনি কিভাবে থাকবেন? *জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, যাঁরা সাধক তাঁকেও এটাই করতে হবে। কারুর প্রতি দ্বেষ থাকবে না, কারুর কাছ থেকে কোন অপেক্ষা থাকবে না। এই অবস্থা যাঁর হয়, তাঁর জীবনটা কৃতকৃত্য হয়ে যাবে। যাঁরা মুনি, ঈশ্বরের স্বরূপকে যাঁরা মনন করেন, অন্য দিকে কর্মযোগ করে যাচ্ছেন, বেদের যজ্ঞাদি করে যাচ্ছেন বা যে দায়ীত্ব তাঁর উপর এসেছে, সেটা পালন করছেন, এনারা পরম জ্ঞাননিষ্ঠায় চলে যান। স্বামীজী এবং স্বামীজীর মত ব্যক্তিরা যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই জ্ঞানে এনারা থিয়োরেটিক্যালি পৌঁছে যান। এগুলোতে থিয়োরেটিক্যাল আর প্র্যাক্টিক্যালে খুব বেশি তফাৎ থাকে না, কারণ তাঁর জীবনধারা পাক্কা সন্ন্যাসীর মতই হয়। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা তফাৎ থাকে। যারা ফিজিক্স থিয়োরেটিক্যালি খুব ভাল বুঝে থাকেন, প্র্যাক্টিক্যালি ওটা একবার দেখে নিলে ওই জ্ঞানটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এই সাংখ্যযোগী, জ্ঞানীদের কি হয়?

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭।।

*(যিনি নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, অতএব সংযতদেহ ও জিতেন্দ্রিয় এবং এইভাবে যিনি ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি স্বাভাবিক বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেও লিপ্ত হন না।)*

এই শ্লোকটা শুনলে মনে হবে যিনি পরম জ্ঞানী, তাঁর কথা বলছেন। কিন্তু এটাও একটা সাধনার পথ। কারণ সিদ্ধি আর সাধনাতে কোন তফাৎ থাকে না। খাওয়ার পর আমার পেট ভরে

যায়, আমার একটা শান্তি হয়; এখানে খাওয়া একটা, পেট ভরাটা আর-একটা, দুটো আলাদা। কিন্তু ধর্ম জীবনে তা হয় না, ধর্ম জীবনে সাধনাও যা সিদ্ধিও তাই। বলছেন, যিনি যোগযুক্ত হয়ে কর্মযোগ করে করে একেবারে বিশুদ্ধ আত্মা হয়ে গেছেন, এখানে এই আত্মার অর্থ মন। এমন বিশুদ্ধ মন যে, সেখানে স্বার্থের গন্ধ পর্যন্ত নেই। শুধু কাম গন্ধ না, কাঞ্চনের গন্ধ না, কোন ধরণের স্বার্থ নেই। জীবনের প্রতি আসক্তি নেই, মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি নেই, সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত। *বিজিতাত্মা*, এই আত্মার অর্থ দেহ, বিশুদ্ধাত্মার আত্মা অর্থ মন। আত্মার অনেক রকম অর্থ হয়, এক আত্মার অর্থ সর্বব্যাপী আত্মা, এক আত্মার অর্থ জীবাত্মা, এক আত্মার অর্থ মন, এক আত্মার অর্থ দেহ। আত্মা মানে আমি নিজে যেটা, individuality। যখন আমি নিজেকে দেহ মনে করছি আমি তখন দেহাত্মা, যখন মনকে মনে করছি আমি, তখন আত্মা মন, আমার ভিতরে যে আত্মা, তাঁকে মনে করছি আমি জীবাত্মা।

বলছেন *যোগযুক্ত*, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি নিজের দেহকে জয় করেছেন, নিজের মনকে জয় করেছেন আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন। তার সাথে *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা*, সবার মধ্যে নিজেকে দেখছেন। আমরা যখন মায়াতে বিমোহিত হয়ে যাই, তখন যাকে ভালবাসি তার মধ্যে আমি নিজেকে দেখি। আর যখন মায়া বিমোহিত থাকি না, তখন আমরা কাউকে পাত্তা দিই না। কিন্তু যিনি সত্যিকারের জ্ঞানী তিনি সবার মধ্যে, একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ের মধ্যেও নিজেকে দেখেন। এগুলোই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে*, তিনি জানেন, আমি যা কিছু করি না কেন, কোথাও আমার লিপ্ত হওয়ার কিছু নেই। আমরাও তো সব সময় কত কিছু করছি, প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত বলছে, মাঝে মাঝে তুমি ভাববে, আমি এগুলো কিছু করছি না, ইন্দ্রিয় তার নিজের বিষয়কে ভোগ করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এই টপিকটা চলছে। যিনি যোগযুক্ত, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী তিনি জানেন আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, থেকে আলাদা। কি করে জানছেন আমি আলাদা? কারণ তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছেন, দেহকে জয় করে নিয়েছেন, মনকেও জয় করে নিয়েছেন। *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে*, সব কিছু করছেন, কিন্তু ভাল করে জানেন আমি কোন কিছুতেই লিপ্ত নই। পরে বলবেন, পদ্ম পাতায় জল পড়ছে, জল সেখানে এসে জমছে, দেখে মনে হবে পদ্ম পাতাটা জলে সিক্ত হয়ে আছে। কিন্তু হাওয়াতে পাতায় একটা নাড়া পড়লেই সরাৎ করে পুরো জলটা নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবে, এখন দেখুন পদ্ম পাতার কোথাও জলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। জীবনের উদ্দেশ্য হল জলে পদ্ম পাতার মত থাকা। পদ্ম পাতা জলের উপর ভাসছে, তার নীচে জল, বৃষ্টির জল, মাছেরা লাফালাফি করাতে ছিটকে জল পদ্ম পাতার উপর পড়ছে, একটু বাতাসে পাতাটা নড়ে উঠল, সমস্ত জল থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল, কোথাও জলের কোন চিহ্ন নেই। ঠাকুর পাঁকাল মাছের কথা বলছেন, পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার শরীর ঝকঝকে, কোথাও একটু কাদার দাগ নেই। সংসারের সব দায়ীত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু কোথাও জড়াতে নেই, নিজের দেহের প্রতিও তাই।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯।।

*(নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা ক্রমে তত্ত্বদর্শী হয়ে কর্মযোগী দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিঃশ্বাস গ্রহণে, কথনে, মলমূত্রাদি ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে এবং নিমিষেও ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত – এরূপ দৃঢ় ধারণা করে 'আমি অকর্তা, কিছুই করি না' – এটা নিশ্চিত জানেন।)*

দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, গমন করা, ঘুমানো আর নিঃশ্বাস নেওয়া, তার সাথে বলছেন কথা বলা, মলমুত্রাদি ত্যাগ করা, গ্রহণ করা, চোখের পাতা ফেলা, চোখের পাতা

খোলা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যত রকমের কাজ আছে, দেহের যত রকমের কাজ আছে, দশটি ইন্দ্রিয়ের দশ রকমের কাজ, আবার কিছু কিছু কাজ আছে যেটা শরীরের কাজ, যেমন ঘুমনো; যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন, ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত কাজ করছে, আমি আমার মত আছি।

আমরা যদি এক মিনিট মনটাকে শান্ত করে একটু ভাবি, আচ্ছা আমরা এখানে এখন গীতার আলোচনা শুনছি, এই সময়ের মধ্যে আমার ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত কত কাজ করে যাচ্ছে; আমার চোখের পাতা নড়ছে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে, এগুলো তো আমি নই, আমি আলাদা, আমার চোখ আলাদা, নাক আলাদা, কান আলাদা। নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়া যেমন নিজের মত হচ্ছে, চোখের পাতা খোলা আর বন্ধ হওয়াটাও নিজের মতে হয়ে যাচ্ছে, আমি এগুলো থেকে আলাদা। যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, দেহকে জয় করেছেন, মনকে জয় করেছেন, তাঁদের এই বোধটা সব সময় থাকে। কিন্তু আমার আপনার মত মানুষ সব সময় এই বোধ রাখতে পারব না। এই জিনিসটাকে বোধ করার জন্য মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে একটু এটার উপর চিন্তা করতে হয়।

বলছেন, এনারা কর্মের অভাব দেখেন। আচার্য এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ উদকবুদ্ধয়া পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানে অপি তত্র এব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে*, মরুভূমিতে বা রাস্থায় যেতে যেতে যদি কেউ জলের মরীচিকা দেখে একবার যদি জেনে যায় এটা মরীচিকা, দ্বিতীয়বার সে ওখানে গিয়ে জল নেওয়ার চেষ্টা করতে যাবে না। স্বামীজীর একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। তিনি তখন গুজরাতের একটা জায়গায় ছিলেন, সেখানে তিনি দূরে একটা পুকুর দেখতে পেতেন আছে। একদিন তাঁর কি মনে হল ওই পুকুরের কাছে যেতে হবে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন, যত যাচ্ছেন দেখছেন তত পুকুরটা দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে ওই জায়গাটা মরুভূমির মত ছিল। উনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এটা মরীচিকা। উনি ওখান থেকে ফিরে ঘরে চলে এলেন। পরের দিন আবার তিনি সেই মরীচিকা দেখছেন, কিন্তু আর পুকুর, পুকুরের জল বলে বোধ হয়নি। তিনি বুঝে গেলেন এটা সেই মরীচিকা।

বড় রাস্থায় গাড়ি করে যাওয়ার সময় সোজা রাস্থার দিকে তাকালে মনে হবে রাস্থার উপর অনেক জল জমে আছে। কিন্তু যত ওর কাছে এগিয়ে আসছি তত সেই জল উধাও, কিন্তু আবার দূরে জল দেখা যাচ্ছে। পরে বুঝতে পারা যায় যে এটাই মরীচিকা। তাই বলে অন্য মরীচিকা দেখে আমি যে ভুল করব না তা তো হয় না, ভুল হবেই। যেটাকে আমরা জেনে গেলাম এটা মরীচিকা, সেটাকে নিয়ে আর ভুল হবে না। জ্ঞানী যখন একবার বুঝে গেলেন ইন্দ্রিয়গুলি নিজের মত কাজ করে, তখন আর তিনি এগুলোতে লিপ্ত হবেন না। ইন্দ্রিয়গুলিকে তুষ্ট করার জন্য তিনি আর লাফালাফি করবেন না। একজন তত্ত্বজ্ঞানী, যিনি পুরো জিনিসটাকে জেনে গেছেন বা যাঁরা থিয়োরেটিক্যালি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এটাই তাঁদের আচরণ। কিন্তু কাউকে যদি কাজ করতে হয়, তখন তিনিও এভাবেই কাজ করেন; কিভাবে কাজ করেন?

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।১০।।

*(যে মুমুক্ষু কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সব কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করতে পারে না, পাপপূণ্য সেই রকম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।)*

*ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি*, মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত কর্মকে যদি *ব্রহ্মার্পণং* করে সব কর্ম করেন, তাঁর কি হয় বলছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ* বলা হয়েছিল, ওটা ছিল জ্ঞানীর ভাব, জ্ঞানী ওই ভাবেই সব কিছু দেখেন, কিন্তু এখানে সাধনা রূপে বলছেন। *সঙ্গং ত্যক্ত্বা*, সমস্ত রকম স্বার্থ ভাবনা ত্যাগ করে, আমিত্বের সাথে যা কিছু জুড়ে আছে, সব কিছু থেকে আমিত্ব ভাব সরিয়ে দিয়ে সমস্ত

কাজ করেন এবং *ব্রহ্মণ্যাধায়*, সব কিছু করে *ব্রহ্মার্পণং* করে দিচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার ভক্তরা কোন কাজকর্ম করার পর শেষে বলেন *শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু*, অর্থাৎ এই কর্মের সব ফল শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করলাম। প্রথমে এটা থিওরেটিক্যালি করা হয়, এইভাবে করতে করতে একটা ভাব জন্মায়, সেই ভাব থেকে এই বোধ আসে, আমি যাবতীয় যা কিছু করি, কি কি, *পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নিষন্নিমিষন্নপি*, যা কিছু করছি সব *ব্রহ্মার্পণং, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু* বলে ঠাকুরকে অর্পণ করে দিচ্ছি।

*লিপ্যতে ন স পাপেন*, বলছেন, এইভাবে সব অর্পণ করে দিলে কি হয়? কোন দিন আর কর্মজনিত পাপ তার লাগবে না। পাঁকাল মাছের মত তার গায়ে কাদা লাগবে না। *পদ্মপত্রমিবাম্ভসা*, এই জিনিসটাকে এখানে পদ্মপত্রে জলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। বাচ্চারা প্রথম যখন পদ্ম পাতা দেখে তাদের দেখে খুব মজা লাগে। পদ্ম পাতায় জল ঢালল, তারপর একটু নেড়ে দিল, সব জল সড়াৎ করে গড়িয়ে গেল। যাঁরা কর্মযোগ করছেন, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের এটাই জীবনধারা – *পদ্ম পত্র ইব অম্ভসা*, পদ্ম পাতা জলে যেভাবে থাকে সংসারেও আমাকে ঠিক সেইভাবে থাকতে হবে, কোন কিছু যেন আমাকে স্পর্শ না করে। কিভাবে স্পর্শ না করে থাকবে? আমারও তো ভালমন্দ জিনিস খেতে ইচ্ছে করবে, আমারও তো ভোগ করার ইচ্ছা হবে, যাকে ভালবাসি তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করবে, ভাল গন্ধ পেতে, ভাল গান শুনতে ইচ্ছে করবে। অবশ্যই করতে পারে, কিন্তু এই চেতনায় সর্বদা নিজেকে জাগ্রত রাখতে হবে যে, এগুলো আমি চাইছি না, আমার ইন্দ্রিয়গুলো চাইছে। আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে আছি, তাই আমার মনে হচ্ছে আমি চাইছি। আসলে আমি জানি, ইন্দ্রিয়গুলিই সব কিছু চাইছে। এরপর কর্মযোগের যখন অনুশীলন করা হয়, সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে যখন সব কর্ম করা হয়, তখন ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলির খেলা সত্যিকারের বুঝতে পারা যায়।

ঠাকুর বলছেন, যখন আত্মজ্ঞান হয়, শুকনো নারকল নাড়লে যেমন বোঝা যায় ভিতরে আলাদা কিছু একটা আছে, যেটা ঢপর ঢপর করে নড়ছে, ঠিক সেই ভাবে পরিষ্কার বুঝতে পারে দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা। এনারাই খুব উচ্চমানের কর্মযোগী। আর আমাদের এটা না মানার কোন কারণ নেই যে, কেন আমরা উচ্চমানের কর্মযোগী হব না। এত ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সাথে আমরা এত উচ্চমানের শাস্ত্রের আলোচনা শুনছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, কত ধর্মীয় কাজে মন যুক্ত হয়ে আছে; কেন আমরা কর্মযোগী হব না, আমরা সবাই কর্মযোগী। হতে পারে কর্মযোগে আমরা প্রথম পা রেখেছি, এরপর কেন আমরা শ্রেষ্ঠতম কর্মযোগী হতে পারব না! শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী হতে গেলে খুব সাধারণ কয়েকটা জিনিস করতে হবে। সেটাই পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।১১।।

*(নিষ্কাম কর্মযোগী ফলাসক্তি বর্জনপূর্বক মমত্ব-ভাবশূন্য হয়ে কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।)*

কর্মযোগী হওয়ার খুব সহজ উপায় বলে দিচ্ছেন। *কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা*, শরীর দিয়ে, মন দিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে, তার সাথে ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করা। মোটামুটি চার রকমের কর্ম হয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম হয়, শরীর দিয়ে হয়, মন দিয় আর বুদ্ধি দিয়ে কর্ম হয়। মন আর বুদ্ধি আলাদা করার অর্থ হল, মন হল যেখানে নানা রকমের চাঞ্চল্য রয়েছে, আর বুদ্ধি স্থির। ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ হয়, দেহ দিয়ে বিশেষ কার্য হয়, মন দিয়ে সংসার চলে, বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরে মন যায়। সমস্ত কিছুতে *কেবলৈঃ*, মমত্ব বর্জিত, আমিত্ব ত্যাগ। এমনকি যখন জপধ্যান করছি, সেখানেও আমি মুক্তি পাব, আমি ঈশ্বর দর্শন পাব, এটাও ত্যাগ। *যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি*, যোগী যখন কাজ করে *সঙ্গং ত্যক্ত্বা*, সমস্ত রকম

আসক্তি শূন্য হয়ে করে। কিসের জন্য করে? *আত্মশুদ্ধয়ে*, যা কিছু কর্ম যোগীরা করেন, তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্যই করেন। যে নূতন বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করেছে, সেও এসে যদি বলে আমি যোগী হতে চাই, নিশ্চয় সে যোগী হতে পারবে। সংসারে আজ থেকে সব কাজ তুমি নিষ্কাম ভাবে করতে শুরু করে দাও।

মহাভারতে অগস্ত্য মুনির কথা আছে, সেখানে অগস্ত্য মুনি পরিষ্কার বলছেন, আমাকে সন্তান পেতে হবে, সেইজন্য আমি এগুলো করছি, না হলে আমি করতাম না। নিজের পূর্বজদের অগস্ত্য মুনি দেখেছেন মাথা উল্টো করে গর্তে পড়ে যাচ্ছেন। মুনির মনে এখন চাঞ্চল্য এসে গেছে, আমার পূর্বজদের পূত নামক নরক থেকে উদ্ধার করতে হবে। মনে চাঞ্চল্য আসার জন্য, মন এখন অশুদ্ধ হয়ে গেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। ওনার বিবাহ হল, পুত্রবধূ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখবে; এটা ভারতের খুব প্রাচীন প্রথা। এরপর রাজা মহারাজের এক সন্তান হয়। ঠাকুর সন্তান হওয়ার খবর শুনে বলছেন, ভাল হল, ওর অতটুকু বাকি ছিল, বেরিয়ে গেল। খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঠাকুরের এই কথা। যিনি পরবর্তি কালে এত বড় সন্ন্যাসী হলেন, যিনি সব সময় ঈশ্বরের ভাবে ডুবে থাকতেন, যাঁর নামে ঠাকুর বলছেন, ওর অতটুকু বাকি ছিল, মিটে গেছে। তার মানে, তিনি স্ত্রীসঙ্গ করছেন, কেন করছেন, যতটুকু বাকি ছিল সেটুকু বার করার জন্য। এর এটাই তাৎপর্য, যেটাই করছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য। এই ভাবটাকে আমাদের জাগিয়ে রাখতে হবে, আমি যা কিছু করছি আত্মশুদ্ধির জন্য। ঠাকুর তখন সাধনায় রত, তাঁর ইচ্ছে হল রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাবেন। যদি না খান মনটা চঞ্চল থাকবে। ব্যবস্থা করা হল, তারপর একবার ডানদিকে কাত হয়ে, একবার বামদিকে কাত হয়ে তামাক খেলেন। ওই প্রথম, ওই শেষ রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাওয়া।

যে কোন কাজ করার সময়, যে কোন কিছু ভোগ করার সময়, এই ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে, আমি এগুলো আত্মশুদ্ধির জন্য করছি। সেইজন্য সব কিছুই করতে হবে মমত্ব বর্জিত হয়ে। আমি এটাকে আমার মুঠোয় ধরে রাখতে চাই, এই ভাব থাকলে আত্মশুদ্ধি হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। যদি আত্মশুদ্ধির জন্যই করা হয়, তাহলে তুমি কেন এটাকে ধরে রাখতে চাইছ? ভিতরে যে নোংরাটা জমে আছে, সেটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য তুমি এটা করছ। আমার জামা ছিড়ে গেছে, আমি ওটা ফেলে দিতে চাইছি, ফেলে দেওয়ার জন্যও একটা ক্রিয়া লাগে, ধরে আনাটাও একটা ক্রিয়া। আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি, ত্যাগটাও একটা কাজ। সেখানেও মনে একটা বৃত্তি আসে, সেই বৃত্তিটা ক্রিয়াবৃত্তি। আমি বলছি, এটা আমি ফেলে দিতে চাই, আবার বলছি আমি এটাকে ধরে রাখতে চাইছি, সেকি হয়! আপনি জামাটা ফেলে দিতে চাইছেন, ত্যাগ করতে চাইছেন, তার সাথে বলছেন আমি ধরে রাখতে চাইছি, তা কি কখন হয়! ঠিক তেমনি আত্মশুদ্ধি, ভিতরের সমস্ত নোংরাকে ফেলে দিতে চাইছি। ফেলে দেওয়াতে মমত্ব কি করে থাকবে? মমত্ব থাকলে শুদ্ধি হবে না, শুদ্ধি চাইলে মমত্ব থাকবে না, অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, জটিলতার কিছুই নেই।

আপনি বলছেন, এই ভোগটা হাজার বার না করা পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না, করুন হাজার বার ভোগ। তার মানে আপনার এখনও অনেক দেরী আছে। সবারই যে এক সঙ্গে হবে তার কোন মানে নেই, সময় লাগবে, লাগুক, কোন সমস্যা নেই। সেখানেও যদি এই ভাব জাগিয়ে রাখা যায়, এই ভোগটা আমাকে এখনও হাজার হাজার বার ভোগ করতে হবে; কোন ক্ষতি নেই। ঠিক আছে, আপনি এই ব্যাপারে সচেতন থাকুন। নিজেকে সজাগ রাখুন, আমি যে এই ভোগ করছি, উদ্দেশ্য হল ত্যাগ। যে কোন ভোগে উদ্দেশ্য থাকবে ত্যাগ, উদ্দেশ্য থাকবে আত্মশুদ্ধি।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২।।

*(ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করছি, ফললাভের জন্য না –এইভাবে কর্মফল ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মযোগী জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ চিরশান্তির (মোক্ষের) অধিকারী হন; কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্তিবশাৎ সংসারে আবদ্ধ হন।)*

আগে বলা হল, আমার ঈশ্বর দর্শন হোক, মোক্ষপ্রাপ্তি হোক, এই ভাবও কোন কাজের মধ্যে লেগে থাকবে না। ফলে যিনি যোগী, যিনি যুক্ত, *কর্মফলং ত্যক্ত্বা*, তিনি কর্মফলকে ত্যাগ করে দেন। আমার দায়ীত্ব, আমাকে এটা করতে হবে, আর আমার শুদ্ধির জন্য এই কাজ করছি। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, উনি খুব ভাল কাজ করেন। এত কাজ করেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়, তার সাথে জপ, ধ্যান, তপস্যাও করছেন, অন্য কেউ হলে দম বেরিয়ে যেত। কিন্তু সব সময় হাসি মুখ। আমি ওনার খুব প্রশংসা করি। প্রায়ই আমি ওনাকে বলি, 'আপনি কি নিষ্ঠার সঙ্গে এত বছর ধরে কত কাজ করে যাচ্ছেন'। উনি সব সময় বলবেন, 'আরে ভাই! আমাকে তো সময় কাটাতে হবে, তাই কাজ করে সময় কাটাই'। যখনই কেউ ওনার কাছে যাবেন, সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলবেন। আমি হয়ত বললাম, 'আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম'। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'আরে এমনিও তো আমি টাইম পাস করছি'। বলছেন টাইম পাস করছেন, কিন্তু মহারাজ একদিন কাজ বন্ধ করে দিলে ওনার পুরো ডিপার্টমেন্ট চোখে সরষে ফুল দেখবে। সময় তো সবাইকেই কাটাতে হয়, একজন যোগী যখন সময় কাটান তখন তিনি এভাবে কাজ করে সময় কাটান।

কিন্তু যাঁরা যোগী নন, *অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে*, ফলে এমন আসক্ত হয়ে যান যে, কর্মফল প্রাপ্তির জন্যই তাঁর কাজ করা। একজন বলছে, যাই নাতির চাঁদমুখটা একবার দেখে আসি। ঠাকুর শুনে এত রেগে গেছেন যে, বলছেন, চাঁদমুখ না পোড়ামুখ।

কয়েক বছর আগে প্রায় পয়ষট্টি বছরের এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রীর সাথে মঠে আমার কি করে দেখা হল। আমাকে দেখেই বলছেন, 'আমরা দুজনে আত্মহত্যা করতে চাই'। শুনে তো আমার মেজাজ প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। কেন আত্মহত্যা করতে চাইছেন? কাহিনীটা হল ওনাদের অনেক টাকা-পয়সা আছে, ছোটখাটো একটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে। পুত্রবধূর সাথে ভদ্রমহিলার ঝামেলা। আমি মজা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'মারধোর করে নাকি'? বললেন 'হ্যাঁ তাও করে'। কথা শুনে আমি অস্বস্থিতে পড়ে গেলাম। আমি বললাম, 'আপনারা আলাদা একটা বাড়ি করে নিলেই তো পারেন'। এই কথা বলার পর বুঝলাম আসল সমস্যা কোথায়। ওনাদের এক নাতি আছে, নাতিকে ভদ্রমহিলা এত ভালবাসেন যে, ওকে ছেড়ে ঠাকুরমা থাকতে পারেন না। অন্য দিকে স্ত্রীকে ছেড়ে ভদ্রলোক থাকতে পারবেন না। ফলে পুত্রবধূর সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। আমি বললাম, আপনাদের আর কি পথ আছে বলুন, এইভাবেই থাকুন। সুইসাইড করে কি হবে, মরে ভূত প্রেতনী হয়ে ওদের বাড়ির কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকবেন। চোখের সামনে নাতিকে দেখবেন কিন্তু নাতিকে আদর তো দূরের কথা, স্পর্শও করতে পারবেন না, সে আরেক তীব্র যন্ত্রণা। বরঞ্চ এখন লাঞ্ছনা সহ্য করেও নাতিকে আদর করতে পারছেন। নিজের ফলের ফল কিনা, নিজের সন্তানের সন্তান। শুধু যে নিজের ফলে আসক্তি তা না, ফলের ফলে আসক্তি। আসল থেকে সূদ অনেক বেশি প্রিয়। আগেকার দিনে গ্রামদেশের বুড়িরা সুদে টাকা দিত। মূল টাকাটা ছেড়ে দেবে, কিন্তু সূদ ছাড়বে না, সূদের প্রতি এমন আসক্তি। এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাচ্ছেন, যোগ আর সন্ন্যাস কেমন মিলেমিশে রয়েছে।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্নকারয়ন্।।১৩।।

*(কিন্তু যিনি পরমার্থদর্শী, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত রকমের কর্ম ত্যাগপূর্বক নিজে কিছু না করে দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানশূন্য, নিরায়াস ও প্রসন্নচিত্তে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহনগরে অবস্থান করেন।)*

আমাদের এই শরীর হল নবদ্বার যুক্ত। শরীরটা যেন একটা নগরী, আর চোখ, কান, নাক, মুখ এবং নীচে দুটি, সব মিলিয়ে নগরীর নয়টি দরজা। এর মধ্যে বসে আছেন সেই জীবাত্মা। *সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী*, মন থেকে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আত্মা সুখে বসে আছেন। কারুর মাথার উপর যদি একটা বিশাল ভারী বোঝা চাপানো থাকে, আর সেটাকে সে কোন রকমে যদি ফেলে দিতে পারে, বোঝাটা হাল্কা হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই সে সুখী হয়ে নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে করবে। ঠাকুরও বার বার বলছেন, তোমরা গৃহস্থ, তোমাদের মনে ত্যাগ। সন্ন্যাসীর মনের ত্যাগ বহিঃত্যাগ দুটোই চাই। *নবদ্বারে পুরে দেহী*, তিনি এই শরীরের মালিক, *নৈব কুর্বন্নকারয়ন্*, তিনি নিজেও কোন কাজ করেন না, কাউকে দিয়েও কোন কাজ করান না। এনারাই হলেন সুখী।

এখানে একটা সুন্দর প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। একজন প্রশ্ন করছেন, 'এটা সন্ন্যাসীদের নিয়ে কেন বলছেন? নবদ্বারের যে শরীর এর মধ্যে সুখে বসে আছেন, সবাই তো এভাবেই থাকে'। আচার্য তখন বলছেন, না, *যঃ তু অজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী* যারা অজ্ঞ হয়, সাধারণ যারা, তারা শরীর আর ইন্দ্রিয়ের যে সংঘাত, এটাকেই আত্মা মনে করে। সেইজন্য সে কখন মনে করে না, এই দেহে আমি বাস করছি। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানের পথে পা ফেলে এগিয়ে পড়েছেন, তিনি পরিষ্কার জানেন, আমি আলাদা দেহ আলাদা। আজ এই দেহে আছি, কাল আমি অন্য দেহে থাকব। সেইজন্য এনাদের এই বোধটা থাকে যে, আমি নিজেও কিছু করি না, অপরকে দিয়েও কিছু করাই না। আজকে আমি এই শরীরে বাস করছি, এখন আমি এই শরীরের মালিক; আগে অন্য শরীরে বাস করছিলাম। শরীর আলাদা আমি আলাদা, এই বোধটা এনাদের সব সময় থাকে। কেন থাকে? এরপর আমরা পরের দুটো শ্লোকের উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি।

আপনাদের সবাইকে সাবধান করে দিতে চাই, কারণ পরের এই দুটো শ্লোকে বেদান্তের একেবারে শেষ কথা বলা হয়েছে, কেউ যেন ঘাবড়ে না যান। বেদান্ত সবার জন্য নয়। যাদের হৃদয় দুর্বল, যাদের মন আরও দুর্বল, তাদের জন্য গীতা নয়, বেদান্ত নয়, এমনকি হিন্দু ধর্মও তাদের জন্য নয়। হিন্দু ধর্ম দুর্বলদের জন্য নয়। এটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যের যে, হিন্দু ধর্মে এখন যত কাপুরুষ, যত দুর্বল, অজিতেন্দ্রিয়রা জন্ম নিয়েছে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।১৪।।

*(কারণ আত্মা মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফলপ্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না; কিন্তু অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়; অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রভাবে কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্বাদি আত্মাতে আরোপিত হয়।)*

আর-একবার বলছি, এই শ্লোকের অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনে বিচলিত হবেন না, কিন্তু এটাই সত্য। যিনি সব কিছুর প্রভু, যিনি আপনার আমার ভিতরে আত্মা রূপে রয়েছেন, ইনি কোন কিছু করেন না, কাউকে দিয়েও কিছু করান না। *ন কর্তৃত্বং*, আমরা যে সব সময় বলে যাচ্ছি, ভিতরে যিনি আছেন তিনিই সব কিছু আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন, কিচ্ছু তিনি করান না। তিনি মুক্ত, কেন তিনি করাতে যাবেন!

*ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ*, ভিতরে যিনি প্রভু আছেন, আর বাইরে যিনি সব কিছুর প্রভু, দুজন আলাদা নন; কেউ কিছু করেন না। আমার আপনার যিনি আত্মা, তিনি কাউকে কোন আদেশ দেন না, কোন নির্দেশ দেন না, কাউকে দিয়ে কিছু করান না, নিজেও কিছু করেন না।

*ন কর্মফলসংযোগং*, কর্ম করলে কর্মের যে ফল হবে, তিনি সেই কর্ম আর তার ফলের কোন সংযোগ করে দেন না। তাহলে কিভাবে সব কিছু হয়?

*স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*। প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করছে। দেহটা প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়টা প্রকৃতি, বিষয়গুলি প্রকৃতি, প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কার্য করে চলছে। এটা সত্য যে, আত্মা আছেন বলেই এই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু আত্মা কোন কিছুই করেন না, তিনি নির্বিকার। তাহলে ভগবান, যিনি উপরে আছেন, তিনিই কি সব করছেন? না তিনিও কিছু করেন না।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫।।

*(পরমার্থতঃ আত্মা কারও পাপ বা পূজা জপহোমাদি কর্মের পূণ্যও গ্রহণ করেন না। অবিদ্যা দ্বারা বিবেকজ্ঞান, আত্মজ্ঞান আবৃত বলে প্রাণীগণ মোহগ্রস্ত হয়ে মনে করে 'আমিই করি ও করাই', 'আমি ভোগ করি ও করাই' – ইত্যাদি ভ্রম করে থাকে।)*

*বিভূঃ*, যিনি ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ, *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং*, আমি কোন ভুল করলে, অন্যায় করলে ঠাকুর আমাকে কোন পাপ দেন না। *ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*, তার সাথে আমি ভাল যা কিছু করছি, সেটাও ঠাকুর নেন না। কি করে নেবেন! যদি নিতে শুরু করেন তাহলে জগতে যত পাপ আছে সব পাপ তাঁর কাছে চলে যাবে, তিনি তো পাপের সমুদ্র হয়ে দাঁড়াবেন। তাহলে লোকেরা যে বলছে, আমি ঠাকুরকে সব অর্পণ করলাম, আমি এই দিলাম, সেই দিলাম?

*অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ*, যারা অজ্ঞানী, আসলে তাদের স্বরূপজ্ঞান অজ্ঞান দিয়ে আবৃত হয়ে আছে, মোহিত হয়ে তারা মনে করে 'আমি তাঁকে সব অর্পণ করলাম'। বেদান্তের শেষ কথা, *তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ*, যত প্রাণী আছে তাদের আসল জ্ঞান অজ্ঞানে ঢাকা পড়ে আছে, সেইজন্য তারা মনে করে, ঠাকুরই আমাদের দেখছেন, করোনা ঠাকুরই দিয়েছেন, ঠাকুরই আবার করোনা থেকে মুক্তি দেবেন। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে সারা বিশ্বে করোনা ছড়িয়ে দিতে। তাহলে ঠাকুরকে পূজা করে কি হবে? পূজা না করে করবেনই বা কি; ঠাকুর আপনার স্বরূপ, যদি পূজা না করেন, মাঠে বসে যাবেন, আরও বেশি বেশি করে জগতের সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন।

ভগবান তাহলে আমাদের কি দেন? ভগবান আর কি দেবেন, তিনি আমাদের স্বরূপ জ্ঞান দেন। স্বরূপ জ্ঞান পেয়ে গেলে তো আপনি রাজা, সব কিছুর মালিক হয়ে গেলেন। এই যে আপনি কুকুরের মত জিভ বার করে জগতের পিছনে দৌড়াচ্ছেন, এটা আপনার দোষ, ভগবানের তাতে কি আছে। যদি আপনি প্রার্থনা করতে শুরু করে, ভগবান তখন আপনাকে আপনার স্বরূপ জ্ঞান দিয়ে দেবেন, স্বরূপ জ্ঞানের উপর আর কিছু হয় না।

অন্তর্যামী রূপে যিনি প্রভু, আমার মধ্যে যে আমিত্ব আছে, সেটাও তিনি দেন না, তিনি যে কোন কর্মের সৃষ্টি করছেন, তাও না। তাহলে কি কর্মগুলি নিজে থেকে এক অপর থেকে হয়ে যাচ্ছে? তাও না। তাহলে কি করে হয়? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করে যাচ্ছে। *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং*, ঠাকুর তুমি আমার দোষটা নিয়ে নাও, কোন দিন ঠাকুর নেবেন না। *ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*, আমি রোজ চণ্ডী পাঠ করছি, গীতা পাঠ করছি, ঠাকুর আমার যেন পূণ্য হয়, ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে পূণ্য দিতে। ভগবান এদিকেও নেই, সেদিকেও নেই। কারা এই রকম ভাবে? অজ্ঞানীরা এই ভেবে সব কাজ করে। আমি আপনি অজ্ঞানী, সেইজন্য যা করছি মনে করছি ঠাকুর আমাকে পূণ্য দেবেন, আমার সব পাপ নিয়ে নেবেন। তাহলে কি হয়? এই ভাবে করতে করতে কোন একটা সময় আমরা ধীরে ধীরে স্বরূপ জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করব।

আচার্য সংসারী মানুষদের নিয়ে বলছেন, আমরা সবাই সংসারী, আমরাই বলি, *করোমি কারযামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি*, করছি, করাচ্ছি, খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি। আচার্য বলছেন *কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুচ্যতে*, তাহলে ভক্তরা যে পূজা করে, শুভ কর্ম করে, যজ্ঞ করে, দান করে, হোম করে, সুকৃত কর্ম করে, এত কিছু কিসের জন্য অর্পণ করে? আচার্য বলছেন, অজ্ঞানীরা অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে অর্পণ করে। এটাই বেদান্তের শেষ কথা, এটাই আদর্শ, এই অবস্থায় আমরা সবাই যেন পৌঁছাতে পারি। কিন্তু প্রথমেই যদি সব কিছু করা বন্ধ করে দেন, তাহলে, ঐ যে আগে বললেন, জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস হয়ে যাবে। আপনি প্রচুর কাজ করেছেন, কাজ করে করে কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, কর্মযোগ থেকে যখন *ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা* হয়ে গেছে, তখন ঈশ্বরের প্রতি কে অর্পণ করবেন, যিনি জ্ঞানী তিনিই অর্পণ করবেন। আমি আপনি সবাই অজ্ঞানী, কোন সন্দেহ নেই। এটা হল ভক্তি পথের থেকে একটা বিরাট তফাৎ, একেবারে বিশুদ্ধ বেদান্তের কথা। যতক্ষণ মনের এলাকায় আছি ততক্ষণ ঈশ্বর আছেন, ততক্ষণ এগুলো সব আছে। কিন্তু মনের এলাকাটাই তো অজ্ঞানের এলাকা।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬।।

*(আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁদের অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেছে, সূর্য যেমন সমস্ত বস্তুকে অবভাসিত করেন, তেমন তাঁদের আত্মজ্ঞান শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে সর্বস্তুতে প্রকাশিত করে।)*

যখন আত্মজ্ঞান হয়, তখন এই আত্মার জ্ঞান অনাদি অজ্ঞানকে নাশ করে দেয়। অন্তঃকরণে, আমাদের মনের ভিতরে যে অনাদি অজ্ঞান রয়েছে, যে অজ্ঞানের দরুণ জীব মোহিত হয়ে আছে। এই যে আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান, আমি কে, এই জ্ঞান রাত্রির অবসানে ভোরের পূব আকাশে সূর্যোদয়ের সাথে আলো প্রস্ফুটিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারের সমস্ত কালিমা সরে গিয়ে সব কিছু যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, ঠিক তেমনি এই জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথেই তার সমস্ত অনাদি অজ্ঞান দুরীভূত হয়ে আত্মার ব্যাপারে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি আপনি এটা থিওরেটিক্যালি বললে পাপ হবে, কারণ আমরা অজ্ঞানে আছি। যতক্ষণ নিজে খাচ্ছি এই বোধ থাকবে, ততক্ষণ প্রভুকে অর্পণ করে খেতে হবে। আত্মার ব্যাপারে সব কিছু যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কি হয়?

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭।।

*(পরমাত্মাতেই যাঁদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁতেই যাঁদের চিত্ত নিবিষ্ট, তাঁতেই যাঁদের পরম প্রীতি, তিনিই যাঁদের পরম আশ্রয় – এই জ্ঞানদ্বারা বিধৌতপাপ যোগীরা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে মুক্তি লাভ করেন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।)*

আপনি যদি সেই অবস্থায় পৌঁছাতে চান, যে অবস্থায় আপনার সমস্ত অপবিত্রতা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, জ্ঞানে আপনি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? *তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, বলছেন, যে পরমার্থ তত্ত্ব, যে তত্ত্বে বলছেন আত্মাই সত্য, ঈশ্বরই সত্য, এই তত্ত্বে যাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাঁরা হলেন *তদ্বুদ্ধি*। *তদ্বুদ্ধি* মানে, যিনি এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন –আত্মাই সত্য।

আর পরব্রহ্ম যাঁর আত্মা, এই বোধ যাঁর হয়ে গেছে, তিনি হলেন *তদাত্মনঃ*।

ঐ আত্ম ভাবনাতে যাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে গেছে, মানে দৃঢ় হয়ে গেছে, ফলে যেখানে সমস্ত কর্মকে সন্ন্যাস করে দিলেন, এটাকে বলছেন *তন্নিষ্ঠাঃ*।

*তৎপরায়ণাঃ*, ফলে কি হয়, এনারা যাবতীয় যা কিছু করে থাকুন, তিনি জানেন আমার পরমগতি হল সেই পরমাত্মা, সেই পরমব্রহ্ম এবং আমার সব কিছু পরমব্রহ্মে সমর্পিত, তখন এটাকে বলছেন, *তৎপরায়ণাঃ*।

মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব আত্মাতে বিলীন হয়ে গেছে, যখন এই অবস্থা হয়, তখন *জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ*, যত পাপ আদি আছে সব নাশ হয়ে গেল।

*গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিং*, সন্ধি করে বলছেন *গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং*, মৃত্যুর পর তাঁর আর জন্ম হয় না, মুক্ত হয়ে গেলেন। যিনি এই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর দেহটা যখন পড়ে গেল, তখন তাঁকে আর এই জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না।

এই জ্ঞান যে মৃত্যুর পরে পেতে হয়, তা না, এই জ্ঞানটা পেতে হবে এই শরীর থাকতে থাকতেই। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে, জীবদ্দশায় এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে, এই জীবদ্দশায় ঈশ্বর দর্শন লাভ করতে হবে, জীবদ্দশায় নিজের জীবনকে ধন্য করে নিতে হয়; পরের জন্মের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। এটাকেই বলা হয় জীবনমুক্তি। বিশ্বে একমাত্র হিন্দুরাই জীবনমুক্তির কথা বলেন।

পঞ্চম অধ্যায় শুরু করার সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞান দুটো সময় হতে পারে, এক জীবদ্দশায়, আর এক মৃত্যুকালে। আমাদের খুব প্রচলিত বিশ্বাস যে মৃত্যুকালে জ্ঞান হয়। শ্রীশ্রীমাও অনেক ভক্তকে বলছেন, চিন্তা করো না, শেষ সময়ে ঠাকুর এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ওটা ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের ভাব না। কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, এটাও ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের ভাব নয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, অনন্ত সুখ ভোগ করতে পারবে, এই ভাবও হিন্দু ধর্মের একেবারেই ঠিক ঠিক ভাব না। ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম কি, এর বর্ণনা গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ঊনিশ নম্বর শ্লোকে করছেন।

যাঁরা পুরো গীতা মুখস্ত করতে পারবেন না, তাঁরা অন্ততঃ এই দুটি শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের আঠারো আর ঊনিশ নম্বর শ্লোক অবশ্যই মুখস্ত করবেন। ঊনিশ নম্বরে শ্লোকে আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্যকে নিয়ে বলছেন। গ্রাম্য লোকাচার, দেশাচার আর পরিবারের যে আচার, এটা কোন ধর্ম না। ধর্ম আসে শাস্ত্র থেকে, শাস্ত্র মানে ঋষিদের কথা, ভগবানের কথা। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামীজী ভারতে বিভিন্ন জায়গায় যে লেকচার দিচ্ছিলেন, সেখানে তিনি কত কঠোর ও কড়া ভাষায় বলছেন, লিখছেন, তোমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। ঘটিকে বাটি ছুলে ঘটি অশুদ্ধ হল, না বাটি অশুদ্ধ হল এই বিচার করে করেই তোমাদের এই দুর্লভ মনুষ্যজীবনটা কাটিয়ে দিলে।

স্বামীজীর লেকচারগুলো সেই সময় সাঙ্কেতিক লিপিতে গুডউইন লিপিবদ্ধ করছিলেন। গুডউইন একটা চিঠিতে স্বামীজীর এই কথাকে উল্লেখ করে তাঁর মাকে খুব দুঃখ করে লিখছেন, ‘এই হিন্দুদের কোন দিন উত্থান হবে না’। প্রতি বছর পাড়ায় পাড়ায়, দূর্গাপূজা হচ্ছে, কালীপূজা হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপূজা হচ্ছে, আর সারা বছর ধরে তের পার্বণ লেগে আছে। কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য যে জিনিসগুলির বেশি প্রয়োজন, সেই পূজা, জপ, ধ্যানে কত জনের মন আছে? কি কি রান্না হবে, রান্না কত রকমের ভোগ থালায় কত ভাবে সাজানো হবে, এগুলোতেই সব মনটা লেগে আছে। আর যে যাই বলুক এটা কখনই হিন্দু ধর্ম হতে পারে না। এসবের জন্যই সমস্ত বিশ্ব হিন্দু ধর্মকে নিয়ে এত হাসাহাসি করে। যেগুলোর কোন দাম নেই, সেগুলোই আমাদের কাছে সব মুখ্য হয়ে গেছে। শুধু আঠার আর ঊনিশ নম্বর এই দুটি শ্লোক মুখস্ত করে নিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। লিখে নিন, এটাই জীবনের আদর্শ। কারণ এটাই হিন্দু ধর্মের মূল ভাব।

উনিশ নম্বরে বলছেন জীবনের আদর্শ কি আর আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন সেই আদর্শে যিনি পৌঁছে গেছেন, তাঁর আচরণ কি রকম হবে। আগে বলা হল, ব্রহ্মজ্ঞান দুটো অবস্থায় হয়, এক জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর সময়ে, গীতাও বার বার এই কথা বলবেন। হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম হল জীবনমুক্তির ধর্ম, আত্মজ্ঞানের ধর্ম। এই ধর্ম আমাকে জীবদ্দশায় পেতে হবে, জীবদ্দশায় না পাওয়া গেলে ওটা মন্দের ভাল। কারণ মৃত্যুর পর কি আছে কে জানে।

মহাভারতে একটা কাহিনীতে বলছেন, কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধার জ্বালায় এক চণ্ডালের বাড়িতে ঢুকে তার মরা কুকুরের মাংস চুরি করতে গেছেন। চণ্ডাল টের পেতেই বলছে, 'কে এই হতভাগা, যে চণ্ডালের বাড়িতে ঢুকে কুকুরের মাংস চুরি করতে এসেছে'? বিশ্বামিত্রের নাম সবাই জানত, তিনি পরিচয় দিতে চণ্ডাল চমকে বলছেন, 'আপনি একি করছেন'? বিশ্বামিত্র বলছেন, 'আমি যদি এই ক্ষুধার্থ অবস্থায় মাংস না খাই আমি এই মুহূর্তে মারা যেতে পারি। মৃত্যুর পরে স্বর্গ আছে কিনা কে দেখেছে, আর কে জানে! এই মাংস খেয়ে বেঁচে থাকলে, এতে আমার যা পাপ হবে এর জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়ার অনেক সুযোগ পেয়ে যাব। কিন্তু আমি যদি মরেই যাই তাতে আমার কি লাভ হবে'! জীবনে তখনই compromise করতে হয়, যেটা না করলে আমার প্রাণ চলে যাবে। এর বাইরে compromise করতে নেই, এমনিতে হাসি ঠাট্টা মজাতে আমরা যে compromise করে থাকি, সেটাও করতে নেই; মূল কথা ধর্ম জীবনকে কখন ছাড়তে নেই।

যখন জীবন-মরণ সমস্যায় আছেন তখনও উদ্দেশ্য হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসা। জীবদ্দশায় যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী হন, এনাদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে বলছেন, পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেও আমরা এই কথা বলেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল, সেখানেও এই কথাগুলো বলা হয়েছিল, এখানেও বলছেন। তবে এই দুটি শ্লোকে জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর বাহ্য আচরণ কেমন হবে বলছেন।

আমরা এখন মন নিয়ে কিছু কথা বলব। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আলোচনায় আচার্যের একটা কথা বলা হয়েছিল, আচার্য সেখানে খুব নামকরা কথা বলেছিলেন – সিদ্ধ পুরুষের যেটা আচরণ, সাধারণ মানুষকে সেটাই কষ্ট করে অনুশীলন করতে হয় বলে সেটাই সাধনা হয়ে যায়। সাধনা মানে, আমার আপনার দৃষ্টিতে যিনি সিদ্ধ পুরুষ, যেমন আমাদের কাছে ঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ, স্বামীজী একজন সিদ্ধ পুরুষ; এনাদের যে আচরণ ছিল, সেটাকেই আমাদের কষ্ট করে জীবনে নামাতে হবে। গীতা আদি গ্রন্থে মুক্ত পুরুষদের আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন এই আঠার নম্বর শ্লোক; আমাকে আপনাকে এটাই পালন করার চেষ্টা করতে হবে।

হিন্দু ধর্মে সাধনা আর সিদ্ধিতে কোন তফাৎ হয় না। সিদ্ধির পরে আমি যেটা করব, সাধনার সময় একই জিনিস করতে হবে। বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে দুদিন পরে এসেই মহারাজদের প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ঠাকুরের দর্শন কেন হচ্ছে না, কবে দর্শন হবে, ইত্যাদি। ঈশ্বরদর্শন হলে মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়ে যাবে? তা নয়, ঈশ্বরদর্শন হলে জীবনের সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর যেন আলু পটল, আমি এত জপ করব আর ঠাকুরের দর্শন হয়ে যাবে! না, তা হবে না। এই যে জগৎ যেটা দেখছি, জগতের প্রতি দৃষ্টিটা আমাদের পাল্টে যাবে, আসল যেটা সেটাকে আমরা দেখতে পাবো। কারণ সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে আমাদের ঢেউ দেখার অভ্যাস হয়ে গেছে; মাঝখান থেকে সমুদ্র দেখাটা আমরা ভুলেই গেছি। এই ঢেউগুলো যে সমুদ্র থেকে আসছে, সমুদ্রে লয় হচ্ছে, সমুদ্রেই এর স্থিতি, এটা ভুলে যাই। সৃষ্টিকে দেখে দেখে, সংসারের বস্তুকে দেখে দেখে ভুলে গেছি, এই যা কিছু আছে সমস্ত কিছু সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম, সেই ঈশ্বরের উপর খেলা করছে।

ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান হলে, ঢেউ থেকে দৃষ্টিটা সরে সমুদ্রে চলে যায়। ঢেউয়ে যখন দৃষ্টি থাকে তখন আমরা সব সময় বিচার করতে থাকি এটা বড় ঢেউ, এটা ছোট ঢেউ, এটা এই রকম ঢেউ, ওটা সেই রকম ঢেউ। ঢেউ থেকে সমুদ্রের দিকে চোখ চলে গেলে তখন এই যে পৃথকীকরণ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, পাপ-পূণ্য, জীবন-মৃত্যু যত রকম পৃথকীভাব রয়েছে, যত রকমের ভেদভাব আছে, সব কিছুর সমাপ্তি হয়ে যায়।

সংসারে এই পার্থক্যগুলি কিভাবে আসে? সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ দিয়ে। সত্ত্বগুণীর মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা থাকে, তিনি জ্ঞানী হন, তবে এই জ্ঞান আত্মজ্ঞানের জ্ঞান নয়। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, যাঁদের সাথে জ্ঞান সংক্রান্ত অনেক কথাবার্তা হয়। এনারাও হোয়টস্ আপ, ফেসবুক করেন, কিন্তু ওনাদের সব সময় নজর থাকে কোন ভাল খবরের দিকে, যেটা জ্ঞান সংক্রান্ত। বলা হয় যে, যাঁরা ফেসবুক করেন, যাঁরা সত্যিকারের ভাল মানুষ তাঁরা যখন ফেসবুকে কোন কিছু পোস্ট করেন, সব সময় জ্ঞান সম্পর্কিত পোস্ট করেন। এইভাবে এক এক করে দেখানো হয়, যারা অধম তারা শুধু নিজের ছবিগুলো দিয়ে বেড়ায়। অনেকে সারাক্ষণ সেলফি নিতে থাকে, বলে, সেলফি নেওয়াটা নাকি একটা মানসিক ব্যাধি। যাঁদের জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা থাকে, তাঁরা সত্ত্বগুণী। মন তাঁদের ধীর, শান্ত, সবারই প্রতি প্রেম ও করুণা থাকে আর উদার স্বভাব। আমি লুটেপুটে খাব, এই ভাব একেবারেই থাকে না।

রজোগুণীরা সব সময় আমি আমি করতে থাকে। তমোগুণীদের বাইরে থেকে দেখতে সত্ত্বগুণীর মত মনে হয়, কিন্তু পুরোপুরি তামসিক। কাজ করতে চাইবে না, কোন কিছুর প্রতি উৎসাহ নেই, দীর্ঘসূত্রী, কোন কাজ করতে বললে, এক ঘন্টার কাজকে এক সপ্তাহ ধরে বলতে থাকবে, এই তো করে দিচ্ছি। আর যে কাজই করবে দায়সারা ভাবে করবে। সত্ত্বগুণী এরকম হয় না, সত্ত্বগুণীকে কোন কাজ করতে বললে, চটপট আর নিখুঁত ভাবে করে দেবে।

শাস্ত্র আমাদের বুঝিয়ে দেয় জগতে কিভাবে এই তিনটে গুণের জন্য কত রকমের বিভাজন হয়ে আছে। যাকে আমি পছন্দ করি না, আমি তার নামে কি কি বলি? কেন পছন্দ করি না? তার মধ্যে এই এই দুর্গুণ থাকার জন্য তাকে আমি পছন্দ করি না। কি কি দুর্গুণ? প্রথম সে একটা বদমাইশ, দ্বিতীয় বলব, সে নিন্দুক, সে কামী, সে লোভী, সে অহঙ্কারী, সে স্বার্থপর; এই ধরণের অনেক দুর্গুণের কথা বলব। এই সব কটা দুর্গুণ তামসিক আর রাজসিক লোকের মধ্যে থাকবে। সাত্ত্বিক লোকের নিন্দা হয় না। শ্রীশ্রীমা যখন বলছেন, কারুর মধ্যে দোষ দেখবে না, তখন এর দুটো অর্থ হয়। একটা অর্থ হল, জগতে পর তো কেউ নেই, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কেন কারুর দোষ দেখতে নেই, যেটা এই আঠার নম্বর শ্লোকে বলবেন। দ্বিতীয় অর্থ হয়, কারুর গুণের মধ্যে দোষ দেখতে যেও না। আচার্য শঙ্করও এর আগে এই কথা বলেছেন। আমাদের দুর্বলতাটা কি? আমরা অপরের নিন্দা কেন করি? যার গুণটাকে আমার কাছে দোষ বলে মনে হয়। নিজের ছেলে যদি ভাল কথা বলে, অমনি সে বলবে, 'দেখেছ আমার ছেলেটা কত সুন্দর কথা বলতে শিখেছে, কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে'। অন্যের ছেলে বললে বলবে, 'এই বয়সেই একটা ডেঁপো হয়ে গেছে, বেশি ফটর ফটর করে'। নিজের ছেলে যদি আগ বাড়িয়ে চটফট করে সব কাজ করতে থাকে, সে বলবে 'আমার ছেলেটা কি কাজের ছেলে হয়েছে'। অপরের ছেলে করলে বলবে, 'বেশি মাতব্বর হয়ে গেছে, সব সময় ছটফট করে যাচ্ছে'। এটাই হল গুণে দোষ দেখা।

যেটা তার সত্যিকার দোষ, সেই দোষ যদি আপনি দেখতে পান, তাহলে তো আপনি আচার্য। এই দোষ দেখাটা আচার্যের কাজ, আপনি তো আচার্য নন। সবার মধ্যে যে আমরা দোষ দেখে বেরাই, এটা আচার্যের কাজ। আমরা সাধারণ মানুষ বলে গুণের মধ্যে দোষ দেখি। কিন্তু

সত্ত্বগুণী মানুষ এই রকম গুণের মধ্যে দোষ দেখেন না। আর যিনি আত্মজ্ঞানী, দোষ দেখবেন, কোন প্রশ্নই নেই। আত্মজ্ঞানীর কাছে আলাদা বলে কিছু নেই।

বেদ, উপনিষদ, গীতা সব শাস্ত্রে এই কথা বার বার আসবে। আত্মজ্ঞানীর মধ্যে inclusiveness এসে যায়। আমাদের মধ্যে inclusiveness আনার জন্য অনুশীলন দরকার, আর ঠাকুরের কৃপায় যদি আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়, তখন আপনিও দেখবেন সব এক। তখন আর দেখতে যাবেন না, কার ভাল, কিসের ভাল, কিসের মন্দ। এটাকেই এবার আঠার নম্বর শ্লোকে উদাহরণ দিয়ে বলছেন –

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮।।

*(বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ সমদর্শী হন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন।)*

পণ্ডিত কে? আচার্য শঙ্কর পণ্ডিতের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, আত্মার বিষয়ে যাঁদের বুদ্ধি স্থিত হয়ে গেছে, এনারাই হলেন পাণ্ডা বা পণ্ডিত, সব কিছুকে আত্মা রূপে দেখছেন, তিনি পণ্ডিত। পণ্ডিত মানে সংস্কৃতের পণ্ডিত না, শাস্ত্রের পণ্ডিত না, ইংরাজীর পণ্ডিত না, ফিলজফির পণ্ডিত না। শাস্ত্রে পণ্ডিতের অর্থ, যাঁদের বুদ্ধি আত্মাতে গিয়ে বসে গেছে। এর আগের শ্লোকে যেমন বলা হয়েছ, *তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ*, তৎ হল সর্বনাম, তৎ মানে সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে যাঁদের বুদ্ধি বসে গেছে, এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। আত্মজ্ঞান একবার হয়ে গেলে, বুদ্ধি আত্মাতে বসে গেলে, নিষ্ঠা একমাত্র আত্মাতেই থাকলে, সব আচরণ ওর মধ্যে ঢুকে গেলে, তখন আর কিসের তফাৎ, কোথায় আলাদা কিছু! এই পণ্ডিতদের তখন জগতের প্রতি, সবার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম হয় এবং কি করেন?

আগেকার দিন ব্রাহ্মণরা বাচ্চা বয়সে উপনয়ন হয়ে গেলেই গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করতে চলে যেতেন। সেখানে যে শুধু বেদের জ্ঞান অর্জন করতে যেতেন তা না, গুরুগৃহে গুরুর সঙ্গ করে করে তাঁরা একটা ভাল আচরণ শিখতেন। ছোটবেলাতে আমরা বাড়িতে কোন দুষ্টুমি করলে বাড়ির বড়রা বকুনি দিয়ে বলতেন, 'স্কুলে গিয়ে তুমি এই শিখছ'। কিন্তু এখন তো স্কুলে সদাচার শেখানো হয় না, জোর করে একটা ভ্যালু এডুকেশান দেওয়া হয়। কারণ বর্তমান কালে শিক্ষকরা ওখানে পয়সার জন্য আছে। আগেকার দিনে গুরুরা বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন, এমনকি ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা গুরুরাই করতেন। সরকার থেকে শুরু করে আমরা সবাই স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ নিয়ে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু সেখানে আমরা কেউ স্বামীজীর শিক্ষার দুটো আদর্শকে নিয়ে কোন কথা বলি না, যে দুটো আদর্শ খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা আদর্শের কথা স্বামীজী দিয়ে গেলেন, শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগীদের উপর অর্পণ করতে হবে। দ্বিতীয় আদর্শ হল –শিক্ষার ব্যয়ভার সমাজকেই বহন করতে হবে। স্বামীজীর এই দুটো আদর্শের কোনটাই রূপায়িত হয়নি।

সমাজে যতক্ষণ কেউ নিজেকে বলিদান না দেয়, ততক্ষণ সমাজ বড় হয় না। এই দায়ীত্ব আগে ব্রাহ্মণদের উপর ছিল। তুমি নিজেকে বিদ্যাতে সমর্পিত করে দাও। তবেই সমাজ বড় হবে। শিক্ষাটা তাহলে ফ্রী হতে হবে। সমাজই শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোশালিস্টিক আইডিয়া নিয়ে এলেন। তখন শিক্ষা ছিল ফ্রী, সব রকম শিক্ষাতে খুব সামান্য একটা অর্থ দিতে হত, তা স্কুল হোক, কলেজ হোক, আইআইটি হোক, মেডিকেল হোক। ১৯৯১ সাল থেকে যখন লিবারাইজেশন শুরু হল, তখন থেকে সব কিছুতে শুধু টাকা আর টাকা। আমেরিকায় যেমন পুরো বিজনেস লাইফ, আমাদের এখানেও সবটাই বিজনেস লাইফ হয়ে গেছে। আইআইএমে এক একটা কোর্স ফী পনের লক্ষ টাকা, কুড়ি লক্ষ টাকা। শিক্ষা

দিনে দিনে হয়ে যাচ্ছে বড়লোকেদের জন্য। স্বামীজী বারবার বলছেন, শিক্ষার দায়ীত্ব সমাজকে নিতে হবে। তার মানে, শিক্ষা সব সময় ফ্রী হবে। তখনকার দিনে আচার্য যা বলতেন, ছাত্ররা সেটা শুনত, এখন ছাত্ররা শুনবে না।

বেলুড় মঠে একজন পণ্ডিত মহারাজ আছেন, তখনকার দিনের উনি এমডি ছিলেন, খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। তবে পরে উনি ডাক্তারিটা কম আর বিদ্যাচর্চাটা বেশি করতেন। ওনাকে একটা নামকরা মেডিক্যাল কলেজে লেকচার দেওয়ার জন্য ইনভাইট করা হয়েছিল। এক সময় ঐ কলেজ থেকেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। উনি ওখানে গিয়ে যখন ওদের পড়াশোনা করার ফীজ্-এর কথা শুনলেন, শুনে উনি বলছেন, 'আমি এদের কি করে লেকচার দেব! তোমরা এই ছেলেগুলিকে দিয়ে টাকা আয় করছ, আমি ওদের ভ্যালু শেখাব কি করে? যে ছেলে এত টাকা দিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে, সেই ছেলে বেরিয়ে গিয়ে শুধু ভাবতে থাকবে কি করে আমি টাকা রিটার্ন পেতে পারি'। মহারাজ তাঁর প্রোগ্রামটাই বাতিল করে দিলেন। 'আমি ওখানে কিছু বলতে যাব না, আমার কথা ওরা কোন দিন শুনবেই না'। পুরো দেশটা আমেরিকার মডেলে একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাকে যদি ফ্রী না করা হয়, তার থেকেও বেশি, যেটা স্বামীজী বলেছিলেন, শিক্ষার দায়ীত্ব থাকবে ত্যাগীদের উপর। সেইজন্য আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোন ভ্যালু শিখছে না।

এখানে বলছেন *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে*, বিদ্যার সাথে সাথে তার মধ্যে যথার্থ বিনয় আছে। বর্তমানের কালের ছেলেরা বিদ্যা পেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিনয় নেই, চরিত্র নেই। কেন নেই? শেখাবে কে? মা-বাবা ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা লোন করে ছেলেকে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাচ্ছে, আর ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে, ছেলে কবে পাশ করে টাকা আয় করে আমাকে ঋণ মুক্ত করবে। শিক্ষকরা যাঁরা পড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে শিক্ষকতাটা ক্যারিয়ার। তাঁরা আরও টাকার জন্য আন্দোলন করছেন, বলছেন আমরা কেন তোমাদের জন্য sacrifice করব। ঠিকই বলছেন, যেখানে সবাই এই রকম হয়ে গেছে, সেখানে তো আর করার কিছু নেই।

আগে ছিল একটা জাতীয় আদর্শ, সমাজ এভাবেই তখন চলত, তোমাকে আমরা সম্মান দেব, টাকা দেব না। শিক্ষকরা এখন দুটোই চাইছে, টাকাও দিতে হবে, সম্মানও দিতে হবে। এভাবে হয় না, দুটোর মধ্যে একটাকে নিতে হবে। *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে*, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের সম্মান বেশি দেওয়া হত। এখন সেটা উঠে গেছে, কিন্তু পড়াশোনা করা মানুষকে এখনও সম্মান দেওয়া হয়। রিচার্ড ফাইনম্যানের একটা ঘটনা আছে। উনি খুব অল্প বয়সে প্রফেসর হয়েছিলেন। রিচার্ড ফাইনম্যন জিউস্ ছিলেন। তিনি একবার এক জিউস্ ফ্যামিলির সাথে দেখা করতে গেছেন। সেখানে চা ও অন্যান্য খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ফাইনম্যানকে বিদায় জানানো হচ্ছে, তখন ফ্যামিলির বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ফাইনম্যানের হাতে হাত মিলিয়ে বলছেন, 'আজকে আমার পরম সৌভাগ্যের দিন, আজ সকালে একজন আর্মি জেনারেলের সাথে দেখা হল আর এখন একজন প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হল'। ফাইনম্যান বলছেন, 'যে সমাজ বিদ্যাকে এত সম্মান দেয় যে, একজন আর্মি জেনারেল আর একজন প্রফেসারকে সমান দেখছেন; সম্মানের দৃষ্টিতে সেই সমাজ কোন দিন মার খেতে পারে না'। এটা ফাইনম্যানের কথা, আমাদের কথা না, হিন্দুরা এটা অনেক আগে থেকেই মানত। ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন হয় তবেই তাঁকে সম্মান দেবে, শুধু বিদ্যা সম্পন্ন হলে একটু কম আর শুধু ব্রাহ্মণ হলে আরও কম। কারণ এই ব্রাহ্মণের যে বংশ, এই বংশই সেই বিদ্যাকে ধরে রেখেছে।

*গবি*, *হস্তিনি* আর তার সাথে *শুনি*, *শ্বপাক* অর্থাৎ গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালের কথা বলছেন। চণ্ডালের সমস্যা ছিল, এরা একটা মিশ্র জাতি, অন্ত্যজ শ্রেণীর। মনুস্মৃতিতে বর্ণনা আছে চণ্ডাল কাকে বলা হয়, যারা শ্মশানে মরা পোড়ানর কাজ করত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এগুলোর

অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণ দিয়ে এখানে শ্রেনীবিন্যাস করা হয়েছে। যেমন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ইনি হলেন সত্ত্বগুণী; প্রথমে উত্তম প্রাণীর কথা বলার পর একটু নীচে গরুর কথা বললেন, গরুকে রজো গুণের প্রতীক বলছেন, বাকিদের মধ্যে তমোগুণ এবং তমোগুণেরও তমোগুণ। বলছেন, আত্মজ্ঞানী এদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। এটাই হিন্দুদের জীবনের আদর্শ, কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না।

আচার্য বলছেন, *অত্যন্তম্ এব অস্পৃষ্টং*, যাদের মধ্যে কোন সংস্কার নেই, যেমন চণ্ডাল আদির মধ্যে কোন সংস্কার নেই, না আছে বিদ্যার সংস্কার, না আছে কোন আচারের সংস্কার, একেবারে সংস্কারবিহীন। পরে আবার দেখা গেল, আমাদের নিজেদের মধ্যে যারা সংস্কারবিহীন তাদেরকেও বলছেন চণ্ডাল, আর আমাদের ধর্ম ও সমাজের বাইরের যারা সংস্কারবিহীন তাদেরকে বলছেন ম্লেচ্ছ। যার জন্য অন্য ধর্মের কেউ খাবার ছুঁয়ে দিলে সেই খাবার তখনকার দিনের লোকেরা খেত না। মানুষের মধ্যে যারা উত্তম, যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ, আবার সাধারণ প্রাণীর মধ্যে যে রজোগুণ, তমোগুণ, কোথাও আত্মজ্ঞানী এই ভেদ দেখেন না, সত্ত্বগুণী হোক, রজোগুণী হোক আর তমোগুণী হোক সবাইকে সমান দেখেন। এখানে সংস্কারের দিক থেকে কুকুরকে নীচে নিয়ে আসছেন, গরু শান্ত শিষ্ট বলে সংস্কারের দিক থেকে বেশি ভাল।

আচার্য বলছেন, *একম্ অবিক্রীয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, যাদের মধ্যে শীল স্বভাব, কি সেই স্বভাব, সব কিছুতে সেই নির্বিকার ব্রহ্মকে দেখাই যার স্বভাব, এই রকম পণ্ডিত সমদর্শি। ঠাকুরকে একবার হলধারী বলছেন, 'তুমি কাঙালী ভিখারীর এঁটো পাতা কুড়োচ্ছ, তোমার ছেলেমেয়ের বিয়ে কিভাবে হবে ভেবেছ'? ঠাকুর খুব রেগে গেলেন, শাস্ত্র পড়ে তোমার এই বুদ্ধি হল? ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর কাছে এগুলো কিছুই না। সমাজে থাকার সময় আত্মজ্ঞানী কিছু কিছু লোকাচার করেন ঠিকই, কিন্তু ঐটুকুই, তিনি সমদর্শি। অনেক সময় ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছু করা যায় না, যেমন শঙ্করাচার্য নিজেই একবার কাশীতে দেখছেন শিব এক চণ্ডাল হয়ে মাংসের ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছেন, আচার্য সেই চণ্ডালকে বলছেন তুমি আমার থেকে দূরে থাক। শিব তখন বলছেন, আমি যদি দেহ হই, দেহ তো জড়, সরবে কি করে। আর আমি যদি আত্মা হই, আমি তো সর্বত্র বিরাজমান, আমি যাব কোথায়? দুটোরই সম্ভবনা, হয় আমি আত্মা, নয় দেহ। দেহ কোথায় যাবে, কারণ সে জড়, আর আত্মা তো সর্বব্যাপী, কোথায় সরবে। শঙ্করাচার্য বলছেন, এ কোন সাধারণ লোকের কথা না। স্বয়ং শিব চণ্ডাল রূপে শঙ্করাচার্যকে শিক্ষা দিতে এসেছেন বুঝতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়ে পড়ে গেলেন।

স্বামীজী পরিব্রাজক হয়ে উত্তর ভারতে ঘুরছেন। যেতে যেতে দেখছেন একজন তামাক খাচ্ছে। তামাক খেতে দেখে স্বামীজীরও তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হল। তামাকে টান দিতে চাইতে লোকটি বলল, 'আমি মেথর'। স্বামীজী শুনে চলে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে ভাবছেন, আমি এটা কি করলাম, আমি তো সন্ন্যাসী। আবার তিনি ফিরে এলেন। এই হল ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বভাব, সমদর্শি। পর আপন বোধ আমাদের থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদেরও পর আপন বোধ করাটা কম করতে হবে। ছোট বড় দেখব, কিন্তু কম করতে হবে। ভেদ ভাব কম করতে হবে। ঠিক ঠিক হিন্দুদের এই হল জীবনধারা।

আচার্য তখন নিজের তরফ থেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কেন স্মৃতিশাস্ত্রে (গৌতম স্মৃতি) তো আছে, *সমসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ*, সমান সমানকে যদি বিষম দেখা হয়, আর বিষমকে যদি সম করে দেখা হয়, তাহলে পূজা আদিতে দোষ হয়। আমি একটা পূজা বা যজ্ঞ করলাম, সেখানে চারজন সন্ন্যাসী গেলেন আর সেখানে চারজন সাধারণ মানুষ আছে, এখানে সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ দুজনকে আমি সমান করতে পারি না। হিন্দুদের যত শাস্ত্র আছে, এনাদের প্রত্যেকের কথাগুলো

ইউনিফর্ম, কথার মধ্যে কোন ভেদ নেই। বেদ যা বলে উপনিষদও তাই বলে, উপনিষদ যা বলে মহাভারতও তাই বলে, মহাভারতও যা বলে স্মৃতিশাস্ত্রও তাই বলে। আচার্য শঙ্কর এই কথাটা বারবার নিয়ে আসছেন। উনি যখন একটা ব্যাখ্যা দেন, তখন কখন মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন, কখন মনুস্মৃতি থেকে উল্লেখ করছেন আবার কখনও গৌতম স্মৃতি থেকে উল্লেখ করছেন।

আচার্য ছিলেন একজন বিশাল পণ্ডিত, বিশ্বকে ভারতের যে অবদান তা হল শঙ্করাচার্যের মত একজন শ্রেষ্ঠ মন। এই রকম মন ভারতবর্ষে আর আসেনি। পুরো ভারতকে তিনি এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই কাজ অন্য কোন আচার্য করতে পারেননি; রামানুজ, মাধ্বাচার্যরাও পারেননি। সেই সময়ে ভারতে কত দর্শন, কত বিধি ছিল, আচার্য সেগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। উনি দেখাচ্ছেন, তফাৎ কিছু নেই। কেন তফাৎ নেই বলছেন? গৌতম স্মৃতিতেই বলছে, যদি সমকে বিষম আর বিষমকে সম করে দেখা হয় তাহলে পূজাতে দোষ হয়। বলছেন, এতে দোষ হবে না। কেন দোষ হবে না? তার উত্তর হল ঊনিশ নম্বর শ্লোক।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এই ঊনিশ নম্বর শ্লোক খুব উল্লেখ করতেন। বেদান্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে কি রকম এনার্জেটিক হয়, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে দেখলে বোঝা যেত। জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ফুল অফ এনার্জি ছিলেন। একবার মুসৌরীতে আইএএস একাডেমীতে লেকচার দিতে যাচ্ছিলেন। প্রত্যকে বছর তিনি ওখানে লেকচার দিতে যেতেন। একবার গাড়ি করে যেতে যেতে দেখছেন একটা মাঠে ইয়ং ছেলেরা ভলিবল খেলছে। তখন ওনার ষাট পয়ষট্টি বয়স হবে। উনি গাড়ি থামালেন। একটা ইয়ং ছেলে টিপ্পণি কেটে বলছে, 'কেয়া বাবাজী ভলিবল খেলনা হ্যায়'। উনি বললেন, 'হাঁ খেলনা হ্যায়'। উনি গেরুয়া ধুতিটা মালকোচা করে বেঁধে নিলেন, সোজা ভলিবল কোর্টে নেমে খেলতে শুরু করলেন। ভলিবলে উনি ভাল স্যাশার ছিলেন। দেওঘরেও উনি এসেছিলেন, আমরা অবাক হয়ে দেখতাম ওই বয়সে নেটের কাছে লাফিয়ে কিভাবে বলগুলিকে স্যাশ করছেন, ভিতরে এত এনার্জি যে আমরা কল্পনাই করতে পারি না। উনি যখন আঙুল নেড়ে নেড়ে লেকচার দিতেন মনে হত যেন ইলেক্ট্রিফাইড করে দিচ্ছেন। আমি ওনার কাছেই প্রথম এই ঊনিশ নম্বর শ্লোকটা শুনেছিলাম। মহারাজ বলতেন এটাই বেদান্ত –

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯।।

*(যাঁদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, এই জীবনেই তাঁরা সংসার জয় করেন – অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে যান; যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দোষ তাই সমদর্শিগণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকেন।)*

*সর্গঃ* মানে সৃষ্টি, যেখানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, এখানেই জয় করা যায়, এখানেই জীবনমুক্ত হওয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝেই 'জীবনমুক্তি' শব্দটা ব্যবহার করছি, 'জীবনমুক্তি' শব্দের অর্থ জীবদ্দশায় আত্মজ্ঞান লাভ, শরীর থাকতে থাকতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। কাশীতে মরলে মুক্তি না; মরার সময় ঠাকুরে এসে নিয়ে যাবেন, সেটাও না; মরার পর স্বর্গে যাব, এগুলো কিছুই না; এখানেই সব কিছুকে জয় করতে হবে। *ইহৈব তৈর্জিতঃ*, here and right now, এখানেই এই শরীর থাকা অবস্থাতেই আমাকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে।

কে জয় করেন? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, যাঁদের মনে এই সাম্য অবস্থা এসে গেছে, যে সাম্য অবস্থার কথা আঠার নম্বর শ্লোকে বলা হল। আঠার নম্বরে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে, গুরু লঘুকে এক করে দাও। আমাদের গুরু লঘুর ভাব এত বেশি প্রবল যে, ফলস্বরূপ পছন্দ, অপছন্দ, রাগ, দ্বেষ এগুলো আমাদের প্রচণ্ড মাত্রায় বেশি। তা না, গুরু লঘুর প্রতি সমান ভাব, সাম্য ভাব এসে যায়।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনি তো অনেক বই লিখেছেন, 'আপনার নিজের প্রিয় বই কোনটা'? 'সমস্ত সৃষ্টি সন্তানের মত, প্রিয় অপ্রিয় হয় নাকি'!

জীবনের উদ্দেশ্য *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এই জীবনেই জয় করতে হবে। কিভাবে বুঝব জয় করতে পেরেছি কিনা? যেটা আঠার নম্বর শ্লোকে আগে বলে দিলেন, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি*, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল এদের সবার মধ্যে সেই নির্বিকার ব্রহ্মকে দর্শন করছি কিনা। ভারতের দুর্ভাগ্য, কোন দিন এই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের অনুশীলন করল না ভারত। আরব দেশের পত্রিকা আল জাজিরা সুযোগ পেলেই ভারতকে গালাগাল দেবে আর হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দেবে। কিছু দিন আগে একটা লেখা বেরিয়েছে যার হেডলাইন হল, Complex hierarchical nature of Hindu cast system, ওরা খুঁজতে থাকে হিন্দু ধর্মে কোথায় কি গোলমাল আছে। যে ধর্মের ধর্মশাস্ত্র গীতা বলছে, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, যেখানে সমদর্শিতার কথা বলা হচ্ছে, সমদর্শিতা যাদের জীবনধারা, সেখানে এত সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সেইজন্য আজকে ভারতের এই দুরবস্থা, হিন্দুদের এই পরিণতি। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি চণ্ডাল, তুমি অমুক, এই করে দেশটা রসাতলে গেল।

স্বামীজী ভারত পরিক্রমার সময় সব জায়গায় এই জিনিসটার উপর জোর দিয়ে বলে গেলেন –তোমরা সমদর্শি হও। সমাজে বড় ছোট থাকবেই, বড়লোক সাধারণ লোক থাকবেই, কিন্তু তাই বলে এত বিভাজন? দু হাজার থেকে তিন হাজার কত cast আছে কেউ জানে না। ভারত সরকার কিছু দিন পর পর সেনসাস করছে, তাতেও কিছুই হচ্ছে না, এ বলছে ওকে মানব না, সে বলছে তাকে মানব না; ভারতের জন্য সত্যিই খুব দুর্ভাগ্য। এই সমদর্শিতা যদি তোমার না থাকে, তুমি কিসের হিন্দু! সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, A Hindu, who is not spiritual, I do not consider him as a Hindu, আধ্যাত্মিক যদি আপনি না হন, তাহলে আপনি হিন্দু নন। আধ্যাত্মিক যদি হন, তাহলে আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হবে *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে জয় করতে হবে। কিভাবে? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, মনের মধ্যে একটা সাম্য ভাব আনতে হবে, যেটা বাইরে দেখা যাবে সমদর্শিতা রূপে। যেখানে ব্রাহ্মণ হোক, গরু হোক, কুকুর হোক, চণ্ডাল হোক সবাই সমান।

আচার্য বলছেন, *জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম*, এই জন্মেই জীবনকে জয় করে নিয়েছেন। *যেষাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে*, এই বোধ, সবার প্রতি সম ভাব। ঠাকুর বাঘ নারায়ণের কথা বলছেন, সবই নারায়ণ কিন্তু বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়, কিন্তু ভিতরে এই জ্ঞান থাকবে যে, সেও নারায়ণ। দুষ্ট নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম, কিন্তু বোধ রাখতে হবে, সেও নারায়ণ। দেওঘরে বিদ্যাপীঠে ভব মহারাজ এক সময় সেক্রেটারী ছিলেন, খুব উচ্চমানের সাধু। আমরা যাঁরা পরে দেওঘরে জয়েন করেছি, ওনাকে অনেকেই আমরা দেখিনি, কিন্তু ওনার অনেক গল্প শুনেছি, দেওঘরেও শুনেছি, আর বেলুড় মঠেও। ছুটির পর যেদিন দেওঘরের স্কুল খুলত, তার আগের দিন সমস্ত সাধুদের একত্রে ডেকে খুব মিষ্টি করে বলতেন, 'দেখো, বালক নারায়ণরা সবাই ছুটির পর কালকে আসছেন, ওনাদের সেবায় যেন কোন ত্রুটি না হয়। আপনার সংস্থায় ছাত্ররা যারা পড়ছে, এরা নারায়ণ, বালক নারায়ণ। দুষ্টুমি করলে অবশ্যই তাকে বকতে হবে, কিন্তু সে নারায়ণ এই বোধটা থাকতে হবে'।

আমাদের ক্লাশে একজন ভদ্রলোক লেকচার শুনতে আসতেন, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ক্লাশ করতেন। তাঁকে শুধু আমি বলেছিলাম, 'অন্ততঃ তিন দিন এই ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা করুন যে, সব নারায়ণ, নারায়ণ জ্ঞানে সবাইকে দেখবেন; স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে তিন দিন নারায়ণ জ্ঞানে দেখুন'। কিছু দিন পর তিনি ক্লাশে এসে আমাকে বলছেন, 'মহারাজ অনেক চেষ্টা

করলাম, কিন্তু একদিনও পারলাম না'। আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'এই যে মনে আছে, চেষ্টা করেছেন, এটাই অনেক'। আপনার স্বামী মাতাল হোক, লম্পট হোক, যাই হোক, নারায়ণ রূপে দেখুন; সন্তান যেমনই হোক বালক নারায়ণ রূপে দেখুন। দেখবেন আপনার ভিতরে যে তিক্ততা, জ্বালা আছে সব চলে যাবে।

একজন ভক্ত একবার শ্রীশ্রীমাকে এসে প্রণাম করে বলছে, 'মা আশীর্বাদ করুন ঠাকুরের নামে যেন পাগল হয়ে যেতে পারি'। মা সেই ভক্তকে বলছেন, 'বাবা ও রকম বলতে নেই, কত পাপ করলে তবে গিয়ে মানুষ পাগল হয়'। মায়ের এই কথা পড়ার পর আমার খুব অবাক লেগেছিল – কত পাপ করলে গিয়ে মানুষ পাগল হয়। তার মানে যে পাগল হয়ে গেছে সে কত পাপ করেছে বলেই পাগল হয়েছে। কত মর্ম বেদনাদায়ক কথা! বর্তমান কালে মনস্তাত্ত্বিদের কাছে এই ধরণের কত রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের ঘুম হয় না, মন সব সময় বিষণ্ন, খুব আক্রমাণাত্মক, ঝগড়ুটে, এগুলো সব পাগলামীর লক্ষণ।

ভারতে এখন একটা নূতন রোগ এসেছে, আগে আমেরিকাতে ছিল, রোগটার নাম BPD, Borderline Personality Disorder। ইয়ং ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। Personality disorder মানেই পাগল, কিন্তু এরা হল borderline case। ঠিক পাগলও না আবার পুরোপুরি ব্যালেন্সেও নেই। এরা কি করে? বাড়ির সমস্ত রকম সুবিধা নেবে, কিন্তু দায়ীত্ব পালনের সময় যখন আসে তখন ওরা কেউ সেটা পালন করবে না। কিছু বললে, এমন চেঁচামেচি, চিৎকার, ভাঙচুর করতে শুরু করবে যে, বাবা-মা পিছিয়ে যায়। একটা সেলফোন দিল না, সুইসাইড করে দিল। মা একটু বকুনি দিল, সুইসাইড করে নিচ্ছে। স্বাভাবিক মানুষ কখন সুইসাইড করবে না, পাগল না হলে কখন সুইসাইড করতে যাবে না। ব্রেন ফেল করে গেছে, ব্রেন ফেল না করলে সুইসাইড করে না, সুইসাইডের চিন্তাও সে করবে না। ডিপ্রেশানের একটা চরম পর্যায়ে না গেল কখন সুইসাইড করবে না। আমি দেখেছি, যাদের অল্প অল্প সমস্যা, হাল্কা ঘুমের সমস্যা, ডিপ্রেশান, সব কজনই কিন্তু গোলমেলে লোক। যখন পাপের ফল পেকে ফেটে যায় তখনই আক্রমণাত্মক ভাব, বিষণ্নতা, হতাশা এগুলো আসতে থাকে। বাচ্চা বয়স থেকে যাদের মধ্যে বিপিডি দেখা যায়, বুঝতে হবে আগের জন্মে অনেক পাপ করে এসেছে।

বলছেন, *নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম নির্দোষ, নির্দোষ মানে আত্মা কোন কিছুর সাথে লিপ্ত হয় না। আত্মাকে দোষযুক্ত মনে হয়। কেউ তামসিক লোক, কেউ রাজসিক লোক, সেখানে দেখে মনে হয় আত্মাই যেন দোষযুক্ত। কিন্তু আত্মা নির্লিপ্ত, পরে গীতাতেই এর উপর অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আসবে। আগেকার দিনে কিছু কিছু ফিলজফার ছিলেন, যাঁরা এগুলোকে আত্মার ধর্ম বলে মনে করতেন। আচার্য বলছেন, এগুলো আত্মার ধর্ম না, এগুলো মনের ধর্ম, মন আত্মা নয়। *সমং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম সব সময় সমান।

ঠাকুর বলছেন, দীপের আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে, কেউ আবার নোট জাল করছে, কিন্তু দীপ নির্বিকার। পরে গীতাতেও এই নির্বিকারকে নিয়ে বলবেন। জ্ঞানী পুরুষরা ওই *সমং ব্রহ্ম*তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলে কখন তাঁদের মধ্যে ভেদ ভাব আসে না। সেইজন্য আর কি হয়? এই ধরণের মানুষকে দোষের গন্ধ পর্যন্ত স্পর্শ করে না। দেহ, মন, বুদ্ধি এদের যে সংঘাত, এটাকে এনারা আত্মা রূপে দেখেন। দুটো জগৎ - একটা আত্মার, আর-একটা মনের। এটা সত্য যে আত্মা থেকেই মনের সৃষ্টি, কিন্তু জগৎ আলাদা। মনের জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলা; ভাল মন্দ, বড় ছোট সব এইখানেই। কিন্তু এর পারে যেটা, সেখানে এসব কিছু নেই। সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক জায়গায় পাহাড় থাকে, সমুদ্রের পারে কোথাও উঁচু জমি, কোথাও নীচু জমি, কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে চলে গেলে সব সমান।

তাহলে গৌতম স্মৃতিতে এই যে বলছেন, *সমসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ*, পূজার সময়ে সম আর বিষম, গুরু চণ্ডাল এক করা যাবে না। আচার্য বলছেন, ঠিকই বলছেন, তখন ওটা এক করা যাবে না। পূজার সময় পরিষ্কার বলা হচ্ছে, যখন দান আদি করা হয়, তখন বলাই হয় যে *ব্রহ্মবেত্তা বেদাদি*, ষড়াঙ্গকে জানেন এমন ব্রহ্মবেত্তাকে দান করবে। এখানে এই তফাৎগুলো থাকবে। অর্থ হল, স্মৃতি আদি গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, এগুলো ব্রহ্মবেত্তার জন্য না; আমার আপনার মত লোকেদের জন্য, যাদের এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয়। স্মৃতির এই কথাগুলো তাঁদের জন্যই বলা হয়েছে, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নন। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী না, তাদের সবাইকে গীতা অজ্ঞানী বলে। অজ্ঞানী বলতে যে কেউ, যারই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়নি সবাই তারা অজ্ঞানী। বলছেন, গৌতম স্মৃতি সূত্রে যেটা বলা হয়েছে, এটা অজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কারণ সেখানে এই ভেদাভেদ গুলো নিয়ে আসা হয়। আর তাছাড়া ব্রহ্ম সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষের পারে, সেইজন্য এই জিনিসগুলো ব্রহ্মবেত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

তেরো নম্বর শ্লোকে বলে দিয়েছেন –*সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী*,; সমস্ত কর্মকে তিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন, এরপর তাঁর আর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। মূল বক্তব্য হল, যত লৌকিক আচার আছে, যত রকম পূজার আচার আছে, এগুলো যিনি ব্রহ্মবিদ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে বাঁধতে পারে না। ঠাকুরকে একজন বলছেন, আপনি নরেন, রাখাল এসব ছোকড়াদের এত ভালবাসেন কেন? সেই সময় নরেনের পিতৃদেব গত হয়েছেন, টাকা-পয়সা কিছু নেই, সংসারে খুব দুর্দিন চলছে। ঠাকুর বলছেন, নরেনের ভাতে নুনটাও জোটে না, ওকে ভালবাসছি বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর নরেনকে যেমন ভালবাসছেন, অন্য দিকে নিরক্ষর লাটুকেও ভালবাসছেন, আবার শশী মহারাজ, হরি মহারাজকেও ভালবাসছেন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা এভাবেই সবাইকে দেখেন, কোন তফাৎ করেন না। *বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন* যেটা বললেন, এটাকেই পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন এই ব্রহ্মজ্ঞানীদের স্বভাব কি রকম হয় –

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০।।

*(নির্দোষ ব্রহ্মই সর্বভূতে এক আত্মারূপে বিরাজিত –এই প্রকার স্থির বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা মোহশূন্য ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ প্রিয় বস্তু পেয়ে উৎফুল্ল বা অপ্রিয় বস্তু পেয়ে উদ্বিগ্ন হন না।)*

প্রিয় বস্তু পেলে আনন্দে ব্রহ্মবেত্তা আটখানা হয়ে যান না, অপ্রিয় সংযোগ হলে তিনি ভেঙে পড়েন না। সেইজন্য সাধারণ মানুষদেরও প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ না। এই সমস্যাগুলি তাদেরই মধ্যে হয়, যারা আত্মা বলতে নিজের দেহকে মনে করে, অর্থাৎ যারা দেহাত্মবুদ্ধি। দেহ, মন, বুদ্ধিকে যখন আমরা আত্মা মনে করছি, এই আত্মা হলেন উপাধিসহিত আত্মা বা সোপাধিক আত্মা। উদ্দেশ্য হলে নিরুপাধিক আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেখানে কোন উপাধি নেই। উপাধি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। মূল হলেন আত্মা, আত্মা আছেন বলেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কাজ করছে, সেই আত্মার উপর অনেক উপাধি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম সোপাধিক আত্মাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি, *ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য*, প্রিয় জিনিস পেয়ে তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন না, আবার *নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্*, অপ্রিয় কিছু হয়ে গেলে, বা কোন অপ্রিয় বস্তু পেয়ে গেলে তিনি উদ্বিগ্ন হন না। কারণ *স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ*, তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে, কোন কাজের দিকে যান না। মানুষ তখনই কোন কাজ করে, যখন তার মনে হয় আমার এই অভাব আছে। অভাবের পূরণ করার জন্য আমার এই এই লাগবে, এবার সেটাকে পাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে। কিন্তু যিনি পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর আর কিসের অভাব, কেন তিনি কাজ করতে যাবেন। অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করে দেন। আর তার সঙ্গে বলছেন –

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১।।

*(যিনি শব্দাদি বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি প্রত্যগাত্মাতে বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ শাশ্বত সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মযোগযুক্ত হয়ে অক্ষর ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন।)*

ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু ধরা হয়, এটাকে বলা হয় স্পর্শ, কারণ তাকে স্পর্শ করা হচ্ছে। আমার কাছে এই কলম আছে, আমি দেখছি, আপনারও দেখছেন এখানে কলম আছে। যাঁরা ফিজিক্স পড়েছেন, তাঁরা জানবেন, কলমের উপর আলো পড়েছে, সেই আলোর প্রতিফলন আমার চোখে আসছে, সেখান থেকে আমি জানছি এটা কলম। আমাদের ঋষিরা এটা মানবেন না, আমরাও মানিনা। তবে আমরাও বলছি যে এটা ঠিকই বলা হচ্ছে। আলো কলমের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে যাচ্ছে, চোখ থেকে মনে যাচ্ছে। আমার ইন্দ্রিয়গুলি নড়ে উঠছে। মন তখন একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেয়। বাইরে থেকে যেভাবে ভিতরে এসেছে, ঠিক সেই একই ভাবে ভিতর থেকে চেতনা বাইরে যায়, বাইরে গিয়ে ওই জিনিসটাকে স্পর্শ করে।

উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, অন্ধকারে যখন কিছু খুঁজি, তখন কোন সিগন্যাল নেই, আমিই চোখটা নাড়ছি, ওটাকে খোঁজার চেষ্টা করছি বা পাশের ঘরে কেউ কথা বলছে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি কি বলছে। কেন চেষ্টা করছি? দৃষ্টিটা ওখানে ঘুর ঘুর করছে, যে জিনিসটাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ছুঁয়ে নেয়, এটাকে বলছেন স্পর্শ। সব জিনিসগুলি বাইরে রয়েছে। বাইরের জিনিসগুলি যখন টোকা দেয় তখন ভিতর থেকে আমাদের জ্ঞান বেরিয়ে আসে, এটাকে বৃত্তি হলা হয়। এটাই আমাদের জ্ঞান দেয়। এগুলো কোনটাই মনের ভিতরে নেই, আসলে বাইরে রয়েছে। যার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে ঘুর ঘুর করতে থাকে। *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*, বাইরের এই স্পর্শ থেকে আত্মা সব সময় অসক্ত, কোন কিছুতে আত্মা জড়ায় না। বাইরে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যা কিছু আছে, এগুলো হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি জড়ায়, আত্মা কোন ভাবে জড়ায় না।

*বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্*, নিজের ভিতরে যে সুখ, সেই সুখ পায়। বাইরে দিকে দৌড়ানটা যখন মানুষের বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে ভিতরে সুখের দিকে এগিয়ে যায়। *ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা*, ব্রহ্মকে জানা, যিনি এটাকেই যোগ করে নিয়েছেন, তাকে বলছেন ব্রহ্মযোগ। *যুক্তাত্মা*, ব্রহ্মে নিজের মনকে লাগিয়ে দেওয়া, এটাই হয় ব্রহ্মযোগ। যাঁদের মন এই ভাবে ব্রহ্মে যুক্ত হয়ে যায়, তাঁরা অক্ষয় সুখ পান। এই অক্ষয় সুখ কেউ যদি পেতে চান, যে সুখের কখন ক্ষয় হয় না, তাহলে বাইরের সুখের আস্বাদ নেওয়াটা তাঁকে বন্ধ করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো জোঁকের মত সুর বার করে খুঁজছে কাকে ধরা যায়। বড় একটা বিয়ে বাড়ির পার্টিতে ছেলেগুলো দেখতে থাকে কোথায় ভাল মেয়ে পাওয়া যায়, মেয়েগুলো আড় চোখে দেখতে থাকে কোন ছেলেটাকে পাকড়াও করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি এদের মত নাচতে থাকে, মনটাও ইন্দ্রিয়ের পিছন পিছন দৌড়ায়। মনের সঙ্গে আবার আমিত্বটা যায়। যেটার জন্য দৌড়াচ্ছিল সেটা যদি না পায়, আর পেয়ে যদি হারিয়ে যায়, তখন ঘটি ঘটি কাঁদে। ঠাকুর বলছেন, লোকে মাগের জন্য, টাকার জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বলো। পাচ্ছি না বলে কাঁদে, হাত থেকে চলে গেছে বলে কাঁদে। এটাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

যে হি সংস্পর্জা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২।।

*(হে কৌন্তেয়, রূপরসাদি বিষয় থেকে উৎপন্ন সকল সুখ সর্বদা দুঃখেরই কারণ; কারণ এগুলোর আদি আছে, অন্ত আছে, অতএব ক্ষণিক। এটা ইহলোকে যেমন সত্য, পরলোকেও তেমন সত্য। সেইজন্য জ্ঞানিগণ এতে প্রীতিলাভ করেন না।)*

ইন্দ্রিয়ের যে সুখ, এর আদি আছে, অন্ত আছে। একটা সময়ে শুরু হয়েছিল, একটা সময় শেষ হয়ে যাবে। যে জিনিসটা শুরু হয়েছে, শেষ হয়ে যাবে, সেটা মাঝেও থাকে না। আমরা এই শ্লোকটাকে কুড়ি ও একুশ নম্বর শ্লোককে একসাথে মিলিয়ে আলোচনা করব।

মৃত্যুর পর আমার কি হবে, কি হবে না, এ-সবের দিকে হিন্দু ধর্ম তাকায় না। হিন্দু ধর্ম এই কথা বলে –আমাকে যা করার এখানেই করতে হবে। পঞ্চম অধ্যায়ের বাইশ নম্বর পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম, এরপরে আরও সাতটা শ্লোক আসবে। এই সাতটা শ্লোকেও বেশ কিছু জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করবেন। তার মধ্যে একটা হল দুঃখের পারে যাওয়া। ভগবান বুদ্ধও জগতে শুধু দুঃখই দেখে গেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের কাছে এই জগতে একমাত্র দুঃখই হল আর্যসত্য। গীতা প্রথম থেকে শোক আর মোহকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন। বেদান্ত পড়তে গেলে বলা হয়, *তপ্তশিরোবৎ* যদি তোমার না হয় তাহলে তোমার এখনও বেদান্ত পড়ার সময় হয়নি। মাথার চুলে আগুন লেগে গেছে, পাগলের মত জলের সন্ধানে দৌড়াচ্ছে, জল দেখলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথার আগুনটাকে নিভিয়ে দেবে। এই ভাব যদি থাকে তবেই তার জন্য বেদান্ত, এই অবস্থা না হলে বেদান্ত তাদের জন্য নয়।

ঠাকুর বলছেন, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এদের দ্বারা ধর্ম হয় না। গীতা এই জিনিসটাকে আমাদের কাছে তুলে ধরছেন, তুমি বোঝ তুমি দুঃখে আছ, আরও বেশি বুঝে নাও যে, এই জগতে সুখের বিন্দু মাত্র আশা নেই। এই ধরণের কথা শুনলে অনেকের মনে হতে পারে, খুব নেগেটিভ কথাবার্তা। একটুও নেগেটিভ না। কারণ যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতার হন তাঁদের মত পজেটিভ মানুষ আর কেউ হতে পারে না। আর সত্যিই যার জন্য আজ আমরা দেখছি বিশ্ব ইতিহাসে মানবজাতির জীবনে যাঁরা একটু যে আনন্দ দিয়েছেন, মানবজাতির জীবনে একটু যে শান্তি দিয়েছেন, তাঁরা সবাই হলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ। আর বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতারা শুধু হানাহানি, কাটাকাটি করে পৃথিবীর মাটির রঙ লাল করে দিয়েছেন রক্তপাতের মাধ্যমে। অবতার পুরুষরা এই মাটির রঙ সবুজ করে দেন নিজেদের ভালবাসা দিয়ে। ভালবাসা তখনই হয় যখন তিনি সবাইকে ভালবাসতে পারবেন।

গীতায় ভগবান একটু পরেই আবার বলবেন *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, সবাইকে ভালবাসার কথা বলছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বলে, আমার ধর্মের লোকেদের আমি দেখাশোনা করব, এর বাইরে যারা আছে তারা মর। হিন্দু ধর্ম কক্ষণ আমাদের এই ধরণের কাজ করতেও দেবে না, মুখেও বলতে দেবে না। আমাদের শাস্ত্র বারবার বলবেন, তুমি দুঃখকে অতিক্রম কর, কিংবা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলবেন।

তিন প্রকার দুঃখের কথা বলা হয় – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক। কিছু দুঃখ শরীরের ভিতর থেকে আসে, যেমন ব্যধি, যেমন করোনা; করোনার ঝামেলাটা বাইরে থেকে আসে ঠিকই, কিন্তু আসল কষ্টটা ভিতর থেকে আসে। আধিভৌতিক মানে, জীবজন্তু থেকে যে দুঃখ আসে, সাপ, বিছে, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ ইত্যাদি থেকে যে দুঃখ-বিপদ আসে। আধিদৈবিক, যেগুলো আমাদের হাতে নেই; যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, আম্ফানের মত ঝড়। বলা হয় এগুলো দেবতারা দেন। করোনা আবার বিচিত্র, কখন মনে হয় আধিদৈবিক, দেবতারা পাঠিয়েছেন; আবার কখন মনে হয় আধিভৌতিক, কারণ করোনা ভাইরাস আমাদের শরীরকে আক্রমণ করছে, কিন্তু আসল দুর্ভোগটা হয় ভিতর থেকে। ঠিক ঠিক দেখলে, সমস্ত দুঃখ ভিতর থেকেই আসে। ঘটনা যা বাইরেই ঘটে, কিন্তু আসল জিনিসগুলো সব ভিতরেই হয়।

এই দুঃখ জিনিসটা কেন হয়? একটু টাকা-পয়সার অভাব হলে কত দুর্ভাবনা, কত চোখে জল চলে আসে। চাকরিতে প্রমোশন না হলে চোখে জল চলে আসে। একজন ইতিহাসবিদ জীবনকে

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খুব সুন্দর লিখছেন। আগেকার দিনে যোদ্ধাদের জন্যই এই পৃথিবী ছিল, যারা যোদ্ধা ছিল তারাই পৃথিবীকে জয় করতেন। আবার বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, পণ্ডিতরা এই সভ্যতাকে সামলেছেন। যেমন স্বামীজী বলছেন, ভারতে এক সময় ব্রাহ্মণদের যুগ ছিল, কখন ক্ষত্রিয়দের যুগ ছিল, আবার বৈশ্যদের যুগও ছিল। তিনি মজা করে লিখছেন, গত একশ বছরটা হল আমলাদের জগৎ। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিসে যায়, সেখানে গিয়ে ফাইলে সই করতে থাকে। সারা বিশ্ব এখন ফাইল দিয়েই চলছে। ফাইলে ওরা কিসের জন্য সই করে ওরা নিজেরাও জানে না। ওদের মাথায় কেবল ঘুরতে থাকে, আমার প্রমোশন কবে হবে। প্রমোশন পেয়ে পেয়ে যতটা উপরে যাওয়া যেতে পারে। আর যখন দেখে আর প্রমোশন হবে না, তখন তার কাজেকর্ম কেমন একটা গয়ং গচ্ছ ভাব এসে যায়।

একটা সময় বছরে এক-দুবার লেকচার দিতে আমাকে আইআইএম ইন্দোরে যেতে হত। একবার আমি গিয়েছিলাম, সেবার ওরা ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের বড় বড় Executivesদের একটা ইন-হাউস ট্রেনিংএ এনেছেন। তাদের সবারই কাজ থেকে অবসরের নেওয়ার সময় এসে গেছে, আর বেশি দিন চাকরি নেই। যারা ম্যানেজমেন্ট পড়াবে তারা সব ছোকড়া। ওদের যে কোর্স-কোর্ডিনেটার ছিলেন, তিনি আমাকে এসে বলছেন, 'স্বামীজী আপনাকে আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে। চল্লিশ জনের মত Executives, সবার রিটায়রমেন্টের সময় এসে গেছে, ওদের আর কিসের ইনসেন্টিভ আর কিসের প্রমোশন'! আমাকে বলছেন, 'যখনই ক্লাশে ঢুকি মনে হয় mass of negativity আমাকে ধাক্কা মেরে ক্লাশ থেকে বার করে দিচ্ছে'। ঠিক এই শব্দটাই বলেছিলেন, mass of negativity। 'স্বামীজী কোন রকমে আপনি যদি এটাকে ভেঙে দিতে পারেন, আপনার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ থাকব'। আমি বললাম, 'কোন ব্যপারই না'। 'স্বামীজী আপনি এক ঘন্টা বলতে পারবেন তো'? 'আমি দু ঘন্টা বলে দিতে পারব, আপনার কোন চিন্তা নেই'। 'কি বলছেন, দু ঘন্টা ওদের ক্লাশে আপনি থাকবেন'? 'আমার কাছে কোন ব্যাপারই না'। ঢুকলাম, বলতে শুরু করলাম। দু ঘন্টার পরেও ক্লাশ নেওয়া শেষ হচ্ছে না। সেই কোর্ডিনেটার ভদ্রলোক যিনি বিদেশে হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিতে পড়াশোনা করা, তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কি করে আমি এতক্ষণ ক্লাশ নিলাম। যে লোকটি যেখানে পৌঁছাবার ক্ষমতা সেখানে পৌঁছে গেছে, তার আর কিসের ইনিসিয়েটিভ, তার কিসের ইনসেন্টিভ, আমি কি বলব তাকে, সে জানে আমি এবার রিটায়ার হতে যাচ্ছি।

বর্তমান কালে পুরো জগৎ শুধু প্রমোশন, প্রমোশন, এই জিনিসটার উপর চলছে। কিন্তু একটু ভাল ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এদের মধ্যেও যে একটু শান্তি রয়েছে, এটা রয়েছে এই ভগবানের কথাতে। আমিও যখন ভগবানের কথা, উচ্চ আদর্শের কথা বলতে শুরু করলাম, তাঁরা মন দিয়ে শুনলেন। শেষে ঘুরে ফিরে দেখবেন শুধু দুঃখ আর দুঃখ। ভগবান যে কথা বলছেন, শাস্ত্র যেটা বলছে, যে যেখানে আছে সবাই সেই দুঃখে আছে। এখন দুঃখ জিনিসটা কি? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতি, আধিদৈবিকের কথা যেটা বলা হল, তার সাথে আর-একটা হয়; শাস্ত্রে যা যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ শাস্ত্রের বক্তব্যটাকে যদি একটু বুঝে নেওয়া যায়, জীবনে আপনার অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক কঠিন সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। গীতার শ্লোকগুলি ঠিক এই একই কথা বলবেন। আমরা সবাই সাধারণ, সাধারণ মানে একটা সাধারণ বুদ্ধিকে নিয়ে চলছি।

যে কোন মানুষকে দেখে কি করে বুঝব এর সাধারণ বুদ্ধি? যে কোন মানুষ মানে, বড় অফিসার হতে পারেন, বড় সাহিত্যিক কিংবা বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাধারণ বুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধির মানুষ কিনা বুঝতে হলে দেখতে হবে, ওনার যে চেতনা, এই চেতনাটা কোথায়? এটা দেহে, না মনে? সারা বিশ্বে বেশির ভাগ মানুষের চেতনা থাকে দেহে; আমার, আপনার, এর, ওর সবারই চেতনা নিবদ্ধ থাকে দেহে। খিদে দেহ থেকে পায়, তৃষ্ণা দেহ থেকে পায়, ইচ্ছা-আকাঙ্খা দেহ থেকে হয়, শীত-উষ্ণ দেহ থেকে হয়। আমার এক হিতৈষী বন্ধু

দেখছেন ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, আমাকে লিখছেন, একটু সামলে থাকবেন, মাথায় টুপি লাগাবেন, পায়ে মোজা দেবেন। দেহ ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত, খাওয়া থেকে ঘুমনো পর্যন্ত আমাদের পুরো চেতনা শরীরকেন্দ্রিক। চেতনাটাকে আমাদের দেহের উপর না দিয়ে দেহের পারে নিয়ে যেতে হবে। দেহকে যত ভুলে থাকা যাবে, শান্তি তত বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে বলার উদ্দেশ্যটা অন্য।

দেহের উপর চেতনা দিতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে আমাদের মন বলে একটা জিনিস আছে। যদিও আমরা সারাদিন মন মন করে যাচ্ছি, তুমি আমাকে মনে বড় কষ্ট দিলে, তোমাকে দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু মন জিনিসটা কি, মন কিভাবে আমাদের চালায়, আমরা এই মন জিনিসটাকে অতটা খেয়াল করি না। মনের ব্যাপারগুলি যদি আমরা একটু নিরীক্ষণ করি এবং বুঝতে পারি, দেখবেন আমাদের জীবনের অনেক সমস্যার খুব সহজ সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের শরীর, শরীরের যে অঙ্গগুলি রয়েছে, যে ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, এই শরীর, শরীরের অঙ্গ, ইন্দ্রিয়গুলি চলে বাহ্য জগতে, যে জগতে আমরা এখন আছি, ঘরবাড়ি, সংসারে চলে। আর এই জগৎ থেকে শরীর আর ইন্দ্রিয়গুলি যা যা গ্রহণ করে, যেমন আমি খেলাম, খাওয়ার পর একটা তুষ্টি হল; মনও তুষ্টি পায়। এই তুষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনকে জানিয়ে দেয় খুব ভাল খেলাম, মন তখন তুষ্ট হয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা মনে করি, আমাদের শরীর আর মন যেন এক।

এই পয়েন্টটাকে আমাদের খুব ভাল করে বোঝা দরকার। এখানেই আমরা প্রায়ই ভুল করে বসি; কারণ আমরা কোন কিছুকে নিয়ে সেভাবে চিন্তা-ভাবনা করি না, ধ্যান-ধারণা করি না। এই আলোচনা শেষ হয়ে গেলে এই জিনিসটাকে একটু ভেবে দেখবেন, আমাদের অজান্তায় ইন্দ্রিয় দিয়ে শরীরের মাধ্যমে যা যা ইনপুটস আসে, আমরা মনে করি আমাদের মন যেন সেটাই। আর এই বাহ্য জগৎ এবং মন, সব যেন মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা তা না। খুব সহজ করে, অত্যন্ত সহজীকরণ করে যদি বলা হয়, যদিও সহজীকরণ করে সব কিছু ঠিক হয় না, বেশির ভাগ যে পাওয়ার অফ পজিটিভ থিঙ্কিং বইগুলি হয়, বা যাঁরা উপদেশ দিয়ে বেড়ান, এনারা সবার চড়কাতে তেল দিয়ে বেড়ান, এনারা সবাই হলেন simplistic ideal। যেমন কম্যুনিজম্ খুব simplistic একটা আইডিয়া, সবাইকে সমান দেখতে হবে, সবাইকে এক করে দিতে হবে, এইসব আইডিয়ার পিছনে কোন গভীর চিন্তা-ভাবনা নেই। শেষে দেখা যায়, নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে বাকিরা যেমন ছিল তাদের সবাইকে তেমন রেখে দিয়েছে। তবে যে কোন পরিবর্তনে কিছু লোকের ভাল হবে, কিছু লোকের  খারাপ হবে। সবারই যে একেবারে সব ভাল হবে বা সবারই যে একেবারে সব খারাপ হবে, তা কখনই হবে না। আমরা এখানে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা বলছি, যে কোন বিচারে যখন তুমি যাচ্ছ, ভাল করে অনুধাবন কর, তার পিছনে তোমার চিন্তা কত গভীর। এগুলো হল সব simplistic আইডিয়াস।

এই জায়গাতে বোঝানর জন্য আমরা simplistic আইডিয়াসকে নিয়ে আসছি। তিনটে জগৎ আমাদের কছে পরিষ্কার, যদিও মাত্র তিনটে হয় না, আরও বেশি হয়, কিন্তু বোঝার জন্য তিনটে জগতের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম হল দেহের জগৎ, দ্বিতীয় হল যত বস্তু আছে, আমার দেহ একটা বস্তু, এই পেন একটা বস্তু, এই ঘর বাড়ি, নদী, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এটা একটা জগৎ, এটাকে বলে ফিজিক্যাল জগৎ। তৃতীয় হল, আমাদের মনের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। এই তিনটে জগতের বাইরে একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে, যে জগৎ আমাদের সবাইকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে, এটা হল আধ্যাত্মিক জগৎ। আধ্যাত্মিক জগৎ ঈশ্বরের জগৎ, আত্মার জগৎ, ব্রহ্মের জগৎ, শুদ্ধ চৈতন্যের জগৎ। মনের জগৎ সূক্ষ্ম পদার্থের জগৎ। যে বস্তু যত সূক্ষ্ম হবে সেই বস্তুর তত ক্ষমতা হবে। সেইজন্য মনের ক্ষমতা অনেক বেশি। আর আমাদের যে শরীর, এটা স্থূল জগৎ। এনারা যখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের কথা বলেন, তার সাথে এর অনেকটা মিল পাওয়া যাবে, কিন্তু পুরো মিল

পাওয়া যাবে না। এখানে বোঝানর জন্য কথাটা বলা হল, পরে আমাদের কাজে লাগবে। মনের জগতে আমাদের অজান্তায়, আমরা জানতেও পারি না একটা অদ্ভূৎ জিনিস হয়, মনের জগৎ আমাকে নিয়ে আর আমার এই দৃশ্যমান জগৎকে নিয়ে আরেকটা জগৎ সৃষ্টি করে দেয়, এই জগৎকেই আমরা অন্তর্জগত বলি। এই অন্তর্জগৎ ব্যাপারটা একটা সাংঘাতিক জিনিস আর এর বিশাল ব্যাপ্তি।

আমরা এই জগৎকে দেখছি, আমি আছি, আপনারা আছেন, এই টেবিল, টেবিলের উপর বই আছে, বস্তুগুলো আছে, আর আমি এর সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছি। আমি সব কিছুর ভোক্তা, এগুলো সব আমার ভোগের জন্য আছে। আবার অনেক সময় আমি যাকে ভালবাসি, সেখানে আমি তার ভোগের পদার্থ। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত স্থূল, এগুলোর বেশি দাম নেই। আসল যেটা হয় সেটা মনের জগতে হয়। মনের জগতে কি হয়, এই দিকটায় আমরা ভাল করে তাকাই না, মনের গভীরে গিয়ে মনের জগতে অন্বেষণ করি না। আমরা প্রায়ই এই কথা বলি, আমি যাকে ভালবাসি, সেই আমাকে চুষে নিচ্ছে। কিন্তু আমিও যে তাকে চুষে নিচ্ছি, আমরা এটা বুঝতে পারি না। যার জন্য যখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন আমরা বলি, আমাকে শেষ করে দিল বা আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। তুমি এতদিন ছিল কেন তার সাথে? কেন তুমি তোমাকে তার শিকার হতে দিয়েছিলে? তোমাকে সবাই এত সাবধান করে দিয়েছে, মা-বাবা সাবধান করেছে, বন্ধু-বান্ধবরা নিষেধ করেছে, তাও তুমি কেন গেলে?

এখানে কারুর কিছু করার নেই, তার কারণ আমার মনের জগতে আমি রাজা, ওখানে আমি ছাড়া কেউ কোন দিন রাজা হতে পারবে না। সেই মনের জগতে যাকে আমি ভালবাসি, সে আমার আসল হয়ে বসে আছে, আর মনে করছি আমার আসল সুখ ওখান থেকে আসছে। এখানে বাহ্য জগতে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না, তার কোন দাম থাকে না। আপনার স্ত্রী আছেন, আপনার স্বামী আছেন, আপনার যে বন্ধু আছেন, কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার যে অন্তর্জগৎ, মনের জগৎ, সেখানে আপনিই হলেন রাজা। সেখানে আপনাকে আটকাবার কেউ নেই, আশেপাশে এনারা সবাই মূর্তি হয়ে রয়েছেন। আপনি যাঁকে ভালবাসেন, সে আপনার বেশি কাছের। আসলে হয়ত সে এই জগতেই নেই, না থাকুক, সে কিন্তু আপনার মনের জগতে বসে আছে।

মনের জগতে আরেকটা সমস্যা হল, মনের জগৎ হল ডায়নামিক, অবিরত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বহির্জগৎ যেমন সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে, মনের জগৎও সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। আমাদের পুরনো যে স্মৃতিগুলো রয়েছে, আমাদের যে স্বপ্নগুলো হয়, যে কল্পনাগুলো হয়, আর এই জগৎ থেকে যা কিছু আমরা পাই, এই সমস্ত কিছু আমাদের মনে সঞ্চিত থাকে –মনের জগতে বেশির ভাগ পরিবর্তন আসে এগুলো থেকে। হিন্দুরা মনে করেন, এই স্মৃতি জন্মজন্মান্তর থেকে সংস্কার রূপে আমাদের চলে আসছে। এই সংস্কারকে যদি যোগ করে দেওয়া হয়, আমরা কল্পনা করতে পারব না যে, মনের জগৎ কত বিশাল এক জগৎ। বহির্জগতে স্মৃতির কোন দাম নেই, কিন্তু মনের জগতে স্মৃতির বিরাট দাম। নামকরা ইংরেজ কবি শেলি এক জায়গায় বলছেন, Memory mixed with desires, স্মৃতিটাও মনের, বাসনাটাও মনের। আমি যাকে ভালবাসি, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, কেন? কারণ Memory mixed with desires। বহির্জগতে না আছে বাসনা, না আছে স্মৃতি। তাই বহির্জগতে বাস করা অনেক সহজ।

আমরা বলছি জগতে কত কষ্ট, কিন্তু আপনি মানুন আর নাই মানুন, জগতে আসলে কোন কষ্ট নেই; আসল কষ্ট তো মনের জগতে; আরও মজার ব্যাপার হল, আমরা এটা বুঝতেও পারি না। কেন কষ্ট হয়? মনের জগতে স্বাধীনতা আছে, ওখানে আপনাকে আটকাবার কেউ নেই। যার জন্য দেখা যায়, মনের জগতে যারা বেশি বাস করে, তারা একটা সময়ের পর পাগল হয়ে যায়। ঠাকুরের ওই কঠোর সাধনা যখন চলছে, লোকেরা মনে করছে, উনি পাগল হয়ে গেছেন, ওরা এটা বুঝতে

পারেনি যে, ঠাকুর মনের জগৎ ছাড়িয়ে চলে গেছেন আধ্যাত্মিক জগতে। চৈতন্যের জগতে যিনি চলে যান, তিনি কখন পাগল হবেন না। কিন্তু যে সব সময় মনের জগতে বাস করে, সে একটা সময় পাগল হয়ে যাবে, মুর্খ গোঁয়ার হয়ে যাবে, অবাস্তববাদী হয়ে যাবে। জীবন চালানোর জন্য তাই স্থূল জগৎ আর মনের জগতের মধ্যে সব সময় সমন্বয় করে রাখতে হয়।

মনের জগতে সমস্যা হল, মন হল স্বাধীন, প্রচণ্ড গতিতে চলতে পারে। সেইজন্য যে কোন ব্যাপারে, জিনিসটা কেমন হবে, সেটাকে সে নিজেই বানিয়ে নেয়। নিজেকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখতে পাবেন, যার সাথে আপনার ঝগড়া আছে, তাকে নিয়ে আপনি অনবরত ভাবতে থাকেন, ওর সাথে দেখা হলে আমি এই এই বলব, ও তখন আমাকে এটা বলবে, আমি তখন এটা বলব। যাকে ভালবাসেন, তাকে নিয়েও ঠিক এভাবেই ভাবতে থাকেবেন। ছেলে অনেক দিন পর হয়ত বাড়ি আসছে, মা সব সময় ভেবে যাচ্ছে, ছেলে আসছে, ছেলের জন্য এটা বানাবো, এটা করবো, ছেলেকে এইভাবে আদর করব, ছেলেকে এই এই কথা বলব ইত্যাদি। মাঝখান থেকে খবর এলো, ছেলে এখন আসতে পারছে না, দু সপ্তাহ পরে আসবে। মা রাত্রিতে রান্না করে বসে আছে, ছেলে আসবে, এসে মায়ের হাতে খাবে; এদিকে ছেলে বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা জানতে পেরে রেগে গেলেন। কেন রেগে গেলেন? এটাই যদি বলত, মা আমি দু ঘন্টা পরে আসব, মা তো রাগতেন না। ছেলে রাত আটটায় আসুক, রাত দশটায় আসুক, মা রাগবে না, যদি আগে থেকে মা জানে। এই যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারতে। কেন বলি? কারণ মন যে সংসার তৈরী করে, সেখানে পরিষ্কার হয়ে আছে যে, ইনি আটটার সময় আসবেন।

অন্য দিকে পদার্থ জগৎ নিজের মত চলে, মনের জগতের সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। চার মাস পরে, তিন মাস পরে একটা জিনিস করব, মন এখন থেকেই এগিয়ে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে গিয়ে সেখানে মন নিজের সংসার সৃষ্টি করে নেবে। স্থূল জগৎ আবার অন্য ডায়নামিকসে চলে, মনের জগতের সাথে এটা মেলে না। ইতিমধ্যে স্থূল জগৎ তিন মাস পরে অন্য রকম কিছু একটা হয়ে গেল, মন তিন মাস আগে থেকে যেটা করবে বলে ঠিক করেছিল, মন সেটা করতে পারছে না। যেমনি মনের জগতের সাথে স্থূল জগতের সংঘাত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনের জগৎটা বিগড়ে গেল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে আমাদের কয়েকজন বন্ধুদের সাথে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। তিন মাস আগে থেকে ট্রেনের টিকিট, প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। অনেক রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হয়ে গেছে। দুম্ করে মার্চ মাসে করোনা মহামারীর জন্য লকডাউন হয়ে যাওয়াতে সব প্রোগ্রাম বাতিল করতে হল। স্বাভাবিক ভাবে মনটা পুরো ভেঙে গেল। মনের জগৎ যখন ভেঙে যায়, স্বাভাবিক ভাবে তখনই দুঃখ আসে। মনের জগতে আগে থেকে যদি কিছু শুনে থাকি বা কিছু দেখে থাকি, সেটাকে পাওয়ার যদি ইচ্ছা হয়, এটাকে বলে কামনা। যদি না পাই, আমরা রেগে যাই। যদি পাওয়ার পর চলে যায়, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য, এই যা কিছু আছে এগুলো সব মনের জগতের, যেখানে আমি রাজা, আমার আজ্ঞাতেই সব কিছু হয়। বাইরে আমরা কেউ রাজা হতে পারছি না, কিন্তু মনের রাজ্যে আমরা সবাই রাজা। বহির্জগতের সাথে মনের জগতের মেলে না। যখন মেলে না, তখন কাম হয়, ক্রোধ হয়, লোভ হয়, পাওয়ার ইচ্ছা হয়, মোহ হয়। আর যদি পেয়ে গেলাম, তখন মদ, অর্থাৎ অহঙ্কার হবে আর অপরে যদি বেশি ভাল পেয়ে থাকে তখন আসবে মাৎসর্য। এই জিনিসগুলো তখনই হবে, যখন মনের জগতের সাথে বহির্জগৎ মিলবে না। কারণ মনের জগৎ সব সময় এগিয়ে এগিয়ে চলে।

তাহলে এখন উপায় কি? যদি আমাদের শোক থেকে বেরোতে হয়, কষ্ট থেকে বেরোতে হয়, কাম, ক্রোধ থেকে যদি বেরোতে হয়, তাহলে উপায় কি? সবাই বলে বাস্তববাদী হয়ে যাও। এই

জগতে কি আদৌ বাস্তববাদী হওয়া যায়? কখনই সম্ভব না। আমাদের বলা হয়, অতীত চলে গেছে, ভবিষ্যত এখনও দূরে, বর্তমানটা কাছে আছে, বর্তমানকে ধরেই বাঁচতে শেখ, live in present। Live in present কি কখন সম্ভব? এগুলো হল খুব সহজ উপদেশ। বর্তমানকে আঁকড়ে কেউ কি থাকতে পারে? তাহলে তো আমাদের সব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে গেল। যোগশাস্ত্র যখন বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এগুলোকে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে নেয়, জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে স্মৃতিতে এসে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেয়। স্মৃতিতে কত কিছু জমে আছে, এগুলো কোথায় যাবে, যাওয়ার জায়গা নেই, ওখানেই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকবে। Live in present যদি হয়, তাহলে কবিরা কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন। শিল্পীরা গান গাওয়া বন্ধ করে দেবেন, ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যাবে, বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা বন্ধ করে দেবেন, এনার কেউ বর্তমানকে নিয়ে চলেন না। সৃজনশীল মানুষরা কেই বর্তমানে বাস করেন না। বর্তমানে বাস করেন না বলেই তাঁরা কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞানে একজন সৃজনশীল ব্যক্তি হতে পারেন। সেইজন্য সৃজনশীল লোকেরা একটু abnormal হন, আরও বাজে, এনাদের চরিত্র সব সময় এলেমেলো হয়। এনারা সংসারের নিয়ম মেনে চলেন না, সৎ পুরুষ হওয়া, চরিত্র গঠন করা, ওনারা এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ ওনারা সবাই নিজের জগতে বাস করেন, যেখানে তিনিই রাজা। উপায় হল, মনের জগৎ আর বহির্জগৎ, এই দুটো যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য করে চলা।

আমরা একটা উদাহরণ প্রায়ই দিয়ে থাকি। আপনি আপনার প্রিয় কুকুরকে নিয়ে সকাল-বিকাল রোজ বেড়াতে যান। কুকুর জানে আমার প্রভু রোজ এই পথ দিয়ে যান। কুকুর আগে আগে যাবে আর তার পিছন পিছন আপনি চলতে থাকবেন। হঠাৎ কোন কারণে আপনি রাস্থাটা পাল্টে নিলেন। কুকুরটা এবার মনমরা হয়ে আস্তে আস্তে আপনার পিছন পিছন আসতে থাকবে। একবার যখন রাস্থাটা বুঝে নিল, আবার সে দৌড়ে আপনার সামনে সামনে চলতে থাকবে। আবার আপনি রাস্থা পাল্টে নিলেন। কুকুরটা আবার মনমরা হয়ে আপনার পিছন পিছন আসতে থাকে। পদার্থ জগতে আমরা যখন বিচরণ করি, তখন মন কুকুরের মত আমাদের সামনে এগিয়ে এগিয়ে চলতে থাকবে। পদার্থ জগৎ নিজের মত চলে, হঠাৎ এখানে একটু পাল্টে গেল, হঠাৎ ওখানে গিয়ে পাল্টে গেল, তখন মনকে মনমরা হয়ে তার পিছনে আসতে হয়, সে পদার্থ জগতের সাথে পেরে ওঠে না, মন কান্নাকাটি করতে থাকে। উপায়, যতটা পারা যায় পদার্থ জগতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা।

আর-একটা উপায় আছে। মন হল দালালের মত, মন করে দালালি; পদার্থ জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের সাথে থাকে। এই মনের সাহায্যে কেউ যদি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে যায়, ঈশ্বরের জগতে যদি কেউ প্রবেশ করে যায়, এটাও ঈশ্বরের জগৎ, এটাও আত্মার জগৎ, কিন্তু পুরোপুরি যদি ওই জগতে চলে যায়, তখন পদার্থ জগতের সব কিছুকে খড়কুটো বলে বোধ হবে। ঠাকুরের খুব সহজ কথা, যে মিছরির শরবৎ খেয়েছে তার আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগবে না। একবার যদি আত্মার ঐশ্বর্য, আত্মজ্ঞান লাভের যে আনন্দ, আত্মাকে লাভ করার যে সন্তুষ্টি, সেই সন্তুষ্টি পেয়ে গেলে পদার্থ জগৎ, মনের জগৎ সব খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। এ্যপেলো-১১ তে চেপে মানুষ প্রথম চাঁদে গিয়েছিল। নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন এ্যলভিন এই তিনজন ছিলেন। মাইকেল কলিন্স চাঁদে নামেননি। মাইকেল কলিন্স ফিরে এসে একটা বই লিখেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ্যবনর্মাল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, অন্তরীক্ষে অত উপর থেকে পৃথিবীকে দেখলাম, সে যা সৌন্দর্য দেখলাম, ওই দেখার পর কোন কিছুই আর মনে ধরে না, সব পানসে হয়ে গেছে। তার সাথে ওনার এই দুঃখটাও ছিল, উনি চাঁদের মাটিতে নামতে পারেননি, ইতিহাসের পাতায় ওনার নাম থাকল না। এখানেও সেই আইডিয়াটা, যদি একবার কেউ অপরূপ রূপ দেখে নেয়, তখন আর কোন কিছুই তার চোখে ভাল লাগবে না।

দুঃখ নিদানের উপায় দুটি, এক নম্বর হল, মনকে বেশি দৌড়াতে না দেওয়া, যতটা সম্ভব বাস্তব জগতে পায়ে পা মিলিয়ে চলা। কিন্তু তার থেকেও শক্তিশালী উপায় হল; আমরা হলাম দেহাভিমানী, আমাদের সমস্ত চেতনা দেহে ঢুকে আছে, এই চেতনাকে দেহ থেকে সরিয়ে আস্তে আস্তে ঈশ্বরের দিকে, আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়া। চেতনা যত আত্মজ্ঞানের দিকে যাবে, তত আমাদের অবসাদ কমে আসবে। আমাদের মনে হতে পারে দেহ থেকে কি করে চেতনাকে ঈশ্বর চেতনায় নিয়ে যাবো? কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে কোন দিন কিছু হবে না। চেষ্টা করে করে দেহ থেকে মন ওঠানো যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর উপর আরও পরিষ্কার করে বলবেন, মনকে কিভাবে সরানো যায়। চেষ্টা করাটা তো শুরু করতে হবে, শুরু করে ছেড়ে দিলে হবে না। শুরু করে একেবারে লেগে থাকতে হবে –আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি যখন একবার ধরে নিয়েছি, আর আমি একে ছাড়ছি না, এটাকে বলে ধৃতি। গীতায় বার বার ধৃতিকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুর বলছেন, আঁট চাই। একটা জিনিস আপনি ধরেছেন, আর ছাড়া যাবে না, এইটাই আমি করে যাব। এই আঁট না থাকলে কোন কিছুই হবে না। ঠাকুর বলছেন, ঢিমে তেতালা দিয়ে কিছু হবে না। ধরার পর আর ছাড়াছাড়ি নেই, ওটাতেই লেগে থাকতে হবে। এই হল সংক্ষেপ কাম, ক্রোধ, দুঃখ, অবসাদ, এগুলো থেকে বেরোনর উপায়টা কি। এখান থেকে আমরা এবার ঢুকবো গীতার মূল শ্লোকে, যেখানে এনারা এই জিনিসটার ব্যাখ্যা করবেন।

কাম, ক্রোধ কেন হয়? আপনার মন এগিয়ে গেছে। আমরা অনেক সময় অন্যদের বলি, বেশি স্বপ্নবিলাসী হয়ো না, কষ্ট পাবে। পথ চলতি আমরা এই কথাগুলো বলি ঠিকই, কিন্তু জীবনে লাগাই না। যাঁরা বলেন তাঁরাও লাগান না, যাঁকে বলা হচ্ছে, তিনিও লাগান না। লাগাতে পারলে এত কষ্ট হত না। যাঁরা এই গীতা আলোচনা শুনছেন, তাঁদের অবশ্যই একটা শুভ সংস্কার আছে, শুভ সংস্কার না থাকলে কেউ শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইবে না। এই কথাগুলো মহাপুরুষদের কথা, যাঁরা মহাপুরুষ হন, যাঁরা মহাপুরুষ হতে চলেছেন, তাঁরাই একান্তে এভাবে ধর্মের কথা শুনবেন।

দ্বিতীয় হল, আপনি শুনছেন, দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছেন, আপনার অজান্তায় আপনার উপর একটা শুভ প্রভাব পড়ছে, আপনি বুঝতেও পারবেন না। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, সারা রাত ধরে হিম পড়ে, সকালে প্রস্ফুটিত গোলাপের উপর হিমের বিন্দুগুলিকে দেখে বোঝা যায় হিম পড়েছিল। ধর্মতত্ত্ব ঠিক এভাবেই চলে, চুপচাপ আপনার উপর প্রভাব ফেলে যাচ্ছে, ফেলেই যাচ্ছে। এর প্রভাব কিছু বছর পরে বোঝা যাবে। সেইজন্য ধরে রাখতে হয়, শুনে যেতে হয় আর মাঝে মাঝে নির্জনে একান্তে বসে শাস্ত্রের কথা, ঈশ্বর, জগৎ, জীব এগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। আমাদের মাঝে মাঝে অনেকে বলে, এত শাস্ত্রের কথা শুনছে, কিছু কাজে লাগাতে পারছে? আরে ভাই, এগুলো কাজে লাগাবার নয়। আপনি তো কলেজে এত ফিজিক্স কেমেস্ট্রি পড়েছিলেন, কটা এ্যটম বোমা বানাতে পেরেছেন? স্কুলে যখন ছিলেন, কলেজে যখন ছিলেন, তখন কত কি পড়েছিলেন, ফিজিক্সের এই নিয়ম, সেই নিয়ম, জীবনে লাগিয়েছেন কখন? তাহলে কেন পড়ানো হয়? জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞানটাই একটা উদ্দেশ্য, মন তাতে প্রসারিত হয়। এখানে আমরা যে আলোচনা করছি, এই জিনিসগুলো হল জীবন-পরিবর্তনকারী জ্ঞান। আপনি বুঝতেও পারবেন না, কখন অজান্তায় আপনার জীবনটা পাল্টে গেছে।

এই কথা বলার পর বলছেন, যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমরা অনেকবার এর উপর আলোচনা করেছি। জ্ঞানী যখন নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় পৌঁছে যান, তখন তিনি দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। নাম-রূপ মিথ্যা আত্মাই সত্য। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এই সমস্ত রূপ মিথ্যা, ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই আসল।

এবারে আমরা দেখব কুড়ি নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বললেন, *ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ*, আমারা যে মনের জগতের কথা বললাম, সেখানে মনের জগৎ আর পদার্থের জগৎ যখন মিলে যাচ্ছে, তখন আমাদের খুব আনন্দ হয়। আমরা আশা করিনি কিন্তু হঠাৎ পেয়ে গেলাম, তাতে আরও বেশি আনন্দ হয়। লটারি লেগে গেলে কি আনন্দই না হয়। বলছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, তাঁরা যখন এটা বুঝে নিলেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তখন তাঁরা প্রিয় কিছু পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যান না, অপ্রিয় কিছু হয়ে গেলে মন খারাপ করে হতাশায় ভেঙে পড়েন না। এগুলোই জীবনে অনুশীলন করতে হয়।

তাহলে কি ঠাকুর স্বামীজী আনন্দে আটখানা হতেন না, তাঁদের কি মন খারাপ হত না? অবশ্যই হত। ঠাকুর বলছেন, ঘোড়াওয়ালা বলেছিল চারটের সময় আসবে, চারটের সময় আসেনি, আমার খুব রাগ হল। ঠাকুরের ওই রাগের কারণে কারুর অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঠাকুরের যে মন, সেই মনটা এগিয়ে রয়েছে চারটের সময় কোথাও যাওয়ার আছে, যাওয়া হল না, রেগে যাচ্ছেন। কিন্তু ওই রাগ ঠাকুরের উপর কোন দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না। যদি আধ ঘন্টা পরে ঘোড়াওয়ালা এসে বলে, একটা কাজে আটকে যাওয়ার জন্য সময়ে আসতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। ঠাকুরও খুশী মনে বলে দেবেন, ও ঠিক আছে। আমার আপনার স্বভাব এমন, যার উপর একবার রেগে গেলাম, তার আর মুখ দেখতে চাইব না। মনের জগৎ আর পদার্থের জগৎএর ফাঁক যত কমান হবে, কাম ক্রোধের বেগ তত কমে যাবে। যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথিক, যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কাছে পদার্থ জগতের কোন দাম নেই, কারণ তাঁরা জানেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদস্থানে ন কেবলাত্মদর্শিনঃ*, যারা দেহাভিমানী আত্মা, যারা নিজের দেহকেই আত্মা বলে জানে, নিজের দেহতেই কেবল আত্মাকে দেখে; একমাত্র তাদেরই প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষ হয় আর অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিষাদ হয়। আত্মাকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়, বহির্বস্তুতে যার খুব লোভ থাকে, যে খুব লোভী পুরুষ, সে নিজের টাকা-পয়সা, গয়না, বাড়ি, গাড়ি, জমি এগুলোকেই মনে করে এটাই আমি। তার এই জিনিসগুলো যদি নাশ হয়ে যায়, তখন সে মনে করে, আমি শেষ হয়ে গেলাম। যে অত্যন্ত কামী পুরুষ, সে তার কামের বস্তুকে আমি দেখে। যার জন্য প্রায়ই দেখা যায়, প্রেমিকা যদি ছেড়ে চলে যায়, প্রেমিক সুইসাইড করে নেয়, নয়তো পাগল হয়ে যায়। টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেয়ে এগুলো সব বহির্বস্তু, এগুলোকে বলা হয় পরাগাত্মন। দেহ মাঝামাঝারি, পরাগও না, প্রত্যগও না। আমরা প্রায় সবাই দেহকে আত্মা মনে করি। দেহকে আত্মা বলে যারা মনে করে তাদেরই এই হর্ষ বিষাদ হয়। যারা কামী পুরুষ, এরাও কোথাও না কোথাও নিজের দেহের সাথে তার কামের বস্তুকে জড়িয়ে রাখে বলে তাদেরও প্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে হর্ষ আর অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে বিষাদ হয়।

কিন্তু যাঁরা কেবল আত্মাকেই দেখেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখেন না, আচার্য বলছন, *ন কেবলাত্মদর্শিনঃ তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তসম্ভবাৎ*, তাঁর কাছে প্রিয় অপ্রিয় কি করে হবে! কারণ সব কিছু তো মনকে নিয়ে, মন যদি সব সময় আত্মাতে পরিপূর্ণ থাকে, আত্মাতে সমরসতা যদি হয়ে যায়, তাহলে বহির্জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিছুই তো তাঁর ভিতরে ঢুকবে না। যাঁরা অনন্তে সেই আত্মাকে দেখেন, তাঁদের প্রিয় অপ্রিয় বস্তুতে হর্ষ ও বিষাদ হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকে না। আমাদের সবার এত দুঃখ কেন? কারণ হল বিষাদ। বিষাদ কেন হয়? অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর সঙ্গে সংযোগ না হওয়া। বাঁচার উপায় কি? ঈশ্বরে মন দিন, ঠাকুরের নাম করুন। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম কর। আপনি বলবেন, 'কেন, গুরু যে বলে দিয়েছেন একশ আটবার করে নাম করতে, আর নাম জপ করার সময় ঠোঁট যেন না নড়ে'? অবশ্যই তাই করবেন। করে সংখ্যা না রেখে মনে মনে হাততালি দিয়ে রাম রাম গুনগুন করতে থাকুন, কেউ বুঝতেও পারবে না আপনি ভিতরে ভিতরে কি বলছেন। যখনই ফাঁকা থাকবেন তখনই এইভাবে ঈশ্বরের নাম

করতে থাকুন। কারণ মন যদি ফাঁকা থাকে, তখন প্রিয় অপ্রিয় বস্তুগুলি ভিতরে নাড়া দিত থাকবে। বলছেন, সমস্ত ভূত, সমস্ত বস্তু রূপে, সমস্ত প্রাণী রূপে সেই আত্মাই বিরাজ করে আছেন। ঠাকুর বলছেন, গঙ্গার ঢেউ উঠছে নামছে, তাতে যেন বালিশ ভেসে যাচ্ছে, গঙ্গার ঢেউটা সমান। এই একটা ঢেউ উঠল, এই আরেকটা ঢেউ মিলিয়ে গেল; তাতে গঙ্গার জল, গঙ্গার প্রবাহের কোন হেরফের হয় না।

এই জ্ঞানের ফলে তাঁর মধ্যে কর্মের কোন স্পৃহা থাকে না। কর্ম হল কিছু পাওয়ার জন্য। আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও কিছু পাওয়ার থাকে না। দেহকে চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু তাঁরা মিটিয়ে দেন। খবরে দেখলাম, কেরলে ইনকাম ট্যাক্সের হানায় এক আর্চ বিশপ ধরা পড়েছে, সে কিভাবে কিভাবে কত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি জমা করেছে। কিসের তুমি ম্যান অফ্ গড্! আর সেও নাকি পুরো ফেক্, কেউ বানায়নি, নিজে থেকেই সেলফ প্রোক্লেইম।

আত্মজ্ঞানী পুরুষরাই আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের জীবনধার তৈরী হয় এই ধরণের মানুষের পদচিহ্নে চলতে চলতে। একুশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, অক্ষয় সুখ কিভাবে পাওয়া যাবে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কিভাবে হবে। কারণ দুঃখের নিবৃত্তি না হলে সুখ কোন দিন পাওয়া যাবে না। বলছেন, *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*, এখানে এই আত্মা বলতে মন বা অন্তঃকরণ; আমাদের মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাইরের বিষয়গুলিকে গিয়ে স্পর্শ করে নেয়। বাইরের থেকে যখন কোন সিগন্যাল আসে, ধরুন কান দিয়ে কিছু একটা শব্দ শুনতে পেলাম, মধুর লাগল, তখন আমাদের চেতনা কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওই বস্তুকে ছুঁয়ে নেয়। একটা জিনিস দেখতে ভাল লাগল, ওটার দিকে চক্ষু এগিয়ে যায়। আবার অনেকে বলে ইন্দ্রিয়গুলি এগিয়ে গিয়ে সব সময় স্পর্শ করার চেষ্টা করছে, অক্টোপাস যেমন সুরগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোঁওয়ার চেষ্টা করে, ইন্দ্রিয়গুলিও সেইভাবে সব কিছুকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেইজন্য বলছেন বাহ্যস্পর্শ। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকেই ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করে নেওয়া যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটাকেই পাওয়া যায় সেটাকেই বলা হয় স্পর্শ। তার মানে আপনি আমার জন্য স্পর্শ, আবার আমি আপনার জন্য স্পর্শ। আর কোনটাই আমাদের ভিতরে নেই, সব বাইরে আছে, সেইজন্য বলছেন বাহ্যস্পর্শ। বাইরের যে কোন জিনিসের প্রতি আমাদের মন চলে যায়, সেখানে গিয়ে আমরা আসক্ত হয়ে যাই – *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা*।

যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর মন কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি, জগতের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হবে না। এই আসক্ত না হওয়ার জন্য যে সুখ হয়, এই সুখটাই ভিতরের সুখ, *বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্*। বাইরে সুখের সন্ধান করতে করতে আমরা ভুলেই গেছি যে, আসল যে সুখ, সেই সুখের এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের ভিতরেই। বাইরে যেখানেই আমরা সুখ পাই মনে করছি, আসলে আমাদের ভিতরের সুখটাই বাইরে গিয়ে সেখানে বসে যায়। আমরা কাকে ভালবাসি? আসলে আমরা কাউকেই ভালবাসি না, আমরা শুধু নিজেকেই ভালবাসি। আমাদের সবারই মনের জগতে যার যার নিজের একটা আইডিয়া আছে, যেমন আইডিয়া অফ বিউটি, আইডিয়া অফ লাভ, আইডিয়া অফ লার্নিং, আইডিয়া অফ কম্পাশান্। যেখানে মনে হয়ে এখানে ভালবাসা হতে পারে, তখন আমার নিজের ভিতরে যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওখানে একটা আবরণ সৃষ্টি করে, তখন আমি ওটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে চেটে চেটে খাই। আমরা এটা বুঝতেও পারি না যে, যদি ওই বস্তুর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে সবাই ওকে ভালবাসত। কই, সবাই তো ওকে ভালবাসে না। ছেলেমেয়েরা প্রেম করে, মা-বাবারা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যান। যদি ওই ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে মা-বাবারাও রাজী হয়ে যেতেন। বৈশিষ্ট্য ছেলের মধ্যে নেই, তোমার নিজের বৈশিষ্ট্যতা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে গিয়ে তাকে আবৃত করে ধরে নিচ্ছে। কিন্তু আপনার নিজের যে ভালবাসা সেটাই বেরিয়ে যাচ্ছে। আর যত বেরিয়ে যাচ্ছে, ভিতরে তত কমে

যাচ্ছে। কি করে কমে যাচ্ছে? কারণ বহির্জগতে যিনি যত সুখ পান, অন্তর্জগতে তিনি তত কম সুখ পান। বাইরে ভালবাসা দিতে গিয়ে অনেক সময় হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তখন দুঃখের আর শেষ হতে চায় না।

বলছেন, যখন বহির্জগতের কোন বস্তুকে স্পর্শ করার জন্য ভিতর থেকে কোন চেষ্টা থাকে না, করতেও চায় না, তখনই সে ভিতরের সেই সুখটা পায়। তিনিই *ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা*, ব্রহ্ম যা আত্মাও তাই, ঈশ্বরও তাই, ওই যোগকে নিয়ে যিনি *যুক্তাত্মা*, অর্থাৎ নিজের মনটাকে ওখানে লাগিয়ে রেখেছেন, *সুখমক্ষয়মশ্নুতে*, তিনি অক্ষয় সুখ পান। যদি কেউ সুখ পেতে চায়, আগে তাকে বহির্জগৎকে ছাড়তে হবে, বাইরের সুখকে ছাড়তে হবে। ঠাকুর বলছেন, ভিতরে সোনা চাপা আছে, খবর নাই। সমস্ত সুখ যে আমাদের ভিতরেই, আমাদেরও এই খবর নাই।

আত্মার ব্যাপার, ঈশ্বরের ব্যাপার ছেড়ে দিন, সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি যদি লাগানো হয়, সেটাই বাইশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, *যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ*, যে সুখ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে জন্ম নিচ্ছে, সেই সুখকে বলছেন *সংস্পর্শ+জা*, কোন শব্দের শেষে যদি 'জ' লেগে যায়, বুঝতে হবে ওই জিনিসটা থেকে জন্ম হয়েছে, যেমন জলজ, জল থেকে যার জন্ম, পদ্মকে বলা হয়। বলছেন *সংস্পর্শজা*, স্পর্শ থেকে যে সুখ জন্ম নেয়, সেই সুখটা কি রকম? *আদ্যন্তবন্তঃ*, এর আদি আছে এর অন্ত আছে। খুব সহজ যুক্তি, যে আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, মাঝখানে সে কোথা থেকে আসবে? এই যুক্তি বেদান্তে ঘুরে ঘুরে আসে। বেদান্ত খুব সহজ যুক্তি নিয়ে চলে। যেমন বলেন কোনটা পরিবর্তনশীল আর কোনটা অপরিবর্তনশীল? তখন বলছেন, যেটা আছে, যেমন ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু; বস্তু মানে তিনটে কালেই যেটা আছে। যেটা গতকাল ছিল, আজকে আছে, আগামীকাল থাকবে না, সেটা অবস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোল নম্বর শ্লোকে যেখানে বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, সেখানে এই বিষয়টাকে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। যদি সৎ বস্তু হয়, তাহলে তার কোন দিন অভাব হবে না। যেটা আজকে আছে, গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে কিনা জানা নেই, তার মানে এটা অবস্তু। মাণ্ডুক্যকারিকাতে খুব সুন্দর বলছেন, যেটা গতকাল ছিল না, আগামীকালও থাকবে না, বুঝে নাও বাপু ওটা আজকেও নেই। খুব মজার argument। আমি একজনকে ভালবাসি, ভালবাসার একদিন জন্ম হল। আগামীকাল সে আমাকে ছেড়ে আর-একজনের কাছে চলে যেতে পারে, কিংবা মরে যেতে পারে; ভালবাসা শেষ। এনাদের খুব সহজ যুক্তি, এটাই মায়া। মায়া কোনটা? দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে যে আবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন; এটাই অসৎ।

কিন্তু সেখানেই থামছেন না, সেখান থেকে আরেক ধাপ যাচ্ছেন। বলছেন, গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না, তার মানে, এটা এখনও নেই, এর কোন অস্তিত্বই নেই। যদি ওটা সত্যি হত, তাহলে তিন কালে সব সময় থাকত। সত্য নয় বলেই থাকছে না। অত্যন্ত সহজ যুক্তি, কিন্তু খুব গভীর যুক্তি; সাধারণ মানুষ এগুলোকে ধারণাই করতে পারবে না। বলছেন, *আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ*, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিমান তিনি কখনই এই ধরণের বস্তুর দিকে যাবেন না – যেটা গতকাল ছিল না, এখন আছে কিন্তু আগামীকাল থাকবে না। যে কোন বস্তুর যার আদি আছে বা যার অন্ত হতে যাচ্ছে, সেই বস্তুকে বুদ্ধিমানরা কক্ষণ ভালবাসতে যাবেন না।

আচার্য তাঁর খুব প্রিয় উক্তিটা আবার এখানে নিয়ে আসছেন, *ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রম্ অপি অস্তি, ইতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ*, মৃগতৃষ্ণা, মরীচিকার মত বুঝতে হয়, মরীচিকার যেমন আদি আছে অন্ত আছে, ঠিক সেই রকম এই সংসারের যত সুখ আছে, সব সুখ ত্যাগ করতে হয়। যে জিনিসটার শুরু আছে, যে জিনিসটা একদিন শেষ হয়ে যাবে, তার মানে সেই

জিনিসটা বর্তমানেও নেই। আমরা এটাকে খুব সহজ ভাবে বলে দিই, এভাবে বলে দিলে এর কোন দাম বোঝা যাবে না, বেদান্ত এত সহজ ভাবে বলবেন না, বেদান্ত বলবেন, সেটা আদপেই নেই, এরপর দাম-অদামের কোন প্রশ্নই নেই। যদি গতকালও থাকত, আগামীকালেও যদি থাকে, তবেই ওটা সৎ হবে। গতকাল যদি না থেকে থাকে, তাহলে ওটা আজকেও নেই। এর উপরেই বেদান্ত তাঁর পুরো যুক্তিতর্ক দাঁড় করান। আমরা হয়ত মানতে পারব না, বুঝতেও পারব না, আপাততঃ আমাদের শুনে রাখতে হবে। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এটার উপর আচার্য খুব সুন্দর ভাষ্য লিখেছেন।

বলছেন, আসলে এটা অনিত্য, অসৎ; অনিত্য বস্তুর দিকে কখন যেতে নেই। আমাদের মনে সংশয় আসতে পারে, তাহলে লোকেরা যে এত খাটাখাটনি করছে, জীবন থেকে যে এত কিছু চলে যাচ্ছে, জীবনে যে এত কিছু আসছে, এগুলো তাহলে কি হচ্ছে? যিনি গীতা বুঝে নিয়েছেন তিনিই বুদ্ধিমান, আর বিশ্বের বাকি সবাই বোকা? পুরো সংসার যে দৌড়াচ্ছে, সবাই কি বোকা? বলছেন, তা নয়, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অত্যন্তমূঢ়ানাম্ এব হি বিষয়েষু রতিঃ দৃশ্যতে*, আচার্যের ভাষা এত সুন্দর যে কল্পনা করা যায় না। যে অত্যন্ত মূঢ়, মনটা যাদের ভোগের মধ্যে থেকে একেবারে বিষয়রসে রঞ্জিত হয়ে গেছে, একমাত্র তাদেরই দেখা যায় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ; কুকুর যেমন মাংস দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম এরা বিষয়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমাত্র এই অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই *বিষয়েষু রতিঃ*। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে বলছেন, *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত*, কে অনেকদিন জীবিত থাকতে চায়? আচার্য শঙ্কর উত্তরে বলছেন, অবিবেকী। যারা অবিবেকী, বিবেকহীন যারা তারাই মনে করে আমি অনেকদিন বাঁচব, অনেক ভোগ করতে পারব। এরাই পশুতুল্য।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩।।

*(এই জীবনেই যিনি আমরণ কাম ও ক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই বস্তুত সুখী।)*

এখান থেকে পরের যে অধ্যায় আসবে সেটার ভূমিকা তৈরী করে দিচ্ছেন। ষষ্ঠ অধ্যায় হল ঠিক ঠিক যোগের উপর। ওটারই প্রস্তুতি পঞ্চম অধ্যায়ের এখান থেকে নিতে শুরু করলেন। *শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ*, জীবিত অবস্থায়, শরীর ত্যাগের আগেই যিনি *কামক্রোধোদ্ভবং বেগং*, কাম আর ক্রোধের দুর্নিবার বেগকে সহ্য করে নেন, আর দ্বিতীয় যিনি সহ্য করতে চাইছেন; এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যিনি কাম ক্রোধ জয় করে নিয়েছেন, আর দ্বিতীয় যিনি জয় করার ইচ্ছা রাখেন। আচার্য শঙ্করের এখানে ভাষাটা হল, যেটা একটু পরেই এক জায়গায় বলবেন, *উৎসহতে*, অর্থাৎ যে সহ্য করে এবং উৎসাহ রাখে। যার উৎসাহ আছে, আমি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করতে চাইছি, সেও একজন মহৎ, আজ হোক কাল হোক সে এটাকে জয় করবেই। যারা একেবারেই চায় না, তাদের কথা বাদ দিন, আপনি পারবেন। বলছেন, কাম ক্রোধের যে তোড় আসে, এটাকে তিনি সহ্য করে নেন। ঠাকুর, স্বামীজী, এনার সহ্য করে নিয়েছেন। আমি, আপনি সহ্য করতে চাইছি। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে জ্ঞানীর কথা বলা হয়েছিল, সেখানেও বলেছিলেন যাঁরা জ্ঞানের পথ নিয়েছেন তাঁরাও জ্ঞানী। আপনারাও জ্ঞানী। যার মধ্যে এই ইচ্ছা জেগেছে, আমি কাম ক্রোধের বেগকে জয় করতে চাইছি, সেও জ্ঞানী। যিনি কাম ক্রোধের বেগকে জয় করতে ইচ্ছা করেন, বা যিনি জয় করতে সফল হয়ে যান, *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ*, তিনি যোগী, তিনিই সুখী। সুখী কে? যিনি কাম ক্রোধের বেগকে আটকে দিয়েছেন, বা আটকাতে চাইছেন, সেই সুখী, সেই পারে দুঃখকে জয় করে নিতে। তবে বলা হয়ে থাকে, কাম ক্রোধের বেগকে ভরসা করা যায় না, মৃত্যুর সময়েও আসতে পারে।

এখানে আচার্য কাম জিনিসটা কি ব্যাখ্যা করে বলছেন, *ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রুয়মাণে স্মর্যমাণে বা অনুভূতে সুখতেতৌ যা গর্ধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ*, যে বস্তুকে আপনি আগে অনুভব করেছেন, ইন্দ্রিয় দিয়ে জেনেছেন, ওই বস্তুর ব্যাপারে পরে আবার শুনে নিলে বা স্মৃতিতে যদি এসে যায়, তখন সেটাকে পাওয়ার যে ইচ্ছা জাগে, এটাকে বলে কামনা। প্রথম কথা, ওই জিনিসটার ব্যাপারে আগে থেকে মনে থাকতে হবে, দ্বিতীয় কথা, ওটাকে টোকা দিতে হবে। সেইজন্য বলা হয় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করতে নেই। কারণ আমাদের মনে অনেক অঙ্কটবঙ্কট আছে, বিষয়ী লোকদের সঙ্গ করার সময় তারা যখন ভোগের কথা বলবে, তখন আমাদের মনে টোকা মেরে ভোগের ইচ্ছা জাগিয়ে দেবে। ভোগের ইচ্ছা একবার জেগে উঠলে, সেই ইচ্ছাকে সামলানো খুব কষ্টকর।

যখন পাওয়া যাবে না তখন ক্রোধ হবে, ক্রোধের ব্যাখ্যা করে আচার্য বলছেন, *ক্রোধঃ চ আত্মনঃ প্রতিকুলেষু দুঃখহেতুষু ইষ্টমানেষু শ্রুয়মাণেষু স্মর্যমানেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ*, প্রতিকূল দুঃখদায়ক বিষয়কে দেখে, শুনে বা স্মরণ হওয়ার পর ভিতরে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় এটাকেই ক্রোধ বলে। সেই দ্বেষের ফলে কি হয়? *রোমাঞ্চন ইষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গঃ*, যখন সুখ হয় তখন চোখমুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, শরীরে রোমাঞ্চ হয়, চোখ মুখ বড় বড় হয়ে যায়। আর যখন রেগে যায়, *গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবঃ*, শরীর কাঁপতে শুরু হয়, ঘাম বেরোতে থাকে, ঠোঁট কামড়াতে থাকে, চোখ ও বদন লাল হয়ে যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে ক্রোধের বেগ এসেছে। আর বলছেন, *তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে প্রসহতে*, যে এটাকে সহ্য করার উৎসাহ রাখে সে যোগী। আপনারা সবাই যোগী, কারণ এই কাম ক্রোধের যে বেগ, এটা সহ্য করার ইচ্ছা আপনাদের আছে, উৎসাহ আছে। একজন পানওয়ালাও বিজনেস করছে, বিল গেটসও বিজনেস করছে, দুজনই বিজনেসম্যান। যোগীও সাধারণ স্তরের হয় আবার উচ্চমানেরও হয়। ভগবান বুদ্ধও যোগী, ওই স্তরেও যোগী হয়, আবার আমার আপনার স্তরেও যোগী হয়। একজন লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন, অন্যজন ব্রহ্মপ্রাপ্তির লক্ষ্যের পথে পা রেখেছেন, দুজনেই যোগী। কিভাবে তিনি ব্রহ্মকে পান?

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারমস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।।২৪।।

*(যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, বাহ্যবিষয়ে নয়; যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত, বাহ্যবিষয়ে নয়, এবং যিনি অন্তর্জ্যোতি ও ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।)*

ভিতরে যিনি সুখ পান, তিনি *অন্তঃসুখঃ*, যাঁর যত ক্রিয়া, যত চিন্তা-ভাবনা সব ভিতরকে নিয়ে, এটাকে বলছেন *অন্তরারামঃ*, আর যিনি ভিতর থেকেই সমস্ত জ্ঞানের আলো পান, তিনি হলেন *অন্তর্জ্যোতিঃ*। তিনটে শব্দ বলছেন, '*অন্তঃসুখঃ*', '*অন্তরারামঃ*' আর '*অন্তর্জ্যোতিঃ*'। *স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং*, সেই যোগীই ব্রহ্মকে পায়, কারণ তিনি সব কিছুকে ভিতরে নিয়ে চলে গেছেন। এনারাই জীবিত অবস্থায় মোক্ষ লাভ করে পরম ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। মৃত্যুর পরে যে মোক্ষ পায় তা নয়, জীবিত অবস্থাতেই, এই দেহে থাকা অবস্থাতেই এনারা মোক্ষ লাভ করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবো, মৃত্যুর পর মুক্তি হবে, এগুলো তাঁদের কাছে কিছুই না। তার জন্য কি করতে হয়? *অন্তঃসুখঃ*, *অন্তরারামঃ* এবং *অন্তর্জ্যোতিঃ*, সমস্ত রকম সুখ ভিতর থেকে পান, সমস্ত রকম চিন্তা-ভাবনা ভিতরকে নিয়ে, সমস্ত জ্ঞান সব ভিতরেই এনারা পান।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫।।

*(যাঁরা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পাপমুক্ত; শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয়রহিত; নিদিধ্যাসন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে নিরত, সেই সমগ্যদর্শী সন্ন্যাসীগণ এই জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।)*

একবার যদি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করার ক্ষমতা এসে যায়, তখন আর একটুতেই তাঁর ভিতরে তোলপাড় হবে না, যোগী হওয়া এবার সহজ হয়ে গেল। তাহলে তো বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সহজেই ব্রহ্মনির্বাণ পেয়ে যাবেন? না, পাবেন না, কারণ ওনাদের মধ্যেও কাম ক্রোধ আছে। আমাদের দেখা আছে, চা দিতে একটু দেরী হলে রেগে চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিচ্ছেন, ওই বয়সেও কত ক্রোধ। তার মানে ভিতরে এখনও কাম ক্রোধ ঠাসা আছে। সেইজন্য আমাদের পরম্পরাতে বলা হয়, একটা বয়সের পর অবশ্যই সব কিছু ছেড়ে ধর্মে মন দিতে হয়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে কাম ক্রোধের বেগ সামলানো অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ এতদিনে ভাদ্র মাসের জল অনেক বেরিয়ে গেছে।

*লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ*, ক্ষীণকল্মষাঃ, যাদের পাপ আদি সমস্ত দোষ নাশ হয়ে গেছে; মনের মধ্যে যত সংশয় আছে, সব ক্ষীণ হয়ে গেছে; যিনি জিতেন্দ্রিয় আর সমস্ত ভূতের প্রতি যাঁর করুণা রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে, তার সাথে অহিংসক; এই ধরণের যাঁরা ঋষি, সম্যক্ জ্ঞানী, এনারা এই জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ পেয়ে যান। এই ধরণের ঋষিদের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি সহজ হয়ে যায়। *ঋষয়ঃ* মানে সম্যক জ্ঞানী, এই পথে যিনি চলতে শুরু করবেন, তিনিও ঋষি। আমাদের মহারাজ ছিলেন স্বামী মোক্ষানন্দজী, ওনার লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল, ট্রেনিং সেন্টারে থাকাকালীন আমরা ওনার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলাম। উনি প্রায়ই স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের পাশে যে বেল গাছ আছে, সেখানে বসে থাকতেন, হাতে পাখা থাকত। একদিন একটা বাচ্চা মায়ের হাত ধরে যেতে যেতে বলছে, 'মা মা দেখ দেখ ঋষির মত'। উনি খুব রেগে গেছেন, 'ঋষির মত কিরে, আমি ঋষিই'। আমাদের বয়স তখন কম, আমরা উত্তরটা শুনে হাসলাম। কিন্তু পরে পরে মনে হতে লাগল, কি সুন্দর উত্তর, ঋষির মত কি, আমি তো ঋষিই।

আর আপনিও পুরোদমে ঋষি, কারণ আপনার ধর্মে মন গেছে, চেষ্টা চলছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র হয়ত আপনি একদিনে হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু পথে তো নেমে পড়েছেন। এবার আপনি ঋষির মত থাকুন। কি রকম? *ক্ষীণকল্মষাঃ*, পাপ আদি করবেন না, চিন্তাতেও পাপ জিনিসটাকে আনবেন না; *ছিন্নদ্বৈধা*, কোন দ্বিধা, সংশয় থাকবে না; *যতাত্মানঃ*, এই পথে লেগে থাকতে হবে, শুধু সকাল সন্ধ্যে আসনে বসে জপ করলাম, ধ্যান করলাম তা করলে হবে না, সারাদিন এতেই লেগে থাকতে হবে। আর *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, সবাইকে নিজের সন্তান মনে করে মায়ের মত তাদের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে। মা তার ছোট সন্তানের কোন জিনিসের প্রতি লোভ করে না, মায়ের যেমন সবারই প্রতি সমান ভালবাসা, সমস্ত ভূতের প্রতিও আপনার সমান ভালবাসা হবে, *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, সবারই মঙ্গলে রত। তাহলে বাঘ যদি আমাকে খেতে আসে? নিজেকে রক্ষা করতে হবে, কারণ আমার তো এখনও জ্ঞান হয়নি, আত্মজ্ঞান হলে তখন দেখা যাবে। আমাকেও বাঁচতে হবে, কিন্তু কারুর কোন ক্ষতি আমি চাইব না।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্।।২৬।।

*(কামক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযত চিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসীরা জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর উভয়তঃ ব্রাহ্মী স্থিতি বা মোক্ষ লাভ করেন; মৃত্যুর পর তাঁদের আর দেহধারণ হয় না।)*

এখানে আরও কিছু যুক্ত করছেন। *কামক্রোধবিযুক্তানাং*, কাম ক্রোধ, এই যে দোষ, এটাকে যিনি জয় করে নিয়েছেন, মানে কাম ক্রোধ থেকে যিনি মুক্তি পেয়ে গেছেন, অন্তঃকরণ, অর্থাৎ মনকে যিনি বশে নিয়ে এসেছেন, আত্মার স্বরূপকে যিনি জেনে গেছেন, এই ধরণের যিনি জ্ঞানী, তিনি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে দুটো অবস্থাতেই মুক্তি পেয়ে যান। *যতীনাং যতচেতসাম্*, যতি যিনি চেষ্টা করছেন, তিনি চিত্তকে বশে করে নিয়েছেন, সংযতচিত্ত।

*অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্*, *অভিতো* মানে উভয়ে, জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর পর, দুটো অবস্থাতেই তিনি আত্মাকে জয় করে নেন। এখানে বলছেন, যাঁরা জ্ঞানযোগী, যাঁরা কর্মযোগী, সবাই মুক্তি পান। কিভাবে? আচার্য শঙ্কর এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই ধরণের যাঁদের নিষ্ঠা, যেটা এই অধ্যায়ের আগেই বললেন, এনাদের তো সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয়ে যাবে। ঈশ্বারার্পিত ভাবে যিনি সমস্ত কর্মের ফল অর্পণ করে দিলেন, সেখান থেকে সমস্ত কর্মকেও ত্যাগ করে দেন। আর যিনি কাজ করছেন, তিনিও সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিলেন, তাঁরও মন শুদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে হয় অন্তঃকরণ শুদ্ধি, এই শুদ্ধি থেকে হয় জ্ঞানপ্রাপ্তি। জ্ঞানপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান থেকে হয়ে যায় সর্বকর্মসন্ন্যাস। প্রথমে হয় কর্মফলসন্ন্যাস, তারপরে হয়ে যায় কর্মসন্ন্যাস, আর কর্মসন্ন্যাস থেকে মোক্ষ।

এতক্ষণ জ্ঞানযোগীদের কথা বলছিলেন, জ্ঞানযোগী সমস্ত জয় করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেছেন। এরপর কর্মযোগীদের কথা বলছেন। কর্মযোগীরা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে কাজ করছেন, সেইজন্য এনাদের মুক্তির জন্য ধ্যানযোগ খুব দরকার। আমরা যারা সংসারে আছি, আমাদের ধ্যান করা খুব দরকার। জপধ্যান যদি না করা থাকে, কর্মযোগীরা মুক্তি পান না, জপধ্যান না করলে মন নিয়ন্ত্রণে আসবে না। সাতাশ ও আটাশ নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে পরের অধ্যায়ের অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভূমিকা।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।২৭।।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮।।

*(মন থেকে রূপ, রস, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়সকলের চিন্তা ত্যাগ করে এবং চক্ষুকে ভ্রুযুগলের মধ্যে স্থির করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারী করে যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত রেখে মোক্ষপরায়ণ ও ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ পরিশূন্য হন, সেই মুনি সদাই মুক্ত অর্থাৎ দেহে অবস্থান করেও তিনি মুক্ত।)*

বাইরের জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুকে মন থেকে বার করে দিতে হবে। আচার্য এখানে এটার উপর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, একটা জিনিসের চিন্তন না করা, এটাই হল তাকে বার করে দেওয়া। জোর করে ত্যাগ করার কথা বলছেন না, যে জিনিসটা আমার ভিতরে এসে গেছে, নানা রকমের কাম ক্রোধাদির ভাব, এগুলোকে চিন্তন না করা। আমরা যখনই ফাঁকা বসে থাকি, তখন শুধু ভাবতে থাকি কি হারালাম, কি পেলাম, কি পাওয়া যেতে পারে। এই ধরণের সমস্ত কিছুকে বাইরে বের করে কি করতে হবে?

*প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা*, প্রাণ আর অপান বায়ুকে সমান করে *নাসাভ্যন্তরচারিণৌ*। বলছেন চোখের দৃষ্টি ভ্রুর মধ্যস্থলে নিবদ্ধ করতে হয়। এগুলো আমাদের জন্য না, আমাদের পরম্পরাতে হৃদয়ে ধ্যান করতে বলা হয়। তখনকার দিনে এগুলো বেশি প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে ধ্যান করা যায়, নাকে ধ্যান করা যায়, ভ্রুর মাঝখানে ধ্যান করা যায়, ব্রহ্মতালুতে ধ্যান করা যায়, হৃদয়ে তো করাই যায়, সব ধ্যানের ফল একই। প্রাণ আর অপানকে সমান করতে বলছেন। আমরা এখন চারিদিকে প্রাণায়ামের কথা শুনছি, প্রাণায়াম কিছু না, নিঃশ্বাস ছাড়া আর নিঃশ্বাস নেওয়া দুটোকে সমান করা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে প্রাণায়ামের উপর যতটুকু আসবে ততটুকু আমরা বলে দেব।

আটাশ নম্বর শ্লোকেও একই চিন্তা-ভাবনাকে ঘুরিয়ে আবার নিয়ে এসে বলছেন, এইভাবে মন থেকে সব চিন্তা ত্যাগ করে, ভ্রুযুগলে চক্ষু স্থির করে এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারী করে

যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে, মনকে, বুদ্ধিকে বশে করে নিয়েছেন, এই ধরণের মুনিরা জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়ে যান, এনারাই হলেন জীবনমুক্ত পুরুষ। আমরা প্রথমে যেখানে শুরু করলাম মন দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু মুনি মনকে একটা জায়গায় স্থির করে রেখেছেন। কিভাবে? সব সময় ঈশ্বরের চিন্তন মনন করে। যিনি সব সময় মনন করেন, তাঁকে বলা হয় মুনি। তাহলে মুনি কাকে বলা হয়? ঈশ্বরের স্বরূপকে যিনি সব সময় মনন করেন। সন্ন্যাসীকেও মুনি বলা হয়, কারণ একজন সন্ন্যাসী সব সময় ঈশ্বরের চিন্তন করেন। আর বলছেন, তিনি শরীরে আছেন কিন্তু *মোক্ষপরায়ণঃ*, জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। যিনি জানেন মোক্ষ বা মুক্তিই হল আমার একমাত্র গতি, মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, ফলে তিনি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধাদি থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁর কোন কিছু চাওয়ার নেই, কাউকে ভয় করারও কিছু নেই, সেইজন্য কারুর উপর তিনি কোন প্রকার ক্রোধ করেন না। এইভাবে মন যাঁদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে, এনারাই হলেন সমাহিত চিত্ত। এনারাই মুক্ত, নূতন করে এনাদের আর মুক্ত হতে হয় না।

এই শ্লোকে যে গুণগুলির কথা বলা হল, তার মধ্যে প্রথম হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে বশ করে নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় যিনি সদা সর্বদা ঈশ্বরের স্বরূপের মনন করেন, অর্থাৎ যিনি মুনি, যিনি সন্ন্যাসী, আর তৃতীয় তিনি মোক্ষ পরায়ণ, তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি মুক্তি চাই, চতুর্থ হল, কামনা, বাসনা, ক্রোধ, ভয় আদির পারে চলে গেছেন। এই গুণগুলি থাকা মানে, এটাই মুক্তি। কারণ যাঁরা মুক্ত পুরুষ, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁরা এটাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে বশে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সব সময় ঈশ্বর চিন্তন করেন, তাঁরা কামনা-বাসনা, লোভ, ভয় এগুলো থেকে সদা মুক্ত। তফাৎ হল, আটাশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন আর বাস্তব জ্ঞানীর মধ্যে শুধু উপলব্ধির ক্ষেত্রে তফাৎ, জীবনধারা দুটোতেই সমান। ভগবান এবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিসূচনা করার জন্য বলছেন –

ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৯।।

*(কর্তা ও দেবতা রূপে আমি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের আমি মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদ্ এই প্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মরূপে জেনে যোগী শান্তি লাভ করেন।)*

এতক্ষণ মুক্তি, মোক্ষের কথা বলছিলেন, এবার ভগবান তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করছেন। এখানে বলছেন, আমি কে। আগে চৌদ্দ নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ* আবার পনের নম্বর শ্লোকে বললেন, *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*, একমাত্র অজ্ঞানীরাই আমাকে এর বিপরীত মনে করে। এই শ্লোকে ভগবান চৌদ্দ ও পনের নম্বর শ্লোকের পুরো বিপরীত কথা বলছেন। কি রকম বিপরীত বলছেন, *ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং*, যত যজ্ঞ করা হয় সব যজ্ঞের ফল আমিই গ্রহণ করি। *সর্বলোকমহেশ্বরম্*, যত প্রকার লোক আছে, সমস্ত লোকের আমিই মহেশ্বর। *সুহৃদং সর্বভূতানাং*, যত প্রাণী আছে সবারই আমি সুহৃদ। হে অর্জুন, তুমি এই জিনিসটাকে ভাল করে বুঝে নাও, বুঝে নিয়ে সব কিছু থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি লাভ কর।

এখানে বিপরীত ভাব কেন? কোন বিপরীত ভাব নেই। চোদ্দ ও পনের নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছিল জ্ঞানীর দৃষ্টিতে। যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি দেখেন আত্মা ব্যতিরেকে সমস্ত কিছু অজ্ঞান প্রসুত, মায়া। আগেও আমরা বলেছি, ঈশ্বর হলেন, ব্রহ্মকে যখন মনের জগতে দেখা হয়। ভক্তি আর জ্ঞানে কোন তফাৎ নেই। ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোকে একজন নিষ্ঠাবান ভক্তের দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে। যিনি ভক্তি কামনা করছেন, তিনি মনে করেন, তিনি যা পূজা করছেন, যা যজ্ঞ করছেন সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য করছেন। জ্ঞানী বলবেন, তুমি অজ্ঞানে আছ। ভক্ত বলবে, হ্যাঁ ভাই আমি অজ্ঞানেই আছি, তার জন্য আমার কোন সমস্যা নেই। তুমি জেনে রাখো, আমি যাঁর পূজা করছি, তুমি জ্ঞানী

হয়ে তাঁরই চিন্তন করছ। তুমি তোমার মনের এলাকার বাইরে চলে যেতে চাইছ, আমার এতে কোন আগ্রহ নেই।

*ভোক্তারাং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*, আমি সব কিছুর ভগবান, আমিই দেবতা রূপে সমস্ত ভোগ গ্রহণ করি আর ঈশ্বর রূপে সব লোকের নিয়ন্ত্রণ করি। *সুহৃদং সর্বভূতানাং*, আমি কারুর প্রত্যুৎকার চাই না। আমি যে মানুষের ভাল করি, প্রত্যেক জীবকে যে ভালবাসি, তা আমি নিজে থেকেই করি। আমাকে প্রসাদ দিয়ে যে বলবে, হে ঠাকুর তোমাকে প্রসাদ দিলাম, আমার ভাল কর; না, ওই প্রসাদের বিনিময়ে আমি কারুর কিছু করি না, আমি যা করার নিজে থেকেই করি।

আচার্য বলছেন, *সর্বকর্মফলাধ্যক্ষং সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং*, এই সংসারে যত কর্ম হয় তার অধ্যক্ষ আমি, আমি যদি অধ্যক্ষ না হই তাহলে আপনি ভাল কর্ম করলেন, তার ফল আমি পেয়ে যাব। ভগবান সব কর্মের অধ্যক্ষ, তিনি আছেন বলে সবাই ঠিক ভাবে কাজ করে। আর তার সাথে বলছেন, *সর্বপ্রত্যয়সাক্ষি*, তোমার বুদ্ধিতে যা কিছু চলে সব কিছুর সাক্ষি আমি। ভগবান সবার অন্তর্যামীর রূপে ভিতরে আছেন, তিনি সরাসরি কোন কিছুতে জড়ান না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই এই বুদ্ধি বৃত্তি গুলি কাজ করে।

*জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্বসংসারোপরতিম্*, এই জিনিসটা যখন বুঝে নেবে, সমস্ত দেবতা রূপে আমি যজ্ঞাদির ফল গ্রহণ করি আর আমি হলাম সবারই সুহৃদ্, *সর্বকর্মফলাধ্যক্ষ*, আর আমি সাক্ষি রূপে আছি বলে, আমি কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করি না, সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে –এই জিনিসটাকে বুঝে নিলে এই সংসার থেকে তোমার নিবৃত্তি হয়ে যাবে। এবার আপনি ঠিক করুন কোন মার্গ নেবেন, জ্ঞানমার্গ নেবেন, নাকি ভক্তিমার্গ নেবেন। কিন্তু দুটোতেই আপনাকে এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সংসার থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসল শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর যদি জ্ঞানযোগী না হয়ে কর্মযোগী হন, তাহলে ধ্যানযোগ আপনার জন্য অত্যন্ত দরকার। জ্ঞানীদেরও প্রথমের দিকে ধ্যানযোগ দরকার, কিন্তু তাঁরা সেখান থেকে আরও এগিয়ে যান। এরপর আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চোমহধ্যায়ঃ।।**